# স্মরণে মননে বিবেকানন্দ

## প্রথম খণ্ড

মুখ্য-উপদেষ্টা

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
কান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ ঃ
অজয় গুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ / সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

## উৎসর্গ

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবাদ' সমগ্র বিশ্ববাসীকে শান্তি, প্রীতি ও জাতীয়-সংহতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক

# ভূমিকা

যে-সমস্ত বহ্নিকণিকা অযুত-নিযুত আলোকবর্ষ অতিক্রম করে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়েছিল তার সবগুলির আলো এখনো মৃত্তিকা স্পর্শ করতে পারেনি। তারই দু-একটি স্ফুলিঙ্গ হচ্ছেন বেদ-উপনিষদের ঋষিগণ, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীস্ট, শ্রীচৈতন্যাদি মধ্যযুগের সাধকগণ এবং আমাদের কালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁর যথার্থ স্বরূপ অবধান করতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুরও বুঝেছিলেন এ-যুবক আকাশের চলবিদ্যুৎ, একে কাচের আধারে বন্দী না করলে এত বড়ো শক্তি উল্কাবেগে নিঃশেষ হয়ে যাবে, জগৎ ও জীবনে তার কোনো চিহ্নই থাকবে না। তাঁরই কৃপায় নরেন্দ্রনাথের নির্মোকের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি নিজেকে বিশ্বহিতে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তো গিরিদরীতে ধ্যানস্থ হয়ে আত্মসম্বিতের গভীরে নিমজ্জিত হতে পারতেন। কিন্তু তাতে জগতের কার কী উপকার হত? নানা জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে তিনি দর্শনে, ধর্মগ্রন্থে, ইতিহাসে, মানবজীবনরহস্যের অতলে অবতরণ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম-তত্ত্বে'র গুরুর মতো নিশ্চয় নিজেকে প্রশ্ন করতেন, "এ-জীবন লইয়া কী করিব? লইয়া কী করিতে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে না এলে হয়তো তিনি সারা জীবন এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। হয়তো মনে করতেন, "সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" অথবা হয়তো বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যুক্ত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে থাকতেন। জনে জনে প্রশ্ন করে হয়তো তিনি মনের প্রদাহ দূর করতে চাইতেন। কিন্তু সমুদ্রের জলে তৃষ্ণা মেটে না, বরং বেড়েই যায়। তেমনি জ্ঞান তাঁকে তৃপ্তির চেয়ে তৃষ্ণা দিত বেশি।

জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি—একি একই সত্যের ত্রিধারূপ? বিশ্বপ্রপঞ্চ কি পারমার্থিকভাবে নঞর্থক? অনন্ত গতিপ্রবাহ এবং নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে কোনো 'কালত্রয়াবাধিতং সত্যম্' আছে কি? ঈশ্বর কি জ্ঞানাতীত, বোধাতীত নিগূঢ় সত্তা? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। জ্ঞান-কর্ম-প্রেম এক মাল্যবাঁধনে গ্রথিত হল। নরেন্দ্রনাথ নামক এক খণ্ড আকরিক লোহকে জ্ঞান ও সাধনার প্রস্তরফলকে শাণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সহস্র ফলাযুক্ত দিব্যায়ুধে পরিণত করেছিলেন। বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিবেকের মানদণ্ড হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমকে দুই বাহুতে ধারণ করে আছেন, যেমন আছেন দেবতাত্মা হিমালয়—"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব

মানদণ্ডঃ"। তাঁর সেই স্বরূপটি তুলে ধরার জন্য এই সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে বিবেকানন্দ কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় সন্ন্যাসধর্মের মতো সমাজকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সাযুজ্য কামনা করেননি। একথা অবশ্যই তর্কাতীত যে, ঈশ্বরচেতনা বাদ দিয়ে বিবেকানন্দের যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে না। এই চেতনাই তাঁর আলোকস্তম্ভ। একালের মননশীল ব্যক্তিদের কেউ কেউ বিশুদ্ধ সমাজবাদ, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ইতিহাস, বস্তুবিজ্ঞান, লোকহিতবাদ ও লোকশ্রেয়বাদের প্রাচীরে উঠে তাঁকে অবলোকন করতে চান। ভূমির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও ভূমাকে বাদ দিয়ে তাঁর যথার্থ পরিমাপ করা যায় না। মানুষের ইহমুখী সত্তার যথার্থ মূল্য স্বীকার করেও তিনি উপযোগবাদের ভূমিতলে একমাত্র আশ্রয় নেননি। মাটি ও আকাশ—দুই ই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কারণ "একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়"—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন. মাটিতে বিচরণ করলেও দৃষ্টি যেন ঊর্ধ্বমুখী থাকে। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য —পশু মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাবার তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ জীবন ও জীবিকার উপরেও আরো একটা সত্যের সন্ধান জানে, সে আকাশকে আলিঙ্গন করতে পারে, প্রকৃতিদত্ত প্রাকৃত প্রয়োজনকে স্বীকার করেও তাকে সে অতিক্রম করতে পারে। তাকেই বলে মনুষ্যত্বের সাধনা। মানবেতর প্রাণীকে চেষ্টা করে জীবনের অর্থ খুঁজতে হয় না, পশুত্বই তার আদি ও অন্ত। কিন্তু মানুষকে স্বকৃত চেষ্টার দ্বারা মানুষ হতে হয়—মানুষের প্রতি বিধাতার এইটি শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। বিবেকানন্দ সেই মনুষ্যত্বের সাধনা করেছেন।

ভক্ত ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? ভক্ত তাঁর মধ্যে দৈবী ও মানুষী মহিমার সমন্বয় দেখতে চান। অপর দিকে যাঁরা মননের দ্বারা বিবেকানন্দের ক্রিয়াকর্ম, ভাব ও আদর্শ বিশ্লেষণ করতে চান—তাঁরা তাঁকে আধুনিক বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজবাদী, নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক নেতা এবং জনগণেশের ধ্বজপতাকাধারী রূপে দেখতে অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে, ভক্তির নির্বাধ আবেগ তাঁকে পুরোপুরি বুঝতে সাহায্য করে না, তেমনি শুধু মননের দ্বারাও তাঁকে বোঝা যায় না। দুই বৃত্তির সুষ্ঠু সমন্বয় হলেই তাঁকে যথার্থ যুগপুরুষ বলে চিনে নেওয়া যায়। যে বিবেকানন্দ বেদান্তকেশরী, নিষ্কল ব্রহ্মবিদ্, তিনিই আবার অপার মমতায় ও সীমাহীন সহিষ্ণুতায় হতভাগ্য 'পারিয়াকে' বুকে টেনে নিয়েছেন। নিষ্কাম কর্ম তাঁকে নিঃস্পৃহ করে তোলেনি, বরং স্নেহ-মমতা-ভালোবাসায় ব্যাকুল করে তুলেছে। কর্ম করেই কর্মের বন্ধন ক্ষয় করতে হয়—এই মহাবাক্যে তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল। গেরুয়া বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করলেও তিনি ছিলেন যথার্থ জননেতা। অবশ্য সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির সুলভতম উপায় নয়, জনতাকে তিনি স্থূল প্রয়োজনের সীমায় বেঁধে রাখতে চাননি, তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন নবজীবনের আবির্ভাব।

মূলতঃ বেদান্তের উপর ভিত্তি করে তাঁর চিন্তাধারা, সাধনা ও ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হলেও বিশ্ববোধ, ইতিহাসচেতনা এবং বাস্তব সুখ-দুঃখের প্রতি ছিল সতর্ক অনুসন্ধিৎসা। বেদান্ত শুধু মোক্ষশাস্ত্র নয়, তার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের তাৎপর্য ও মহিমা খুঁজতে হবে। বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ এবং সেজন্য মমকার-অস্মিতাকে বাদ দিয়ে নিষ্কাম কর্মের অতন্দ্র অনুশীলনে জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির অনুধাবন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ ত্যাগের জীবন গ্রহণে উপদেশ দিয়েছে—'মা গৃধঃ', এইটি সনাতন ভারতবর্ষের বাণী। অপরদিকে পাশ্চাত্য জগৎ ভোগের জীবনকেই অধিকতর স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রথমটির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে দেশ-সমাজ-মানুষ-লোকহিত প্রভৃতি বাস্তব জীবনচর্যা মায়াময়, সুতরাং ধূম্রস্বভাব হয়ে যায়। দ্বিতীয়টিকে একমাত্র শরণ্য বলে জানলে সমস্ত জীবনটাই হেডনিস্ট্ কামসংহিতায় পরিণত হয়। ধর্মার্থকামমোক্ষ সমান ভাবে সেবা করতে হবে। যে-ব্যক্তি শুধু একটিতে লগ্ন হয়ে থাকে সে অতি নিকৃষ্ট জন—ভারতের শাস্ত্র এই উপদেশ দিয়েছে। এই ভাবটিকে ঐতিহাসিক সীলি (John Robert Seeley, 1834-95) বলেছেন 'Religion of Culture'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাকেই বলা যেতে পারে 'অনুশীলনতত্ত্ব', শ্রীকৃষ্ণ যার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাই ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম। মাঝখানে কয়েক শতকের জন্য নাস্তিক্যবাদী ও বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম তাতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সে যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ ত্যাগব্রতের গেরুয়া ধারণ করেছিলেন। তার একপিঠে বৈরাগ্য, আর একপিঠে প্রেম—যে-প্রেম কামনাশূন্য, বিশ্বহিতপ্রাণ, বিরজা হোম।

কমল হীরকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হলে তা থেকে সহস্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, বিবেকানন্দ তেমনি একটি হীরকের সহস্রমুখী দ্যুতি। তাঁকে যে যে-ভাবে দেখেছেন, এই সংকলনে তারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ-দেশ ও বিদেশ, প্রবীণ ও নবীন, যোগী ও কর্মী, বিজ্ঞানী ও সাধক—এমন কি যিনি সংশয়ের অস্তি-নাস্তির মধ্যে ঘূর্ণায়মান, তাঁদের বিচিত্র ও বিবিধ রচনা এই সংকলনে গ্রথিত করে বিবেকানন্দের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মানচিত্র অংকন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্যকে খোঁজা যায় না। তবু প্রদীপের ক্ষীণ শিখারও মূল্য আছে। আমরা সেই চেষ্টাই করেছি।

যিনি ভক্ত, সাধক ও যোগী—বিবেকানন্দের বাণী তাঁর মনের রসায়ন। তেমনি যিনি বাস্তব দুঃখহত মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তার আশ্রয় দিতে চান, যিনি সমাজসেবী, হতভাগ্য শ্রমিক-কৃষক, অস্পৃশ্য মানুষের সেবায় আত্মদানে অভিলাষী, তিনিও স্বামীজীর বাণী থেকে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করবেন। বিশ্বের কোনো অবতার, কোনো নবী, কোনো মেসায়া পার্থিব জীবনের এতটা গুরুত্ব স্বীকার করেননি। তাঁদের কাছে ত্রিবিধ দুঃখে অভিহত মানুষ দেহদশাধীন তন্মাত্রের জড় প্রতীক মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সেই মানুষকেই অমৃতের সন্তান বলেছেন, তারই মধ্যে অনন্ত শক্তির সম্ভাবনা নিদ্রিত অবস্থায় আছে—যেমন একটি পরমাণুর মধ্যে

সৃষ্টি ও ধ্বংসের লক্ষকোটি সম্ভাবনা সংগুপ্ত অবস্থায় থাকে। শুধু বেদান্তের নিষ্কল ব্রহ্ম নন, মানুষের মধ্যে সেই ব্রহ্মসনাতনকে উপলব্ধি করা, তৃণখণ্ডের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করা—এই তো ভারতের নিত্যধর্ম। অবশ্য কালবিবর্তনে যুগধর্মের প্রভাবে তার কিছু আকার-প্রকার বদলে গেছে, কিন্তু তাতে নিত্যধর্মের কিছু ব্যত্যয় হয় নি, যেমন অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণের আকার বদলালেও তার গুণগত উৎকর্ষ কিছুমাত্র ম্লান হয় না। দীর্ঘদিন পরজাতি-পদানত হয়ে আমরা যে খকথ ভুলে গেছি, শ্রীশ্রীঠাকুর তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বাণীই গেরুয়া পতাকায় খচিত করে স্বামীজী দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছেন। আজকের বিশ্ব সেই ভাব-ভাবনাকে নব্য মানবধর্ম (neo-humanism) বলে গ্রহণ করেছে। এতদিন পশ্চিম মনে করত, পার্থিব এষণার অতিরিক্ত আর কোনো সাধ্যসাধনা নেই, 'মিস্টিক' ভারত তার কাছে স্বপ্ন-মায়া-মতিভ্রম বলে উপহসিত হত। "অন্নং বহু কুর্বীত" —বহু অন্ন দান কর, এর চেয়ে আর কোনো বড়ো প্রার্থনা তাদের সমাজবিপ্লবী ও অর্থনীতিবিদের মনে স্থান পায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই য়ুরোপ নব্য মানবতাবাদ প্রচার করেছে। তাঁরা বলেছেন, পুঁথির মধ্যে ধর্ম নেই, দেবালয়ের শিলাস্তূপেও ধর্ম নেই। সে ধর্ম আছে মানুষের জীবসত্তা রক্ষার জন্য মঙ্গল-প্রচেষ্টার মধ্যে—য়ুরোপের ইহবাদী বার্হস্পত্যগণ এতদিন ধরে এই চিন্তার নিশান উড়িয়ে শোভাযাত্রা করেছিলেন। অবশ্য এ-কথা অযুক্তিযুক্ত নয় যে, তাঁরা নর-কে নরোত্তমে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সংগ্রাম করেছেন —'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ', এই মন্ত্র স্মরণ করে মিল-বেন্থাম-কোঁতের দল সর্বহারা দরিদ্রদের মনুষ্যত্বের অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লব মানবমুক্তির নব বেদমন্ত্র ঘোষণা করেছিল—liberté, egalité, fraternité, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেই পতাকায় লেখা হল *royauté*, ১৮০৪ সালের ১৮ মে যেদিন নেপোলিয়ন ফরাসি জাতির সম্রাটরূপে নিজেই নিজের শিরে রাজমুকুট ধারণ করলেন। তার অর্ধশত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপের কত পরিবর্তন হয়ে গেল। ১৮৪৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে একাধিক ইণ্টারন্যাশনালের ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছে—শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক প্রতীকগুলি অধুনা একের পর এক ধূলিসাৎ হচ্ছে কেন? এর কারণ জনকল্যাণমূলক হিতবাদে বদ্ধদৃষ্টি হয়েও সমাজের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা নরের মধ্যে নরোত্তমকে, এবং নরোত্তমের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। তাই কোঁতের পজিটিভিজম্ (ধ্রুববাদ), মিল বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ (উপযোগবাদ) এবং জড়বাদী দ্বান্দ্বিক সাম্যদর্শন (ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজম্) ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। বেকন-কথিত সেই *idola*-গুলি আজ খরিদ্দারের অভাবে পথিপার্শ্বে অবহেলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিস্মরণীর পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ভারতবর্ষের চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনের মধ্যে এই ধরনের বিরোধ ছিল না।

পুরাণের প্রথমেই নর-নরোত্তম ও নারায়ণের জয় ধ্বনি করে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছে। য়ুরোপ শক্তিহীন, ভীরু, নির্যাতিত জনসংঘকে রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নর-কে নরোত্তমের পর্যায়ে কতকটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সমাজবিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রামের সাহায্যে সাধারণ মানুষ (অর্থাৎ 'নর') অসাধারণ শক্তি অর্জন করে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর প্রোলেটারিয়েটে ('নরোত্তম') পরিণত হয়েছে, যুক্তির দিক থেকে এ ধারণা অযথার্থ নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ এখানেই থেমে যায়নি—নর-কে নরোত্তমে এবং নরোত্তমকে নারায়ণে পৌঁছে দিয়ে তবে তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। য়ুরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সেই ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত বলেই প্রতীচ্যের ইতিহাস বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। নর-কে ক্রমে ক্রমে নরোত্তম ও নারায়ণে উন্নীত করতে না পারলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের অন্ন-বস্ত্র-আচ্ছাদনের সমস্যাও মিটবে, কিন্তু thesis-antithesis synthesis, এবং পুনরায় ঐ পথে অনন্ত চক্রাবর্তনে মানুষের বড়ো সত্তা ক্ষণে ক্ষণে বিপন্ন হবে। য়ুরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস তারই শোচনীয় সাক্ষ্য বহন করছে। বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষ প্রহরে ইতিহাসের এই দুর্গতি অনুমান করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব যে সংকটের মধ্য দিয়ে মৃত্যুগুহার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু শুধু সমাজতত্ত্ব বা রাজনৈতিক চেতনা নয়, তিনি মানুষের আত্মিক কল্যাণ কামনা করেছিলেন। যে-মানুষ শুধু ক্ষুৎক্ষামদুর্বল জীবমাত্র নয়, তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই জাগাতে চেয়েছিলেন। একদিকে তিনি ভারতের সনাতন সত্তা, তার অধিমানস, অধ্যাত্মচেতনা ও আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন, অপরদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ ও সেবাধর্মকে পুঁথির মধ্যে বন্দী না রেখে জীবন-সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দরিদ্র, হতভাগ্য, নিরন্ন, অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁর মতো কোন্ জননেতা এত গভীর ভাবে ভেবেছিলেন, এত মমতায় বুগে জীর্ণ কংকালগুলিকে আতপ্ত হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন? মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব তারও বিশ-পঁচিশ বছরের পরবর্তী ঘটনা। স্বামীজীর উদাত্ত বাণী জড়পিণ্ডবৎ ভারতবর্ষকে নবজাগ্রত বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়েছিল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের দীপ্ত মশাল তাঁরই করধৃত দীপশিখা থেকে অগ্নি চয়ন করেছিল। সেকালের রক্তপথের যাত্রী নবযুবকের দল গীতা, বিবেকানন্দের গ্রন্থ ও বন্দেমাতরম মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে ভয়ঙ্করের অভিসারে বেরিয়েছিল, তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্য উল্লাসে অধীর হয়েছিল, তাঁর এই বাণী বেদমন্ত্রের মতো তাদের অভীঃ করে তুলেছিল—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ···।"

ভারতের পতন শুরু হয়েছিল দশম শতাব্দী থেকে। জাতিভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বে জর্জর শতধাবিদীর্ণ হিন্দুসমাজ শূন্যগর্ভ অধ্যাত্মবিলাসের গিরিগুহায় বন্দী হয়ে

বাস্তবের নিষ্কমালা ভাঙিয়ে মোক্ষ-মুক্তি-নির্বাণের স্বপ্নসৌধ রচনায় ব্যস্ত ছিল। ভগবান তথাগতের ধর্ম ও নীতি হিন্দুধর্মের বনিয়াদ ভেঙে সব একাকার করে ফেলেছিল, কিন্তু ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সর্বম্ অনিত্যম্, সর্বম্ অনাত্মম্, নির্বাণম্ শান্তম্—যার শেষ পরিণাম শূন্যবাদের তামসিক বিকার। মহাযান শাখা যখন বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযানে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল, তার পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের অধঃপতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আচার্য শঙ্কর ও কুমারিল ভট্ট সনাতন ধর্মের বাঁধ দিয়ে সে অবক্ষয় রোধ করতে পারেননি। পরস্পর বিবদমান, ভারতবর্ষের জাতি-সম্প্রদায় ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব দশম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই উৎকট রূপ ধারণ করেছিল—সমগ্র সমাজ ভগ্নবিধ্বস্ত হতে বসেছিল। সেই দুর্বলতম মুহূর্তে নব বিশ্বাসে বলীয়ান মরুপর্বতবাসী ইসলাম-ধর্মাবলম্বী দুর্ধর্ষ অভিযানকারীর দল ভারতসীমান্ত অতিক্রম করল জয়োদ্ধত হুংকার দিয়ে, উৎক্ষিপ্ত বর্শাফলকে অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পীতপতাকা ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করে, কোষমুক্ত শাণিত তরবারি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ ক'রে। সে আঘাত ভারতবর্ষ সহ্য করতে পারল না—দলে দলে মৃত্যু বরণ করে, কখনো ধর্মত্যাগ করে, প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা করল। তারপর মুসলমান রাজশক্তির শাসন চলল প্রায় আট শ বছর ধরে। কিছু নাগরিক বিলাস এবং ভক্তিবাদী সুফী ধর্ম ছাড়া ভারতবর্ষের অন্তরে ও বাইরে ইসলামের বিশেষ কোন গভীর প্রভাব নেই—যারা ধর্ম ত্যাগ করেছিল তাদের কথা স্বতন্ত্র। হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্রাংশ ইসলামের কাছে মাথা নত করল। সমাজের নীচের তলায় দাঁড়িয়ে যে-সমস্ত শূদ্র-পারিয়ার দল ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের গুরুভার বহন করত, প্রতিদানে তারা যুগযুগ ধরে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে শুধু ঘৃণাই লাভ করেছে, মানুষের সামান্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। অপর দিকে ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে তারা সাড়া দিয়েছিল—কিছুটা আশাবায়ুতে মুগ্ধ হয়ে, কিছুটা বা প্রাণভয়ে। ভারতের শাস্ত্রযাজী অংশ স্মৃতি-সংহিতার পাতি মিলিয়ে সমাজ শাসনে ব্যস্ত ছিল। অপরদিকে সরিয়ত-শাসিত ইসলামধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ভারতবর্ষ কবলিত হল। বিশুদ্ধ 'তমদ্দুনে'র চাপে হিন্দুর ধর্মকর্মশীলসদাচার ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল, অনুস্বার-বিসর্গের টংকার দিয়ে এবং অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের বচন আউড়ে দুর্দৈব এড়ানো গেল না। ইসলামের প্রবল জীবনাসক্তি প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মতো ভারতবর্ষ প্লাবিত করে ফেলল। এই বৃহৎ দেশ তখনো নির্বেদ-বৈরাগ্যের জীর্ণ কাঁথা মুড়ি দিয়ে মোক্ষের স্বপ্ন দেখছিল। তখন সাত্ত্বিকতা ঘোর তামসিকতায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমা ও অহিংসা ক্লীবতার ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছে, ভারতের রাজা-মহারাজা, ক্ষত্রপ ও সামন্তবর্গ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে পরস্পর কলহে মত্ত। ইসলামের প্রধর্ষী আক্রমণের সামনে আত্মহত্যা বীরত্ব বলে পূজা পাচ্ছে। অতঃপর সেই শ্মশানভূমিতে শিবের অনুচরের দল বলপূর্বক প্রবেশ করে যজ্ঞভঙ্গ করল। তারপর আটশত বৎসর ধরে নীরব শূন্যতার যুগ। শুধু মধ্যযুগীয় সন্তসাধক ও সুফী পীর-ফকির-আউল-বাউলের দল জীবনের অস্তিবাদী দিকটি

বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাই এই যুগে ভারতের চূড়ান্ত অধোগতি হয়নি। দূর দ্বীপবাসী ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের পর ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ঐহিকতার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, মধ্যযুগীয় তন্দ্রাতুর জড়তাও অনেকটা দূর হয়েছে, কিন্তু সামাজিক পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে ভেদ ছিল, ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের ইংরেজি-জানা ও ইংরেজি না-জানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-ব্যবধান কি তারও চেয়ে অল্প ? পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের অনেক দিক থেকে ঐশ্বর্যবান করেছে, কিন্তু দূরপনেয় ক্ষতি করেছে, আমাদের চরিত্রহনন করেছে, মনুষ্যত্ব আবিল করেছে। তা না হলে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়েও এদেশের সমাজ ও রাজনীতি ক্রমেই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে পরিণত হয়ে উঠছে কেন ?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারিনি। অধুনা য়ুরোপের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী ও কর্মদর্শনের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাইছেন—কীভাবে একটা বিশাল ভূখণ্ড এত দীর্ঘকাল ধরে পরজাতির পীড়নে নিষ্পিষ্ট হয়েও নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পারেনি, তার গূঢ় কারণ ইতিহাসের বস্তুপিণ্ডের মধ্যে নেই, আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনার মধ্যে। তাই এতদিন ধরে যারা ধর্মকে অহিফেন বটিকা বলে নস্যাৎ করে আসছিল, এখন আবার তারাই ধর্মের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেয়েছে। রথযাত্রার পর উল্টোরথের পালা কেউ ঠেকাতে পারে না। এ সংকলনে গৃহীত স্বামীজী-সংক্রান্ত দেশ-বিদেশের মনীষীদের প্রবন্ধ নিবন্ধে সেই সমস্ত সমস্যা গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। কেউ ভক্ত, কেউ সাধক, কেউ জ্ঞানমার্গের পথিক, কেউ-বা সংশয়বাদী। কিন্তু সকলেই স্বামীজীর সাধনা, চিন্তা ও কর্মপ্রণালী ধৈর্যের সঙ্গে অবধারণ করতে চেয়েছেন। তাঁর ঋধিমানসের অনুপুংখ অনুশীলন, বিশ্লেষণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি মমতা, ইতিহাস রাষ্ট্র সমাজ—সর্বোপরি দীনদরিদ্র-বঞ্চিতের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা—এই আলোচনাগুলিতে তাঁকে নানা দিক থেকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর দেশ-বিদেশের ভক্ত ও অনুরাগীদের চিন্তাধারা উপস্থাপিত করে, এবং তাঁর নিজের কথার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর জীবন-চেতনার স্বরূপ সন্ধান এই প্রবন্ধগুলির মূল উদ্দেশ্য। কোথাও ভক্তির উচ্ছ্বাস, কোথাও তদ্‌গত আত্মনিবেদন, কোথাও যুক্তিবুদ্ধির অতন্দ্র নিষ্ঠা, কোথাও বিজ্ঞানমনস্কতা—তারই নিরিখে এযুগের সাধক, চিন্তানায়ক ও মানবহিতব্রতী স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপন্থা ও চেতনার সম্যক অবধারণ সহজ ব্যাপার নয়। কারণ পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের, প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্যের, কর্মের সঙ্গে নৈষ্কর্মের এবং ইহর সঙ্গে পরত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক অধিগত করা বিশেষ অধিকার সাপেক্ষ। শুধু ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা নয়, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রও নয়—তার সঙ্গে বিশ্ববীক্ষাশক্তি না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দের মনঃপ্রকৃতি দুরধিগম্য রয়ে যাবে। এই নিবন্ধগুলি সেই সমস্ত সংশয়-সন্দেহ পার হতে কিছু সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই সংকলনের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সম্পাদক ডক্টর শ্রীমান প্রদ্যোত সেনগুপ্ত। তিনি আমার পুরাতন ছাত্র, সুতরাং তাঁর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। পাঠক-পাঠিকারাও তাঁর নিপুণ বিন্যাসকুশলতার পরিচয় পাবেন। বহু দুরধিগম্য স্থান থেকে তিনি নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা উদ্ধার করেছেন, কোন কোনটিকে বিস্মৃতির গ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন। এবং সেগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে একটি সুশৃংখল চিন্তাপ্রবাহে পরিণত করেছেন। এজন্য তিনি জিজ্ঞাসু ও শ্রদ্ধাবান পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবেন। এই প্রসঙ্গে 'বর্ণালী' প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার কান্তিরঞ্জন ঘোষকে সাধুবাদ দিই। তিনি তিনখণ্ডে সমাপ্য এই বিশাল গ্রন্থকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন, এবং তার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস বৃহত্তর পাঠকসমাজে বিস্তার লাভ করুক এই আমার একান্ত কামনা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয়—যিনি ঐ যুগেই নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রবাদী বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আবার সমাজতন্ত্রই যে সর্বপ্রকার সমস্যামুক্তির সুনির্দিষ্ট একমাত্র মৌলিক বাহন, একথাও বিবেকানন্দ কখনই উচ্চারণ করেননি। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার নানা উজ্জ্বল দিক বর্তমান। বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্বের চালচিত্রে তাঁকে যুক্তিধর্মী সংগঠক, ধর্মবীর, কর্মবীর এবং যুগের তুলনায় আশ্চর্যরূপে প্রাগ্রসর পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই হয়। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—স্বামীজীর দূরদৃষ্টি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবজীবন ও কর্মধারার সংগঠনমুখী দিকটির অনুকরণ। পাশ্চাত্যের গঠনমূলক ভাব-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপাদানগুলিকে প্রাচ্যের প্রয়োজনে গ্রহণ করেছেন, আবার প্রাচ্য জাতির মানসিক গঠন, আচার-ব্যবহার ও কার্যপ্রণালীর বিবেকানন্দ সুবিস্তৃত পরিমাপও করেছেন। বিবেকানন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলসত্তাকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণেই উপস্থাপিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই ইতিহাসচেতনা 'বহুল পরিভ্রমণ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা'য় তাৎপর্যপূর্ণ, ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার-ব্যবহারের ব্যাখ্যা এই ইতিহাসবোধকে গভীরতর করেছে। সেই সূত্রেই স্বাদেশিক প্রেম ব্যক্ত হয়েছে। জাতীয় ভাবগুলির নিরপেক্ষ দর্শন প্রসঙ্গে নানা জিজ্ঞাসা ও উত্তরের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ একান্তরূপেই মৌলিক। মন ও মননে, সত্যানুরাগে, স্পষ্টবাদী-নিরপেক্ষ মনের পরিচয়ে নিন্দা-স্তুতির সমমূল্য দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রবাদী বিবেকানন্দের আত্মবিশ্লেষণ মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির মতো—তা জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন জীবনচর্যা, ইহমুখীনচিন্তা ও ভাব, রাষ্ট্রিক চেতনায় ভাস্বর। শেষাবধি আধিমানসিক পরম উন্নতির সহায়ক। বিবেকানন্দ ভারতাত্মার প্রতীক—তাঁর অভ্রান্ত মতাদর্শ ও পথনির্দেশনা আজ বিশ্বমুখী চেতনাতেও বিস্তৃত। ব্যক্তি বিবেকানন্দ তাঁর কর্ম ও ভাবজীবনের আলোকে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি। নানা মতের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে স্বতন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। নিজের মৌলিক উপলব্ধির সঙ্গে রিয়্যালিস্ট বিবেকানন্দ গুরুদেবের ধ্যান-ধারণাকে সমন্বিত করে কর্মমুখীন এক বিশেষ ভাবদর্শনেরও স্রষ্টা। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নানা মতাদর্শের ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাদ' আমাদের মতে স্বতন্ত্র মাত্রা যোজনার একটি ধ্রুব কেন্দ্র। স্বামীজীর একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে ভারতে ও বহির্ভারতে যখন নানাভাবে স্বল্পায়ু বিবেকানন্দের চিরজীবী মতবাদ পুনর্বিচারে মহাসাগরের ব্যাপ্তি ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল—তখনই বিবেকানন্দের কর্মমুখীন, ধ্যান-সন্নিহিত এবং যুক্তি-মার্জিত ভাবাদর্শের একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নের ইচ্ছা জেগেছিল। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবাদে'র এই আধ্যাত্মিক চিন্তামিশ্রিত ব্যবহারিক

আধুনিকতার পূর্ণরূপায়ন খুবই দুরূহ কঠিন বলে উপলব্ধি করা গেল। তখনই এই কঠিন সাধনার নানা দৃষ্টিকোণকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ-উপলব্ধিকে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করবার দুরন্ত মানসিক তাগিদ অনুভব করেছিলাম। এক্ষেত্রে ভাব-ভাবনা যতই এগিয়েছে, ততই স্বামীজীকে আশ্চর্যরূপে আধুনিক মুক্তমতির অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন একজন অনন্য পুরুষ বলে মনে হয়েছে। এই মানসিক একান্ত প্রেরণার ফলশ্রুতিই হল আলোচ্য 'স্মরণে মননে বিবেকানন্দ' পর্যায়ের গ্রন্থ। বিবেকানন্দের নানামুখী চিন্তা-চেতনার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাকে ঘিরে এ গ্রন্থটি বিশাল বনস্পতির মতো—তিনটি সুচিন্তিত খণ্ডে তাই গ্রন্থখানি সমাপ্য। বিবেকানন্দের বিপ্লববাদের স্বরূপের আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মবাদ সমমাত্রিক গুরুত্বে সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত। আধ্যাত্মিকতার ফলিত দিকটি বিবেকানন্দের সমাজবিপ্লব-বাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ। বিবেকানন্দের সমগ্র দর্শন এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী। এই সমগ্র দর্শন আবার ইতিহাস-অনুমোদিত। শুধুমাত্র ভাবযোগেই নয়—কর্মযোগেও তিনি অভিলাষী ছিলেন, বিপ্লবের মন্ত্র বিদ্যুৎতরঙ্গের মতোই সেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে। বস্তু-তন্ত্রবাদী ও অধ্যাত্মমিশ্রবাদী ধারণা মানবিক দৃষ্টিকোণে সমাজতন্ত্রে সম্মিলিত হয়েছে। তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব, স্বদেশীয় ভাবসংহতির সহায়ক নানা উপাদানকেও তিনি আত্মস্থ করেছেন।

বিবেকানন্দের এই সামগ্রিক চিন্তানায়কের মূর্তিকে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্মরণ ও মননের নানা প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবেকানন্দের অনন্য ব্যক্তিত্বকে সূক্ষ্ম প্রণালীতে ও বিন্যাসগত প্রকৃত স্বরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়ে আমরা প্রথমেই বিবেকানন্দের প্রতি আমাদের মানসিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। সুর ও কথারসে ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করতে চেয়েছি। বহু ভক্তসাধক ও বিদগ্ধ কবি-মহাকবিদের রচিত ভজনগুলি এক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়েছে। অপ্রচলিত বা লোকচক্ষুর অন্তরালের বহু 'বিবেকানন্দ-গীতি' এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভক্তি-গীতির পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আমরা এক জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে উপস্থিত হতে চেয়েছি। কেন্দ্রানুগশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত স্নেহের নরেন্দ্র তাঁর দৃষ্টিতে কোন্ ভাবের প্রতীক, আবার বিবেকানন্দের ভাবে তাঁর গুরুই বা কিভাবে অনন্ত জ্যোতির জ্যোতি, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের আশ্রয়ে সৈনিক-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের রূপ—আবার বিবেকানন্দের মানস-গঠনে দেবী সারদা কিভাবে একই সঙ্গে 'আকাশ ও নীড়'—তার বিশ্লেষণ, লোকমাতা নিবেদিতার দৃষ্টিতে স্বামীজী, স্বামীজীর দৃষ্টিতে নিবেদিতা, ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকারের শততমবর্ষ কিভাবে ভারতবর্ষীয় চেতনার মহামিলন ঘটিয়েছে—স্তরে স্তরে ইতিহাসের সেই তথ্যকে এখানে বিবেকানন্দ-পরিচয়ে সমন্বিত করে বিভিন্ন লেখকের মূল্যবান রচনাগুলিকে সাজানো হয়েছে। বিবেকানন্দের বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত অনুরাগী ভক্তবৃন্দের এবং স্বামীজীর পাদমূলে দীক্ষিতা বিদেশিনীদের পরিচয়ও এ গ্রন্থে ঐতিহাসিকসূত্রেই বিধৃত। বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্যের অসীম পরিধির পরিচায়ক

হিসেবে অধ্যায়গুলির হয়ত স্বয়ং স্বতন্ত্র মূল্য আছে। বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ, স্বামীজীর সান্নিধ্যে, বিবেকানন্দ দুমুখোছুরি, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, ইত্যাদি নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিবেকানন্দের যে স্বরূপ এখানে পরিস্ফুট—তা নিঃসন্দেহে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাদের' পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতবর্ষ, ভারতীয় ঐতিহ্য-চেতনা ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেও বহু প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতধর্ম'—অধুনালুপ্ত এই প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য একটি নতুন সংযোজন। স্বামীজীর মন ও মননে সংশ্লিষ্ট উপনিষদ ও ভারত সভ্যতার প্রসঙ্গ নতুন দৃষ্টিকোণে আলোচিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের ধর্মমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনায় বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ-চেতনায় মুসলমানধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা, স্বামীজীর জীবনে ও চিন্তা-ধারায় সুফী প্রভাব, স্বামীজীর বেদান্ত দর্শনের নানা পরিচয়, বিবেকানন্দ ও নব বেদান্ত, বিবেকানন্দের কর্মে পরিণত বেদান্ত, শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দের দৃষ্টি-কোণে 'অপরোক্ষানুভূতি' ইত্যাদি নানা সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির আলোকে বিবেকানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'স্মরণে মননে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যার আলোকে ও সাহিত্যের রসের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

'স্মরণে মননে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের পরিকল্পনা ক্ষেত্রে মুখ্য-উপদেষ্টারূপে আমার শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হয়ে আমায় অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশনা এক্ষেত্রে আমাকে অমোঘ মন্ত্রের মতো পরিচালিত করেছে। তাঁর লিখিত একটি সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকা গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

'বর্ণালী' প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। এই বিশাল গ্রন্থত্রয়ী তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-আনুগত্যের সঙ্গে একটি জাতীয় কর্তব্যও তিনি পালন করেছেন। আমার প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী অসিতা বন্দোপাধ্যায়কেও এই সূত্রে আমি আশীর্বাদ জানাই—গ্রন্থখানির পরিকল্পনা থেকে প্রকাশন-সংক্রান্ত নানা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা আমার পরিশ্রম লাঘব করেছে।

গ্রন্থ প্রকাশন-সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয়া অভয়া দাশগুপ্ত। নানা দুষ্প্রাপ্য রচনাও সংগ্রহ করে দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন—তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের অন্যতম সক্রিয় কর্মী শ্রীপরিমলকান্তি দাস মহাশয় নানা পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহযোগী হয়েছেন।

তাঁর উদার মনকে অভিনন্দন জানাই। 'গোলপার্ক' ইনস্টিটিউট্ অব কালচার'-এর গবেষণা-সহায়ক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ নানা বিদগ্ধজনের স্বামীজী-প্রসঙ্গে রচনাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। তিনি আমার অগ্রজকল্প—তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ স্বামীজীরা আমাদের এই উদ্যোগে সক্রিয় অংশ নিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং সমগ্র গ্রন্থের মূল্য বিবর্ধনে সহায়তা করেছেন, তাঁদেব সকলকে এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এগ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা অসম্ভব ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগের কর্মী অনুজকল্প শ্রীমান প্রভাস চক্রবর্তী নানাভাবে যুক্ত থেকে আমাকে এ গ্রন্থ সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আরও নানাভাবে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন—পলাশ ভূঁইঞা, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, গৌরী গঙ্গোপাধ্যায়, রূপা ভট্টাচার্য, ছবি ঘোষ, ছায়া ঘোষ, শশবিন্দু জানা, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য।

যে সমস্ত বিদগ্ধ লেখক এ গ্রন্থে তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দবাদী নানা জনের, সহৃদয় সাধারণ পাঠক পাঠিকার আন্তরিক রসানুমোদন লাভ করলে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক মনে করবো—

বিনীত—

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

# কথামুখ ঃ ভজন

সন্নিহিত হৃদয়ের ধ্যানে

## প্রণাম

## নিবেদিতা

যে-তুমি জ্ঞান-স্বরূপ,
চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, চিরন্তন সাক্ষী-স্বরূপ,
যে-তুমি গুণাতীত, বাক্যমনাতীত—
সেই তোমাকে, আমার সত্য গুরু তুমি,
একমাত্র তোমাকে আমার নমস্কার।
শিব গুরু ! শিব গুরু ! শিব গুরু !

[ শিব গুরু নিবেদিতার বন্দিত। নিবেদিতার শিব গুরু হলেন স্বামীজী স্বয়ং। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সময়ই অনিবার্যভাবে শিব গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিবেদিতা তাঁর দিনলিপিতে—( 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম ) লিখেছেন —"আরও একজনকে সেই সন্ধ্যায় কে যেন ধ্যানের স্থানে জোর করে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল ; সেখানে তাঁর আত্মা এক অসীম জ্যোতির মুখোমুখি দাঁড়াল—তার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে তিনি বলে উঠলেন—শিব গুরু !" ]

# বিবেকানন্দ প্রণাম

## স্বামী অভেদানন্দ

### ইমন-কল্যাণ—একতাল

স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র,
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্মের স্রক্ গন্ধ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যে দিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশিস্ সঙ্গে
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাজিলে গৌর নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

ভূধরে সাগরে গহনে কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানী গিরিকন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি ;
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত-মর্মবাণী,
পাশ্চাত্য সেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিস্ময় মানি ।
স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

শিকাগো সঙ্ঘে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব, শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী ;
সৃজিলে "শ্রীমঠ" কুঞ্জকুটির তীর্থ মুখরাবিন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ ॥

### স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ছায়ানট—একতাল

বলগো ঠাকুর! বলনা আমারে আনিলে এ কারে সাথে তোমার
ব্রহ্মতেজোদীপ্ত আনন পুরুষসিংহ কে এ কুমার ॥
বীরেশ্বর অমিতবীর্য
সুর-সেনাপতি জিনিয়া শৌর্য,
জ্ঞানে গরীয়ান, তাপস প্রধান, প্রেমে ভাসমান নয়ন তাঁর ॥
ত্যাগে শুকদেব, প্রেমেতে নারদ, বুদ্ধের মত হৃদয় যাঁর,
জ্ঞানে শিবগুরু শঙ্কর সম, সে কেন লুটায় পদে তোমার ?
হুঙ্কারে যাঁর কাঁপে ত্রিভুবন
সে কেন মাগিছে তোমার শরণ ?
তোমারি আশিস্ করিয়া ধারণ সে কি ধরিবে ধরার ভার ॥

### স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শিবরঞ্জনী—ত্রিতাল

জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীবিবেকানন্দ।
ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন বিশ্বমানব চিরবন্দ্য ॥
প্রেম ঢল ঢল কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ-বেদান্ত।
ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যা উজ্জ্বল চিত্ত নিরমল শান্ত ॥
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ।
ব্রহ্ম পরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণারবিন্দ ॥

### স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা—দেওরা

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয়রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায় ॥
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে আপনা সঁপিতে কে যাবি আয় ॥
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভোগ-কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এস দেব এস করুণা নিধান, লহ আজি মম তনুমনপ্রাণ,
কৃপা করি কর এ আশিস্ দান তব কাজে যেন জীবন যায় ॥

**নজরুল ইসলাম**

আড়ানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী।
যজ্ঞাহুতির হোম শিখাসম, তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী ॥
মদগর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি ॥

**স্বামী প্রেমেশানন্দ**

ভৈরবী—একতাল

ধরম ভেদ-ভঞ্জন বন্দি জগত-বন্দন।
জ্ঞান ভকতি বিতরণে নর শরীর ধারণ ॥
বিগত গেহ বন্দন, বিজিত-মীন কেতন
রূপে কাম গঞ্জন, বাণী বীণা নিন্দন ॥
প্রেমমত্ত নর্তন, অভীরভীঃ গর্জন
ভূধর সাগর লঙ্ঘন, জীব তারণ-কারণ ॥
কূট-কপটী-মর্দন, সজ্জন-মনোমোহন
বিশ্বমানব বন্দে তোমায় রামকৃষ্ণ-নন্দন ॥

## শ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা

### বিবেকানন্দপঞ্চকম্

**স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ**

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং তস্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া।
বিবেকবৈরাগ্যবিশুদ্ধচিত্তং যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥ ১

বিবেকজানন্দনিমগ্নচিত্তং বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥ ২

ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়ৎ যৎ নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং স্বরূপং প্রকরোতি যস্য আনন্দমূর্তিং তমহং নমামি ॥ ৩

সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি ॥ ৪

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং বিবেক-আনন্দমহং নমামি ॥ ৫

এই জগতে অনিত্য বস্তুরাজি হইতে নিত্যবস্তুকে পৃথক করিয়া যে বিবেকী লীলাচ্ছলে সেই নিত্যবস্তুতে বিবেক ও বৈরাগ্যপ্রভাবে পবিত্র চিত্তকে সমাহিত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। ১

বিবেকসম্ভূত আনন্দে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, যিনি বিবেকদানেই আনন্দিত, বিবেকজ্যোতিতে যিনি রমণীয়রূপশালী, সেই বিবেকীকে আমি সর্বদা নমস্কার করি। ২

যাঁহার স্বরূপ সত্য ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিরবকাশ নিত্য সুখ প্রদান করে, সেই আনন্দস্বরূপ মূর্তিধারীকে আমি নমস্কার করি। ৩

সূর্য যেরূপ গভীর অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষ্ণু যেরূপ দুর্বৃত্তদিগকে বিনাশ করেন, সেইরূপ যাঁহার নয়নাভিরাম রূপ বিশ্বজনের ত্রিতাপ বিদূরিত করে—। ৪

নরহিতার্থে অবতীর্ণ সেই আচার্যপ্রবর, পরম পবিত্র, জগৎপালক, আনন্দময়, যোগিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দকে আমি নমস্কার করি। ৫

## প্রণাম মন্ত্র

### স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে ॥

শ্রীমান, সন্ন্যাসিরাজ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ত্রিতাপহারী, সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার।

## মূর্তমহেশ্বরস্তোত্রম্

### শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্,
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্ ॥ ১

কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো ! কটিতটকৌপীনবন্তম্,
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ্ মুখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যম্ ॥ ২

ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং,
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্ ॥ ৩

যিনি সূর্যসদৃশ প্রদীপ্ত এবং দেব ও মনুষ্যের বন্দনীয়, কাম কাঞ্চনের হীন বন্ধন যিনি ত্যাগ করিয়াছেন সেই দেবতনু মূর্তিমান মহেশ্বর আমার ইষ্ট বিবেকানন্দকে বন্দনা করি। ১

অহো ! কোটী ভাস্করের কিরণে মণ্ডিত সিংহসদৃশ, কটিতে কৌপীনমাত্রধারী এবং যিনি অভিঃ অভিঃ রবে দিক্‌সমূহ নিনাদিত করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য করেন—। ২

যাঁহার কৃপাপটাক্ষে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সম্ভব, যিনি পাপরাশি দলনে সমর্থ শশিকলাধারী, শিবস্বরূপ, সেই ইন্দুর আরাধ্য গুরুরূপী বিবেকানন্দকে প্রণাম। ৩

### স্বামী সারদানন্দ

বাগেশ্রী—আড়া

স্তিমিত-চিৎ-সিন্ধুভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন,
কোটী সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন ॥

উজল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে করে ধারণ ॥
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন ॥
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান ;
তারা জ্বলি' ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমি উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ ॥

**নীরদরঞ্জন মজুমদার**

খাম্বাজ—একতাল

কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণা ।
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা ॥
ললিত ছন্দে গভীর মন্দ্রে, পশিল সে তান রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
জাগিল সুপ্ত লুপ্ত-গৌরব ভারতবর্ষ দীনা ॥
হিমাদ্রি-শিখরে জলনিধি-তীরে, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিগদিগন্তরে,
বেদান্ত-মহিমা কে বল প্রচাবে, বর্ণিতে নারি সীমা ॥
(করি) গুরুপদে মন-প্রাণ সমর্পণ, মহাযোগী-বেশ করিলে ধারণ
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ জীব-সেবাব্রত করিলে উদ্দীপনা ॥

**স্বামী প্রেমেশানন্দ**

আড়ানা—একতাল

কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন ।
কে রে শারদ-ইন্দু-নিন্দিত-চারু-ভুবন-মোহন-আনন ॥
শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ ॥
জ্ঞান-ঘন-তনু শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি,
বিষাণ বাদনে 'অভীরভীঃ' স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন ।

জড়-বিজ্ঞান-কৌরব রণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাম্বুধি-লঙ্ঘন।
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ত্রিশূল ধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা-বাদন॥
শরণাগত চরণে তোমার 'বিবেকানন্দ' বীর অবতার,
কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস রঞ্জন॥

### স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—ঠুংরী

এস ভুবনপাবন-নারায়ণ।
এস আর্ত-পতিত-চিতে, শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন-তারণ-কারণ॥
দ্বেষ হিংসা হেরি ঝরিত নয়নবারি,
সাম্য প্রচারিলে দেশে দেশে ঘুরি,
লাঞ্ছনা সহিলে, সাধি' শিখাইলে জীবহিতে জীবনধারণ॥
হের ঘোর তম, স্বার্থ সে নির্মম ছাইছে ভুবন কালমেঘ-সম,
শোণিতে রঞ্জিত, রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন॥
(এস) হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরযামী হয়ে
স্বার্থবন্ধ কাট প্রেম-অসি দিয়ে,
খুলিয়ে দাও ঠুলি, হেরি নয়ন মেলি, ঘটে ঘটে সেই নিরঞ্জন॥
বিজ্ঞান-ভাস্কর, এস হে শঙ্কর, ভৈরব 'অভীঃ' রবে মোহধ্বান্ত হর,
বিবেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ! নন্দিত কর ত্রিভুবন॥

### স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোশ—দাদ্‌রা

ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূর্তি ধরিয়া এল এবার।
গগনে পবনে উঠিল রে ঐ "মাভৈঃ মাভৈঃ" হুহুঙ্কার॥
আশ্বাস দিল শঙ্কিত জনে, পুলক জাগাল হতাশ জীবনে,
'উত্তিষ্ঠত' গরজি সঘনে সুপ্তি নাশিল এ বসুধার॥
'অমৃতস্য পুত্র' আমরা, মৃত্যু মোদের নাহিক আর,
কার ভয়ে তবু কেঁদে দিশেহারা উঠে দাঁড়া মিছে স্বপন ছাড়।
ত্যাগ ও সেবার বিজয় কেতন, নির্ভয়ে চল বিদারি গগন,
ধন্য হইবে বিশ্বভুবন সাথে আছে সদা আশিস্ তাঁর॥

## ভজ রে বিবেকানন্দম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ভজ রে স্বামি বিবেকানন্দম্
ভজ যতিরাজং মানস সততম্ ॥ ১ ॥

—রে মন, প্রতিনিয়ত যতিরাজ স্বামী বিবেকানন্দের ভজনা কর। ১

ত্যক্তসপ্তমুনিবিশাললোকম্
নাশিতভুজনগুরুতরশোকম্ ॥ ২ ॥

—যিনি সপ্তর্ষিলোক থেকে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্ববাসীর নিদারুণ দুঃখ মোচন করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর। ২

রামকৃষ্ণগুরুপদাব্জভৃঙ্গম্
প্রসাদমধুবলবিজিতানঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে যিনি মধুকরের মতো ছিলেন এবং তাঁর প্রসাদে যিনি কামনা-বাসনা জয় করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর। ৩

আত্মশ্রদ্ধাস্থাপিতধর্মম্
মজ্জদ্ভারতমন্দরকূর্মম্ ॥ ৪ ॥

—যিনি 'আত্মশ্রদ্ধা' ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং কূর্মাবতারের মতো নিমজ্জমান ভারতকে রক্ষা করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর। ৪

হংসশক্তিযুতমহদুরুনাবম্
পরহংসসুধাপূরিতভাবম্ ॥ ৫ ॥

—যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি-চালিতঅর্ণবপোত এবং যাঁর হৃদয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসুধায় পরিপূর্ণ সেই স্বামী বিবেকানন্দকে ভজনা কর। ৫*

## বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

### গিরিশচন্দ্র ঘোষ

( ১ )

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী ॥
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি ॥
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জিত শান্তিপ্রদান; শিষ্য গুরুপদে হৃদে সাধে ধরি,
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী ॥

( ২ )

কে রে নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনাশকারী ॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি কে এনেছে সহাকারী ॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত-বত-জন-মন তাপহারী ॥
গুরুপদে বলিদান, জীবন যৌবন মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী ॥

( ৩ )

ভুবন ভ্রমণ কর যোগিবর যার ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথপানে ॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানাদেশে নানাভাবে জয়ধ্বনি একতানে ॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে।
জনমন পুলকিত, মোহনিশা অবসানে ॥

# বিবেকানন্দ প্রণাম

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে।
সচ্চিদসুখস্বরূপায় স্বামিণে তাপহারিণে ॥

প্রেম ও জ্ঞান যে ব্যক্তিত্বে অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করেছে, আমরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত প্রণতি জানাই। ভারতকে স্বামীজি যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সে দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যাত্মচেতনাপ্রসূত। স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সত্তা নয়, ঐতিহাসিক অভিপ্রায় নয়, নৈতিক শক্তিও শুধু নয়। ভারতবর্ষ স্বামীজীর অধ্যাত্ম উপলব্ধি। তাই অতীতের দিব্য অনুভূতিতে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—"ভারত আবার উঠিবে কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া। অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান। ...জ্ঞান, ভক্তি. কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। ...আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।" এই স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে আমাদের একবার ফিরে যেতে হবে নরেন্দ্রনাথের সত্তাতে যেখানে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত—ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে হাজির হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পাদমূলে; সিদ্ধিলাভই ছিল তাঁর অভিলাষ, মানবজন্মের পরমপুরুষার্থই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

কিন্তু গুরুমুখে দুটি দিনের দুটি কথা স্বামীজির ব্যক্তিত্বে ম্যাজিকের মত কাজ করলো। বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মধ্যে যে প্রেমিক বিবেকানন্দ কোরক সুপ্ত ছিল, তারই উন্মেষ হলো। শ্রীগুরুর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—"তুই কী চাস্?"

"নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই।" এই ছিল নরেন্দ্রের উত্তর।

"এর থেকেও উঁচু অবস্থা আছে রে"—শ্রীগুরুর মুখে বারংবার শুনেছেন, "ব্রহ্ম-মায়া-জীব জগৎ সবটা এক, তা নইলে ওজনে কম পড়ে। দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যেমন বেল 'শাঁস', বীচ, খোলা, আঁটা সবটা নিয়েই বেল। জগৎ আর তার স্রষ্টা কিছু আলাদা নয়।"

আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনায়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন ইত্যাদি প্রসঙ্গ চলছিল—গুরুমুখে নরেন্দ্রনাথ শুনলেন, "জীবকে দয়া করার তুই কে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

সমগ্র ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর জীবনালোকে ভারতাত্মার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিলেন, পরিচিত হলেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের কোটি কোটি অজ্ঞ, নিপীড়িত, অশিক্ষিত জনগণের সঙ্গে। যে সত্য আর্যঋষির চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছিল ঃ

'একো হি দেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ,
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ॥'

স্বামীজী এ বেদান্ততত্ত্ব স্বীয় চিত্তে অনুভব করলেন। স্বামীজীর কাছে এ তত্ত্ব অনুভূত সত্য। অতএব ভারতের গিরিগুহাবাসী নির্জনে সাধনারত সন্ন্যাসীর ধর্মাচরণের প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ন্যাসীপ্রবর হানলেন এক বৈপ্লবিক আঘাত—'Each soul is potentially divine'—প্রতি জীবে অনন্ত দেবত্ব বিদ্যমান। এই সত্য উপলব্ধি করবার উপায় নির্ধারণ করলেন ধর্মের নবপ্রবক্তা। সেবাই কর্মযোগ এবং সেই কর্মে পরিণত বেদান্তই ধর্ম। অদ্বৈত বেদান্ত ও বৈষ্ণব বেদান্ত একসূত্রে বাঁধা হলো—

(ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়ে)
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সর্ববন্ধনমুক্ত হয়েও প্রেমের বন্ধনকে স্বীকার করে নিলেন। উপনিষদের মূলীভূত তত্ত্বই হলো—'সোহকাময়ত একোহহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়ং' 'তৎসৃষ্টবা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' জগৎ সৃষ্টির মূলে এই সত্যই রয়েছে যে, ব্রহ্ম এক ছিলেন বহু হলেন এবং বহুর মধ্যে তিনি ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করলেন। অতএব ঈশ্বর ও তার সৃষ্টি অভেদ—এই বৈদান্তিক রহস্য বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা দিলেন আধুনিক শিক্ষায় পরিচালিত মানব মনের কাছে—"ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।") মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উদ্বোধনই ছিল প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সাধনা।( কোটি কোটি নরনারীর দৈহিক ও মানসিক দুঃখবেদনাপীড়িত আর্তস্বর উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবহেলা করে নয়, সমবেদনা, প্রেম ও প্রীতির সূত্রে মানবাত্মাকে সাহায্য করে তাকে দেবত্বের পথে নিয়ে যাওয়া।) তাই মানবিকতার অপূর্ব জয়গান স্বামীজির কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

'Ye are the children of Gods, the sharers of immortal bliss, holy, perfect, you can do anything and everything. You are Almighty.' (তুমিই অমৃতের সন্তান, তোমার মধ্যেই অনন্তশক্তি বিদ্যমান।) কর্মে পরিণত বেদান্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রীতির রূপান্তর মাত্র। জীব সেবাই ঈশ্বরোপাসনা। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘস্থাপনের উদ্দেশ্যই হলো মানবাত্মার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। তাই বহুদিন তপস্যার পরে আবু পাহাড়ের থেকে নেমে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন,—'হরি ভাই তোমাদের ঈশ্বর টীশ্বর কিছু বুঝলাম না, ভক্তি, মুক্তিও বুঝলাম না—হৃদয়টা আকাশের মত হয়ে গেছে। সমস্ত প্রাণীর সুখ দুঃখ এখানে অনুভূত হচ্ছে।' এই যে অনুভূতি এটাই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর বেদান্তজ্ঞান হৃদয়ের পরম কোমলস্থানে আস্বাদিতপ্রেমসঞ্জাত। মায়াবাদের মূলভিত্তিতে যে বেদান্ত উদ্ভূত সে বৈদান্তিক স্বামীজী নন। জগতের সুখদুঃখকে মিথ্যা আধ্যাত্মিক ভ্রমমাত্র বলে যে বেদান্ত প্রতিপন্ন করে তেমন ধর্মমতের ভাষ্যকার স্বামীজী নন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁর কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে প্রতীত হয়েছিল। তাইতো বলতে পেরেছিলেন —"কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্মিক; সেই শিবের সামীপ্যলাভ করে।"

স্বামীজী বাস্তবজীবনকে পরম মর্যাদা দিয়েছেন। তাই দেহ ও দেহের প্রয়োজনকে তুচ্ছ করেননি। বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের ভাবনা বিবেকানন্দ জীবন-দর্শনে একটি ঋজু ও কঠিন জিজ্ঞাসা। মানুষকে বাঁচতে হলে তার দেহের পুষ্টি চাই, দেহের পুষ্টির জন্য সমাজ চাই, সমাজের জন্য স্বদেশ চাই। প্রত্যেকটি স্তরেব সমঞ্জসীভূত সাধনার নামই অনুশীলনধর্ম। বিশেষকে অক্ষুণ্ণ রেখেই স্বামীজি নির্বিশেষ মানবতার কল্পনা করেছিলেন। অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে বাস্তবপরায়ণতার মিলন। স্বামীজীর ধর্ম কর্মাত্মক। আত্মকেন্দ্রিক অথবা দুর্বল, মস্তিষ্ক সর্বস্ব কিংবা হৃদয়হীন রসবিলাসী, কোন রকম মানুষই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন নি। শরীরকে বলিষ্ঠ করে না তুললে এবং সেই অনুপাতে চিন্তাবৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ না ঘটালে ধর্মের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না।

আজ ভারতের জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পরিবর্তন পরিলক্ষিত কিন্তু এই পরিবর্তনের যুগে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে স্বামীজী প্রবর্তিত প্রণালীতে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে সুগঠিত করবার অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত।

বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম ও শিক্ষা এই দু'টি স্তম্ভের ওপর স্বামীজী জাতীয় জীবনের সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও বৃত্তিগুলিকে আয়ত্বাধীন করে সফলকাম করে তোলাই স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষা। "বাহিরের শিক্ষা দ্বারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলিয়া যায়, তবেই তাহার কিছু মূল্য আছে বলা যাইতে পারে। ...ইউরোপীয় বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের

দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছে; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন।...যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সেই শ্রদ্ধার লোপ। দেশের লোকগুলিকে যদি আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢালিলেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করিতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার...যাহাতে ঐ শিক্ষার ফলে তাহারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হইতে পারে।

"যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক-ভাবে প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে।"

শ্রদ্ধা, সংযম, বীর্য ও পরার্থপরতা যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে বোঝা যায় তিনি প্রকৃত শিক্ষিত। এমন মানুষই সর্বস্তরের সমস্যা সমাধানে সমর্থ।

স্বামীজীর বাণীর মূল সুরটি এই ঃ

দ্বন্দ্ব নয়—শক্তিসঞ্জীবিত শান্তির বাণী।

সংকীর্ণতা নয়—ঈর্ষাদ্বেষমুক্ত উদারতার বাণী।

দুর্বলতা নয়—অভীঃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নির্ভীকতার বাণী।

বিভেদ নয়—বেদান্ততত্ত্বোদভাসিত প্রেমের বাণী।

ওঁ দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রম্<br>
বিশ্বস্যপালং মধুরং যতীন্দ্রম্।<br>
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং<br>
বিবেক আনন্দমহং নমামি ॥

# প্রথম অধ্যায়

## 'মুখোমুখি আত্মসম্বোধন'

"আমাদের জীবনের চলার ছন্দে—
বিবেকানন্দের ছন্দ যেদিন মিলবে,
আমরা নতুন জীবনের সন্ধান পাব
প্রত্যেকটা জীবন এক-একটা মহাকাব্য হবে।"

—**নিমাই মুখোপাধ্যায়**

( 'মহাকাব্য'—'আগামী শতাব্দীর জন্যে'
কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত। )

## স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

অভয়া দাশগুপ্ত

"প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,
কভু দেখি—আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

—এ গীত স্বামী বিবেকানন্দের। আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গাইছেন শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। আজীবন স্বামী বিবেকানন্দের কথায় কাজে চিন্তায় এক কল্যাণ শক্তি প্রেরণা জুগিয়ে গেছে—শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কল্যাণ শক্তি। এ সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মতো করে অপরে বুঝতে পারেনি। বিবেকানন্দের পত্রে-প্রবন্ধে, বক্তৃতায়-কবিতায়, বাণী ও রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ওতপ্রোত, শ্রীরামকৃষ্ণই প্রকাশিত। কারণ আচার্য-শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের মতো ঘনিষ্ঠ। পিতামাতা সন্তানকে প্রতিমুহূর্তের স্নেহে যত্নে শিক্ষায় গড়ে তোলেন—তাকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তানের প্রতিষ্ঠায় ও সাফল্যে পিতামাতার সার্থকতা, পরিপূর্ণতা। আচার্যও শিষ্যকে পরম যত্নে স্নেহে গড়ে তোলেন। তার চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত করে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য করেন। শিষ্যের সফলতায় আচার্যের সার্থকতা। তাই আচার্যের ভালবাসা আরও যেন গভীর, দায়িত্ব আরও বেশী ওজনে ভারী। আচার্য প্রতিদিনের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে শিষ্যের জ্ঞানোন্মেষ ঘটান, প্রতিমুহূর্তের পরম স্নেহের আশ্রয়ে তাকে রক্ষা করেন। যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক শিষ্য বিবেকানন্দ। নিজ সাধনালব্ধ সত্যকে লোকসমক্ষে উপস্থিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরী করলেন অলোকসামান্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্পর্ক অনুধাবন করলে যা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তা রামকৃষ্ণের অপার অলৌকিক স্নেহ এবং নরেন্দ্রের বিশিষ্টতা। রামকৃষ্ণ নিজ মুখে শিষ্যের স্বরূপ জানালেন এবং এমন শিষ্যের জন্য কিভাবে গুরুকেই ব্যাকুল হতে হয় তা দেখালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্প কথার মধ্যে শিষ্যের পরিচয় রেখে গেলেন সমকালের কাছে ভাবীকালের জন্যে। তাঁর সেইসব উক্তির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের পরিচয় তুলে ধরা এই রচনার উদ্দেশ্য।

তপস্যার আসন থেকে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান জানালেন—"তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে।" তাঁর এই আহ্বান বাণী দক্ষিণেশ্বরের সীমানা অতিক্রম করে পৌঁছে গেল দেশ-দেশান্তরে। তাঁর আমন্ত্রণ গিয়ে পৌঁছল সকল ধর্মের, সকল জাতির, সকল স্তরের মানুষের কাছে। আর সেই আহ্বানে দলে দলে জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-তরুণ এসে সমবেত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। দক্ষিণেশ্বর এখন তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল মানুষের দ্বারা। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন

সকল ধর্মকে তথা সকল মানুষকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর তপস্যা সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। সেই এতবড় তপস্যা কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হয়ে যাবে? তাই প্রয়োজন একটি যোগ্য আধার—যাকে সর্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

তপস্যান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—সব ধর্ম সত্য। এই অমোঘ সত্যবার্তায় ধর্মের সকল সংকীর্ণ গোঁড়ামির বেড়া গেল ভেঙ্গে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আমন্ত্রণে এলেন পণ্ডিত শশধর, এলেন আর্যসমাজের দয়ানন্দ সরস্বতী, এলেন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এলেন নরেন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে। নরেন্দ্রনাথ! কে এই যুবক? কি তাঁর পরিচয়? এক কথায় মানুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই নরেন্দ্র। কিন্তু নরেন্দ্রর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—জীবের দুর্গতি দূর করতে এই নরেন্দ্র এসেছেন পৃথিবীতে। তাই তিনি নরেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত জহুরী। প্রথম দিনেই তিনি চিনে নিলেন এই রত্ন ছেলেকে। দুর্লভ ধন এই নরেন। যুগের সকল মানুষের পথ প্রদর্শক, দিশেহারা মানুষের আশ্রয়স্থল এই নরেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) ঢুকেছিল। দেখলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও শরীরের বেশভূষার কোন পারিপাট্য নেই। বাইরের কোন পদার্থেই ইতর সাধারণের মত একটা আঁট নেই, সবই যেন তার আলগা। চোখ দেখে মনে হল, তার মনের অনেকটা ভেতরের দিকে কে যে সব সময় টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব? মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রয়েছে, তার পাশে বসল। তার সঙ্গে সেদিন দু-চারজন আলাপী ছোকরাও ছিল। গান গাইবার কথা জিজ্ঞেস করে জানলাম, বাংলা গান তখন সে দু-চারটি মাত্র শিখেছে। তাই গাইতে বললাম। তাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরল এবং ষোল আনা মন প্রাণ ঢেলে ধ্যানস্থ হয়ে যেন গাইতে লাগল—শুনে আর সামলাতে পারলাম না, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লাম।"—ভাবাবিষ্ট হয়ে কি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? নরেনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে অতি আপনজনের ভাবে অভিমান প্রকাশ করলেন। অভিযোগের সুরে বললেন—"এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করে রয়েছি, তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনে শুনে আমার কান ঝলসে যাবার মত হয়েছে।"—এরপরেই আবার করজোড়ে স্তব করছেন—"জানি আমি, প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।"—এই যে প্রথম দিনেই শুনিয়ে রাখলেন মানব-কল্যাণ মন্ত্র, ভবিষ্যতে সেই মানব-কল্যাণ ব্রতেই নরেন্দ্রনাথ নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। দীনতম, মূর্খতম মানুষের জন্যেও তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করে 'বহুজন হিতায় বহুজন

সুখায়' নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হন। এই রূপায়ণের কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ নিখুঁত শিল্পী। এই সত্ত্বগুণী ছেলেটির জন্যে তিনি যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সে খবর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ নরেনকে অবলম্বন করেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম দিকে দিকে বিলিয়ে দিতে হবে। তাই ঈশ-প্রেমের প্রতিভূ হিসাবে এই নরেনকে চাই।

"পরে সে চলে গেলে তাকে দেখার জন্যে প্রাণের ভেতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হয়ে থাকলো যে বলবার নহে। যেন কে গামছা নিঙড়াবার মত জোর করে নিঙড়াচ্ছে। তখন নিজেকে আর সামলাতে পারতাম না, ছুটে বাগানের উত্তরে ঝাউ-তলায়, যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, সেখানে যেয়ে, 'ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতাম।"—আচার্যের সঙ্গে শিষ্যের মিলন ঘটেছে। শিষ্যের অদর্শনে এখন অধৈর্য। শিষ্যের সব ভার নেওয়া হয়ে গেছে বলে তাকে দৃষ্টির বাইরে রাখা চলে না। পরম যত্নে-স্নেহে শিষ্যকে তৈরী করার পালা এখন।

পাশ্চাত্য-দর্শন-অধ্যয়নরত নরেনের মনে প্রবল সংশয়। সত্য লাভের দুর্বার আকাঙক্ষা, ঈশ্বর সম্পর্কে প্রখর জিজ্ঞাসা তাকে চঞ্চল করে তোলে। তাই প্রশ্ন—"আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?"—নরেনের এই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে বিস্মিত করে না, আনন্দিত করে। কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর—হাঁ, আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি, তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠরূপে।"—এরপরে আরও জানাচ্ছেন যে, শুধু নিজে দেখেননি, অপরকেও দেখাতে পারেন, যদি সে আন্তরিক-ভাবে চায়। শুধু প্রয়োজন আন্তরিকতার। তাই তো বলছেন, "ঈশ্বর দর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে বলছি। কিন্তু কে তাঁকে চায়? লোকে মাগ-ছেলের শোকে, বিষয়-আশয়ের দুঃখে ঘটি ঘটি কাঁদে, কিন্তু ভগবানের জন্য কে তা করে? সরলভাবে ভগবানের জন্য কাঁদলে তিনি নিশ্চয় দেখা দেন।"—চাই শুধু সরলতা, আন্তরিকতা, আকুলতা। ভগবানের জন্যে সংসার, বিষয়-আশয় ভুলতে হবে। একান্ত করে তাঁকে চাইলে তিনি দেখা দেন।—শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর নরেনকে চমকিত করে। সত্যানুসন্ধিৎসু নরেন সংশয়ের অকূল সমুদ্রে যেন এক ঝলক আলোর সন্ধান পেলেন। কোথায় ভেসে গেল স্পেনসার ও হাক্সলির রচনাবলী, কোথায় গেল মনের মেঘ। মনের দ্বিধা, অবিশ্বাস সরে গেল। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করে নেওয়ার পালা আরম্ভ হল। নরেন সামনে এমন একজন মানুষকে দেখলেন যিনি তর্ক করেন না, যুক্তি তর্ক দিয়ে অন্যের মত খণ্ডন করেন না। কারুর ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেন না। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যা বোঝেন, তাই বলেন। তিনি হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। নিজ জীবনে ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন বলেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারেন—হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। এই মহাপুরুষের প্রভাব নরেনের জীবনে এনে দেয় এক বিরাট পরিবর্তন। নবজীবনের সূচনা হয় এসময়ে।

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হয়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে কেঁদে বলতে লাগলে, ওগো আমার এমন করলে কেন ? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো।"—নরেনের আর্তনাদে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে হাসি। তিনি যেন খল-খল হাসিতে এ কান্না চাপা দিতে চাইলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহমিশ্রিতস্বরে বলছেন, "তবে এখন থাক। একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।"—কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই মানুষটির ইচ্ছাশক্তি। তিনি ইচ্ছামাত্র নরেনের মতো বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী ছেলের মনকে কাদার তালের মত যেমন খুশী এক অলৌকিক জগতে নিয়ে যাচ্ছেন আবার স্পর্শমাত্রে নরেনের চিরপরিচিত রাজ্যে ফিরিয়ে আনছেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নরেনের মনে প্রশ্ন জাগে—একেই কি বলে hypnotism! আবার উপলব্ধি করেন এই পূজারীর অন্তরের প্রদীপ্ত জ্ঞান তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। দিনের পর দিন সেই আকর্ষণ তীব্রতর হতে থাকে। এইভাবে চলে কিছুদিন। আচার্য-শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা করে নিতে ব্যস্ত। সহজে কি দ্বিধা কাটে ? শিষ্যের কাছে গুরুকে দিতে হয় অনেক পরীক্ষা। আবার গুরুও শিষ্যকে পরীক্ষা করতে ছাড়েন না। তিনি দেখতে চান নরেন্দ্রের গুরুর প্রতি আকর্ষণ, ভালবাসা কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছে ! আবার শিষ্যকে তার স্বরূপের সন্ধান দিয়েই সেদিকের দরজা বন্ধ করে চাবিটি রাখেন নিজের হাতে। নরেনকে পার্থিব জগতে ধরে রাখার জন্যেই বুঝি, নরেনকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্যের চেয়ে অসম ভালবাসা দেখিয়ে বলছেন, "নরেন খাও, নরেন খাও।"

"নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখতে পেলাম না। যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে। ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নেই, বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে। সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্যসকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি ?"—নরেনের প্রতি অসম ব্যবহারের কৈফিয়ত দিচ্ছেন যেন। এই প্রাণঢালা অপার্থিব ভালবাসার যোগ্য পাত্র নরেন। নিজমুখে অকপটে সে সত্য প্রকাশ করছেন। একদিকে তাঁর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মন, অপরদিকে ধ্যাননিষ্ঠ, ভক্তিআপ্লুত হৃদয়। ভাববৈচিত্র্যের আধার নরেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এই হচ্ছে হিন্দুধর্মের মর্মকথা। কারণ মানুষে মানুষে ঐক্য যেমন সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের রুচিগত পার্থক্যও তেমন সত্য। অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী তিনিই হতে পারবেন, যিনি ভাব বৈচিত্র্যের আধার। তাই নরেনের প্রতি এই বিশেষ ভালবাসা। নরেনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বলছেন,—"দেখলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেন্দ্রের ভেতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে। পরে নরেন্দ্রের দিকে

তাকিয়ে দেখি তার ভেতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত দূর করেছে।"—নরেনের অন্তরের প্রদীপ্ত জ্ঞানের খবর শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মোহমুক্ত নরেন যে একথার তীব্র প্রতিবাদে মুখর। এসব দর্শন রামকৃষ্ণের বিকৃত মস্তিষ্কের ফলে হয়, সে কথা ঘোষণা করতে নরেন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেন না। তদুপরি এত 'নরেন' 'নরেন' করলে শেষকালে ঈশ্বর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জড়ভরতের অবস্থা হবে—এই সাবধান বাণীও নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়ে দেন। নরেন যে "খাপখোলা তরোয়াল", তাই কোন কিছুই তাকে সহজে বশ করতে পারে না। কিন্তু অকুতোভয় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে যা ভেসে ওঠে, তা তিনি জনসমক্ষে নির্বিকারভাবে প্রকাশ করে বলেন, "এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই। পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি—যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠি-বাটা ইত্যাদি। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়।"—অসাধারণ প্রতিভা ও মেধা নিয়ে যিনি জন্মেছেন, তিনি জন্মলগ্ন থেকেই সবার সেরা। পড়াশুনায়, খেলাধুলায়, গান-বাজনায় সমবয়সীদের মধ্যমণি তিনি। ইনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে হলেন ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। এখানেই শিষ্যের কৃতিত্বে আচার্যের সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছেন, এ অসাধারণ যুবক—ভেতরে তেজ আছে, শক্তি আছে, প্রাণ আছে, হৃদয় আছে। এ মেকি নয় খাঁটি। একে দিয়েই ভারতের সনাতন ধর্মকে নবতররূপে প্রকাশ করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে একটি উদার ধর্মমতের বিরাট প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সে প্রয়োজন মেটাবে এই বুদ্ধিদীপ্ত, জ্বলন্ত, জীবন্ত, প্রাণবন্ত যুবক। পরবর্তীকালে ভারতীয় ঋষিদের আদর্শ, দর্শন ও নীতির ফলিত রূপে দেখা দেবেন এই অসাধারণ মেধাবী যুবক। শিষ্যকে যথার্থ যোগ্য করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সিদ্ধপুরুষ নিজেকে প্রকাশ করবেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় যাকে দেখতে পেলেন তিনি নরোত্তম, নরেন্দ্রনাথ।

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসত—একঘর লোক, তবু ওর দিকপানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বলত, এদের সঙ্গে কথা কন, তবে কইতাম। যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম, ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। একদিন ভোলানাথকে বললুম, হ্যাঁ গা, আমার এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে (মহাভারতে) আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে, সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবু আমার নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে কাঁদতুম।"—এরপরে আরও জানাচ্ছেন, "দেখ নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।"—এককালে আরাধ্যা দেবী ভবতারিণীর সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা' 'মা' করে যত কেঁদেছিলেন, এখন এই কায়েতের ছেলে নরেনের

জন্যেও যেন সেই ধরণের আকুলি-বিকুলি। অন্তরে গামছা নিঙড়ানোর মত করে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা অনুভব করছেন। একি অলৌকিক ভালবাসা! সেই একই আর্তি, একই ভালবাসা যেন। কারণ—"নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণী। আমি দেখেছি, সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন।" তাই সামান্য অদর্শনে কাতর হয়ে পড়ছেন। গুরু-শিষ্য উভয়েই একই জ্যোতির রাজ্য থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। তাই এই সাময়িক দূরত্বেও হৃদয় বিদারী বেদনা—'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না। তাকে একবার দেখবার জন্যে প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু আমার এই টানটা সে বুঝে না।"—দীর্ঘ বার বছর ধরে ভগবানমুখী প্রেমপ্রবাহের এবারে মোড় ফিরল নরেনমুখী হয়ে। যেই নরেন জীবের দুর্গতি নাশ করতে এসেছেন, তাকে ঈশ্বরপ্রেমের প্রতিভূরূপে তৈরী করতে হবে। সাধনার কঠোরতায় তাঁর নিজ দেহ এত কোমল হয়ে গেছে যে, সে শরীরে লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রেম বিতরণ সম্ভব নয়। তাই বাহকরূপে প্রয়োজন এই সত্ত্বগুণী নরেনকে। সেই প্রয়োজনে নরেনকে তৈরী করতে হবে। তার অন্তরের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করতে হবে। ত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, কর্মের সাধনা, প্রেমের সাধনার আগুনে পুড়ে নরেন খাঁটি হবেন। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ পরশপাথরের পরশে সোনা হতে হবে। আচার্যের সাহচর্য শিষ্যের চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত করবে, তার প্রতিভাকে বিকশিত করবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুর্বার আকর্ষণ শিষ্যের জন্যে। এত প্রাণ-নিঙড়ানো ভালবাসা!

"দেখ দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জ্বলজ্বল করছে।"—ধর্মের নামে পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে। সমস্ত অনুদারতার অবসানের জন্য চাই জ্ঞানের আলো। যে জ্ঞান মানবের পশুত্বকে বধ করে তাকে দেবত্বে উন্নীত করবে। সেই জ্ঞানের আলো এই তীক্ষ্ণধী যুবকের মধ্যে নিহিত আছে। এত গুণগাণ সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেনকে পরীক্ষা করে নিতেও ইতস্ততঃ করলেন না। দিনের পরে দিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রতি উদাসীন। কোন কথা বলেন না বরং একটা উপেক্ষার ভাব। এভাবে দু-তিন মাস কাটে। এতে নরেনের মধ্যে কোন বিরূপভাব শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে পড়ে না। তখন একদিন প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটি কথাও কহিনা, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি?"—নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর রামকৃষ্ণকে তুষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসায় শিষ্য ছুটে ছুটে আসেন। এছাড়া অপর কোন স্বার্থের অন্বেষণে তিনি আসেন না। আচার্যের পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ। শিষ্যের এই রায়ের গর্বে গুরু আনন্দিত, পুলকিত। তিনিও যোগ্য আধারেই এত প্রেম ভালবাসা ঢালছেন। পরীক্ষা শেষে উভয়ের আত্মসমর্পণের পালা। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনতে পাই—"মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত। আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলে-ছিলাম, শালা, তুই আর এখানে আসিস না। তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না।"—এই আপনার

জন বলেই তো নরেন্দ্রনাথ অভিজাত বংশে, ধনী পরিবারে জন্ম নিয়েও—সামনে বৈষয়িক উন্নতির সকল সোপানকে উপেক্ষা করে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে ত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। এই ত্যাগের ব্রতে রিক্ততা নেই, আছে ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ।

আজীবন নির্ভীক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি বার মাত্র ভয় আসে। যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ছেলেবেলা থেকে কোন কিছুকে পরোয়া করলেন না, চিরকাল আপন গতিতে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন, তিনি আজ নরেনের চিন্তায় শঙ্কিত। সেই ভয়কে গানের ছলে প্রকাশ করছেন—

কথা কহিতে ডরাই — না কহিতেও ডরাই
আমার মনে সন্দ হয় — বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই।
আমরা জানি যে মন তোর — দিলাম তোকে সেই মন্তর—
এখন মন তোর;
আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই॥

এ মন্ত্র হচ্ছে, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না বাপু।" নরেন্দ্র যদি সংসারে জড়িয়ে পরে এই আতংকে ভীত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন। কারণ ঈশ্বরকে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে লাভ করা যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় হৃদয় দিয়ে—অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। তার জন্য প্রয়োজন নিজের অহং-এর বিনাশ। অহং-এর শাসন অতিক্রম করার জন্য সংসারের আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার বিশেষ প্রয়োজন। কঠোর ত্যাগ ভিন্ন পরিপূর্ণ প্রেমকে লাভ করা যায় না। ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ না করলে প্রেমিক হবেন কি করে? এই জগৎব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়—এই শিক্ষা দিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ডেকেছিলেন। মানুষের অহং মানুষকে বাসনার দিকে টানে, প্রেমের দিকে নয়, আনন্দের দিকে নয়—এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করতে পারলে আনন্দ লাভ করা যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের চিন্তায় ভীত, শংকিত।

এদিকে নরেন সংসারের কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা। পিতৃ-বিয়োগের পরে বাড়ীতে দারুণ অর্থাভাব। ভাই-বোনদের ক্ষুধার্ত, ক্লিষ্ট মুখ দেখে দেখে নরেন উৎভ্রান্ত। তখন তিনি ছুটে আসেন রামকৃষ্ণের দরবারে। অনুরোধ করেন তাঁর ভবতারিণীকে বলে সংসারের একটা সুব্যবস্থা করে দিতে। আচার্যও এই সুযোগটি ছাড়লেন না। নিরাকারবাদীর টুটি চেপে ধরলেন এই সুযোগে। বলছেন —"মাকে মানিস না—সে জন্যে তোর এত কষ্ট। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাতে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি-ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করছেন, তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন?"—নিরাকারে বিশ্বাসী নরেনকে ঠেলে দিলেন একেবারে ভবতারিণীর অন্দর মহলে। নরেন মন্দিরে এসে স্তম্ভিত, এ যে চিন্ময়ী মূর্তি! অসীম করুণার মূর্তি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ী মা। এক অপূর্ব ভাবের প্রেরণা

এল নরেনের মনে। ভক্তিতে, প্রেমেতে তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। নরেন করজোড়ে শুধু প্রার্থনা জানালেন—'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।" —এর বাইরে আর কোন প্রার্থনার কথা তাঁর অন্তরে প্রতিভাত হল না। অথচ শান্তিতে, তৃপ্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ। এই শক্তিকে নরেন আর অবিশ্বাস করেন কি করে! এই চিরজাগ্রত করুণার শক্তি নরেনের অন্তরে চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়ে গেল। একবার, দুবার, তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়াতে নরেন বুঝলেন যে, এ নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক খেলা। তখন তাঁকেই চেপে ধরাতে বলছেন, "ওরে আমি যে কারুর জন্যে এরূপ প্রার্থনা কখনও করতে পারিনি, আমার মুখ দিয়ে যে উহা বের হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যা চাইবি, তাই পাবি, তা তুই চাইতে পারলি না। তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি করব? আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।"—জ্ঞান বিচারের ক্ষুরধার পথকেই নরেন্দ্র এতদিন আঁকড়ে ধরেছিলেন। মহামায়াকে নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণকে এই নিয়ে বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না। কিন্তু আজ নরেনের সামনে জলজ্যান্ত চিন্ময়ী মা করুণার মূর্তিতে এসে উপস্থিত। এখন সাকারবাদ, নিরাকারবাদ কোনটাই আর মিথ্যা নয়। সব সত্য। ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে প্রকাশ দেখে নরেনও আনন্দে পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণেও আনন্দ আর ধরে না যেন। কারণ আদ্যাশক্তি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র। আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না। বলে—লজ্জা করে। মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, মার গান শিখিয়ে দাও। 'মা ত্বং হি তারা'—গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে, তাই এখন ঘুমুচ্ছে। নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে—না? নরেন্দ্র মাকে মেনেছে। বেশ হয়েছে—কেমন?"—কালী না মানলে নরেনকে ঐশী প্রেমের বাহকরূপে নেবেন কি করে? বিশ্বজননী এখন নরেনের চৈতন্যে উদ্ভাসিতা হলেন।

এরপরেই আবার ঘোষণা করছেন—"দেখছি কি—এটা ( নিজে ) আমি আবার ওটাও ( নরেন ) আমি! সত্য বলছি, কিছুই তখন বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটি লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। বুঝতে পারছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল?"—তাই তো জানাচ্ছেন, "মা তোকে তাঁর কাজ করবার জন্যে সংসারে টেনে এনেছেন আমার পশ্চাতে তোকে ফিরতেই হবে। তুই যাবি কোথায়?" অন্যদের বলছেন, "নরেন্দ্রকে দেখছ না?—সব মনটা ওর আমারই ওপরে আসছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মস্ত বড় শিল্পী। এই শিল্পীর হাতে পড়ে নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণে যা বীজ, বিবেকানন্দে তা পরিণত হয়েছে মহীরূহে। শ্রীরামকৃষ্ণে যার আরম্ভ, বিবেকানন্দে তার পরিপূর্ণতা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে শুধুমাত্র

অসামান্য শক্তি সম্পন্ন গুরু তাই নয়—তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীম-করুণা। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্যে পরমদয়া যেন মানবরূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ চাইলেন নির্বিকল্প সমাধির অমৃতসাগরে ডুবে থাকতে। তেজদীপ্ত নরেন আজ ভিখারীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা ভিক্ষা চাইছেন। চাইছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—শুকদেবের মত নির্বিকল্প সমাধি। অপূর্ব শিষ্যের অপূর্ব প্রার্থনা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হলেও তাঁর মুখে উচ্চারিত হল কঠোর তিরস্কারের বাক্য। নরেনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছেন বলেই এতদিন নরেনের জন্য এত কেঁদেছেন। আজ সেই নরেনের প্রার্থনায় বজ্রের মতো কঠোর স্বরে তিরস্কার করছেন—"ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা না রে, এত ছোট নজর করিস নি।" শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেই শেষ করলেন না। এরপরে তাঁর স্বভাবসুলভ উপমার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বললেন—"আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো, ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত দুই হ।"—নিজের মুক্তি কামনা করা যে স্বার্থপরতা। সেই অতি সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে রক্ষা করে তাকে উৎসর্গ করে দিলেন আর্তমানবের সেবায়। শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"—বাণীকে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্যে শিষ্যকে গড়ে তুললেন মহান মানবপ্রেমিক করে। নরেনের মাঝে সত্য মানবরূপ ধারণ করল, ভক্তি নরদেহে প্রকাশিত হল। বিশ্বমানবের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রনাথ প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করে এক নবধর্মের জয়গান গাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন—বর্তমান ভারতের নব ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভাগীরথীর কূলে কূলে গড়ে উঠবে বিশ্বের নব নব তীর্থ—যা সার্বভৌম ও কালাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন—মানুষের মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, সকলের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায়। পরবর্তীকালে এই মানবপ্রেমিক মানব সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন—ভালবাসায় শান্তি, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতিতে শান্তি। আরও বলেছেন—"পড়েছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।" ধর্মের এমন নবতর ব্যাখ্যা এর আগে কেউ কোথাও শোনেনি। নবযুগের মানবশ্রেষ্ঠ আরও নতুন কথা শোনালেন—"দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।" তিনি জানালেন, মানুষ দুর্বল নয়, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। মানুষের মধ্যেই দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব,

আর পূর্ণতার সাধনায় সব পথ সমান। এভাবে তিনি আপামর সাধারণের মিলনক্ষেত্র রচনা করে বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক মানবতার যুগ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। আর এই মিলন-মনের, উদার মানবতার মন্ত্র—দ্রষ্টা বিবেকানন্দকে মায়ার জগতে ধরে রাখেন আচার্য শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ।

একদিন বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন—যেই নাম, সেই ঈশ্বর নাম নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নাম করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে। কৃষ্ণেরই জগত সংসার—একথা হৃদয়ে ধারণা করে সর্বজীবে দয়া—। জীবে দয়া, জীবে দয়া ? দূর শালা। কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" —ঈশ্বরের পূজা মানে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবা। নরেন্দ্রনাথ সেদিন এক নতুন আলোর সন্ধান পেলেন, এক অভিনব বার্তা শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে। মনে মনে সংকল্প করলেন, ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ পেলে এই নতুন আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে, কোন্ কথাটি কার কাছে জমা রাখতে হয়। তাই অন্য অনেকের মধ্যে বসে নরেনের কানে দিয়ে রাখলেন একটি মন্ত্র—"যত্র জীব, তত্র শিব" আর এই "শিবজ্ঞানে জীব সেবা।" শুধু সেবা নয়, শিবজ্ঞানে সেবা। ভবিষ্যতে নরেন্দ্রনাথের মহান ঈশ্বরপ্রেম তাঁকে মহান মানবপ্রেমিকে পরিবর্তিত করেছিল। সর্বহারা মানুষের জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল হয়েছেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারেন নি, 'আমার রক্ত, আমার ভাই' বলে তাদের আলিঙ্গন জানিয়েছেন। একদা অর্জুন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, অধুনা নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বদর্শন করলেন। তাই জীবসেবাকে দেবসেবায় উন্নীত করলেন। সব্যসাচীরূপে দেশের, জগতের গ্লানি সমূহকে দূর করে সমন্বয় সাধনে ব্রতী হলেন। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ. সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি-মুহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার—এটিই বিবেকানন্দের মর্মকথা। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছে জেনেছেন—"দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা" হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। এই ভারতের সনাতন ঋষির ভাষায় বলা যায়—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" —মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে অভিহিত করা ভারতের সনাতন ধর্ম। এই শাশ্বত বাণীকে সর্বমানবের গ্রহণ যোগ্য করে ব্যাখ্যা করেন, কালোপযোগী করে সকলের কাছে উপস্থিত করেন স্বামী বিবেকানন্দ। সার্থক শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আচার্যের ধ্যানকে বাস্তবে রূপ দেন।

সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনালব্ধ সমস্ত ঐশ্বর্য, সম্পদ নরেনকে দিয়ে নিজে চলে গেলেন। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কঠোর তপস্যায় ঐশী সম্পদ আহরণ করে বিবেকানন্দের জীবনের রক্তক্ষয়ী পরিশ্রমে সেই ঐশ্বর্য মানবসেবায় বিলিয়ে দেওয়াই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। তাই নরেনকে জানাচ্ছেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে

ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।"—এভাবে তাঁর আজীবন সাধনার সম্পদ তিনি এই যোগ্যতম আধারে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ নরেন্দ্র মহামায়ার বরপুত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় সত্তা। বিশ্বকে রামকৃষ্ণের বাণী শোনাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল নরেনের মতো একটি সবল, সতেজ, প্রেমিক মানুষকে। শিষ্য নরেন নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে কাজে পরিণত করা যায়।

বিদায়ের আগে নরেনকে আরও কিছু ভার দিয়ে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"—গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে তিনি গড়ে তুললেন এ যুগের নবীন ধর্মসঙ্ঘ। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই ধর্মসঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য। তাই একসংগে এক হাতে পূজা, অপর হাতে সেবার অপূর্ব সমন্বয় এই সঙ্ঘের আদর্শ হিসাবে রূপ নেয়। একদিকে স্বার্থপর বাসনার ক্ষয়, অপরদিকে নিঃস্বার্থ প্রেমের বিস্তার—এই শিক্ষা যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে ধরে রাখতে পারে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেদিকে সদা-সতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তরুণ-ত্যাগী-রত্ন-ছেলেদের ভার নরেনের হাতে দিয়ে গেলেন তাঁদের ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিয়ে তিনি প্রেমের রজ্জুতে তাঁদের বেঁধে দিলেন। সর্বোপরি রুগ্ন, আতুর, দরিদ্র, মূর্খের সেবাকে তিনি বর্তমান যুগের মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করলেন।

আদর্শ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বিবেকানন্দ শুনেছেন—"মানুষ আর মানহুঁশ। যার চৈতন্য হয়েছে, সে-ই মানহুঁশ। চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ জন্ম।" উপযুক্ত আধারে এই শিক্ষা সার্থক রূপ নেয়। বিবেকানন্দের অসামান্য প্রতিভায় বিশ্ববাসী আজ মুগ্ধ ও বিস্মিত। এই সম্ভাবনাময় মানুষটিকে প্রথম দিনেই চিনে নিয়েছিলেন যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্য দিয়েই সার্থক শিষ্য বিবেকানন্দকে বোঝার চেষ্টা আমাদের। স্বামী বিবেকানন্দের চৈতন্যের দ্বার যিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন—সেই শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিবেকানন্দ গেয়ে গেলেন—"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।"

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে-সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন তাহা আলোচনা হইত। সে-সকল কথা বারবার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইতনা। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম, ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেকবার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বারবার শুনিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইত না, এবং পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে ; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধহয়, আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব সত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে-সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব ( আছে ), তাহা সৌজন্যসহকারে দীনভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখকান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। আমাতে তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিরসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে, বিবেকানন্দ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহাব জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন। ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রামদাদা বলিলেন—"বিলে, কি এদিক ওদিক ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে বেড়াস—যদি ধর্ম-কর্ম করবার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।"

রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি ? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া

জুড়াইব।” বিবেকানন্দ বলিতেন, “আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রামদাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, (আবার) মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব অবস্থা।” বিবেকানন্দ যখন বাড়ি ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ি আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি? এরূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন'না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রামদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইলেন—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনীবিদ্বেষী, শিশুকালে মৃন্ময় শ্রীরামমূর্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যেদিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সেদিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভালো লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কলকে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃপুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন-দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই। গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—“শোন্ না, কথা শোন্ না।” বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—“কথা শুনিতে আসি নাই।” পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“তবে কি করিতে আসিস্?” বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, “তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।” ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু-শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন—

"ও তোমার মাথার ব্যারাম !" দেবদৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম ! অন্ধ বিশ্বাসে তুমি সাকার মূর্তি মানো।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালো, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস ?" (পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন)। গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেইদিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম !" বলিতেন—"অন্ধবিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধবিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না।" এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনোরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন-দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য-নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য-নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, অধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় ! গুরুর উপদেশে ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন ; সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়। [ তখন ] গুরুর নিকট সমাধিলাভের প্রার্থী হইলেন। বলিলেন—"আমার পরম পদার্থ নির্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই নির্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত ?" ইহা তো পূর্বে একদিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে—'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে !' " দক্ষিণেশ্বরের এ-ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে ? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—"করো কি গো ! আমার যে বাপ আছে—মা আছে !"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে—আমরা [ যে-কথা ] বলিতেছিলাম—গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—"জীবের যাহা পরমবস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য করো। জীবের নির্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি

দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিমান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে। তোমার মহাকার্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।”

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের [ এমন ] একটি অবস্থা হইল যে, [ যে- ] সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞালাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, “যাহা চাও, তাহা এই !—এই নির্বিকল্প সমাধি। তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য করো কার্যান্তে পাইবে।”

কি কার্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদি হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য করিতেন, বলিতেন তাঁহার গুরুর কার্য করিতেছেন। কেহ-কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম, এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত ! উভয়ের একই ভাব, কার্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা-মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ ভক্তি-বিভোর [ সেই ] মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান [ ও ] ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞান [ ও ] ভক্তি এক ; জ্ঞান বিবেকানন্দ, ভক্তি-পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞানলাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান” তাহা সত্য। *

## 'শ্রীশ্রীমা সারদার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ'

**স্বপ্না সেন**

এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, মানুষের হৃত আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটাতে— স্মরণ করিয়ে দিতে তার প্রকৃত স্বরূপ ; আর এই কার্য সম্পাদনের জন্যে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নরেনকে লোকশিক্ষা দেবার চাপরাশ দেবার আগেই শ্রীসারদাকে বলেছিলেন, 'তুমি তাদের দেখো'—মনুষ্য জগতকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে উত্তীর্ণ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। নরেনের জীবনের পরবর্তী সাধনার, ব্রতের সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল শ্রীসারদার আশ্রয়ে, নির্দেশে।

শ্রীসারদা, স্বামীজীর কাছে যিনি 'জ্যান্তদুর্গা', তিনি স্বামীজীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন? স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁরই বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায়, কেমন ছিলেন তাঁর নরেন!

নরেনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীসারদা বলেন, 'স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য ত, মিথ্যা হবার যো নেই ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭৭ পৃষ্ঠা )'। অন্যত্র আবার বলেন, 'বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন ; তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৭৯ পৃষ্ঠা )।'

স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য সম্পাদনের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন, শ্রীসারদা স্পষ্ট ভাষায় সেকথার উল্লেখ করেন। মঠের সকলের উদ্দেশ্যে লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্র তাঁকে শোনান হলে শ্রীসারদা বলেন, 'নরেন হ'ল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে, নরেনকে দিয়ে এসব লিখাচ্ছেন ( শ্রীমা সারদাদেবী, ১৯৬ পৃষ্ঠা )।'

পরাধীন ভারতে স্বামীজী বেঁচে থাকলে দেশের কত কাজ হত, এ প্রসঙ্গে শ্রীসারদা বলেন, 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ২০৪ পৃষ্ঠা )।'

শ্রীসারদার সঙ্গীত-রসবোধ ছিল উচ্চাঙ্গের। স্বামীজীর সঙ্গীতের মূল্যায়নে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আর নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ীর বাড়িতে ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৭৪ পৃষ্ঠা )।'

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তের জন্য সারাদিন মায়ের রান্নার কাজ চলত,

বিভিন্নজনের রুচি অনুযায়ী রান্নাও করতেন তিনি নানারকমে। নরেনের রুচি অনুযায়ী রান্নায় তাকেও পরিতৃপ্ত করেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীসারদা বলেন, 'নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, "বেশ করে রাঁধো।" আমি মুগের ডাল, রুটি করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে, কেমন খেলি ?" নরেন বললে, "বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।" ঠাকুর শুনে বললেন, "ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।" আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হল ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা )।'

বরানগর মঠে থাকাকালে স্বামীজীর ( এবং তাঁর অন্যান্য গুরু-ভাইদের ) কষ্টের কথা স্মরণ করে জননীর অন্তর মমতায় ভরে ওঠে,—'এখন ছেলেরা তো মহাসুখে আছে। আহা ! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০১ পৃষ্ঠা )।' নরেনের কষ্টের অন্য ঘটনারও উল্লেখ করেন শ্রীসারদা। 'আর একবার এমনি হয়েছিল, তিনদিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে খিদেয় মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা, এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির একটি কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাঁচে ! নরেন আমেরিকা হ'তে ফিরে এসে এক সভায় ( আলমোড়ায় ) একদিন ঐ মুসলমানটিকে একধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধ'রে নিয়ে এসে সভার মাঝে বসালে। সকলে বললে, "একি ?" তখন নরেন বললে, "এ আমার জীবনদাতা" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১০২ পৃষ্ঠা )।'

সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাকে দিয়েই স্বামীজী মঠের প্রথম দুর্গাপূজা করিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আহা ! নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা ( দুর্গাপূজা ) যেবার করায়—সেবার পূজককে আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণে দেওয়ালে ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০৩ পৃষ্ঠা )।'

নরেনের অহংশূন্য মনোভাবের প্রসঙ্গে সে সময়ের আর একটি ঘটনাও আমরা শ্রীসারদার মুখে শুনতে পাই।…'তার মাকেও পূজোর সময় মঠে নিয়ে এসেছিল।… নরেন তখন তাকে এসে বলে, "ওগো, তুমি করছ কি ? মায়ের কাছে গিয়ে বস না—লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এ সব করেছে। তা নয়, যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০৩-৪ পৃষ্ঠা )।'

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছিলেন শ্রীসারদা, আর এই বাস্তব রূপায়ণের অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন স্বামীজী। বুদ্ধগয়ার মঠ দর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীসারদার প্রার্থনায়, ইচ্ছায় গড়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। এ প্রসঙ্গেও স্বামীজীর নেতৃত্বের কথার উল্লেখ করেন তিনি—'তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে ( শ্রীমা সারদা দেবী, ৩৬০ পৃষ্ঠা )।' 'হ্যাঁ বাবা তিনি ( স্বামীজী ) নিজের দেহের রক্ত দিয়েছিলেন পরের জন্যে। নরেনই তো বিলাত

থেকে ফিরে এসে এইসব করলে। তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ২৯৯ পৃষ্ঠা )।'

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর শ্রীসারদার জন্য স্বামীজীর সংবেদনশীলতা শ্রীসারদার মন্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত। 'তাঁর যাবার পর নরেন এরা বললে, "বাড়ীটা তিন দিনও থাক, আমরা ভিক্ষে করে খাওয়াব মাকে—সদ্য সদ্য মায়ের মনে কষ্ট" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৫৫ পৃষ্ঠা )।' পরবর্তীকালে মঠের জমি কেনার পরে স্বামীজীর সেই কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'মঠের নূতন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, "মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪৮ পৃষ্ঠা )।'

আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজী শ্রীসারদার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পত্র লিখেছিলেন। সে সময়ের এক অলৌকিক স্বপ্নে এই বিদেশ যাত্রার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জননীর অন্তর ভয়-ভাবনামুক্ত হয়। তিনি দেখেন, 'ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন, ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন ( শ্রীমা সারদাদেবী, ৩৮১ পৃষ্ঠা )।'

শ্রীসারদার এক সরস উক্তিতে স্বামীজীর প্রত্যুত্তর, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর অটল-ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। 'নরেন বলেছিল, "মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।" আমি বললুম ( হাসিয়া বলিতেছেন ) দেখো, দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিওনা। নরেন বললে, "মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ? যে জ্ঞানে গুরু পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরু পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায় ?" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪৯ পৃষ্ঠা )।'

বারবার শরীর ধারণ সম্বন্ধে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করে শ্রীসারদা বলেন, 'আহা, নরেন বলেছিল, "লাখ জন্ম হলেই বা তাতে ভয় কি ?" তাই ত, জ্ঞানীর জন্ম নিতে ভয় কি ? তাদের তো পাপ হয় না ! অজ্ঞানীরই যত ভয় ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৯১ পৃষ্ঠা )।'

স্বামীজীর কাজে শ্রীসারদার গভীর আস্থা ছিল। তাঁর কার্যপ্রণালীকে কেন্দ্র করে মতবিরোধের সৃষ্টি হ'লে যুক্তিসঙ্গত সমর্থনে সেসব সমস্যার সহজ সমাধান করতেন তিনি। স্বামীজী প্রবর্তিত নিষ্কাম কর্মযজ্ঞকে সে সময়ে অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু শ্রীসারদা এ বিষয়ে বরাবর সমর্থন করেছিলেন। স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সম্বন্ধেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন অনেকে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা কাশীর সেবাশ্রম দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন ( শ্রীমা সারদাদেবী, ২৯২ পৃষ্ঠা )।' তিনি স্বামীজী প্রবর্তিত কর্মযোগের সম্বন্ধে বলেন, 'মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে ( শ্রীমা সারদাদেবী, ৩৬৪ পৃষ্ঠা )।'

সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীসারদা আবার তাঁর নরেনকে নিয়ন্ত্রিতও করেছেন। মহাপ্রাণ স্বামীজী কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সেবাকাজ শুরু করে অর্থের সংস্থানের জন্য প্রয়োজন হলে মঠের জমি-জায়গা বিক্রী করার কথা ভাবেন। কিন্তু শ্রীসারদা তাঁকে জমি বিক্রী করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তার কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে (উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, ২০২ পৃষ্ঠা)।'

পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের ঐতিহাসিক দিনে স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীসারদা উচ্চারণ করেছিলেন এমন কিছু কথা, যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "গোলাপ মা ঃ 'মা বলছেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। তোমাকে সমাজের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে।'…'ঠাকুর মা-কালীর থেকে পৃথক নন। ঠাকুরই এই বিরাট জিনিসগুলি তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। তুমিই তাঁর বাছা, শিষ্য এবং সন্তান। তোমার প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা, তিনি সকলকে বলেই গিয়েছিলেন, তুমি একদিন পৃথিবীর আচার্য হবে।……'চিন্তা করো না। তুমি যা করেছ, আর যা করবে সবই চিরকালের জিনিস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ, হাজার হাজার মানুষ তোমাকে পৃথিবীর সেরা আচার্য বলে গ্রহণ করবে"—(শতরূপে সারদা ৭৬১ পৃষ্ঠা)।'

স্বামীজী একদিন অভিমান ভরে বলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার কি করলেন? বেদান্ত-প্রচার আর অদ্বৈতানুভূতি করেও যদি একটা কাজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারলুম তবে আর কি হ'ল (যুগ নায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)?' অনুরূপ কথা শ্রীসারদার কাছেও বলায় তিনি বলেন, 'বিদ্যা, বিদ্যা মানতে হয় বই কি, বাবা!……স্বামীজী তবু বলিয়াছেন, শ্রীমা যতই বুঝান না কেন, ঠাকুর বস্তুতঃ কিছুই নহেন। শ্রীমা তখন সকৌতুকে উত্তর দিয়াছিলেন, *'না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে* বাঁধা (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের এবং স্বামীজীর ভূমিকার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রীসারদার দুটি অলৌকিক দর্শন, বিশেষ প্রাসঙ্গিক শ্রীসারদার এই দিব্য দর্শনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর নরেনের প্রকৃত স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছুকাল পরে শ্রীযুক্তা যোগীন-মা কামারপুকুরে *গেলে শ্রীসারদা একটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'ঐ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঠাকুর* তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষে দেখলুম ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন (শ্রীমা-সারদা দেবী, ১৬৭ পৃষ্ঠা)।'

শ্রীসারদা একদিন উদ্যানবাটীতে গঙ্গার ধারে উপবিষ্ট থাকাকালে "অকস্মাৎ

দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন হতে আসিয়া দ্রুতপদে গঙ্গায় নামিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ যুগযুগান্তরারাধিতা ভাগীরথীর পাপহারী পবিত্র নীরে মিশিয়া গেল। তদ্দর্শনে শ্রীমায়ের সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে দুই হস্তে সেই ব্রহ্মবারি লইয়া চারিদিকে অগণিত নরনারীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীমা চাহিয়া দেখিলেন, অসীম জনসঙ্ঘ সেই জলস্পর্শে সদ্যোমুক্তি লাভ করিতেছে।"

( শ্রীমাসারদাদেবী, ১৯০ পৃষ্ঠা )

# স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

**তারকনাথ ঘোষ**

আমেরিকা থেকে ( ১৮৯৪ খ্রীঃ ) স্বামী শিবানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর সমগ্র ভাবটি দুটি অনুচ্ছেদে জীবন্ত করে তুলেছেন। [ বাণী ও রচনা ৬, পৃঃ ৪৫-৪৬ ]—

"মা-ঠাকুরণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি ?—শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। এইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি ?

সকলে ভাল, সকলকে আশীর্বাদ কর। দাদা, দুনিয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি! দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।…ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম বলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সহ করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ ক'রে পগার পার, এই বুঝ। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে টাকার জোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।"

ঐ পত্রেই আর একটি মন্তব্য—"বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব।"

যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার পর বেশ কিছুকাল তাঁর সঙ্গ করেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে বা তাঁর উপর একান্ত নির্ভর করতে পারেন নি—তাঁকে কিছুটা যাচিয়েও নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে অনেকদিন লেগেছে। সে তুলনায় শ্রীশ্রীমার

সান্নিধ্য তিনি কতটুকু পেয়েছিলেন। কিন্তু 'মা-ঠাকরুণ কি বস্তু' তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। গুরুপত্নী বলে শ্রদ্ধাভক্তি করা নয়—শ্রীশ্রীমা তাঁর চেতনায় পরমা-শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর স্বভাবজ গভীর অন্তর্দৃষ্টি অথবা শ্রীশ্রীমার অহৈতুকী করুণা এ দুইয়ের কোনটি যে এর মূল কারণ তা বলা কঠিন। নরেন মা কালীকে মেনেছে—অর্থাৎ তৎকালে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহে মাতৃরূপা চৈতন্যশক্তিকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করেছিলেন। কিন্তু নারীরূপধরার মধ্যে সেই মহাশক্তিকে রূপে অনুভব করা—সেই অনুভূতি তথা বিশ্বাসের প্রেরণায় মহাকার্যসাধনে পরিপূর্ণভাবে আত্মউৎসর্জন অবশ্যই মহত্তর সিদ্ধি।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা থেকে এই পত্র লেখেন তখন তিনি দিব্যশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আধ্যাত্মিক চেতনায় ভাস্বর। আরও বছর চারেক আগে গাজিপুর থেকে (১৪. ৯. ১৮৯০) বলরাম বসুকে যে পত্র লিখেছেন তা থেকে তাঁর মনোভঙ্গি অনুধাবন করতে পারি।—পত্রের কিছু অংশ [ বাণী ও রচনা ৬, পৃঃ ৩০৯-১১ ]—"মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি?···মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।" —ঐ বছরই জুলাই মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী তীর্থদর্শনে যাবার সংকল্প করেন। ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজীর জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দের বর্ণনা [ যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড—'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' ]—"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে শ্মশানের ধারে এক ভাড়াবাড়ীতে ছিলেন, তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক জানিয়া স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ সেই বাড়ীতে গেলেন। স্বামীজী ভক্তিবিনম্র-হৃদয়ে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীত শুনাইলেন। তারপর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন, 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব ; নতুবা এই-ই।' শ্রীমা সচকিত হইয়া বলিলেন, 'সে কি ?' স্বামীজী অমনি শুধরাইয়া লইলেন, 'না না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' শ্রীমা আবার প্রশ্ন করিলেন, 'বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না ?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'মা, আপনিই আমার একমাত্র মা !' শ্রীমা আর কিছু বলিলেন না ; প্রত্যুত তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন।"

চিকাগোয় ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমেরিকা যাওয়ার আগেও স্বামীজী শ্রীশ্রীমার অনুমতি আর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন।—"আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্প প্রায় স্থির হইয়া গেলেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হইবার জন্য তিনি ভাবিলেন, 'আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশস্বরূপিণী ; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না ? তিনি যেরূপ বলবেন, সেইরূপই করব।' [ শ্রীমা সারদাদেবী—

'সঙ্ঘমাতা' ; স্বামী গম্ভীরানন্দ ]।—স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে [ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ২য় খন্ড ] জানা যায় যে স্বামীজী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, স্বামী সারদানন্দ আর স্বামী যোগানন্দকে পত্র লিখেছিলেন। সন্তানকে অচেনা দূর দেশে যেতে দিতে মন না করলেও শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে আশীর্বাদ করেছেন।—দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্রদুটি লোকলোচনের অন্তরালে থেকে গেছে—সম্ভবতঃ বিলুপ্ত।—স্বামী শিবানন্দকে লেখা পত্রে স্বামীজী এই আশীর্বাদ পেয়ে 'হুপ করে পগার পার' হওয়ার কথা বলেছেন। এই বিশ্বাসের বলে আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ( ১৮৯৫ খ্রীঃ ) একটি পত্রে তিনি হেঁকে বলেছেন, "মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব।"

মানবীরূপধারিণীর মধ্যে 'জ্যান্ত দুর্গা'কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই স্বামীজী আমেরিকার নারীকুলে জগদম্বার শক্তিরূপে প্রকাশ অনুভব করে বিভিন্ন পত্রে তাঁদের প্রশস্তি গেয়েছেন। নারীসমাজের সক্রিয়তা যে কীভাবে জাতিকে জাগ্রত জীবন্ত করে তোলে আমেরিকায় তা দেখেছিলেন বলেই তিনি ভারতের নারীসমাজকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য একান্ত আগ্রহী হয়েছেন। লালয়িত্রী পালয়িত্রী শিক্ষয়িত্রী পরমস্নেহময়ী জননীর বহুধাশক্তিযোগে প্রেরণাই ভারতীয় জীবনসাধনার আদি উৎস। সেই মাতৃশক্তি কালবশে অবহেলিত অবজ্ঞাত নিষ্পিষ্ট হওয়ায় বিমূর্ছিত। নারীশক্তি জাগ্রত, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেই জাতির পুনরুজ্জীবন হবে। শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই মহাশক্তির জাগরণ হবে—এটি স্বামীজীর আশা বা স্বপ্ন নয় ; এ তাঁর সেই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি।

সেইজন্য তিনি প্রথমে মায়ের মঠের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। অবশ্য মায়ের মঠ বা মায়ের মেয়েদের জন্য মঠ তখনই হয়নি, সেজন্য আরও প্রায় ষাট বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। স্বতন্ত্র মঠ স্থাপিত না হলেও বেলুড়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জন্য জমি কেনা হয়েছে (১৮৯৮ খ্রীঃ), স্বামীজী সেটিকে শ্রীশ্রীমায়েরই স্থান বলেছেন। শ্রীশ্রীমা মঠের জমি দেখতে গেলে স্বামীজী তাঁকে মঠের চৌহদ্দি দেখিয়ে বলেছেন, "মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁফ ছেড়ে বেড়াও।"·· মঠে যখন প্রথমবার দুর্গাপূজা হয় (১৯০১ খ্রীঃ), স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে বেলুড়ে এনে পূজার কদিন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াবাড়িতে স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন—পূজার সংকল্পও শ্রীশ্রীমায়ের নামে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কথা [১ম ভাগ, পৃঃ ১০৩] স্মরণ করতে পারি।—

"আহা ! নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা (দুর্গাপূজা) যেবার করায় সেবার পূজককে আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণে দেওয়ালে। চৌদ্দ'শ টাকা খরচ হয়েছিল। পূজারদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতেই খানিক বাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা. একি হল, এখন কি হবে ?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্য যে, ছেলেগুলো

প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম আর কি।' ইহা বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল!"

কৌতুককথা বলে মনে হলেও এই ছোট্ট ঘটনায় শ্রীশ্রীমার উপর স্বামীজীর গভীর বিশ্বাস আর নির্ভরতার পরিচয় লীন হয়ে আছে!—কেবল আবদারে নয়, অভিমানেও ঐ নির্ভর! কাশ্মীরে এক ফকিরের অভিশাপে (? অভিচারে) উদারাময় হয়ে পিছু হটে আসার ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, "মা! এই তো তোমার ঠাকুর!… তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।" শ্রীশ্রীমা "বিদ্যা মানতে হয় বইকি বাবা!" আর ঠাকুর সব মানতেন বলে প্রবোধ দিলেও স্বামীজী প্রথমটা সেকথা মানতে রাজি হলেন না। শেষে শ্রীশ্রীমাকে বলতে হয়, "না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।"—স্বামীজীকে একথা মেনে নিতেই হয়।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' থেকে আর একটু অংশ [২য় ভাগ, পৃঃ ৪৯]—

"মা বলিতেছেন, 'নরেন বলছিল, "মা, আজকাল আমার সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।" আমি বললুম (হাসিয়া বলিতেছেন), "দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!" নরেন বললে, "মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?"

ইহা বলিয়াই আবার বলিতেছেন, 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। "মা, মা" শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা!"

এ যেন ক্ষীরভবানী দর্শনের পর স্বামীজী অবস্থার বর্ণনা! অখণ্ড মাতৃচেতনায় প্রজ্ঞানের পরিপূর্তি! অবতারত্বের প্রসঙ্গ না তুলেও বলা যায়, শ্রীশ্রীভবতারিণীকে অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানী হয়ে যে সহজ আনন্দের সাগরে ভাসতেন, শ্রীশ্রীমাকে ধরে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানেই গিয়ে মিশেছেন।

নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর উক্তি।

উনিশ'শ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী নিবেদিতাকে "A Benediction" কবিতায় যে আশীর্বাদ করেন, তার অনুবাদ ঃ

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদু মধুময়,
আর্যবেদী 'পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে—
সকলই তোমার হোক, আরো, আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের কেহ।
ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

**বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে**

**ভগিনী নিবেদিতা**

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের কথা যদি কেহ সঠিক লিখিতে পারে, সে নিবেদিতা, আর কেহ নয়।" বিবেকানন্দ আদৌ অত্যুক্তি করেন নাই। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ১৯০৭ সালের প্রথম দিকে নিবেদিতা তাঁহার THE MASTER AS I SAW HIM গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করেন। আরো তিন বৎসর পরে ১৯১০ সালে লন্ডন হইতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইখানি প্রকাশিত হইবামাত্র সকলের সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং এই দ্বিতীয় গ্রন্থ লিখিযাই লেখিকা হিসাবে নিবেদিতা আরো খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যদি পরে আর কোনো বই না লিখিতেন, তাহা হইলেও এই একখানি পুস্তকই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি হিসাবে অমর হইয়া থাকিত। অনেকের মতে ইহাই নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কারণ ইহা বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের অনুপম ব্যাখ্যা।

'দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্' একাধারে বিবেকানন্দের জীবন-চরিত ও নিবেদিতার জীবনস্মৃতি। এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র, তাঁহার কাগজপত্র, তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যের পরিকল্পনা, তাঁহার কবিতা, এ সমস্তই নিবেদিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। না পারিবার প্রধান কারণ এই যে, যখনই তিনি লিখিতে গিয়াছেন তখনই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই গুরুর প্রতি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। গুরুর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে গিঁয়া নিবেদিতার মত তেজস্বিনী মহিলাও তাঁহার মনের আবেগকে সামলাইতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টার

পর তিনি শান্ত হইয়া নিজের মনকে দর্পণ স্বরূপ মনে করিলেন এবং সেই দর্পণে তাঁহার গুরুর প্রশান্ত মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। এই গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পর গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিবেদিতা তাঁহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ ইহারই মধ্যে বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন অতি সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইযাছে।

স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য নিবেদিতা এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে এই গ্রন্থ অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তাহা এক নিবেদিতাই বর্ণনা করিতে পারিতেন। গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে বিবেকানন্দের দৃপ্ত-পৌরুষ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত। নিজের কথা নিবেদিতা খুব অল্পই বলিয়াছেন। নিবেদিতা এই জীবন-চরিত রচনায় যেরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যে স্যামুয়েল জনসনের বিখ্যাত জীবন-চরিত-লেখক বস্‌ওয়েলের কথা আমাদের স্মরণ হয়। বস্‌ওযেল না থাকিলে জনসনকে যেমন বুঝিতে পারা যাইত না, সেই রকম নিবেদিতা না থাকিলে আমরা বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারিতাম না। নিবেদিতা সত্যই বিবেকানন্দের বস্‌ওয়েল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি পদক্ষেপ শুধু চক্ষু দিয়া নয়, মন দিয়া তিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন; জীবনকে বিশ্লেষণ করিবার যে বিচক্ষণতা ও নিপুণতা নিবেদিতার লেখনীমুখে ছবি আঁকিয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। এক নেভিনসন্ ভিন্ন ইংরেজী সাহিত্যে আর কেহ লেখনীমুখে এরূপ ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ষ্টেটসম্যান্-সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে গিয়া বক্তা হিসাবে এবং লেখিকা হিসাবে নিবেদিতাকে তুলনা করিয়াছেন। সে তুলনা পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা, বক্তা অপেক্ষা লেখিকা হিসাবেই ভগিনী নিবেদিতার কৃতিত্ব বেশী। তাঁহার বক্তৃতায় থাকিত আবেগ, কিন্তু তাঁহার রচনায় পাই শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা, সংযম আর ভাব প্রকাশের অভিনব রীতি।

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিলেন—তাহারই চিত্তস্পন্দী ইতিহাস 'দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্' এবং এই ইতিহাসের মূল চরিত্র বিবেকানন্দ। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর হইতে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর নিবেদিতা বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। এই সাত বৎসর সর্বদাই তিনি গুরুর নিকট থাকেন নাই। বিবেকানন্দের সহিত তিনি উত্তর ভারতে ও জলপথে একাদিক্রমে ছয় সপ্তাহ ভারত হইতে ইংলণ্ডে জাহাজে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময় যে সকল কথোপকথন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ

সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিবেকানন্দ যেমন একটি আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, কোনো ব্যক্তিকে প্রচার করেন নাই, নিবেদিতাও তেমনি এই জীবন-চরিতে সেই বিবেকানন্দের কথাই বলিয়াছেন যে বিবেকানন্দের মধ্যে এমন একটি বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি যে হৃদয় হইতে ইতিহাসে রাষ্ট্র-বিপ্লবের জন্ম হয়।

এই পুস্তক প্রসঙ্গে নিবেদিতার ফরাসী-চরিতকার লিখিয়াছেন ঃ

"স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর মিস ম্যাকলয়েড নিবেদিতাকে তাঁহার গুরুর একখানি জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা কথাটি গায়ে না মাখিয়া বলিয়াছিলেন, 'হয়ত লিখিব, এখন নয়। কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক না। তাঁহার জীবনী লিখিতে হইলে ভাব ও ভাষা অনাড়ম্বর এবং স্বচ্ছ হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করা চাই তাহার মধ্যে।'…'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রথম অধ্যায়গুলি ছাপা হয় ১৯০৬ সালে। বাঙালি বিবেকানন্দকে জানিত অবতার বলিয়া, কিন্তু নিবেদিতা ফুটাইয়া তুলিলেন মানুষ বিবেকানন্দকে। সরল সহজ উদারচেতা পুরুষ। এ-বিবেকানন্দকে কেহই চিনিত না। স্বামীজীর এই মানবতাই যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল।"

বইখানির প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ-পত্রে নিবেদিতা শুধু লিখিয়াছিলেন একটি কথা. 'বন্দে মাতরম্'। ১৯১০ সালের উদ্বোধন-সংস্করণে এই উৎসর্গ-লিপিটি পরিত্যক্ত হয় এবং ইহার পরিবর্তে স্বামী সারদানন্দ লিখিত চার লাইনের একটি আশীর্বাণী সংযোজিত হইয়াছে। এ যাবৎকাল বইখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বইখানির যে ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বলিয়াছি, গুরু ও শিষ্যের চিরন্তন আত্মিক সম্পর্কের গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ একটি আলেখ্য এই বইখানি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাহিত্যের ইতিহাসে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সাহিত্যের ইতিহাসেও নিবেদিতার 'দি মাণ্টার অ্যাজ আই স হিম' বইখানি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. কে. চেইনী পুস্তকখানি প্রথম যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিখ্যাত 'হিবার্ট জার্নাল' পত্রিকার এক সংখ্যায় ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ "নানা ধর্মশাস্ত্রের পরই ধর্ম-বিষয়ক যত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে তাহাদের ন্যায় অমূল্য এই গ্রন্থ। ইহা 'দি কনফেসন্স্ অব সেণ্ট আগস্তিন' এবং সেবেতিয়ার-প্রণীত 'লাইফ অব সেণ্ট ফ্রান্সিস' এই বই দুইখানির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য।"

লণ্ডনে বিবেকানন্দকে প্রথম দেখিবার পর ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পর নিবেদিতার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল. তাহার বর্ণনা লেখিকা প্রথমে দিয়াছেন।

"স্বামীজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বেই এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি

তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। ধর্মোপদেষ্টা হিসাবে, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার জগৎকে দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি দেখেন যে, সত্য উহাতে না থাকিয়া অন্য কিছুতে আছে, তাহা হইলে তিনি এক মুহূর্তের জন্য ঐ মতের অন্তর্গত কোন কিছুই সমর্থন করিবেন না। আমি তাঁহার উপদেশাবলী উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহার কোন অংশে অসংলগ্নতা নাই; কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে হাতে-কলমে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত আমি উহাদের চরম সত্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করি নাই। আর, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হইলেও, আমি সে সময় তাঁহার এবং আমার জানিত যে-কোন চিন্তাশীল বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য পরে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

"অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় এবং অদ্ভুত গাম্ভীর্যময় এক প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি আমার নিকট সর্বোপরি আধ্যাত্মিক জীবনেরই মাহাত্ম্য প্রচারক ঋষিরূপে প্রতিভাত হইতেন; বাহিরের জগৎ অন্তর্জগতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে—ইহাই তিনি প্রচার করিতেন। তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং যে দিক দিয়া উহা করিতেন সেগুলির যুক্তি-বিচারগুণ উপভোগ্য হইলেও, উহাদের মধ্য দিয়া একটি ধ্বনি, একটি মূল সুর শ্রুতিগোচর হইত। সেই সুর, সেই ধ্বনি এই: 'আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকৃতিই আত্মার জন্য।' যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বামীজীর বক্তৃতাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহার নিকট পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ এইরূপ বোধ হইবে—একটি যেন প্রত্যূষে বহুদূরে কোন নদীতীর হইতে সমাগত বংশীধ্বনির ন্যায়, উহা পৃথিবীর বহু সুমধুর গীতের মধ্যে অন্যতম: অপরটি সেই স্বরলহরীই, শ্রোতা যখন ক্রমশঃ নিকটতর হইতে হইতে অবশেষে উহাতে তন্ময় হইয়া গিয়া নিজেই গায়ক হইয়া যান, তখন যেরূপ হয়, সেইরূপ। আর উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগের মাহাত্ম্য জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠে।

"পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজী আমাদের নিকট শুধু ধর্মাচার্যরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এখনও মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেই আমি তাঁহাকে সেই পুরাতন বক্তৃতাগৃহে উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিতে পাই; দেখি তিনি বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্তভাবে এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই আধুনিক জগতে সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারিত হইতেছে। তাঁহার এই স্থির ধারণা ছিল যে ভবিষ্যতে আবার একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্ত্যে আসিয়া তাঁহার মতই ভাবী বংশধরগণের ফললাভের জন্য নূতন নূতন বীজ বপন করিয়া যাইবেন। তাঁহার

আচার-ব্যবহারে যে বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর ভাব আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার এই স্থির ধারণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।"

ভারতবর্ষে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিবেদিতা বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার আলোকে স্বামীজীকে তিনি যে-ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই রকম ঃ

"আমার মনে হয়, একথা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিবিধ প্রভাবের ফলে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল ঃ প্রথমত, তাঁহার ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ; দ্বিতীয়ত, তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র—যিনি, সমুদয় শাস্ত্র যে-জীবনকে একবাক্যে আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরূপ ছিলেন; এবং তৃতীয়ত, আমার যতদূর মনে হয়, তাঁহার ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান—যাহার বলে তিনি উহাদিগকে এমন এক বিপুল সজীব ধর্মশরীরেরই অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অশেষ মহিমান্বিত গুরুদেবও স্বয়ং যাহার সাকার বিগ্রহ ও বাণীমাত্র ছিলেন। আমার মনে হয়, এই তিনটি প্রভাব তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা হইতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেছেন ও জগতের সম্মুখে স্বদেশবাসিগণের দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি প্রধানত প্রাচীনকালের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন; অবশ্য যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা শুধু ঐ সকল গুহ্যপ্রতিপাদ্য সত্যসমূহ তাঁহার গুরুদেবের জীবনে একাধারে সমষ্টিভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়া। আমরা যখন তাঁহার বক্তৃতাগুলি পাঠ করি, তখন আমরা এমন কিছুর পরিচয় পাই যাহা তাঁহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত; এই সকল বক্তৃতার পশ্চাতে যে-শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার দীর্ঘ ভারত-ভ্রমণেরই ফল। স্বামীজীর এই ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া শেষ করিবার নহে। তাঁহার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রদ্ধা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ফল নহে, উহা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানজনিত। আমি শুনিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের আশৈশব এই অন্তর্নিহিত সংস্কার ছিল যে, তিনি দেশের উপকার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেক পরে তিনি এই কথা মনে করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন যে, আমেরিকা গমনের পর প্রথম প্রথম তাঁহাকে যে সকল অবস্থাবিপর্যয় সহ্য করিতে হইয়াছিল—যখন ও বেলার আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন তাহার ঠিকানা ছিল না, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যে সকল মহাত্মা কোন বিশেষ কার্য সংসাধিত করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এইরূপ একটি অদম্য আশা বর্তমান থাকেই থাকে। ইহা ভাবী মহত্বের একটি গভীর ধারণা, ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না; উহার একমাত্র প্রকাশ জীবনে। ...শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ার করিবার জন্যই

জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি তাই ? না, জগন্মাতার একটি মাত্র মহীয়সী বাণীর এক অংশকে তাঁহার অংশান্তর হইতে নিশ্চয়পূর্বক পৃথক করিয়া দেখা যেমন অসম্ভব, তেমনি এই দুইজনের জীবনকেও পৃথক করিয়া দেখা অসম্ভব ! এ সকল জীবনের সম্যক আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই জীবনের অর্ধ-আলোকময় অংশে অনেকগুলি মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

"পাশ্চাত্যের বিলাসিতার মধ্য দিয়া তিনি নির্ভীকভাবে এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিচরণ করিতেন। ভারতে আমি যেমন তাঁহাকে অবিচলিতভাবে সাধারণ লোকদের মত বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মেঝেয় বসিয়া হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে দেখিয়াছি, ঠিক তেমনই ভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না করিয়া তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল জীবনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগ করা এবং সে-সব ত্যাগ করা—এ দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান। অতীত যুগে ভারত নির্ধনতাকেই সকল গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভবিষ্যতে সম্পদকেও কতকটা গৌরব দান করিতে হইবে।'

"স্বামীজী সর্বদাই সকল বস্তুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি আগ্রহের সহিত যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, নানাবিধ শিক্ষাসংস্থা, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য লইতেন। তবে কোন স্থানেরই রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা অনুভব করিয়া সেই রকম ব্যবহার করিতে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। প্রত্যেক বিষয় প্রত্যেক জিনিস যে যে ভাবরাশি অভিব্যক্তি করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহা দ্বারাই তিনি উহাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। শেষবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমি তার প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি প্রধানত তার অর্থ-লিপ্সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি।...ভারতের সমস্যা ও আমেরিকার সমস্যা যে সম্পূর্ণ পৃথক, অন্তত এ বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নেই।' তিনি বিদেশে ভারতের অভাব বা সমস্যাসমূহের আলোচনা করার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে ঐরূপ করা হইলে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেন। যদিও সকলে তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বেরই অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন, তথাপি স্বামীজী নিজে সর্বদা ভারতভূমে জন্মগ্রহণের জন্যই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে এবং বিদেশে যে সব মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভগিনী নিবেদিতার সুযোগ হইয়াছিল সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার এবং বুঝিবার। স্বামীজীর মত সম্পর্কে নিবেদিতার আলোচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে ; কারণ

বিবেকানন্দকে নিবেদিতা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দই পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট বেদ ও উপনিষদের ভাবরাশির প্রথম ও প্রামাণিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার নিজের কোন ধর্মমত প্রচার করিবার ছিল না। তিনি স্বর্গের পরিবর্তে মুক্তি প্রচার করিতেন, পরিত্রাণের পরিবর্তে জ্ঞানলাভ শব্দ ব্যবহার করিতেন, ঈশ্বরের পরিবর্তে সর্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে উপদেশ দিতেন, এবং কোন একটি বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা না করিয়া সকল ধর্মেরই সত্যতা ঘোষণা করিতেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ বিদ্যালয়ে অধিগত দর্শনচর্চামাত্র ছিল না; উহা ছিল এমন এক জীবন্ত মহাজাতির হৃদয়ের চিরপোষিত বিশ্বাস যাহা পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ধরিয়া ঐ জাতি তাহাদের জীবনে-মরণে উহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। ধর্মগ্রন্থসকল তাঁহার নিকট জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই; উহারা তাঁহার নিকট শুধু এক মহান্ জীবনের টীকা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিল; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদই সর্বোচ্চ অবস্থায় একমাত্র সত্য। স্বামীজী বলিতেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও উহাদিগের সমন্বয় করা চলে। স্বামীজীর চক্ষে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ন্যায় অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটুকু প্রকাশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একবার তিনি বলিয়াছিলেন—'এক 'মনুষ্যত্ব' কথাটিতেই জাতি বল, ধর্ম বল—সব কিছুরই সার নিহিত।' আবার ইহাও দেখিয়াছি, কোন জাতির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে স্বামীজী তাহাদের সদ্গুণরাজির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উহা করিতেন, কখনো তাহাদের দোষগুলি দেখিয়াই বিচার করিতেন না। হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি আবিষ্কার তাঁহার একমাত্র কার্য ছিল। তিনি বলিতেন—হিন্দুধর্মের ভিত্তি বেদ এবং বেদের মাহাত্ম্য ধর্মের ইতিহাসে এক অতুলনীয় সামগ্রী। প্রাচীন বলিয়াই বেদ শ্রেষ্ঠ নহে ইহা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, জগতের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কেবল বেদই মানবকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাকে সকল গ্রন্থের পারে যাইতে হইবে। সেইজন্য বহু সম্প্রদায় ও মতমতান্তরের সমষ্টিতে গঠিত হইলেও হিন্দুধর্মের অনন্ত উদারতা ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাকে উহার গণ্ডীর বাহিরে রাখিবার চেষ্টাই স্বামীজী আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষকে একতাসূত্রে আবদ্ধ জ্ঞান করিতেন। মনের অপেক্ষা হৃদয়ের একতাই তাঁহার নিকট বেশী মূল্যবান ছিল। তিনি কখনো জাতীয়ত্ব প্রচার করেন নাই, কিন্তু উক্ত শব্দে যাহা বুঝায়, তিনি স্বয়ংই তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি ভারতের জাতীয় আদর্শ, আমাদের আচার্যদেব নিজ জীবনদ্বারা আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া

দিয়াছিলেন।”

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনে কোন্ ভাবটি প্রবল ছিল এবং ধর্মসংস্কারক হিসাবে তাঁহার কি মতবাদ ছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

“আধ্যাত্মিক হিসাবে বলিতে গেলে, স্বামীজীর মন দ্বিবিধ উপাদানে গঠিত ছিল, ইহা আমি সর্বদা অনুভব করিয়াছি। তিনি যে আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ ; শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী যখন আট বৎসরের বালক মাত্র, তখনই তিনি খেলা করিতে বসিয়া সমাধিস্থ হইবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি অফুরন্ত সূক্ষ্ম ও দার্শনিক ভাবগুলির দিকে ছিল ; সচরাচর যে সকল ব্যক্তিকে ‘পৌত্তলিক’ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, উহা তাহাদের ঠিক বিপরীত ছিল। যৌবনে, এবং খুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইবার অন্ততঃ কিছুকাল পরে, তিনি যথারীতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি এমন কিছুই প্রচার করেন নাই, যাহা মূর্তি-বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম- সাক্ষাৎকারই তাঁহার একমাত্র আদর্শ, অদ্বৈত দর্শন তাঁহার একমাত্র মতবাদ এবং বেদ ও উপনিষদ্ তাঁহার একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষের জগজ্জননী-বোধক ‘মা’ শব্দটি তাঁহার মুখে সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তিনি দিবারাত্র জগদম্বার ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, তিনি সকলই জগন্মাতারই হাত বলিয়া জ্ঞান করিতেন।···যখনই তাঁহাকে কালীমূর্তির ব্যাখ্যা করিতে বলা হইত, তখনই তিনি বলিতেন—‘মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ ; মানব উহা পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, আর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে অবশেষে সে দেখে যে, উহাতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, ইহাই চরম ব্যাখ্যা। মা-কালীই ভারতের ভাবী বংশধরগণের একমাত্র উপাস্য হইবেন। তাঁহার নাম লইয়া মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন। সর্বশেষে তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ঘটিবে, শক্তির-মধ্য দিয়া ব্রহ্মে উপনীত হইবে।’

“ভারতের অতীতকে মাত্র পুনরুজ্জীবিত বা পুনঃস্থাপিত করা স্বামীজীর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তিনি নিজে দেখিতে চাহিতেন সেই প্রাচীন ভারতের বলবীর্য এই নূতন যুগে নূতন ভাবে প্রযুক্ত হউক, এবং কল্পনাতীত রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হউক। তিনি একটি ‘সক্রিয়’ ধর্ম দেখিতে চাহিতেন। যাহা জগতে অলৌকিক রহস্য নামে পরিচিত, সেই জিনিসকে স্বামীজী ভীতির চক্ষে দেখতেন। প্রকৃত ধর্মের সহিত তথাকথিত অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের কোনো সম্বন্ধ আছে—তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন না এবং অপরকেও উহা বিশ্বাস করিতে বলিতেন না। এই সকল কথা তাঁহার নিকট ঘৃণার বস্তু ছিল। প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিগণ ভারতবাসীদিগের নিকট যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উদারহৃদয় স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট

সেই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্মভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এবং যে-কোন আকারের নিষ্ঠাসহকৃত সেবাদ্বারা উহার বিকাশ করা যায়—উহাই উক্ত ধর্মের সারকথা। ধর্মের ব্যাপারে য়ুরোপীয় নেতৃত্বের সফলতায় স্বামীজী কদাপি বিশ্বাস করিতেন না।”

ভারতের নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর উন্নতি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও মনের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া ছিল। তাঁহার মানবপ্রেমিক গুরুর চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

“আমাদের আচার্যদেব মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা শিষ্যদের সর্বদাই বলিতেন,—‘কখনো ভুলো না, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতিসাধনই আমাদের মূলমন্ত্র।’ স্বামীজী জাতিভেদ-ব্যবস্থাটির সর্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন। উহাকে মানবজীবনেরই একটি অনিবার্য ব্যাপার বলিয়া দেখিতে পাওয়ায়, তিনি জাতিভেদকে শুধু হিন্দুধর্মেরই একটি বিশেষ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই, সে বিষয়ে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাচরণ বলিয়া অভিহিত করিবেন, সে-বিষয়ে তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার নিকট, যাহা কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে কোন শিক্ষাপ্রণালী এই সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। যাহারা চঞ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তাভ্রষ্ট, শত বাহ্য পারিপাট্য সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেখিতেন যে, কোন আধুনিক ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীনকালের ন্যায় একান্ত নির্ভর ও পরাভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুর-গৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকালসুলভ নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি, তাঁহার নিকট, ‘আদর্শ হিন্দুপত্নী’ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক দেখান ব্যাপার নহে। আর যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষা পদবাচ্যই নহে।

“ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যানশক্তিবর্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাব বিসর্জন দিয়া নহে। স্বামীজী বেশ স্পষ্ট বুঝিয়া-

ছিলেন যে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা হইবে, যাহাতে সমগ্র সমাজ-শরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্তন আনয়ন করিবে। আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ করিতে সহায়তা করিবে। আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। তেজস্বিতা ও সাহসের সহিত নারীগণকে কোমলতা ও মাধুর্যেরও বিকাশ দেখাইতে হইবে। স্বামীজী স্ত্রীজাতির স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা-বিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈ-চৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঙিয়া ফেলা, এ-সকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। সমাজের আদর্শগুলি মানিয়া লইয়া, জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদেশগুলি বুঝিয়া লইয়া, নারীগণ যতই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবেন, ততই তাঁহারা উন্নতির এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দের বুদ্ধ-প্রীতি সম্পর্কে নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"স্বামীজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই সর্বপ্রধান। এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা হেতুই তিনি উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়, ওটি একটি উচ্চ অবস্থা।' নিজে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেও, স্বামীজী শুধু 'ললিতবিস্তর' নহে, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার বিখ্যাত মূল গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতা' সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া বোধিবৃক্ষের তলে বসিয়াছিলেন। বুদ্ধের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতাই শুধু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। তাঁহার গুরুদেবের জীবনের সহিত আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এই সর্বজন-স্বীকৃত ইতিহাসের অনেক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে স্বামীজী সর্বদাই গভীরভাবে আলোচনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সারা জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর জীবন্ত জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অসীম ত্যাগ ও দয়া সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের শেষ জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া নিবেদিতা যে সংযম ও মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার মতন সুনিপুণ লেখিকার পক্ষেই সম্ভব। নিবেদিতা লিখিতেছেন ঃ

"তাঁহার গুরুদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য শেষ হইলে স্বামীজী আবার তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিরূপ আমটি খাইতে পারিবেন ; সে কথা তাঁহার বাল্য-সঙ্গিগণ কদাপি বিস্মৃত হন নাই। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্তে ঐ কার্য সমাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার চরম অনুভূতি যে আসন্ন, একথা কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছিলেন। যতই শেষ দিন নিকটবর্তী হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তপস্যা

তাঁহার অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়াছিল। যে-সকল বস্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারিত না। তাঁহার শেষ জন্মদিনের প্রাতঃকালে তাঁহার শেষ তীর্থ দর্শন হইল বুদ্ধগয়া এবং তাহার পরে বারাণসী। তাঁহার সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অবসান হইয়াছিল। দেহত্যাগের পূর্বে একজনকে বলিলেন—'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জাগিয়াছে এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি।' শেষের কয়দিন স্বামীজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। এই সময়ে তাঁহার মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মাত্র বলিয়া বোধ হইত।...সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। আধঘণ্টা পরে সেই ধ্যানরূপ পক্ষে ভর করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া পরমধামে চলিয়া গেল; শরীরটা ভাঁজ করা পোশাকের মতন পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।"

## ২. জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

**ভগিনী নিবেদিতা**

যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, আজ তাঁহার কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গঙ্গার তীরে নির্জনে যে আলোকশিখা গত পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নির্বাপিত। যে কন্ঠস্বর দেশে-দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল আজ তাহা নীরব। এক উদ্দাম ঝটিকার বেগে জীবন বিকশিত হইয়াছিল এই মহান আত্মার মধ্যে। কিন্তু সেই জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল শান্তির মধ্যে। সান্ধ্য সঙ্গীত শেষ হইলে পরে মৃত্যুর আশীর্বাদ নামিয়া আসিল এক অমাবস্যা রজনীতে। ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহভার তিনি রক্ষা করিলেন এবং ক্রমে মহাসমাধিতে বিলীন হইয়া গেল তাঁহার সেই বিজয়ী আত্মা।

সবেমাত্র তিনি কর্মসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে বিবেকানন্দের মৃত্যু হইল। আরো নূতন এবং বৃহত্তর কর্মের আহ্বান যখন তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন মানুষ গড়িবার জন্য এবং সেই কার্যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করিয়াছিলেন এবং এই দুরূহ কার্যের জন্য তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে আচার্য, পিতা এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর দিনের অপরাহ্ণটি পর্যন্ত তিনি এইভাবে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কার্যে সিদ্ধিলাভ কিম্বা—নেতৃত্ব—ইহার কোনোটাতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম প্রচারের সময় বহু বিত্তশালী লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে রাখিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিলাসবহুল জীবনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করিতেন না। তাঁহার কাছে ভিক্ষুকের ছিন্নবাস, কলিকাতার স্বল্পপরিসর রাস্তা এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর অক্ষমতা সবচেয়ে প্রিয় ছিল। পাশ্চাত্য তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল কেন? কেন সেদেশের লোক তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম-প্রচারকদের একজন বলিয়া সম্মান করিয়াছিল? তিনি তো ব্যক্তিগত কোনো ধর্ম প্রচার করেন নাই। তিনি তো কোথাও বলেন নাই হিন্দুধর্মই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কিম্বা আর সব ধর্ম নিকৃষ্ট। কিম্বা কোনো একটি বিশেষ মতবাদ তিনি জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া হিন্দুধর্ম গঙ্গোত্রীর নির্মলধারার মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং নিতান্ত বুদ্ধিজীবিরাও সেই ধারায় স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদ্ ছাড়া তিনি অন্য কোনো শাস্ত্র হইতে উধৃতি দিতেন না। বেদান্ত ভিন্ন তিনি অন্য কিছু প্রচার করিতেন না। মানুষের অন্তরে গিয়া প্রবিষ্ট হইত সেই বাণী, কারণ সেই

বাণী আসিয়াছিল এমন একজন ধর্মাচার্যের নিকট হইতে যিনি সত্যকে ভয় করিতেন না।

তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে জানিতেন একজন সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া। তীব্র ত্যাগ ছিল সেই সন্ন্যাসের অবলম্বন এবং তাঁহার সরল উপদেশের মধ্যে সর্বদা প্রতিধ্বনিত এই তীব্রবৈরাগ্য। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যেন আমার গুরুর ন্যায় যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি ; কাঞ্চনে আসক্তি নাই, কামিনীতে আসক্তি নাই, যশে স্পৃহা নাই এবং এই তিনটির মধ্যে যশস্পৃহা হইল সবচেয়ে মারাত্মক।" এমন যে বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি একজন সতর্ক গৃহস্থকে—যে গৃহস্থ সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, যে গৃহস্থ বস্তুর ব্যবহার শিখিতে এবং শিক্ষা দিতে আগ্রহবান এবং যাহার সকল কর্ম প্রচেষ্টা জীবনকে শৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া গঠন করিতে ব্যগ্র। তাঁহার বৈরাগ্য এবং ত্যাগের মধ্যে তাই জীবনকে উপেক্ষা ছিল না।

বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ভারতের শ্রেয়োধর্মী অধ্যাত্মধারণার মূর্ত বিগ্রহ ও একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক। জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার কালে যে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে, তিনি সেই যুগকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। ভারতের ঐতিহ্যে তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল এবং ইহার প্রাচীন রীতিনীতির তিনি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের জাতীয় জীবনের পরিণতি যেন তাঁহার মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল এবং তিনি এক নূতন জীবন-বোধের সূচনা করিয়া ঊনবিংশ শতকের জাগরণকে অনেকাংশে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পাইয়াছিলাম। ভারতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য নির্ণীত হইবার সময় এখনো আসে নাই। কারণ ধর্ম হইল জীবন্ত বীজের সমান, সেই বীজ তিনি সবেমাত্র বপন করিয়া গিয়াছেন, ফসল তুলিবার সময় এখনো আসে নাই।

কিন্তু একমাত্র মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমরা দেশপ্রেমিককে পাইয়া থাকি। আজ তিনি যখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যখন শ্মশানে তাঁহার সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তখনই শুনি সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর যাহার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল এবং সমগ্র জাতি এক মন হইয়া যাহা শুনিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমন একটি মনের পরিচয় পাই যাহা পৃথিবীর নানা দেশের নানা লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অসাধারণ সুযোগ পাইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছেন এবং সর্বত্রই উচ্চ এবং নীচ সকলের দ্বারাই তিনি সম্বর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাহা কিছু দেখিত তাহারই মর্মে প্রবেশ করিত। কতবার না তিনি বলিয়াছিলেন—"আমেরিকাবাসীরা শূদ্রের সমস্যা সমাধান করিবে—কিন্তু তাহার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে।" কিন্তু পরবর্তীকালে, দ্বিতীয়বার যখন তিনি পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার এই মতের পরিবর্তন

হয় এবং তিনি পাশ্চাত্যের অপরিসীম ধনলুব্ধতা ও বৈশ্য-প্রবৃত্তির কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন যে, উহার তুলনায় এশিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার নৈতিক মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত।

তাঁহার নিকট প্রত্যেক জাতির মহত্ত্ব স্বীকৃত হইত এবং তিনি বলিতেন যে, সেই মহত্ত্বের আলোকেই সেই জাতিকে চিনিয়া লইতে হইবে। তেমনি ভারতবর্ষকে চিনিতে এবং বুঝিতে হইলে, স্বামিজী বলিতেন, ভারতের যুগযুগান্তরের মহত্ত্বের ইতিহাস জানিতে হইবে। দরিদ্র, সর্বরিক্ত, পরাধীন ভারত চিরকাল কিন্তু পরাধীন ছিল না, এবং চিরকাল উহা পরাধীন থাকিবেও না। কিন্তু ইহার যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা ভারতের সকল অবস্থার মধ্যেই অটুট রহিয়াছে। কী সেই মহত্ত্ব, যাহার জন্য ভারত সারা এশিয়ার মুকুট-মণি, তাহার দিকে বার বার অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া স্বামীজী বলিতেন, ভারতবাসীকে যদি প্রাচীন যুগের সহিত নবীন যুগের সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগকে ভারতের চিরন্তন মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে। তাঁহার দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কী ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া গিয়াছেন? মৃত্যুকালে যে গৈরিকবাস তিনি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় কোন্ বৈশিষ্ট্যে তিনি সন্ন্যাসীর সেই বস্ত্র রাঙাইয়া লইয়াছিলেন? দণ্ডের উপর সেই বস্ত্রকে পতাকা করিয়া আজ আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মানুষ যে মানুষ জীবনে অকৃতকার্যতা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। আজীবন তিনি ছিলেন শক্তিমন্ত্রের, অভীঃমন্ত্রের উপাসক। নেতিবাচক কোন কিছুই তাঁহার চিন্তার পরিমণ্ডলে থাকিতে পারিত না। উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা ছিল তাঁহার চরিত্র হইতে সুদূরতম জিনিস। কাহারো কর্তৃত্বই তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না— এমনই প্রচণ্ড রজোগুণের আধার ছিলেন তিনি। একমাত্র আচার্যের ভূমিকা ভিন্ন অন্য কোনো ভাবেই তিনি কোনো বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এমনই তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল তাঁহার স্বাজাত্যাভিমান। আমার এক ইংরেজ বন্ধু, যিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর যাহা কিছু প্রতিভা, তাহা তাঁহার মর্যাদার মধ্যেই নিহিত। রাজকীয় মহিমায় দীপ্ত সেই মর্যাদা"।

স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়ের মত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট আসিবে, চাটুকার হিসাবে নহে, ভৃত্য হিসাবে নহে, আসিবে আচার্য হিসাবে, গুরু হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে। সেই যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তিনি কখন কাহারও নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা অবনমিত করেন নাই। কতবার না তিনি গভীর ঘৃণার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন—"ইংরেজ আমাদের ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেবে! গোষ্পদে সমুদ্র যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণাও তেমনি। ভারতের স্থান এখানে পৃথিবীর শীর্ষদেশে —একথা আমি হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করে বলতে পারি।"

ভারতবর্ষের সব কিছুই বিবেকানন্দের চক্ষে মহিমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

ইহার জনগণের দুঃখদৈন্য ও দারিদ্র্যে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ করিব। একবার জাহাজে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষের পুরাণ সম্পর্কে একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে। স্বামীজী এমন প্রচণ্ড যুক্তি সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া ভদ্রলোক রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সেই সময় ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্র, ইহার প্রাচীন বেদ ও উপনিষদ্ সম্পর্কে তিনি এমন সারগর্ভ আলোচনা করিলেন যাহা শুনিবার পর সেই বিদ্রূপকারী ইংরেজ একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। ভারতের স্বার্থে যে কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, স্বামীজী নির্মমচিত্তে তাহাকেই প্রতি-আঘাত হানিয়াছেন। সে যদি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হইত, তাহা হইলেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ভারতের সব কিছুই, তাঁহার কাছে চিরন্তন পবিত্র। তাই না তিনি বলিতেন—"ঈশ্বরে যাঁহারা পৌঁছাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভারত-বর্ষের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক মহিমার চির পুণ্যক্ষেত্র এই প্রাচীন দেশ।" এইজন্যই তিনি তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদিগকে বলিতেন—"যদি তোমরা ভারতবর্ষকে ভালবাস, তাহা হইলে ইহার সব কিছুকেই ভালবাসিতে হইবে, তোমাদের খুশিমত ভালবাসিলে চলিবে না।"

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের শিবকে উপলব্ধি করিতেন, তাহাদের ব্যথা তাঁহার বক্ষে ভীষণ-ভাবে বাজিত, তাহাদের দুঃখে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। পাশ্চাত্ত্যের ভোগবিলাসের শ্রেষ্ঠতম জিনিস তাঁহার চরণে অর্ঘ্যের মত প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি সেই সরল অকিঞ্চন হিন্দু সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং তাহাতেই তিনি গর্ব বোধ করিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রার সরলতা তাঁহার চরিত্রকে এক নিরুপম মাধুর্য প্রদান করিয়াছিল। সরলচিত্ত ছিলেন বলিয়া তিনি দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন না। সকল রকম দুর্বলতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার জাতির জন্য, জাতির প্রত্যেকটি লোকের জন্য একটি মন্ত্রই রাখিয়া গিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

## বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র

**নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

॥ ১ ॥

'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' বর্ণিত একদিনের একটি ঘটনা।

ঋগ্বেদ পড়ছিলেন সশিষ্য-বিবেকানন্দ। উপস্থিত গিরিশচন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন. "হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যাভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে···?"

স্বামীজী নির্বাক। বন্ধ হল ঋগ্বেদ—তাঁর দৃষ্টি ভাবলোক থেকে জীবলোকে নেমে এসে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। অশ্রুবিন্দু গোপন করবার জন্যে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন তিনি।

গিরিশচন্দ্র শিষ্যকে লক্ষ্য করে বললেন, "দেখলি···কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না। কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্যে মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

এই প্রসঙ্গেই সেদিন গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, "জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।"

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সংবেদনশীল চিত্তে গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের এই মানব প্রেমিক মূর্তিটি স্থায়ী আসন অধিকার করে ছিল। গিরিশচন্দ্রের মনোবিকাশের ক্রমটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি সংশয় থেকে ক্রমশঃ নিঃসংশয়তার একটি ধ্রুব-লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁচেছেন। সেই পরমবিশ্বাসের শেষ কথা মানবপ্রেম। রামকৃষ্ণে তিনি মানবপ্রেমের ভাবরূপকে খুঁজে পেয়েছেন, নরেন্দ্রনাথে পেয়েছেন তারই বাণীরূপ। জ্ঞান আর প্রেমের অভিন্ন মূর্তিটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। গিরিশচন্দ্র তাঁর রচনায় মানুষকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং মানবসেবাকেই সাধনার প্রকৃষ্টতম পন্থারূপে প্রচার করেছেন। এই প্রচারণায় তিনি শুধু রামকৃষ্ণের ভাবধারাকেই গ্রহণ করে তৃপ্ত হন নি। 'ভ্রান্তি' নাটকে স্বামীজীর কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনিটুকু শোনা যায়। এ নাটকে রঙ্গলালের সংলাপে বিবেকানন্দের ভাষাকেও যেন গ্রহণ করেছেন তিনি ঃ

"গঙ্গা—তুমি নাস্তিক নাকি ?"

রঙ্গলাল—আমি নাস্তিক ? যে আমায় নাস্তিক বলে সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ.

খায়, আমার দেবতা পরমসুন্দর।

গঙ্গা—কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গলাল—মানুষ আমার দেবতা। যারে হিন্দুমুসলমান ক্রিশ্চান বলে ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ; যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।"

আবার অন্যত্র রঙ্গলাল তার আদর্শ প্রচার করে বলেছে, "আমি যেন দু-একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি তা হলেই আমি চরিতার্থ হব।"

যে বিবেকানন্দ একদিন মঠনির্মাণরত সাঁওতালদের ভুরিভোজে পরিতুষ্ট করে "নারায়ণের ভোগ" দেবার আনন্দলাভ করেছিলেন, গ্রামে গ্রামে আর্ত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যে যিনি "মঠ ফট্" বিক্রী করার কথাও চিন্তা করেছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ মানবপূজারীর মূর্তিই যে নট-ভৈরবের অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছিল এই অংশটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর তিরোভাবের পর নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলি যেমন প্রাবন্ধিক গিরিশচন্দ্রের পরিচয়কে প্রকাশিত করেছে তেমনি গুরুভ্রাতার সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কটিও উদ্ঘাটিত করেছে। গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিতে "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ।" স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য পরিক্রমার পর পশুপতিনাথ বসুর গৃহে যখন উপস্থিত শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ স্বামীজীকে প্রণাম করছিলেন তখন বয়োকনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে আগ্রহী গিরিশচন্দ্রকে স্বামীজী নিরস্ত করেছিলেন—এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন 'এইরূপ অমানীকে মানদান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এইরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য বিবেকানন্দেতেই সম্ভব।" বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের মনোজগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধ নির্ণয়ে উপরোক্ত ঘটনা ও উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বামীজীর তিরোভাবের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারার অভিন্নতা সম্পর্কে কারও কারও মনে সংশয় দেখা দেয়। ক্রমশঃ সংশয়বাদী সমালোচকদের কণ্ঠ প্রবল হতে থাকে। গিরিশচন্দ্র সেই বিরূপ সমালোচকদের প্রত্যুত্তরে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে উভয়ের সাধনার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "বিবেকানন্দ কার্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরু কার্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত,—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তিজ্ঞান

—আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্যে বিভিন্ন ভাবধারণ।…জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ।"

এই অভেদত্ব প্রমাণের সূত্রে প্রথমোক্ত প্রবন্ধে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চারিত্রিক সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ "গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়া দেখিলে অনুভূতি হয় যে, নরেন্দ্রও সেই স্বভাবসিদ্ধ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী।" এই প্রসঙ্গে তিনি নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের দুটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন—রাম সীতাকে বিবাহ করেছিলেন শুনে রাম উপাসনা পরিত্যাগের কাহিনী এবং জনৈক ব্যবহারজীবীর অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অর্থপ্রলোভন প্রদর্শনে অবিচলিত নরেন্দ্রনাথের কাহিনী। দ্বিতীয়ত, গুরুর ন্যায় সহজাত অসীম ঈশ্বরানুরাগ। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন বিবেকবৈরাগ্যলাভের প্রার্থনা ও অষ্টসিদ্ধলাভের প্রলোভন পরিত্যাগের কাহিনী। তৃতীয়ত গুরুসদৃশ অসীম করুণা; গুরু-কৃপা-বঞ্চিতের জন্য কৃপা প্রার্থনাই তাঁর দয়াদ্রচিত্তের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে গিরিশচন্দ্র নির্দেশ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতে, উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক বিবেকানন্দকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মসাধনের গুরুভার অর্পণের কারণ। যাঁরা বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে আচারভ্রষ্টতার কথা উত্থাপন করে বিবেকানন্দের কর্ম সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিরসাশ্রিত ধর্মচেতনার অভাবের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁদের সমালোচনার জবাবে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার মর্ম-কথাটি উদ্‌ঘাটিত করে প্রশ্ন করেছেন, "যে মহাত্মা সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন, যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে যে ভগবান স্থাপিত, তাঁহার সর্বভূতে সর্বব্যাপী ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন, যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে?… ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরমধর্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্ত চূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই?"

"বিবেকানন্দের সাধনফল" প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের সাধনার দুটি অঙ্গ হিসাবে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাসঙ্ঘের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারে বিবেকানন্দ উভয় সাধনাতেই সিদ্ধ। তাঁর নির্দেশিত পথে "অদ্বৈত আশ্রমে অদ্বৈত জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত" এবং সেবাশ্রমে "সকল মূর্তি নারায়ণের মূর্তি জ্ঞানে নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত" দুটি সম্প্রদায় তাঁর সাধনার ধারক ও বাহক। গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের সাধনার এই উভয়ধারাকেই জাতীয় উন্নতির সোপানরূপে চিহ্নিত করেছেন। স্বামীজীর অধ্যাত্মসাধনা শুধু যে মোক্ষকামী মানুষের সংসার-বৈরাগ্যমাত্র নয় সেই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "ধর্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য এবং ভারতবাসী প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্মোন্নতি করিয়া

যদি অপর জাতি সকলের সহিত আবার আদানপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই অবনত মস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্য-লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। 'সাম্য—সাম্য' এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিক সমস্ত মানব একপরিবার স্বরূপ বাস করে, এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্যসমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি ?…যদি এইরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি এইরূপ একত্বস্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয় তা হলেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্যস্থাপক দর্শন—বেদান্ত দর্শন।…যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আত্মদ্বয়কে এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সাধনা এবং জগৎব্যাপী মানবপ্রেম প্রচারণার আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন। গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতির মধ্যে একটি সুন্দর নিগূঢ় ঐক্য বর্তমান এবং উভয় সাধনারই মূল লক্ষ্য একটি। ভারতের ঐহিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী ধর্মচেতনা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববাসীকেই উপকৃত করতে পারে—স্বামীজীর এই প্রত্যয়ের সত্যতা উপলব্ধি করে তিনি বিবেকানন্দের সাধনার তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। স্বামীজীর এই সাধনা যে তাঁর গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ-ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, রামকৃষ্ণ জীবনের একাধিক কাহিনী উল্লেখ করে প্রবন্ধকার তা প্রমাণ করেছেন। একদা যে রামলালা বিগ্রহটি রামকৃষ্ণের অপার বাৎসল্যে স্নেহ-শাসনের ভাবরসে অভিসিক্ত হয়েছে সেই বিগ্রহই কালে বৃহত্তর জগতের সর্বজীবে প্রসারিত হয়েছে—বিবেকানন্দের বিশ্বব্যাপী মানববিগ্রহের সেবায় এই তত্ত্বটিই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নব্যবাংলার কাছে স্বামী বিবেকানন্দের আবেদনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র "বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ" নামক রচনায় বলেছেন, "বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ-মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজ যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।" বিবেকানন্দ তাঁহার বিপুল ধর্মসাধনার দ্বারা নব্যবঙ্গের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি ফরাসী, ইংরেজ এবং হিন্দুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে হিন্দুসমাজের মৌলিক কাঠামো ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর 'ধর্ম' শব্দটি কোনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত নয়—সমস্তের মধ্যে ব্রহ্মদর্শনের দ্বারা তিনি তাঁর ধর্মবোধকে উদারতায় মণ্ডিত করেছেন। গিরিশচন্দ্র স্বামীজীনির্দিষ্ট সেই নব্যকালোপযোগী চিরন্তন ভারতীয় ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বেদান্তধর্মের মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও পবিত্রতার অস্তিত্বে নিষ্ঠাবান। সেই বিশ্বজনীন ধর্মের

উদ্গাতা বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে গিরিশচন্দ্র বাংলার তরুণসমাজকে প্রেম ও শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষালাভের আহ্বান জানিয়েছেন। বিবেকানন্দের স্মৃতিচিহ্ন কোনও আড়ম্বর বা প্রতীকের অপেক্ষা রাখে না। গিরিশচন্দ্র সেই তুচ্ছ প্রতীকের অসারতার কথা উল্লেখ করে স্বামীজীর সর্বকালজয়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের কথা বলেছেন :

"বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আসিয়াছে, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা—সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝ, গগনস্পর্শী-স্বর্ণচূড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া—সেই মহানুভবের স্মৃতিস্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতিস্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভাল, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম। মনুষ্যত্ব লাভ করো—তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় কর,...... 'বিশ্বাস কর' বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি-স্থাপনা করিবে।"

বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী-উৎসবের দিন গিরিশচন্দ্রের এ আহ্বান অবিস্মরণীয়।

॥ ৩ ॥

গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দের কাছের মানুষ। উভয়ের মধ্যে এক গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে উঠেছিল। সুদূর আমেরিকা থেকে গুরুভাইদের কাছে লেখা অনেক চিঠিতেই স্বামীজী তাঁর 'জি. সি'র খোঁজ নিয়েছেন। অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য হল তিনি বেহিসাবী সাহিত্যসেবী ; তাঁর সাধনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র—সেখানে বহু মানুষের ভিড়, বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ। সেই পরিচয়ের সূত্রে তিনি সমাজের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেছেন—গুরুপ্রদত্ত লোকশিক্ষার ভারগ্রহণে এ উপলব্ধির মূল্য অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মাটিতে যতখানি অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন—বিরূপ সমালোচনার তীক্ষ্ণ আঘাতে তার থেকে কম তাঁকে বিক্ষত হতে হয় নি। একদিকে যেমন ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ তাঁদের পরাজয়কে ঢেকে নেবার জন্যে বিবেকানন্দের নামে মুখরোচক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন অন্যদিকে সনাতন-পন্থী হিন্দুদের মধ্যেও রামকৃষ্ণ আনুরক্তির নামে বিবেকানন্দবিরূপতা প্রশ্রয় পেয়ে চলেছিল। স্বামীজীর দেহাবসানের পর সংশয় ও সন্দেহের মেঘ যখন ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠছিল তখনই গিরিশচন্দ্র তা অপসারণ করে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। জীবসেবার আদর্শ ও মানবপ্রেমের নবমন্ত্রের মধ্যে তিনি আপনার অন্তরের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় তাঁর রচনাগুলি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাবশিষ্য নফরচন্দ্র কুণ্ডু যখন দুটি মুসলমান বালককে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আত্মদান করেন তখন গিরিশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "দেবেনবাবু স্বামীজী বাঁচিয়া থাকিলে আজ আপনাকে কোলে করিয়া নাচিতেন" (নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)। গিরিশচন্দ্রের কাছে এই পরার্থে আত্মদানে চিত্ত উদ্বোধনের মূল্য

স্বামীজীর তৃপ্তিতে। এক মহৎ জীবনের সাধনফল পরবর্তী জীবনকে উজ্জীবিত করেছে—সাধনার এই তো সব চেয়ে বড় সার্থকতা!

একদিন রামকৃষ্ণের অযাচিত প্রেম জীবনযুদ্ধে বিক্ষত 'নোটো গিরিশ'কে আচ্ছন্ন করেছিল। সেদিন দক্ষিণেশ্বরের দাক্ষিণ্যই গিরিশচন্দ্রের ভারসাম্যহীন জীবন শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু সেই তৃপ্তি তাঁকে গুরুর ব্যক্তিত্বের গণ্ডিতে অবরুদ্ধ করে জীবন পলাতকের নিঃস্বতায় নিমগ্ন করেনি। গুরুর প্রেমমন্ত্র তাঁকে মানবমাহাত্ম্যের নিগূঢ় সাধনায় আত্মমগ্ন করেছে। সেই প্রেমের আদর্শ ও মন্ত্রের সিদ্ধি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। গুরুর অবর্তমানে 'কৃপাকণা অভিলাষী' ভক্ত ভৈরব সেই বয়োকনিষ্ঠ গুরুভ্রাতাকেই প্রদান করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য ঃ

তারা উজ্জ্বল পশি ধরাপর, নির্মল গগনবিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল বিভোর বালসন্ন্যাসী ॥
রবিকর কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন আবার দিনকর কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়াপ্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি।
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী
জনমন মার্জিত শান্তিপ্রদান, সশিষ্যগুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী ॥

## শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাক্ষাতের শততম বর্ষ

রণজিৎকুমার সেন

যুগাবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের) প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের হেমন্তিকায় বা নভেম্বরে। সেই হিসেবে ১৮৮১ বছরটি তাঁদের উভয়ের সাক্ষাতের শতবর্ষপূর্তি বছর। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন, মুগ্ধ হন তাঁর সঙ্গীত শ্রবণে। সঙ্গীতই নরেন্দ্রনাথকে যুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। তাঁর গৃহীশিষ্য ও সেবক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশেষ পরিচিতি ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী ছিলেন তিনি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেব নভেম্বরের একটি বিশেষ দিনে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুকে নিজের বাড়িতে এনে একটি বিশেষ আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। তাতে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল, কারণ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেও তিনি প্রায়শঃ রামপ্রসাদী ও অন্যান্য ভক্তিসঙ্গীত গাইতেন। গানের মধ্য দিয়ে মন তাঁর অমৃতলোকে পোঁছাতো, মাঝে মাঝে সমাধিস্থও হতেন তিনি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গৃহে সেদিন যার গাইবার কথা ছিল, তিনি না আসায় প্রাণের আকুতি নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আহ্বান ক'রে আনেন প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে। ধ্রুপদী নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়ে থকেন। একথা তৎকালীন কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে অজানা ছিল না। নরেন্দ্রনাথ যে সুরেন্দ্রনাথের গৃহে আসেন এবং গান গেয়ে শোনান, পশ্চাতে ছিল পরম ভাগবতী ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাই নরেন্দ্রনাথকে যুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। এর দ্বারা নরেন্দ্র-চরিত্রের আর-একটি দিকও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, তা হচ্ছে তাঁর অহংবোধবর্জিত মানসিকতা। এ' অবস্থায় কোন গীতশিল্পীকে পাওয়া কঠিন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেননি নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে বলেই এটি ছিল সেদিনের পরম ভাগবতী ইচ্ছা। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে তাঁর সদা চঞ্চল ও নিত্য-সত্যসন্ধানী মন স্থির হতে পারে নি। তিনি এমন মহৎ কিছুর সন্ধান করছিলেন—যা তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজ্ঞাশীল চিত্তকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে। সেই অনুসন্ধানের প্রথম দরজা খুলে গেল সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে। সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে দু'টি ব্রহ্মসঙ্গীত করেন, একটি—'মন চলো নিজ নিকেতনে', অপরটি—'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'।

এই প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীতে স্বামীজী'-প্রবন্ধে উল্লেখ করেন ;···'সেদিন তাঁর কণ্ঠে ওই গান শুনে এবং গায়ককে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণও করেন। সেদিন থেকে তাঁদের দু'জনের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত।···শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবসম্মিলনের এক প্রধান যোগসূত্র

হল সঙ্গীত। তাঁদের সাক্ষাৎকারের যতদিনের বিবরণ পাওয়া যায়, তার বেশীরভাগ দিনেই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি ভালবাসতেন তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর গান অবশ্যই শুনবেন, এই ছিল যেন রীতি। সেজন্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতেন—তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি।··· নরেন্দ্রনাথের গান শুধু শোনা নয়, সে গান শোনবার ফলে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে যেতেন।'···

এ' প্রসঙ্গেরই আরও গভীর সমর্থন পাই স্বামী সদ্রূপানন্দজী রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যান' প্রবন্ধে। তিনি উল্লেখ করেন ঃ '···প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণের ফলে নরেন্দ্রনাথের আরম্ভ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন। কয়েকবার যাতায়াতের পরই শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রিয়দর্শন যুবক হইতেছেন সেই সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের দিব্য-জ্যোতির্ঘনতনু সাতজন সমাধিস্থ ঋষির অন্যতম—যাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সস্নেহে আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে শুভাগমনের পূর্ব-মুহূর্তে। তিনি বুঝিয়াছিলেন অখণ্ড জ্যোতির্লোকের মুক্ত পুরুষসিংহ তাঁহার যুগধর্ম প্রচারে সাহায্য করিতে আসিয়া মায়ার বন্ধনে ছটফট করিতেছেন। মায়াকে আশ্রয় করিয়াই শিব হয় জীব। যে জীবকে ঈশ্বরী মায়া নিঃশেষে গ্রাস করিতে সক্ষম হয়, সে জীব নিজের শিবত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া মায়ায় কল্পিত এই আপাতঃরম্য জগৎপ্রপঞ্চের আকর্ষণে বন্ধ হইয়া পড়ে। অখণ্ডলোকের বাসিন্দা পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এত বৃহৎ যে, মহামায়া তাঁহাকে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিতে সক্ষম হন নাই। ইহার ফলে যে ভূমানন্দে সমাধিস্থ ছিলেন তিনি শিবলোকে, তাহার স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে এই রমনীয় পৃথিবীকে কোন সময়ে আপনার করিয়া লইতে দেয় নাই। এইজন্য জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল সত্যলাভের অত্যুগ্র বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা অশান্তির তুফান।'···

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে প্রথমে দ্বিধা ও অবিশ্বাস, পরে সংশয় এবং সর্বশেষে বিস্ময় ও আত্মসমর্পণ নরেন্দ্রনাথের জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করে। তিনি চান আত্ম-মুক্তি, চান নির্বিকল্প সমাধি; শ্রীরামকৃষ্ণ দেন তাঁকে বিশ্বকার্য সাধনের দায়িত্ব, বলেন ঃ 'যত্র জীব তত্র শিব; তাই জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, জগদ্ধিতায়—জগতের হিতে এই কর্মই তোকে করতে হবে নবেন'। নরেন্দ্রনাথ সম্বিৎ ফিরে পেলেন নিজের মধ্যে, মনে মনে একবার উচ্চারণ করলেন ঃ 'জগদ্ধিতায়',—আর সেই সঙ্গে নিজের আত্মমুক্তি চাইলেন গুরু-নির্দিষ্ট জগতের হিতকর্মে। ধ্রুপদী শিল্পী হলেন অদ্বৈত বৈদান্তিক। এখানে শঙ্করাচার্য ও রামমোহনের দর্শন এসে একাত্ম হয়ে গেল তাঁর জীবনে। সে দর্শন একান্তভাবেই ভারতীয় দর্শন। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাঁকে সেই দর্শন উপলব্ধি করালেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬—এই

পাঁচ বছরকাল গুরুসান্নিধ্যে থেকে নরেন্দ্রনাথ যা অর্জন করলেন, পরবর্তীকালে তা-ই পরম সম্পদ হয়ে দেখা দিল স্বামী বিবেকানন্দে। গুরুর দেহাবসানের পর তার সর্বপ্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটলো ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্মসভায়। সেখানে তিনি শুধু বেদান্ত বা ভারত-প্রবক্তাই নন, সেইসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেরও তুলনামূলক ব্যাখ্যাতা। সেখানে সর্ববিজয়ী তিনি।

নিত্য আত্মা ঈশ্বরের উপলব্ধিই একজন অদ্বৈত বৈদান্তিকের প্রধান উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিতেই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: 'সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থানমাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থান বিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুলাগ্রহে হ'য়ে থাকে।' আবার তিনি বললেন: 'এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনো তীর্থ নাই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নাই। ঐ যে জগন্নাথের রথ—তাও এই দেহ-রথের কংক্রীট ফর্ম মাত্র। এই দেহ-রথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে'—বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর উক্তির মধ্যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠই যেন অধিক উচ্চারিত। স্বামীজী বললেন: 'অভেদ—সর্ববস্তুর একাত্ম।...সুতরাং সকল জিনিসের পরিণতি একত্বে। যাকে বহুরূপে দেখি—কাঞ্চন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী—সবই আসলে ঈশ্বর'।

তাঁর এই বেদান্ত দার্শনিকতা সম্পর্কে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় গুরুভ্রাতা বিশিষ্ট বৈদান্তিক স্বামী অভেদানন্দজীর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। অভেদানন্দজী বলেন: 'He was the greatest of all Eastern and Western Philosophers. In him I found the ideal of Karmayoga, Bhaktiyoga, Rajayoga, and Jnanayoga; he was like the living example of Vedanta in all its different branches.'

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: 'যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বিত পুরুষ তিনি, বেদমূর্তি।...বেদ-বেদান্ত আর আর সব অবতার যা-কিছু ক'রে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। কেননা He was explanation. তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচিরে প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-অপণ্ডিত ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ—সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ভেদ ইত্যাদি সব চ'লে গেল। ঐ যে ভেদাভেদ লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের। এ সত্যযুগ তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। He was the saviour of women, saviour of the masses, saviour of all high and low ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পুজোয় সকলের অধিকার'।

গুরু সম্পর্কে স্বামীজীর এই উক্তি থেকে ভবিষ্যৎকালে তাঁর ভারতের প্রতি

বিখ্যাত উক্তিটির মর্ম আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বললেন ঃ 'হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য দেবতা উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।... ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ-দরিদ্র-মুচি-মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।...'

রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আলাপে-কথনে স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যায় ঃ 'If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative.'

# আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী

স্বামী হিরন্ময়ানন্দ

[ ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ভূমিকার অনুবাদ ]

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারিখণ্ড[১] গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্র যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন কোন হিন্দু-জননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষ দিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজী ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও ঐ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান ; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের —যাহা সত্যসম্পর্কে বিগতশ্রী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সঙ্কট-মুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নিজের সীমান্তের বাহিরে অবস্থিত মানবসাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত। ইহা যে এইবারই প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তাধারার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল—সেই আত্মগত একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নূতনভাবে সৃষ্ট

১। ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলায় এই গ্রন্থাবলী দশখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।

—সম্পাদক

হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশঃ 'তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদ্গত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি বলিতে-ছিলেন, 'একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে।...সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।' এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আমরা হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ্য করি, তাহা নয়, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পাশীদিগের অগ্নি পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই। আমরা জানি নিম্নতম বস্তুরতি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলব্ধি এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুসুম চয়ন করিয়া প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পূজার জন্য একটি অপূর্ব স্তবক রচনা করি।' এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে বিদেশী বা পর; তাঁহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল।

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাব-সমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে—যেখানে মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ন এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে—এই নগর-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্তৃত—উত্তরের দ্যুতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইউরোপের ঐতিহ্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্দ্রের সৃজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতূহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক ঐক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ।

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর—তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা ছিল অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ পরিবেশেরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহুযুগের

অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত ; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে—এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধ-ধর্মও প্রায় সে-দিনের—এমন একটি জগৎ, যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ—একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধূলিকণা যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ—তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সব কিছু—শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এইগুলি ছিল দুইপ্রকার চিত্তপ্রবাহ, যেন দুইটি বিশাল চিন্তা-তরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক, ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক-পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্য এই ব্যক্তির আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্‌গত হয় নাই,—এমন কি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট। তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে—মধ্যাহ্নসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ ঊষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য!

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই, তিনি যে প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা'। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন ; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অনুস্যূত।...যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও

সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।'…এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশ ঃ 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে'—ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে।

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভান্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহ প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হইতেছে—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত ঃ 'শোন অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে—সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।' এই

তো সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে। 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান—এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠের পাদ-মূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে—ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোষণা করে ঃ সাধনার অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে নিরাকারে—কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না কেন, প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান্ ঊর্ধ্বগতির সোপান-স্বরূপ মনে করে এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়—ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতিদ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশকরূপে—ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন, তথাপি তাঁহা দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও বেশী—ঐগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতো নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।

তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত,

সেই অদ্বৈত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুই-ই', তিনি এমন এক তত্ত্ব যাহাতে সাকার নিরাকার দুই-ই আছে।

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকাব সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও অধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।'

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা—সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাবজগতের যে বৈষম্য এই ভাবে তাঁহার চক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্ম গ্রন্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়াছিল; ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের ঋষিগণ আকস্মিকভাবে ইহা লাভ করেন নাই যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্তু ইহা ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়—সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন 'নরেন'—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক

খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁহার জ্ঞানলাভের নিত্যপদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত—মনের গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ। তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্যদর্শন লাভ করিত। 'জ্বরভাবের মতো' পরম জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা এই শিষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থ-সমূহের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্জিকা লাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাঁহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

সুতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান সঙ্গীত। এই রত্নগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা—একই দীপাধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাঁহার হাত দিয়া উহা জ্বালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই দীপ প্রজ্বালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য—স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাঁহারা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা
( N. of Rk-V. )

৪ঠা জুলাই, ১৯০৭

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## 'আনন্দিত আত্মার মহান অধিকার'

ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্রের ( সারদানন্দ ) আমহার্স্ট স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে অধুনা ধূলিধূসরিত দুইমহল বিরাট পৈতৃক বাড়ীতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ পরিচয় করে শরৎচন্দ্রকে জানিয়ে দেন যে, দুইজনের বন্ধুত্ব প্রাক্তণ ও নিগূঢ়। তখনও দুইজনে সন্ন্যাসী হন নাই।

নেতাকে কেমনতর হতে হয়, তা সারদানন্দ মহারাজকে দেখে বুঝেছি—মুগ্ধ হয়েছি। 'হামি'-কে চাপতে খুবই মজবুত। সাধারণতঃ অধ্যাত্ম দর্শনের কথা বলতে গেলে বলতেন, 'ঠাকুর এমনি দেখেছিলেন, মা এমন দেখেছিলেন, মহারাজ এমন দেখেছিলেন।'

নরেন্দ্রনাথকে উপযুক্ত চালক দেখে, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর নিকটে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। গুরুভাইয়ের সঙ্গে একেবারে গুরুবৎ ব্যবহার। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"শরতের ভার, ঠাকুর আমার উপর দিয়ে গিয়েছেন। ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে।" প্রত্যেক কাজটি স্বামীজীর কথা ভিন্ন শরৎ মহারাজ করতেন না। একবার শরৎ মহারাজকে স্বামীজী বললেন, "কিরে মঠে ( বেলুড়ে ) বসে বসে খালি অন্ন ধ্বংসাচ্ছিস। যা ওপারে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করে খা-গে। আর ধ্যানধারণা করগে।" স্বামী সারদানন্দ বললেন, "তাই গেলুম। ওমা, দু'তিন দিন যেতে না যেতেই মঠে কার অসুখ করেছে—সেবা করবার জন্য লোকের দরকার। বলে পাঠালেন, শিগগির আয়। ফিরে এলুম।"

শরৎচন্দ্র অসীম ধৈর্যসহকারে সুরহীন বালককে গান শেখাচ্ছেন। বালক বলল, "এই যে লাইনটা গাইলেন, তাতে কি কি পর্দা ব্যবহার করলেন বলুন। আমি লিখে রাখি। মনে রাখবার, শেখবার সুবিধা হবে।"

জবাব দিলেন—

"আমি তোমাদের মতন সা-রে-গা-মা সেধে গান শিখিনি। স্বামীজী গেয়ে যেমন শেখাতেন, ঠিক তেমনটি শিখেছি। আর তার একচুলও এধার ওধার এখনও আমার হচ্ছে বলে মনে হয় না। তুমি হারমোনিয়াম টিপে কি কি পর্দা লাগছে, পারো তো মিলিয়ে ঠিক করে নাও।

"মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কান খুব ভাল ছিল। আমি স্বামীজীর কাছে শিখে নিয়ে, ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না, মহারাজের কাছে একজামিন দিতুম। তিনি অনুমোদন যতক্ষণ না করতেন ছাড়তুম না।"

শরৎচন্দ্রের দেখতাম, যেন সব মাপকাঠিই স্বামীজী। মানুষটিকে এক এক সময় স্বামীজীময় বলে মনে হত। একদিন ঐ বালককে বলছিলেন—"কিরে সিন্ধুড়া সুর

শিখছিলি নাকি ?”

বালক বলে উঠল—“আপনি কি করে জানলেন ওটা সিন্ধুড়া ?”

হাসিমাখা মুখে উত্তর—“আমরা নিজেরা না জানলেও স্বামীজীর মুখে শুনেছি।”

স্বামীজীর বই পড়লে ছেলেদের কল্যাণ হবে, বিশ্বাস করতেন। পড়তে বলতেন। বাঁকুড়া কলেজের একজন পাশ্চাত্ত্য দেশীয় অধ্যাপক চটে একবার একখানা চিঠি লিখেছেন—সম্পাদক সারদানন্দের কি অধিকার আছে জগৎবিখ্যাত স্বামীজীর ইংরাজী পুস্তকের ভাষার উপর হাত দেবার ? উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের দুই সংস্করণে (সম্ভব—কর্মযোগ—ইং) তফাত অনেক। সারদানন্দকে দেখেছি, যেমন ইচ্ছা কাট-ছাঁটা করেছেন।

সারদানন্দ বললেন, “এ চিঠির কোন জবাব দেবার দরকার নেই। তবে তোমরা জেনে রেখো, তাঁর লেখা যেমন ইচ্ছা কেটে ছেঁটে ছাপাবার অধিকার স্বামীজী আমাকে দিয়ে গিয়েছেন।”

শরৎ মহারাজ বলতেন—“ভারতেই বলো বা ভারতের বাইরেই বলো, একই জায়গায় স্বামীজীর সঙ্গে গেছি, পাঁচ মিনিট রইলাম, দুজনেই ফিরে এলাম, কেউ যদি আমাকে বলতো, ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু বলতে, আমি তো বাপু, বিশেষ কিছুই বলতে পারতাম না, আর স্বামীজীও যে ঐ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন—তিনি অন্ততঃ আধঘণ্টা তো টানা বলতে পারতেন।”

স্বামীজী সম্বন্ধে শরৎ মহারাজকে পূর্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করেন—‘আচ্ছা জ্ঞানমার্গের সাধন ও সিদ্ধি ছাড়া স্বামীজী যে অন্যান্য পথের যথা, ভক্তিপথের কথা বিবৃত করেছেন, সেসব কি ঠাকুরের জীবন দেখে নিয়ে, না, নিজেও ঐ ঐ পথে সত্য-সাক্ষাৎকার পেয়েছিলেন ?’

উত্তরে শরৎ মহারাজ বলেন—

“কাশীপুরে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ভক্তিমার্গের ও অন্যান্য মার্গের অনেকরকম সাধন করিয়ে নিয়েছিলেন। আর স্বামীজীও অসাধারণ শক্তিমান ও গ্রহণ-সামর্থ্যবান বলে খুব অল্পের মধ্যেই ঝটপট এক একটা পথে ফল পেয়েছিলেন। (মাষ্টার মহাশয়ের অপ্রকাশিত নোটে ইহা পরে সমর্থিত)—স্বামীজী নিজেও সবরকম উপলব্ধি করে নিয়ে তবে অপর লোককে বুঝিয়েছেন—বক্তৃতা দিয়ে। শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে বা ঠাকুরের দৃষ্টান্ত সহায়ে মাত্র নহে। সবটাই তাঁর নিজের পরীক্ষিত। এই ধরো, তখন আমরাও ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি, আসছি। স্বামীজী আগে থেকেই যাতায়াত করছেন। এই সময় একদিন দেখি, তাঁর সিমলার বাড়ীতে আনন্দে ডগমগ হয়ে বসে আছেন। প্রসঙ্গাদি করে পরে জানলাম যে, ঠাকুরের কৃপায় তার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর শ্রীরাধার দর্শন ঘটেছে।* তা দেখ, দেবদেবী দর্শনও

* শ্রীরাধার দর্শনই স্বামীজীর প্রথম সাকার দর্শন কিনা এখন সঠিক কে আর বলবে ? কারণ লীলাপ্রসঙ্গে আছে—দিব্যভাবে শ্রীশ্রীকালীকে দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুর

স্বামীজীর যথেষ্ট হয়েছে। তবে তিনি চাপা মানুষ ছিলেন। এ সব অপরকে বলতেন না।"

পরিব্রাজক অবস্থায় পশ্চিমে ঘুরতে ঘুরতে পাশ্চাত্যে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ঠাকুরের কাছ থেকে পান। এই কথার উল্লেখ এক পত্র মধ্যে করে শ্রীশ্রীমাকে লিখেছিলেন—আমি এরূপ আদেশ পাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? স্বামীজী এই পত্র শরৎ মহারাজ মারফত মাকে পাঠান।—'তুই এই চিঠি নিজে গিয়ে মাকে পড়ে শোনাবি এবং মার মত আমাকে জানাবি।'

আদেশ মত শ্রীশ্রীমাকে শোনানোতে তিনি ঘোমটার ভিতর থেকে শরৎ মহারাজকে বললেন—'দুদিন পরে বলবো।'

দুদিন পরে শ্রীমা ধ্যানযোগে স্বতন্ত্রভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা জানতে পারেন এবং বলেন—'লিখে দাও, ঠাকুর বলছেন, তাকেঁ ওদেশে যেতে হবে।'

সারদানন্দ বলেছিলেন—

"স্বামীজী থাকতে থাকতেই আমাদের ভিতর কেউ কেউ, তাঁর কাজ কর্ম অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করেন। আমি তখন West-এ (পাশ্চাত্যে)। এসে শুনলুম, একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে যোগেন-স্বামী প্রভৃতি, ঐ কথা বলতে, তিনি অভিমান করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'আর শরীর রাখব না!—ছেড়ে দেবো!'—এই বলে, নির্জনে বসে রইলেন। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই। শেষে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আবার এসে তাঁদের বকাবকি করেন,—'সর্বনাশ! তোমরা আবার এ কি করলে! এই পাগলকে ক্ষ্যাপালে? তিনিই ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করেন। আর বাস্তবিকই, যারা তাঁর Criticism করেছিলেন, তাঁদেরই বা দোষ কি? তাঁরাও দেখেছেন—স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন,—যে বক্তৃতা প্রভৃতি করলেন, তাতে বড় একটা ঠাকুরের নামগন্ধ নেই।

"আর দ্যাখো, একথা ঠাকুরও বলে গেছেন। তখন ঠাকুরের সেই কয় রাত্র ঘুম হয় নি। মুখ চোখ লাল—Flushed হয়ে গেছে। ঘরে আমরা সবাই বসে আছি। স্বামীজী ঢুকতেই তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ, এঁর মত কেউ নেই। দ্যাখ! তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না। তুই ঠিক থাক!'

"স্বামীজীর তখন দেওঘরে অসুখ। আমি attend করছি। রোগা হয়ে গেছেন।* আর ওরই ভিতর পাশ-মোড়া দিচ্ছেন শুয়ে শুয়ে, আর বলছেন, 'দেখছিস্, এই দ্যাখ। এটাকে বলে, গরুড়াসন, এটাকে বলে অমুক আসন' ইত্যাদি। একদিন

---

স্বামীজীকে কালী মানিয়েছিলেন। এটা আগে, না শ্রীরাধা দর্শন আগে, তা নির্ণয় করা দুরূহ। পঠদ্দশায় তিনি সৌগত বুদ্ধ ভগবানের সাক্ষাৎ পান।

* এই সময়েরই একখানি ছবি আছে, সামনে ঝোঁকা হাত দু'খানির উপর ভর দেওয়া, ফতুয়া পরা, দেখলেই মনে হয় স্বামীজী অসুস্থ। এই ছবিটি কিন্তু স্বামীজীর অ্যালবামে শিলঙে তোলা বলে লিখিত আছে।

খুব Inspired হয়েছেন, তখন কার সাধ্য কথার প্রতিবাদ করে? বলছেন গাল দিয়ে 'অমুকের কি দরকার ছিল, আমাদের কাজ পণ্ড করবার? (যত শান্ত করবার চেষ্টা করি, ততই বেড়ে চলে) ঠাকুরের উদার ভাবকে একটা বদ গোঁড়ামি কিম্ভূতকিমাকার দাঁড় করালে। বললে, ঠাকুর অবতার, এটা আগে বলা চাই। কিন্তু আমাদের Method অন্য রকম। তাঁর Character, ভাব দিতে হবে। তারপর লোকে আপনা আপনিই বলবে।"

স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কথার টুকরো সারদানন্দ একবার পূর্ণানন্দকে বলেছিলেন—

'একবার স্বামীজীর শিষ্য শান্তিরামের (প্রেমানন্দ-ভ্রাতা) বড় অসুখ: প্রাণ টেকে কিনা সন্দেহ। তার মা অত্যন্ত কাতর হয়ে স্বামীজীকে খুব জিদ করে ধরলেন, কিছু একটা করে শীঘ্র শীঘ্র তাকে আরাম করে দিতে। আমাদের সামনেই তিনি খানিকটা গঙ্গাজল আনতে বললেন, একটা বাটি করে। তারপরে সেই জলটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি বললেন, 'যাও, ওকে খাইয়ে দিও একটু একটু করে। বাকি যেটা থাকবে, ঘরে রেখে দিও। বাড়ীর কারুর শক্ত ব্যারাম হলে ব্যবহার করবে।'—তা বুঝলে, এই দেখনা, Miracle-এর যে কথা তুমি তুললে, তা তাঁর যথেষ্টই ছিল। তবে সব জায়গায় ওগুলির ব্যবহার করতেন না। আর ঠাকুরও নিষেধ করতেন।"*

একটি বালক ব্রহ্মচারী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আচ্ছা আঠারটা গুণ স্বামীজীর ছিল বলে ঠাকুর বলতেন। তা কোনদিন আপনাদের কাছে এই আঠারটা গুণ কি কি, তাকি বলেছিলেন?" শরৎচন্দ্র উত্তরে কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "না, তোমরা লিষ্টি চাইবে বলে তিনি রেখে যাননি।"

শরৎ মহারাজ আমাদের জানান, বি, এ, পাসের পর বসুমতীকে একটি গানের বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়ে স্বামীজী ৫০ টাকা পান।

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে স্বামীজী একদিন সারদানন্দকে বলেছিলেন, "ওরে আর সে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না! বেটী আমার হাত ছেড়ে দিলে।" সারদানন্দের মুখে শুনেছি, তিনি নাকি তখনই তাঁকে বলেন, "সেকি ভাই, তা কি কখনো হতে পারে? মা তোমার হাত সর্বদাই ধরে আছেন।" মুখে এই কথা বললেও, শরৎ মহারাজ আমাদের বলছেন, "দেখ, সেইদিন থেকে আমিও বুঝলাম, স্বামীজীর শরীর দিয়ে মার যা কাজ করবার ছিল তা সাঙ্গ হয়েছে।"

* ইহা ছাড়া আমরা পাশ্চাত্যদেশে সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দান সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের কথা অবগত আছি। স্বামীজী ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন, "দ্যাখো, খুব যখন কষ্ট হবে, দিন চলে না, ঘরে খাবার নেই, খেতে পাচ্ছ না, তখন এই ব্যাগটি খুললেই অর্থ পাবে। এর অপব্যবহার করলে কোন ফল পাবে না। সাবধান।"

স্বামী সারদানন্দ শেষবার শ্রীক্ষেত্রে শশী নিকেতনের দুতলায় একখানি ঘরে বসে সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপ্রসঙ্গ করেছিলেন। সেদিন পরিষ্কার বললেন, "স্বামীজীই তো একটা অবতার, ঠাকুরের কথা ছেড়েই দাও। একদিন ঠাকুর স্বামীজীকে বার বার তিনবার বলেছিলেন, 'তুই ঠিক থাক—তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না।' "

## স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ

### স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে স্বামীজী একটি ঘাট বাধানোর প্রয়োজন বোধ করে বিজ্ঞানানন্দকে একটি এষ্টিমেট তৈরি করতে বললেন। বিজ্ঞানানন্দ আনুমানিক তিন হাজার টাকার এষ্টিমেট দিলেন। স্বামীজী দেখে খুশী হয়ে ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে কাজের ভার দিলেন।

কাজ আরম্ভ হোল। স্বামীজী একদিন ব্রহ্মানন্দের কাছে হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজের তখনও অনেক বাকী। তখন তিনি ব্রহ্মানন্দকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নীরবে সব শুনলেন। স্বামীজী চলে যাবার পর তিনি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দকে পাঠালেন ব্রহ্মানন্দ কি করছেন দেখে আসার জন্য। তিনি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন দরজা জানালা সব বন্ধ। দু'একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে তিনি স্বামীজীকে সেকথা জানালেন। স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে ধমক দিয়ে তাঁকে আবার পাঠালেন ব্রহ্মানন্দের খবর নিতে।

এবারও ডেকে সাড়া না পেয়ে বিজ্ঞানানন্দ আস্তে আস্তে দরজা খুললেন। দেখলেন, তিনি বালিশে মুখ গুঁজে অভিমানভরে কাঁদছেন। বিজ্ঞানানন্দ অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমার জন্যই এত কষ্ট পেলেন।' কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে ব্রহ্মানন্দ বললেন, 'দেখতো হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বলতো? স্বামীজী এক এক সময় এমন কড়া কথা বলেন যে আর সহ্য হয় না। এক একবার মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই।'

বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীকে জানালেন, ব্রহ্মানন্দ বিছানায় শুয়ে কাঁদছেন। শুনেই স্বামীজী উন্মত্তের মত ব্রহ্মানন্দের ঘরে ঢুকে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'রাজা, রাজা আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি। তোমায় গালাগাল করেছি—আমায় ক্ষমা কর।' স্বামীজীর কান্না দেখে ব্রহ্মানন্দ হতভম্ব হয়ে বললেন, 'তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ, তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাইতো এসব বলেছ।' স্বামীজী তখনও মহারাজকে বুকে জড়িয়ে আছেন বললেন, 'না, না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমায় ঠাকুর কত আদর করতেন, কখনও তোমার তিনি একটি কড়া কথা বলেননি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করলুম, তোমার মনে কষ্ট দিলুম। আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে, কোথায়ও গিয়ে নির্জনে থাকব।'

ব্রহ্মানন্দ অমনি বলে উঠলেন, 'সেকি! তোমার গালাগাল যে আমাদের আশীর্বাদ।

তুমি কোথায় চলে যাবে ? তুমি আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকব ?'

দুজনে এভাবে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে অনেকক্ষণ পরে শান্ত হলেন।

সংবাদ এল স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে আসছেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সমগ্র রাজপথে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত ও পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হয়ে স্বামীজী যখন বাগবাজারে পশুপতি বসুর বিরাট বাড়ির দ্বারে এসে পৌঁছালেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর গলায় একটি সুন্দর ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাদবন্দনা করে সহাস্যে বললেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।' ব্রহ্মানন্দ স্বামীও মৃদুহাস্যে বললেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।'

**শিবানন্দ**

বোধিদ্রুমমূলে সমাধিস্থ তিন নবীন তাপস, দূর থেকে তারা এসেছে। কলকাতার কলেজে-পড়া তিনটি তরুণ—নরেন্দ্র, তারক ও কালী। ভগবান বুদ্ধ তাদের আকর্ষণ করেছেন। একদিন দুইদিন তিনদিন—স্মরণ, মনন ও ধ্যানে কেটে যায়।

তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রি। নীরব নির্জন আবেষ্টনী অন্ধকার ও ঝিল্লীরবে নিবিড়। সিদ্ধাসনে ধ্যাননিশ্চল তিনটি নবীন যোগী।

সহসা নরেন্দ্রনাথ শিউরে ওঠেন—অন্ধকার শিউরে ওঠে—মর্মবিদারী ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে তিনি তারকনাথকে জড়িয়ে ধরেন।

কান্না থেমে আসে। ব্যাকুল কয়টি সত্তা সেই ঘন তমিস্রায় রোমাঞ্চিত হতে হতে এক সময় স্থির হয়ে আবার ধ্যানের রহস্যে হারিয়ে যায়।

কান্না কেন ?

নরেন্দ্রনাথ কাতরস্বরে বলেন, সবই ত রয়েছে, বুদ্ধের সেই ঘনীভূত ভাব, তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য, তাঁর মহাপ্রাণতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতা—কিন্তু তিনি কোথায় ?

তিনি কোথায় ?

স্বামী শিবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'স্বামীজী হলেন আমাদের মাথার মণি। তাঁর জন্য আমরা নিজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিনে। বুকের রক্ত দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে নিজেদের ধন্য মনে করব। স্বামীজী যে কি জিনিস তা তুমি কি বুঝবে।'

**তুরীয়ানন্দ**

বরাহনগর মঠ থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ আছেন আবু পাহাড়ে। একদিন হঠাৎ আবু রোড স্টেশনে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা। তখন তাঁর আমেরিকা-যাত্রার মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকী।

নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'হরি ভাই ! তোমাদের এই তথাকথিত ধর্মটাকে আমি বুঝতে পারলাম না।'

রক্তের দ্রুত প্লাবনে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। একখানি কম্পিত হাত বুকের উপর রেখে তিনি বলেন, 'আমার মনটা কিন্তু আরও অনেক, অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি মানুষের দুঃখ বেদনা অনুভব করতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, নিদারুণ বেদনায় আমি অনুভব করছি।'

আবেগে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হোল। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে থাকে।

স্বামীজী তখন আমেরিকা থেকে ফিরে বলরাম মন্দিরে রয়েছেন। তুরীয়ানন্দ সে সময়কার একটি স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন—

"আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করছেন। ······মীরাবাঈয়ের একটি বিখ্যাত গান গুনগুন করে গাইছেন। দুই চোখ ভরে গেছে অশ্রুতে। থেমে আলসের উপর ভর দিয়ে তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। ······বার বার করে বললেনঃ 'ওরে আমার দুঃখের কথা কেউ বোঝে না!'

তীরের মত তাঁর কণ্ঠস্বর গিয়ে আমাকে বিঁধল। তাঁর দুঃখের কারণ যেন চকিতে বুঝলাম। তাঁর মধ্যে যে করুণা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করত তারই রক্তধারা তাঁর চোখের জল হয়ে বিগলিত হোত।

এই যে রক্তধারা অশ্রুধারা হয়ে বিগলিত হয়েছিল—তা কি ব্যর্থ হয়েছে? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁর প্রতিটি অশ্রুবিন্দু—তাঁর শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করবে। এই বীরের দল তাঁদের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করবে।"

মহাতাপস স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমে বিদেশে যেতে রাজী হলেন না। গুরুভ্রাতাদের অনেক অনুনয় নিষ্ফল হোল। একদিন "স্বামীজী তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে সাশ্রু-লোচনে বললেন, 'হরি ভাই, আমি ঠাকুরের কাজের জন্য বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দুপাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না?"

স্বামীজীর কথায় তুরীয়ানন্দ অভিভূত হলেন। সুদূর আমেরিকায় যেতে তাঁর আর কোনো আপত্তি রইল না।

স্বামীজী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন, 'দেখ, হরি ভাই, তোমাকে কাজে নামাবার জন্যই আমি কড়া কথা বলেছিলাম। এরা আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন কখনও দেখেনি, আমার কাছে শুনেছে মাত্র। তোমাকে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছি এজন্য যে তোমার জীবন দেখে এরা বুঝবে আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী কিরূপ।

**প্রেমানন্দ**

স্বামী প্রেমানন্দ বলতে লাগলেন—

"ঠাকুর বলতেন, একমাত্র স্বামীজীই জ্ঞানের অধিকারী, আর সকলে ভক্তির। ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশীর ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর

স্বামীজী ভক্তিকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর মতন ভক্তিমান লোক আর কয়টা আছে?

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছলেন। তখন বরানগরে মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সব বৈষ্ণবভাব হয়েছিল। তাই দেখে স্বামীজী একদিন বললেন, বৃন্দাবন থেকে তোরা তিলক মাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।' এই বলে সর্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তিলক প্রভৃতি কাটলেন। তারপর বললেন, দে ঝুলি মালা দে।' ঝুলি মালা নিয়ে বিদ্রূপ করে চক্ষু বুঝে জপ করতে লাগলেন, 'নিতাই ঠক্ নিতাই ঠক্ নিতাই ঠক্ ঠক্।' তা দেখে হাসির রোল উঠল। খানিক পথে ঝুলি মালা রেখে বললেন, 'খোল নিয়ে আয়, এবার কীর্তন হবে।' এইসব কথা তিনি বষ্টুমি দীনতায় বললেন। খোলটোল এলে বললেন, 'আমি মহড়া গাইছি, তোরা সব গাইবি।' এই বলে গান ধরলেন—নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে রে। আমরাও সব গাইলুম। ঐ লাইনটা কয়েকবার গাইবার পরই দেখি স্বামীজীর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়ছে।

**অদ্ভুতানন্দ**

কাশ্মীরে স্বামীজী একটি মন্দির দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'এটি নিশ্চয়ই দুই তিন হাজার বছর আগেকার।' সেকথা শুনে লাটু মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি করে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এলে?' স্বামীজী বললেন, 'আমার সিদ্ধান্তের কারণগুলি তোমাকে বোঝানো শক্ত। যদি তুমি আধুনিক শিক্ষা পেতে তাহলে তোমাকে বোঝানো সম্ভব হোত।' লাটু মহারাজও ঠকবার পাত্র নন, তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তোমার এমন শিক্ষা যে আমার মত মূর্খকে বোঝাতে পারলে না!' উত্তর শুনে হাসির রোল উঠল।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে প্রথমবার কলকাতায় ফিরে এসে লাটু মহারাজের খোঁজ করলেন। লাটু মহারাজ এলে স্বামীজী তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতক্ষণ আসিসনি কেন?' উত্তরে লাটু মহারাজ বললেন, 'তুমি বড় বড় লোকের সঙ্গে আছ, তাই আসতে ভয় হয়েছিল।' তখন স্বামীজী স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'চিরতরে তুমি আমার সেই লাটু ভাই, আর আমিও তোমার সেই লরেন ভাই।'

লাটু মহারাজ স্বামীজীর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'যদি লরেন ভাইয়ের সঙ্গ পাই আমি শত শত জন্ম নিতে প্রস্তুত।'

**রামকৃষ্ণানন্দ**

স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে স্বামীজী জাহাজযোগে আমেরিকা যাচ্ছিলেন। পথে মাদ্রাজে জাহাজ নোঙর করল। রামকৃষ্ণানন্দ তখন সেখানে সঙ্ঘের কেন্দ্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছিলেন। গুরুভ্রাতাদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি আহার্য প্রস্তুত করে নৌকাযোগে জাহাজের কাছে এসে উপস্থিত

হলেন। কিন্তু প্লেগের আশঙ্কায় জাহাজ থেকে কাউকে নামতে বা জাহাজে কাউকে উঠতে দেওয়া হোল না। উপায়ন্তর না দেখে রামকৃষ্ণানন্দ বললেন, 'মহাত্মাদ্বয়ের পাদস্পর্শ হোল না, অন্ততঃ তাঁদের একবার প্রদক্ষিণ করে যাই—মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ করতে বল।"

বরানগর মঠ থেকে সকলেই বেরিয়ে পড়েছিলেন তীর্থ পর্যটনে—একমাত্র শশী মহারাজ ঠাকুর ঘর ছেড়ে যেতে রাজী হননি। ঠাকুর-ঘর ছিল তাঁর প্রাণেরও অধিক—তাকে ছেড়ে যাবার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজী একদিন তাঁকে বললেন--হ্যাঁরে শশী, তুই আমাকে ভালবাসিস্? বলা বাহুল্য, শশী মহারাজ হাঁ বললেন। তখন স্বামীজী বললেন—তাহলে চলে যা মাদ্রাজে, সেখানে মঠ তৈরি কর।

প্রাণাধিক ঠাকুর-ঘর পড়ে রইল—স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি মনে করে চলে গেলেন মাদ্রাজে।

প্রাণপাত করে শশী মহারাজ কাজ করতে লাগলেন সেখানে। শহরের প্রান্তে ছোট একটি মঠ গড়ে উঠল। সেখান থেকে নিয়মিত দূরে শহরে যেতেন ক্লাস নিতে। এক প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে এমনি ক্লাস নিয়ে শশী মহারাজ অবসন্ন দেহে মঠে ফিরলেন। পোষাক ছেড়ে হাতপাখা নিয়ে বসে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে। কিন্তু এর পরেই হঠাৎ পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—স্বামীজীর ছবির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি, এত যাতনা ভোগ করছি।' কি শুধু এক মুহূর্ত। তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'না, না, না ভাই. ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি করেছ তাই ঠিক, তাই ঠিক।'

যখন তিনি উঠলেন এক পরম প্রশান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ।

**যোগানন্দ**

স্বামী যোগানন্দের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে স্বামীজী অত্যন্তই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। একদিন তাঁকে বললেন, 'যোগীন, তুই রেড়ে ওঠ, আমি মরি।'

যোগানন্দের মৃত্যুর পরে স্বামীজী বলেছিলেন, 'কড়ি খসলো! এবার ধীরে ধীরে বর্গাগুলিও খসে পড়বে।

**অভেদানন্দ**

স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন—

সমাপ্তির পূর্বে আমি আপনাদের নিশ্চয়ই জানাব যে এই মহান্ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে এবং আপনাদের এই দেশে আমার থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার এই গুরুভ্রাতার সঙ্গে আমি একত্রে বাস করেছি ও ঘুরে বেড়িয়েছি, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁকে দেখেছি এবং দীর্ঘ বিশ বৎসর

এই চরিত্র লক্ষ্য করেছি। আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, এই তিনটি মহাদেশে তাঁর মত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে আমি দেখিনি এবং এই আশ্চর্যজনক মানুষটির স্থান কেউই অধিকার করতে পারবে না। মানুষ হিসাবে তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও অকলঙ্ক, দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মধ্যে আমি কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের আদর্শকে দেখতে পেয়েছি, তিনি ছিলেন সর্বাবয়ব বেদান্তের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

**অখণ্ডানন্দ**

স্বামীজীর সান্নিধ্যের মধুর স্মৃতি অখণ্ডানন্দ ভুলতে পারেন না। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

বেলুড়ে একদিন তখনও রাত আছে—উঠে পড়েছি, উঠেই স্বামীজীকে দেখতে ইচ্ছা হোল। স্বামীজীর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি। ভেবেছি স্বামীজী ঘুমুচ্ছেন—উত্তর না আসলে আর জাগাবো না। কিন্তু স্বামীজী জেগে আছেন—ঐটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে

Knocking knocking who is there ?
Waiting waiting brother dear !

স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন এক নিভৃত পল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে বাস্তব রূপ দিতে নিরত, সে সময় একদিন আকস্মিকভাবে খবর এল স্বামীজী আর ইহজগতে নেই। সেই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে তিনি একবস্ত্রে মঠের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মঠে পৌঁছে কারো সঙ্গে দেখা না করে তিনি সোজা স্বামীজীর ঘরে গেলেন এবং সেখানে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দুইজনে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। অখণ্ডানন্দের স্বাভাবিক অবস্থা তখনই ফিরল না, সর্বদা আনমনা থাকেন—কখনও গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ান, কখনও বা স্বামীজীর ঘরে গিয়ে বসেন।

একদিন সকালে স্বামীজীর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে তিনি কালীঘাটে গেলেন। ফেরার পথে ট্রাম লাইনের উপর দাঁড়িয়ে ভাবলেন, 'আর কেন ? এখানেই জীবন শেষ করে দিই।' এমন সময় দেখলেন, গৈরিক আলখাল্লা-পরা এক সহাস্যবদন জ্যোতির্ময় মূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলেন সেই পরিচিত কণ্ঠে স্বামীজী বলছেন, 'আমি কি মরে গেছি !' এই অভাবিত দর্শন পেয়ে অখণ্ডানন্দ আবিষ্ট হলেন। এদিকে ট্রাম প্রায় গায়ের উপর এসে পড়েছে, ঘণ্টাধ্বণি তাঁর কানে পৌঁছাচ্ছে না, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। শেষে কণ্ডাক্টারের ঝাঁকুনিতে চমক ভাঙ্গল।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ। সেদিন স্বামীজীর জন্মোৎসব। সারগাছি আশ্রমে দলে দলে ভক্ত সমাগম হতে লাগল। সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন অসুস্থ

দেহে অবস্থান করছেন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় মুক্তির দিনটির দিকে চেয়ে।

এক ঝুড়ি সাদা গোলাপ ফুল নিয়ে একজন এসেছেন। অখণ্ডানন্দ খুব খুশী হয়ে বললেন, 'তুমি বোধ হয় জানো না, আজকের দিনে এই গোলাপের মূল্য কত! স্বামীজী সাদা গোলাপ বড় ভালবাসতেন। যাও, স্বামীজীর ছবির সামনে ফুলগুলি সাজিয়ে দিয়ে এস।'

উৎসবের কোলাহলে সেই শুভদিনটি কেটে গেল। সারাদিন তিনি উপবাসে কাটিয়েছেন। সন্ধ্যার পরে সেবককে রাত্রির আহারের একটি দীর্ঘ তালিকা শুনিয়ে অখণ্ডানন্দ শুয়ে পড়লেন। আহার্য প্রস্তুত করে সেবক এসে দেখলেন তিনি নিঃসাড়ে শুয়ে আছেন। রাত ঘনিয়ে আসছে দেখে সেবক সরবে তাঁকে ডাকলেন।

অখণ্ডানন্দ বললেন, 'কি খাওয়াবি তুই? আমি স্বর্গে গিয়েছিলাম—স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। সেখানে তিনি কত ভাল ভাল জিনিস খাওয়ালেন, সব খিদে মিটে গেছে। তুই কি খাওয়াবি?'

এই ঘটনার মাত্র পাঁচ দিন পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ মর্ত্যলোক ছেড়ে গিয়েছিলেন।

**বিজ্ঞানানন্দ**

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন বিজ্ঞানানন্দ অতি প্রত্যূষে প্রস্তুত হয়ে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। খুবই অন্তর্মুখ। সেবককে ধীরে ধীরে বলছেন—'মন্দিরে ঠাকুরকে বসিয়ে বলব—স্বামীজী, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর, আপনার পরিকল্পিত মন্দিরে বসেছেন—উপর হতে দেখবেন, দেখুন।'

প্রতিষ্ঠাকার্য শেষ করে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তখনও গভীর 'ভাবতন্ময়।' কিছুক্ষণ নীচে কেটে যাবার পর সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্দিরে ঠাকুর বসিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীকে যা বলবেন বলেছিলেন, বলেছেন কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ, বলেছি। স্বামীজীকে বললাম—স্বামীজী আপনি উপর হতে দেখবেন বলেছিলেন। আজ দেখুন; আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন। তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই, দাঁড়িয়ে দেখছেন।'

## বিবেকানন্দের শিষ্যদের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ

**স্বামী ধীরানন্দ**

( বিবেকানন্দ-শিষ্য, কৃষ্ণলাল মহারাজ নামে বেশী পরিচিত )

কৃষ্ণলাল মহারাজ বলেন—

মার্চ ১৮৯৯, গিরিশবাবুর বাড়ীর সামনের গোল বারান্দাওয়ালা ভাড়া বাড়ীতে ( এখন রাস্তায় নিশ্চিহ্ন ) স্বামী যোগানন্দের দেহ গেল। বেলা তখন তিনটে। মা সারদা উপরে আছেন। স্বামীজী যোগেন মহারাজের দেহ আরতি করলেন। মিষ্টি ভোগ দিলেন। স্বামীজী শ্মশানে গেলেন না। শিশিরবাবুর বাড়ী বসে রইলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) গেলেন। স্বামীজী বললেন.—'এই কড়ি খসলো, এর পরে একে একে বরগা প্রভৃতি খসে পড়বে।' যতক্ষণ না প্রাণবায়ু গেল, স্বামীজী নিকটে বসে রইলেন। কোন নামটাম চেঁচিয়ে করলেন না। Silently pass করতে দিলেন। যোগীন স্বামীর গর্ভধারিণী মা দেখতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে শিগগির চলে যেতে বললেন।

একদিন মার বাড়ী স্বামীজী খাবেন। বোসপাড়ায়। কলায়ের ডাল হয়েছে শুনে, ভারী খুশী। খুব ভালবাসতেন। কোন লোকের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'এর চাউনি ভাল নয়, তুই সাবধানে থাকবি।' কোন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে যখন যোগেন স্বামী তার ভার নিলেন, তখন স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন। নেয়াপাতি ডাবের ভিতর চিনি দিয়ে, সেই ডাবের খোলে বরফ দিয়ে খেতে ভালবাসতেন! বলরামবাবুর বাড়ীতে একবার তাই দিলুম। খেয়ে ভারী খুশী। বললেন, 'আঃ চমৎকার, নে তুই খা।' আমি খাচ্ছি, তখন বালকবৎ বলছেন—'আমায় আর একটু দেনা।' এঁটোর জ্ঞান নেই। পশ্চিমে বেড়াবার সময় একপাতে নিয়ে খেতে বসেছেন।

আমরা মার বাড়ীর দ্বারী ছিলাম বলে, আমাদের তামাশা করে, কালীঘাটের পাণ্ডা বলতেন।

শুদ্ধানন্দও বলেন, লাহোরে জগদ্‌বিখ্যাত স্বামীজীকে দেখলাম একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ছোকরা ব্রহ্মচারীর উপর মায়ের মত যত্ন। একদিন কফির দানাগুলি বেশী ভাজা হয়েছিল বলে, সেবক কানাইলালকে সেবার ত্রুটির জন্য স্বামীজী কান মলে দিলেন। কানাই লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কর্তা দূর হতে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—"দেখতে পেয়েছি, কানাই। আর কেঁদো না বাবা।" তারপর গলা জড়িয়ে আবদারের সঙ্গে বললেন—"ওরে কিছু মনে করিস নি। তোদের ভালবাসি, তাই এমন করে ফেলি। তোরা আপনার লোক।"

তাঁর সঙ্গে যোধপুরের ম্যানেজারের বাসায় আমরা আছি। হরিদ্বার থেকে একজন

সাধুর কাপড়পরা লোক এলেন। এক ঠোঙা জিলাপী স্বামীজীকে দিলেন। তিনি কিন্তু কাউকে খেতে দিলেন না। রাজার হাতীকে খাওয়ালেন। আগত ব্যক্তি আশ্রম করবেন বলে টাকার জন্য এসেছেন। ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কিছু পাইয়ে দেন। স্বামীজী নিজের সীমা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে ম্যানেজারের সংবাদ। রাজাকে ওপরচড়াও হয়ে কিছু বললেন না। সেভিয়ারকে বললেন, দশ টাকা দিতে। এই পর্যন্ত। স্বামীজী গুজ গুজ ভাব পছন্দ করতেন না। পরিষ্কার জবাব, স্পষ্ট কথা এবং দোষ স্বীকার পছন্দ করতেন। গিরিশবাবুর নাটকে আছে ফাঁড়ীদারের চার চোখ। স্বামীজীরও এইরকম ছিল। তিনি নিজেও বলতেন—আমার পিছনে দুটো চোখ। সামনে দুটো। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলম্বোতে Diabetes রোগ প্রথম দেখা দেয়। তার পূর্বে শরীর বেশ চমৎকার ছিল। শেষে রোগা হয়ে গেলেন।

**স্বামী নির্ভয়ানন্দ** ( বিবেকাননন্দ-শিষ্য )

নির্ভয়ানন্দ পাঁচ মাস শয্যাশায়ী। স্বামীজীর সন্ন্যাস-সন্তান। স্বামীজীকে রেঁধে খাইয়েছেন। অঙ্গসেবা করেছেন। দিনের পর দিন একঘরে শুয়েছেন। স্বামীজীর কথা বলতে তিনি শতমুখ। তিনি বলেন,—

"ভুরুর উপর একটা দাগ ছিল। বড় শান্তশিষ্ট ছেলে ছিলেন কিনা! বেশ নাচতে পারতেন। বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে সাহেবী নাচ আমাকে দেখিয়েছিলেন। নানারকম নাচ। আর একবার খোল-করতালের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে তাঁকে যেতে দেখেছি, রামকৃষ্ণপুরে শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে যেদিন তিনি স্বয়ং ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন, পুণ্যশ্লোক নবগোপালের এই দুর্লভ ভাগ্যোদয় ঘটেছিল!"

তুলি বা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে তাঁকে কখন দেখেছো কিনা প্রশ্ন করায়. নির্ভয়ানন্দ বললেন—"না।" শেষে আবার হাসতে হাসতে বললেন, "তবে ছেলে স্কোয়ার ছিলেন।"

**জ্ঞান মহারাজ** ( বিবেকানন্দ-শিষ্য )

তিনজনই ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনটিই কৌমার বৈরাগ্যবান। বেলুড়মঠে সাধু হবেন বলে স্বামীজীর আশ্রয়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের নিলেন, এবং তিনজনকেই বললেন,—'তোরা, আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকবি। তোদের অন্য কোন সংস্কার নেবার দরকার হবে না।' প্রথমজন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দলাল মহারাজ। একটা সত্ত্বগুণের আভা তাঁর মুখে দেখেছি, পরনে সাদা কাপড়, কাছা দেওয়া। স্বামীজীর আদেশ পালনে তিনি সমর্থ হন। কলিকাতার আহিরীটোলা পল্লীর এই সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী অনেক যুবকের প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবপ্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন কিন্তু সন্ন্যাস নেন। কেষ্টলাল মহারাজ স্বামী ধীরানন্দ হন। বিক্ষুব্ধ বিবেকে তিনি

আমাদের বলতেন—'সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছি, স্বামীজীর কথা আমি বর্ণে বর্ণে রাখতে পারিনি, এই যা মনে খেদ।'

তৃতীয়জন, জ্ঞান মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারীই থেকে যান। স্বামী সারদানন্দ এঁর সম্বন্ধে একদিন আমাদের কাছে বলেছিলেন, 'স্বামীজীর কাজ ছেলেদের ভিতর জ্ঞান অনেক করেছে, তবে ও কারুর অধীনে কাজ করতে পারে না। ঘর ছাড়ার পর এঁর পিতৃদেব একবার বেলুড়ে এসে দেখেন যে ইনি রান্নাঘরের নিকট বঁটি হস্তে কুমড়ো কুটছেন। ঐ না দেখে তিনি প্রাণের দুঃখে বলেছিলেন—'বাবা, দোহাই তোমায়, বাড়ী ফিরে চলো। কতো কুমড়ো কুটতে চাও? গাড়ী গাড়ী কুমড়ো কিনে দেবো। মনের সাধে কুটবে। বাড়ী চলো।' কিন্তু কে শোনে?

জ্ঞান মহারাজের কথা—

উনিশ-শো একের কথা। মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙালী আমরা। অভিভাবকদের ব্যবস্থা-মত আমার 'পাকা দেখা' স্থির। আমি কিন্তু উদ্বাহবন্ধনে গলা দিতে একান্ত নারাজ। সাধু হবো, ঐকান্তিক, সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। অতএব রক্ষা পাবার অনন্য উপায়—গৃহত্যাগ। পাকা দেখার আগের দিন তা করতে হল। উদ্বোধন পাক্ষিক পত্র প্রথম বৎসর হতেই পড়ি। স্বামীজীর চারখানা যোগগ্রন্থও ক্রমে ক্রমে পাঠ করেছিলাম।

এর আগে কলকাতায় বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ-মিশন সভায় উপস্থিত হই। স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে। একখানা লম্বা বেঞ্চির ওপর রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজকে উপবিষ্ট দেখলাম। দেখেই মনে হল—হ্যাঁ, চেহারা বটে! আমারও পালওয়ানী-করা মজবুত দেহ ছিল।

খানিকটা কীর্তন হল। একটু পাঠ ও আলোচনা হলঘরে হল। শুনলাম। দুটো রসগোল্লা পেসাদ পেলাম। রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় তখুনি বুঝলাম যে ওঁর গাছের বড় সখ। মুঙ্গেরে বাড়ী শুনে বললেন—ওদিকের আম বিখ্যাত। আমাদের জন্যে কয়েকটা আমের চারা যোগাড় করে পাঠাতে পারবে?

উত্তর করলাম—হাঁ, ওদিককার আম ভাল বটে। কিন্তু চারাটারা যোগাড় করে পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুনে শরৎ মহারাজ হাসতে লাগলেন।

উদ্বোধনের একখানা বিজ্ঞপ্তিপত্র হতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অস্তিত্ব জানতে পারি। তাতে লেখা ছিল যে, ওখানে ব্রহ্মচারীদের রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে। আমি বাড়ী ছেড়ে মায়াবতী যাবো মনে মনে ঠিক করলুম। কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করা গেল। তাঁরা জবাব দিলেন—হাঁ, ওরূপ আমাদের কল্পনা ছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ কাপ্তেন সেভিয়রের মৃত্যু হওয়াতে, ওসব ওলটপালট হয়ে গেছে। এখন ব্রহ্মচারীরূপে কাউকে নেওয়া হবে কি না ঠিক নেই। যাই হোক্, তুমি যদি যাত্রা করে থাকো তো উপায় নেই, ইত্যাদি।

যাক্—স্বামীজী, দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণ থেকে ফিরে এলেন। আমিও মুঙ্গের

থেকে মায়াবতী পাড়ি দিলাম। যাবার আগে জানালাম, যাচ্ছি। একেবারে একটানা গেলাম না। পাছে আত্মীয় কেউ ধ'রে ফেলে। খানিক-খানিক ছাড়া-ছাড়া যাত্রা হল। পরিশেষে টনকপুর এলাম। সেখান থেকে হেঁটে মায়াবতী। কয়েকদিন রইলাম। স্বরূপানন্দ স্বামী গীতা, চণ্ডী পড়াতেন। একটি ঘরে ঠাকুরের পুজোও আমি করতাম।

স্বামীজী এলেন। আমার থাকা হবে কি না, সন্দেহ ছিল। তিনি মঞ্জুর করবেন কি না। যেদিন কানে এল তিনি অপরকে বলছেন,—'এ থাকবে'—তখন যেন কূল পেলাম। গম্ভীর মোটেই নন—তাঁকে দেখলাম। আমার বাবা বেলুড়ে তাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বেই দেখা করেছিলেন। বিয়ের ব্যাপার জানিয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বন্ধুর মত আমায় বললেন—'কি রে বউ পছন্দ হয় নি—নাকি? না, ঘড়ি, ঘড়ির চেন বা অপর কিছু দেওয়া-থোওয়া তোর মনঃপূত হয় নি? বলি, ব্যাপার কি রে?' দেখলাম বেশ রসিক, আর আমুদে। আমার শক্ত দেহ দেখে ভারী আহ্লাদ। মস্ত আমার বুক। তিনি হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, বাঃ বাঃ বাঃ! বাংলায় এমন শরীর হয় না।

দিন পনেরো তিনি রইলেন। রোজ রোজ বৃষ্টি। বেড়াতে পারতেন না।

প্রথম প্রথম আমি সকলের সঙ্গে টেবিলে ওপরে দোতলায় খেতাম। তাতে আচার-বিচার তত মানা হত না। কম্বল পেতে খাওয়া হত। স্বামীজী কিন্তু পছন্দ করলেন না যে, নবাগত ব্রহ্মচারী আমি—গোড়া থেকেই ঐরূপভাবে খাই। বললেন,—ওকে কাল থেকে রান্নাঘরে নীচে খেতে হবে। তিনি কারুর নিষ্ঠা সহজে ভাঙতে চাইতেন না।

মায়াবতীর পাহাড়ীরা ওখানের আশ্রমস্থ সব সন্ন্যাসীকেই 'স্বামীজী' সম্বোধনে ডাকত। খালি আমাকে বাবু বলত। স্বামীজী বললেন—তা হবে না। তোরা সব ওকে 'মহারাজ' বা 'দাদা' বলে ডাকবি! সেই থেকে তাঁদের মধ্যে খালি আমাকেই ওরা 'মহারাজ' সম্বোধন করত।

মিসেস সেভিয়র একদিন স্বামীজীর লেকচার শুনতে চাইলেন। খালি তাঁরই অনুরোধে আমাদের মাত্র আট দশজনের সামনেই তিনি পায়চারি করতে করতে, কখনও মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে খুব চড়া আওয়াজেই বক্তৃতা করলেন। প্রায় আধঘণ্টা। এমনি, সাধারণ বিষয়ে বললেন। মনে হল যেন তিনি এক প্রকাণ্ড জনসভাতে ভাষণ দিচ্ছেন। বলতে বলতে খুব মেতে উঠলেন। উদ্দীপ্ত হতে লাগলেন। হিমাচলের সমস্ত নিস্তব্ধ বেষ্টনী, শান্ত বায়ুমণ্ডল তাঁর আওয়াজে ভূরি ভূরি কাঁপতে লাগল—দিকে দিকে সেই অনবদ্য কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনি হতে লাগল। ইহাই আমার জীবনে একমাত্র তাঁর বক্তৃতা শোনা। উচ্চারণ-চোস্ত দুরস্ত, ঠিক সাহেবদের মতো। কোথাও একটুও খিঁচ নেই।

মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রগাঢ় ভাবের সহিত তিনি স্তব-পাঠ করতেন ও পায়চারি করতে করতে গান গাইতেন। তিনি বলতেন পাশ্চাত্যে অনেক বক্তৃতা করে

তাঁর কণ্ঠস্বর কথঞ্চিৎ কর্কশ হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে গীতা, চণ্ডী ও কতকগুলি স্তব মুখস্থ করতে বলেছিলেন। তাঁর কথায় আমি করেও ছিলাম।

পাহাড়ীরা প্রথম দিন তিনি যেতেই একটা থালায় খানিকটা কর্পূর জেবলে তাঁকে আরতি করল। তিনি তাদের অতি প্রাচীন মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি দেখে রসিকতা করে বললেন,—'বাবা, ভূতেও এ রকম আরতি সহ্য করতে পারবে না—মানুষ তো কোন্ ছার্!' তারপরে তারা থামে।

তিনি মায়াবতী থেকে চলে আসছেন। আমারও মন টিঁকল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু মাইল হেঁটে চললুম। মতলব—তাঁর দলেই নামবো। তিনি তখন ডাণ্ডীতে। আমি পায়ে হেঁটে। বললেন—

'তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাবি? আমি তো এখন মঠে (বেলুড়) যাচ্ছি না। নানা জায়গা ঘুরবো যে রে। তুই এখানে থাক।—সাধু হবি যে, তা আমার কথা শুনে চলতে পারবি তো?'

—হাঁ নিশ্চয়ই।

'আচ্ছা, এই খাড়াই বা ঢালু থেকে যদি বলি, লাফ দে—পারবি?'

হাঁ।

'আচ্ছা, তা আর দিতে হবে না। আমি বলছি, তুই আশ্রমে ফিরে যা। ওখানে এখন থাক। আমি যখন ঠাকুরের উৎসবের সময় মঠে ফিরবো, খবর নিবি। মঠে আমি গেলে তখন এখান থেকে নামবি।'

অগত্যা প্রবল অনিচ্ছা থাকলেও তাই করতে হলো।

ইতিপূর্বে আশ্রমের সব ঘর তাঁকে একদিন দেখানো হচ্ছিল। যে ঘরে ঠাকুর-পূজো আমি করতাম—ঢুকে বললেন—'বুড়ো এখানেও জুড়ে বসেছে, দেখছি।' বাবুরাম মহারাজ ওখানে এর আগে যাওয়াতে কীর্তন ও পূজা জোর চলেছিল। স্বামীজীর অভিপ্রায়মত তা অতঃপর বন্ধ হয়।

একদিন মায়াবতী আশ্রম থেকে তিনি ঘোড়া চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বৃষ্টি পড়ছিল। আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তাঁর মাথায় ছাতি ধরেছিলাম। তিনি তখুনি নেমে পড়লেন। ভারী খুশি। বললেন, 'সাবাস্! এই তো চাই।'

স্বরূপানন্দস্বামী পছন্দ করতেন না যে, কোন নতুন ছেলে বাড়ী থেকে এসেই স্বামীজীর কাছে থাকে। স্বামীজীর advanced thinking, বিধি-নিষেধ বহির্ভূত পরমহংসোপম ব্যবহার ও অত্যুচ্চ ভাবধারা ঠিক্ ঠিক্ হয়ত নিতে পারবে না। ভাব গুলিয়ে যাবে। নিজের গঠনের জন্য ওরূপ ছেলের প্রথম আলাদা থাকা দরকার—এরূপ মনোভাব তিনি পোষণ করতেন।

মায়াবতীতে স্বামীজীর ঘরের জানালা দিয়ে চির-তুহিন গিরিমালা দেখা যেতো। তিনি নিরালায় বসে বসে উপভোগ করতেন। একদিন আমাকে ঐ সৌন্দর্য

দেখালেন।—'দ্যাখ্—দ্যাখ্! কি চমৎকার! শিবের স্তব জানিস?'—বলেই একটি স্তব অতীব শুদ্ধবাণী-সমন্বিত অশ্রুতপূর্ব অপরূপ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন।* ভাষা মনে নেই, ভাবটা এই—মহাদেবের সবই সাদা—আর তিনি জ্যোতির্ময়।

আবৃত্তি করতে করতেই কেমন যেন বাহ্যহারা হয়ে গেলেন—স্থির, নিশ্চল।

তাঁর সঙ্গে হিমাচলের কোলে এই রকম আমার প্রথম পরিচয়। মায়াবতীতে আমি তো তাঁর বেশ সুন্দর bright শরীর দেখেছি। তবে যাঁরা তৎপূর্বে তাঁকে দেখেছিলেন তাঁরা বলতেন তিনি খুব reduced—কাবু।

তারপর বেলুড় মঠে। তাঁর ঘরে যাবো। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাঁর শরীর খারাপ। নিরঞ্জন মহারাজ—লম্বা চওড়া চেহারা—দুই হাত তুলে দরজা আটক করে রেখেছেন। আমি বাধা মানলুম না। তলা দিয়ে গোলে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে বসে কথা কইছিলেন। আমি ঢোকাতে তাঁরা নিরঞ্জন মহারাজকে হাসতে হাসতে বললেন—'কি হে, খুব তো গার্ড দিচ্ছ! এই ছোঁড়াটা কি করে এলো?'

স্বামীজী বললেন—'কিরে, তুই চলে এলি যে?' আমাকে দেখেই চিনেছেন।

বললাম—আপনার সঙ্গে কথা ছিল যে, আপনি মঠে এলে আসবো! তখন চুপ করলেন। সেভিয়র-পত্নীর কাছ থেকে তিনি বেলুড়ে ঠাকুরঘরে রাখবার জন্যে একখানি ছবি চেয়েছিলেন। তা আমার মারফত পাঠানো হয়। পথে আমি ছবির কাঁচখানি ভেঙে ফেলি। ভয় ছিল—কি না জানি বকবেন। ছবি পেয়ে খুব খুসী হলেন, বকলেন না মোটেই।

ঠাকুরপূজো বেলুড়ে আমি করতুম। তিনি ঠাকুরঘরে রোজ যেতেন তখন। একদিন আমাকে ডেকে দীক্ষা দেন। আমি চাই নাই। আমাকে গেরুয়া পরে থাকতে তিনি পরে আদেশ দেন। আমার কাপড় নাই দেখে, শিবানন্দস্বামী তাঁর দুইখানি গেরুয়া কাপড়ের একখানি আমাকে প্রথম দেন। তারপর কখনও লাল, কখনও নীল, যেমন কাপড় পেতুম পরতুম। গোপাল-দা বহুরূপী বলে ঠাট্টা করতেন। স্বামীজী শুনে গেরুয়া পরতে বলেন।

ইদানীং দেহত্যাগের আগে শরীর খারাপ যাচ্ছিল বলে স্বামীজীর ঘরে যাবার আগে রাখাল মহারাজ আমাদের কাছে প্রথম খবর নিতেন—ওঁর মেজাজ কেমন। মাস আটেক বেলুড়ে তাঁর কাছে থাকবার পর ওঁর দেহ গেল।

* গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং। খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে॥ গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি। সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥—পশুপতির গায়ে শুভ্র ভস্ম। হাস্য শুভ্র। হাতে শুভ্র নরকপাল। দণ্ড শুভ্র। বাহন বৃষভ—শুভ্র। কর্ণে দুই শুভ্র কুণ্ডল। মাথায় জটা—গাঙ্গ—ফেনসমূহ দ্বারা শুভ্র। ভালে শুভ্র অর্ধচন্দ্র।—তিনি সর্বশুভ্র।—শ্রীমৎ আচার্য শঙ্কর কৃত।

স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় কয়েকবার বেড়াতে ও নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি। তাঁর বোনের বাড়ী। বোন তাঁকে বড় ভালবাসতো। তিনি শেষটায় বিশেষ খেতে পারতেন না। আমি বেশ খেতাম। কানাই মহারাজও খুব খেতেন।

কেদার বাবা ও নিশ্চয়-স্বামীর সন্ন্যাস এই সময় বেলুড়ে হলো। আমাকে বলেছিলেন—'তুই এই ভাবেই যেমন আছিস থাকবি।'

যতো শেষের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই তাঁর শ্রীমুখে 'জয় প্রভো, জয় প্রভো,' 'মা, মা মা'—মহাশব্দ ঝঙ্কৃত হতো। আর শুনতাম—'শিব—শিব—শিব।"

যে-সব ছেলেরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে বেলুড়ে তাঁর কাছে সাধু হতে আসতেন—তাঁদের উপরে স্বামীজীর অগাধ ভালবাসা দেখা যেতো। কোন পাশ্চাত্য ভক্ত একবার স্বামীজীকে একটি সৌখীন কাঁচের গ্লাস উপহার দেন। স্বামীজী ঐ গ্লাসে কমলা-লেবুর রস করবার জন্য ঐরূপ এক বালককে বলেন। ঐ কাজ করতে অনবধানবশতঃ বালক গ্লাসটি ভেঙে ফেলল। কোন বয়স্থ সাধু তা দেখে বালককে অতীব চড়া রকমের তিরস্কার করতে লাগলেন। স্বামীজীর কর্ণগোচর হলে তিনি বালকের দিক নিয়ে বললেন—'ঠাকুরের কাছে আমরা গিছলাম, তিনি কত ভালবাসা দিয়ে আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন। এরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছে। এদের ওরকম ভীষণ বকুনি দিলে চলবে কেন? এরা থাকতে পারবে কেন? গেলাস তো ঐ ভাবেই যাবে, গেলাসের তো আর কলেরাও হবে না, থাইসিসও হবে না।'

[ বাগবাজার-নিবাসী স্বামীজীর শিষ্য অসীম বসুর স্মৃতিকথা—]

আমার পিতা ( কথামৃতের চুণী বসু ), ঠাকুরের ভক্ত। ছেলেবেলায় বহুবার আমাদের পাড়ায় পরমহংসদেব এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছি অনেকবার। পিতার নির্দেশমত আলমবাজার মঠে পরে স্বামীজীর কাছে আমার দীক্ষা হয়। এনট্রান্স দেবার সময় স্বামীজী আমাদের বাড়ি এসেছেন। আমি অঙ্কে কাঁচা। তাঁকে জানাতে তিনি বললেন,—'আমিও তাই ছিলুম। F. A. তে Wilson-এর Conics মুখস্থ করে পাস করেছিলাম। তুইও তাই করবি।'

পরে আমি আইন পড়ছি। একদিন স্বামীজী এসেছেন। কথায় কথায় বললেন—'উকীলের তো উদ্দেশ্য দেখছি পরের ভেতর ঝগড়া সৃষ্টি করা।' ওঁর কথায় আমার কেমন একটা ওকালতীর উপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। আইন পড়া ছেড়ে দিলাম।

অভিনয় সম্বন্ধে একদিন তিনি প্রসঙ্গ করছিলেন। পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশের তখনকার দিনের অভিনয়-দারিদ্র্যের কথা বললেন। এবং নিজে গিরিশবাবুর নাটক থেকে, ও শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট থেকে খানিকটা অভিনয় করে দেখালেন। চমৎকার লাগল।

প্রতিভার খনি ছিলেন তিনি। বাবার আগ্রহে তাঁর কাছে দীক্ষা হয়। যখন দীক্ষা নিই তখন চাকুরি করি। সেদিন কিছু ফলমূল ও তাঁর প্রিয় খাবার কিছু মাংস সঙ্গে নিয়ে যাই। আগে থেকেই আমাকে স্নেহ করতেন। পুজো-টুজো না করেই দীক্ষা

দেন। মন্ত্র নেওয়ার পরে ক্রমশঃ তাঁকে গুরু বলে বুঝতে পারলুম। ধ্যান জপ করতে শেখালেন। তাঁর কৃপায় ধীরে ধীরে সাধুদের আপনার জন বলে বোধ হতে লাগল। আমার শরীর বরাবর খারাপ। একটু কিছু না খেয়ে জপ আহ্নিক করার অসুবিধা সারদা মহারাজ মারফত তাঁকে জানানোতে তিনি বলে পাঠান—'একটু খেয়ে-দেয়ে করলেও কোন দোষ হবে না। আর যখন তোমার সুবিধা হবে, করবে।'

তিনি একবার বলেছিলেন—'ঠাকুরের কৃপায় শাস্ত্রের Text পড়লেই অতি সহজে ভেতরের ভাবটা এসে যায়। তোমরা ভাষ্যটাষ্য বেশী পড়বে না। Text আগে পড়বে। বেশী করে পড়বে।'

দেহত্যাগের ঠিক এক সপ্তাহ আগে শেষ দেখা। বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁর কবিরাজী চিকিৎসার বাঁধাবাঁধি চলছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন আছেন ?'

বললেন—'আরে তুমিও যেমন! ডাক্তার বদ্যিতে অনেক কথাই বলে। কিন্তু আমার মৃত্যুরোগ। তারা কি করবে ?'

—'কি খাবেন ? দুধ খাবেন ? আমাদের বাড়ীর গাই আছে।'

—'হ্যাঁ তা খাবো। অন্য কিছু খাওয়া চলবে না।'

[ মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যের বড় ছেলে 'বপেনে'র বন্ধু ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ বলেন—]

স্বামীজী নবীন সন্ন্যাসীদের খেলাধুলাতেও উৎসাহ দিতেন। মনে পড়ে স্বামীজী দেখছেন আর মূল মঠবাড়ীর সামনের তীরবর্তী লনটুকুতে সুশীল, মহারাজ প্রভৃতি একটি নেকড়ার বল তৈয়ারি করে খেলছেন।

দেশে রজোগুণের বিকাশ ক্রমশঃই হতে থাকবে, একথা তিনি বলতেন। বলেছিলেন, "এরপর দেখবি, কলকাতা শহরে গলির মোড়ে মোড়ে, রাস্তায় রাস্তায় পানের দোকানের মতন চপ কাটলেটের দোকান হবে।"

১৮৯৭ সনে শীতকালে দেরাদুনে গিয়েছিলেন। একদিন সকালবেলা, চা-আদি খাচ্ছেন কয়েকজনের সঙ্গে টেবিলে বসে, খানিকটা আনমনা হলেন, স্থির হয়ে চিন্তা করে সমবেত কয়েকটি লোককে বললেন—"ওহে একটা যুদ্ধ বেধে গেল যে।" ( ইহার পরই বুয়র যুদ্ধ লেগেছিল। ১১ই অক্টোবর ১৮৯৯—২১শে মে ১৯০২। স্বামীজীর যোগজ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল। তিনি ইচ্ছা করে বিভূতি প্রকট করতে চাইতেন না। গুরুদেবের নিষেধ ছিল। কোন কোন সময়ে আপনা-আপনি একটু-আধটু বাহির হয়ে পড়ত। )

বলরামবাবুর বাড়ীর ডাক্তার স্বামীজীকে দেখতে এসেছেন। সারা কলকাতা জুড়ে ডাক্তারের খুব নামডাক। স্বামীজীর জীবনের শেষাশেষি। চিকিৎসককে লক্ষ্য করে অন্যদের বলছেন—"কি ছাই জানে! দু-চারখানা বই পড়ে ভাবে—আমরা সব মেরে দিয়েছি। আমরা স-ব জানি। আমরা সব বুঝি।"

একদিন ঐখানেই একজন ছুৎমার্গী ব্রাহ্মণ স্বামীজীর সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে তর্ক করতে এলেন। ওঁর অপরিসীম ধৈর্য সেদিন দেখলাম। তিলমাত্র বিরক্ত না হয়ে পণ্ডিতের সঙ্গে বেশ শান্তভাবে কথাবার্তা কইলেন জবাব দিলেন। তাঁর আপত্তিগুলি সংযত হয়ে শুনলেন, একে একে খণ্ডন করলেন।

আর এক দৃশ্য। স্টার থিয়েটারে ( বিডন স্ট্রীট ) রঙ্গমঞ্চের উপর বেড়াতে বেড়াতে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন। শ্রোতাদের দিকে যেন মোটেই লক্ষ্য নেই। Speaking within himself, thinking aloud as it were. যেন নিজে নিজে আপন মনে আপন ভাবে বক্তৃতার তোড় চালিয়ে যাচ্ছেন—চীৎকার করে চিন্তা করছেন। দুঃখ হয়, সেই অনুপম শব্দের, সেই প্রাণোন্মাদকারী অমৃতনিঃসারী বাক্যচ্ছটার—শব্দব্রহ্মের—কোন রেকর্ড রইলো না, আর প্যালা পণ্ডার গলার রেকর্ড হয়ে গেলো—রয়ে যাচ্ছে!

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন, দার্জিলিং-এ মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে। বাঁড়ুয্যেদের তুলে

দিতে গিছলুম। একটা লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা পরা, পায়ে একজোড়া মাদ্রাজী স্লিপার, যেন কাউকে দেখছেন না, আলুথালু অবস্থায় চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে উঠলেন। সাহেবগুলো, বাঙলী, হিন্দুস্থানী—স্টেশনে যতলোক ছিল, সব হাঁ করে চেয়ে রইল। ব্যক্তিত্বের অকাট্য আকর্ষণ!

আর একবার আমরা জনকয়েক কলেজের ছোঁড়া বিকেল নাগাদ চড়ুইভাতি করতে বেলুড়ে গেছি। নীলাম্বর মুখুয্যের গঙ্গার ওপর বাগানবাড়ীতে তখন ভাড়াটে মঠ। স্বামীজী দেখেই খুব খুশী। গুপ্ত মহারাজ (সদানন্দ) লম্বা চওড়া খুব বলবান সুন্দর চেহারা, লন-এ পায়চারি করছিলেন, যেন কোন দেবতা। তাঁকে তখন বললেন—'ওরে গুপ্ত, এই ছোকরারা সব এসেছে। এদের তাড়াতাড়ি একটা খাবার ব্যবস্থা ক'রে দে।' আমরা বললাম—'না আমরাই ক'রে নেব এখন।' যা হোক, গুপ্ত মহারাজ খুব Expert ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে চমৎকার খিচুড়ি ও মাংস করে এনে হাজির। স্বামীজী তাঁর সেই Peculiar strong সুরে বললেন, 'নে, সব খেয়ে নে।' যেন কত আপনার।

আর একবার কি একটা খাওয়া-দাওয়া ছিল। আমি এমনি গেছি। অতি সহজভাবে বললেন,—"আয়!—ওরে একে একখানা পাত দেতো। বোস! খা!' তাঁর Voice একটা চমৎকার জিনিস। অমন কারুব শুনিনি। কথা একেবারে লোকের Heart-এ পৌঁছাতো, ধাক্কা দিত, গঙ্গায় স্টীমারে যেমন ভক্ ভক্ করে স্টীম ছাড়ে, সেইরকম, এক একটা impression দিয়ে যেতো, ভুলতে পারা যেত না, গাঁথা থাকত, যেন বুলেটের মত খাপে খাপে লোকের আঁতে গিয়ে বসছে, আর ঘা মারছে।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে একদিন আমরা গেছি। এমনি, ধর্ম-টর্ম কিছু নয়, বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ দেখতে গেছি। কি চিঠি-পত্তর লেখাচ্ছিলেন, বড়ো ব্যস্ত-সমস্ত। বাবুরাম মহারাজ এসে বললেন, "চান করবে চলো। বেলা হয়েছে ঢের।" বললেন "যাচ্ছি, চ।" তারপরেই উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন, কামারপুকুর অঞ্চলের পল্লীগ্রামের, আস্ত গেঁয়ো-লোক যাকে বলে, একেবারে ঠিক তাই, এল। ঠাকুরের আমলের লোক, মালুমে বোধ হলো। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতো। অতবড় যে বিবেকানন্দ—তিনি তা যেন এক নিমেষে ভুলে গেলেন। তার সঙ্গে সহজ, সরলভাবে, আগেকার ঘরোয়া রকমে বসে আলাপ-সালাপ হাসি ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলেন। ঠাকুরের দেশের লোক বলে খুব খাতির। খাবার-দাবার ব্যবস্থা, আদরযত্ন যথেষ্ট করলেন। সে লোকটি গোড়াগুড়ি একটু অবাক-অবাক ভাব দেখাতে লাগল। তারপর সবই এক হয়ে, মিলেমিশে গেল। আবার যখন গম্ভীর হতেন কার সাধ্য এগোয়। আমাদের সামনে তো দেখলুম খুব active, লোককে খালি কাজ করতে, organise করতে বলছেন। বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে বারান্দায় একদিন দেখি, একা পায়চারি করছেন। আর গুন্‌গুন্ করে আপন মনে গাচ্ছেন—'পিলেরে অবধূত হো মাতুয়ালী পিয়ালা হরি রস করে।" ছবি! ছবি!

[ শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বাগবাজার-নিবাসী বলরাম বসুর প্রতিবেশী শৈলেন বসু। পোর্ট কমিশনে কাজ করতেন। ব্রহ্মানন্দের দীক্ষিত। তাঁর বিবৃতি— ]

আলমবাজার মঠ। সেদিন জন্মাষ্টমী। 'গুডউইন* কোথায়' বলে স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছেন। গুডউইন খুব আমুদে। খানিক খানিক বাংলা বুঝতেন। স্বামীজীর চেয়ে বেঁটে। দাঁড়ি গোঁফ কামানো। বয়স মনে হয় চল্লিশ। কোটপ্যাণ্ট পরা। মাথায় চুল। গুডউইন স্বামীজীর সামনে এসে গরুড় পাখীর মতো হাঁটু ভেঙে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। "তুই নাকি উপোস করেছিস্? কে করতে বললে? তোরা বড় জ্বালালি! এত বাড়াবাড়ি সইবে কেন?"

একবার গুডউইনের পেটের অসুখ। স্বামীজী বললেন—"আর কিছু খেয়ো না, খালি দুধ আর সোডাজল।" অন্য সাধুদের ডেকে বললেন "তোমরা কিছুই নজর রাখো না, এদের কি হচ্ছে না হচ্ছে! বিলেত থেকে এসেছে, এদের সাবধানে রাখবে।"

[ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর লীলার মূলাধার আচার্যবরিষ্ঠ শ্রীবিবেকানন্দ। দুইজনকে একসঙ্গে দেখবার ও সাধ্যমত বুঝবার ভাগ্য যাঁর হয়েছে, তিনি ভাগ্যবান। কলিকাতা মেছুয়াবাজারের ঈশান মুখোপাধ্যায়ের নাম রামকৃষ্ণলীলা-রসিকগণের সুপরিচিত। ইনি বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা প্রায় দ্বাদশ বৎসরের বড়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাতচল্লিশ, ইনি তখন প্রায় ঊনষাট হলেও রামকৃষ্ণপদে শরণাগত। মুখুয্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশচন্দ্র পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সতীর্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্ন, ধর্মে ও বিনয়ে অবনত, যাকে দেখে ঠাকুর চমৎকৃত হয়ে উক্তি করেছিলেন—'এমন লোকের ওকালতী!' সেই শ্রীশচন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্রবাবু জেলা-জজিয়তি করার পরে দ্বাদশ বৎসর যখন 'পেনসিল' ( ঠাকুরের ভাষায় ) ভোগ করছেন, তখন তাঁর মুখ থেকে এই স্মৃতিকথা সংগৃহীত হয়। ]

আমাদের তখন একসঙ্গে বিরাট যদুগোষ্ঠী। দাদু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর, আমার বি-এ পাসের পর, তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে গঙ্গালাভ করেন। নাতি-নাতনী আশ্রিত-কুটুম্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রায় চুয়ান্ন জন আমরা মেছোবাজারের বৃহৎ বাড়ীতে থাকি। আমাদের ভদ্রাসন হরিনাভি গ্রামে—ব্রাহ্মকুলনায়ক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদেরই গ্রামের। ঠাকুর যখন দাদুর কাছে, আমাদের বাড়ীতে ( এখন ১৯নং কেশব সেন স্ট্রীট ) পদধূলি দিতেন তখন আমার বয়স সাত আট। তাঁকে দেখা, দুবার স্পষ্ট মনে পড়ে। বাড়ীর সামনে সুন্দর ফুলফলের বাগান ছিল। একতলায় দুটি বৈঠকখানা, ছেলেদের। একতলায় বাগানে একটু ঢুকে দাদুর বৈঠক আলাদা। একদিন ঠাকুর সেখানে এলেন। পরে জেনেছি, সেটা ভাগবত পাঠের আসর-আয়োজন। বিজয় গোস্বামী, রাখাল মহারাজ,—শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ. ( সকলে তখন কিন্তু বাবু ) প্রভৃতি সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়ার লম্বা ব্যবস্থা। আমার

* গুডউইন একজন ইংরাজ যুবক। যিনি পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সমস্ত বক্তৃতার অনুলেখক। মূলতঃ তার জন্যই আমরা স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর সহিত পরিচিত হতে পেরেছি।

ছেলেমানুষের মনে হয়েছিল—বুঝি যাত্রা জুড়বে। পাড়াপড়শী সবায়ের ভিড় লেগে গেছে। এমন সময় হঠাৎ—'পরমহংস আসছেন! পরমহংস আসছেন! পরমহংস আসছেন!'—চারিদিকে তুমুল রব উঠল।

ঘরে একখানা পেল্লায় আরশি টাঙানো ছিল। তিনি আসন গ্রহণ করে একবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—যেন আরশির সঙ্গে কথা কচ্ছেন। বসে পড়লেন তারপর। পরে শুলেন। একজন (ইনিই পুষ্পের ন্যায় পূত প্রেমানন্দজী) তাঁর কর্ণমূলে ভগবানের নাম অনেকক্ষণ শোনালেন। পাঠ মুলতুবি রইল খানিক। থমথমে ভাব। গম্ভীর সবাই, কি জানি কি হয়! ঠাকুর একটু একটু কাঁপতে লাগলেন। বললেন—'খাবো বাবুরাম, খাবো, খাবো।' আধখানা সন্দেশ কে যেন আমার হাতে দিয়ে ওখানে পাঠালেন। একটু নামমাত্র মুখে দিয়ে আবার ঠাকুর স্বাভাবিক, সহজ হয়ে এলেন। পরে তাঁর আহার অতি অল্পই দেখা গেল।

রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার ঠিক তখন আমাদের বাড়ীর সামনে, রজু রজু দক্ষিণে। সেখানে বেটাছেলেরা মেয়েদের পার্ট প্লে করত। ঠাকুর আমাদের দোতলার হলঘরে বসে প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় দেখছেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁকে আহ্বান করে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ীর ভেতর পিসিমা, ঠাকুরের জন্যে ক্ষীরকমলা করেছেন, ঠাকুর তা খেতে ভালবাসতেন।

নরেনবাবু যখন বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ তখনকার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, প্রথম সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে। আট নম্বর রামতনু বোস লেনে আমার বাবা ও আমরা ভাড়া থাকতাম, স্বামীজীর মাতামহীর বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতে। (আমাদের মেছোবাজারের বাড়ী তখন ঘুচেছে)। স্বামীজী যখন ঐখানে তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আমরাও তাঁর কাছে যেতাম। তিনি ওখানে খেয়ে-দেয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করতেন! ১৮৯৮, তখন আমি আইন পড়ি। অনেক কথা গল্প হতো। তখন দিব্যি সন্ন্যাসীর চেহারা। দেশের ও পরদেশের তুলনামূলক আলোচনা করতেন—সমাজ, রাষ্ট্রগঠন, অর্থনীতি, সব বোঝাতেন। আমাদের চোখ ফুটোবার প্রয়াস পেতেন। দাদুর কথা কইতেন, ন-কাকার কুশল প্রশ্ন করতেন।

বেলুড় মঠে পরে স্বামীজীকে দু'চারবার দর্শন করে ধন্য হয়েছি। দেখলাম বড় গুরুগম্ভীর, মঠের সকলে বাঘের মত ভয় করছেন। আমরা সন্ধ্যের একটু আগে একবার নৌকা করে গেছি। দক্ষিণেশ্বর দিকের বৈঠকে পুলিন গান করবে—স্বামীজী নামছেন শুনে সব ভড়কে গেল। গান বাজনা সব বন্ধ, চুপচাপ—পাছে কি ভুলচুক হয়। বড় রাশভারি ব্যক্তিত্ব দেখলুম। স্বামীজী নীচে গঙ্গার ধারে এসে 'আয়াহি বরদে দেবি'—গায়ত্রী আবাহন মন্ত্র সুস্বরে আবৃত্তি করতে করতে উঠানে আমগাছের কাছে সমাধিস্থ—বাবুরাম মহারাজ ইত্যাদি তটস্থ। চক্ষু লাল জবা-ফুলের মত, যেন মদ খেয়ে টলছেন। তারপর ভাব কেটে গেলে, গাছতলায় পায়চারি করতে লাগলেন অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন। দূর থেকেই

দর্শন। যখন নরম হতেন মানুষ তো সামান্য কথা, কুকুর বেড়ালটাও ছুটে ভাব করতে যেত। তখন এক অনির্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি দশদিকে বিকীর্ণ হতো। তাঁর সম্বন্ধে সত্যিই বলা যায়—তিনি হাসলে ভুবন হেসে উঠত, আর কাঁদলে পৃথিবী কাঁদত! আমাকে একবার স্বাবলম্বন-শিক্ষা খুব দিয়েছিলেন। বললেন—'কারুর সেবা নিবি না। নিজে সব কাজ করবি। কোন কাজই ছোট নয়, মনে নিশ্চিত জানবি।' তাঁর আশীর্বাদে এখনও এই সাতষট্টি বছর বয়সে, হার্টের অসুখ নিয়ে সেদিন নিজ হাতে বেঁধে ছেলেপিলে সবাইকে খাওয়ালাম। তাঁর কৃপায় একরকম সব কাজই করতে পারি।

স্বামীজীর সঙ্গে পূর্বে এই যে 'এক মেটে' ভাব হয়েছিল, তারই ফলে মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে পরে ১৯১৩-১৪ সনে উদ্বোধনে দয়া করে স্থান দিলেন। তার আগে কর্মস্থল (জেলাজজ) বনগাঁয় নিজ বাসায় পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হই। পরিব্রাজক অবস্থায় হিমালয় ও পশ্চিমে, কত আশ্চর্য অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর খোকা মহারাজের জীবন রক্ষা করেন, সে সব কাহিনী, যা অপরে শুনলে বাড়ানো গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেবে,—আমার পাকা জজিয়তি মনেও গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। কৃপার কথা বলতে বলতে তিনি লাল হয়ে উঠতেন। আমরা তিন পুরুষে শ্রীরামকৃষ্ণ পদলুণ্ঠিত। দয়াঘন শ্রীমা আমার, নিজেই প্রস্তাব করে দীক্ষিত করলেন। দাদু, ও পিতৃদেবের ভাটপাড়ার কুলগুরুদেবকে দেখলে সত্যিই ভক্তিতে মাথা লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু তারপর ভাটপাড়ার গুরুকুল-ধারায় ভাঁটা পড়লো, আর সেরূপ মনে ধরার মত মানুষ পেলাম না। ঠাকুর-স্বামীজীর আবহাওয়া আমাদের বাল্যাবধি জীবনের উপজীব্য। সেই জন্যই আমরা একধারে গীর্জা ও ব্রাহ্মসমাজে, নববিধানে ও সাধারণের উপাসনায় বহুবার যৌবনে হৃদয়ের সহিত যোগ দিয়েছি ও লাভবান হয়েছি।

কি অপরিসীম স্নেহই ছিল রাখাল মহারাজের! ৫৭ নম্বরে, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুক শুনতে গেছি। লোকের ঠাসাঠাসি। একটি ছোট বেঞ্চে রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বসে। রাখাল মহারাজ আমাকে দেখেই একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসালেন—ঠিক যেমন ছোট ছেলেকে করে। অথচ আমি লম্বা চওড়া ও বয়স্ক। লজ্জা হলো আমার। আর উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের ছোট বৈঠকে কতবার গেছি। তিনি জানতেন যে, তাঁর সামনে আমি তামাক খাবো না। অপবে কেউ বুঝতো না, আস্তে আস্তে তামাকটি তৈরী করে রেখে পাশের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য উধাও হতেন। যুগপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিতেরা আমাদের স্নেহ ধারা ঢেলে দিয়েছেন, কিসে আমাদের চৈতন্য হয়। শরৎমহারাজ—Nature's gentleman—খানদানী ভদ্র।

[শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষের অনুজ কান্তিচন্দ্র ঘোষ, পরে যিনি ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছেন। সেকালের ঘোড়ার ট্রাম-চলা রাস্তার উপর এদের বাড়ি। এঁর বয়স যখন ১২, তখনকার একদিনের স্মৃতি—]

বর ও বরযাত্রীর ব্যাণ্ড-বাজনা ভঁপর-ভঁপর-ভোঁ, শোভাযাত্রা, এইসব দেখে এসেছি বরাবর হাঁ করে। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী, তখন শীতের আমেজ আছে, একদিন বিস্ফারিত চোখে দেখি—ওমা এক সুন্দর সুঠাম গেরুয়া বসন পরা সাধুকে নিয়ে মস্ত ডামাডোল—হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। বিপুল আনন্দের স্রোত। রাস্তায় লোক আর ধরে না। পাশ্চাত্য-বিজয়ী স্বামীজীকে নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে বাগবাজারের দিকে। ঠাকুরের পরমপ্রিয় পূর্ণচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে শোভাযাত্রা খানিক থামল। দাদা ( পূর্ণবাবু ) এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

[ রাজেন মুখুজ্জে, বাড়ি কেনাবেচার দালালী করতেন। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখোপাধ্যায় এর সম্পর্কের পিতামহ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন, এবং শ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছেন। এঁর স্বল্প স্মৃতি— ]

আমার মামাতো ভাই ছিলেন স্বামীজীর সতীর্থ। তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দেখতে গেছি ১৮৮৪ সনে। পর বৎসর মেট্রোপলিটান স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। বয়স ষোল। তারপর চার-পাঁচবার দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখি। তুলোপটিতে একবার, ও শ্যামপুকুরে পাঁচ-ছয়বার দর্শন হয়েছে। এ ছাড়া কাশীপুর বাগানে শেষ ছয়-সাতবার। কোন দিন কোন কথা কিন্তু হয়নি। ধর্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার সামর্থ্য আমার ছিল না। পায়ে হাত দিয়ে দেখেছি—তুলোর বস্তার মত নরম। আর একবার মনে পড়ে পায়ে হাত দিতেই যেন electric shock-এর মতো লাগলো। বিজলী স্পর্শে চমকাবার মত।

কাশীপুর বাগানে পরমহংসদেব পীড়িত। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার কথা বলতে নিষেধ করেছেন। ওর কাছে বসে আছি। শশী মহারাজের তাড়িয়ে দেবার ফিকির। হুঁ-হুঁ শব্দ করে আঙুল দিয়ে ইসারা করে সরাতে চাইলেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে তাঁকে নিষেধ করলেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের সপ্তাহ খানেক পূর্বে বেলুড় মঠের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে আমার কাঁধ ধরে বললেন—'তুই কি ব্রাহ্মণের ছেলে? গায়ত্রী করিস্?'

আমি বললাম—'করি না।' তিনি বললেন—'তবে বামুন কিসের? গায়ত্রী করবি। সাধু হওয়া বড় শক্ত। মেয়ের প্রলোভন, মোহ—বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করবি। তুই ঠাকুরকে দেখেছিস তোর চেষ্টা করলে শিগগীর হবে।'

[ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের যতীন্দ্রবাবু বলেন— ]

ঢাকায় নামিয়া ভক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের কুশল প্রশ্ন অন্তে জানলেন যে, দাসের পুত্রের অসুখ। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন —"আমি যদি গৃহস্থ হতাম, আর আমার ছেলের যদি অসুখ থাকতো এবং সন্ন্যাসীর আগমন হতো, সন্ন্যাসীকে বলতাম, আপনি এখন ফিরে যান, আপনি ফিরে গেলে আবার আপনাকে পাবো, কিন্তু ছেলে গেলে ছেলে আর ফিরে পাব না। মন প্রাণ দিয়ে আমি ছেলেকেই এখন দেখব। অন্যদিকে নজর দেবার অবকাশ এখন আমার নেই।" স্বামীজী অপরের অবস্থা প্রাণ

দিয়ে বোধ করতে পারতেন। নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলতে পারতেন।

শেষে একদিন ঐ ছেলের মামার বাড়ী—ঢাকার সন্নিকটেই—গিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করবার জন্য অনুরুদ্ধ হলে স্বামীজী বিনয়সহকারে বলেছিলেন, "আমার কি শক্তি আছে? আমার আশীর্বাদে কি হবে?" কিন্তু পরম আগ্রহবান জনকের অনুরোধে একদিন গিয়ে রোগশয্যায় শায়িত বালকের বুকে মাথায় আশিস হস্ত বুলিয়ে দিলেন।

এই সময় গুপ্ত মহারাজ ও কানাই মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী কয়েকজন মহিলাসহ লাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্র স্নানে যান। এদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য স্বামীজী একখানি বজরায় সেবিকাদিসহ ঢাকা থেকে জলপথে বুড়ীগঙ্গা দিয়ে ঐস্থানে হাজির হন। এই ভ্রমণ তাঁর খুব উপাদেয় বোধ হয়েছিল।

[ স্বামীজীর প্রসঙ্গে যোগীন-মার কয়েকটি টুকরা কথা ]

আহা! সেই সদাহাস্যময় মুখখানি মনে আসছে। যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বেলুড় থেকে সকাল সকাল অন্নপূর্ণার ঘাটে নেমে, আমাদের বাড়ী এলেন। ফটক পেরিয়ে বারবাড়ীর উঠান থেকেই, ডেকে-হেঁকে বলছেন, "ও যোগেন-মা, আজ বেলায় কাজ সেরেসুরে এসে তোমার এখানেই বসবো। ভাল করে এই এই রাঁধবে।"

আবার একদিন বাবুরামকে রঙ্গ করে বলছেন, "দ্যাখো ভেঁপু, তোমার ও খালি 'হায়রে লিতাই, হায়রে লিতাই', আমার এ মঠে চলবে না। এখানে পড়াশুনো করতে হবে।"

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একদিন গল্পে গল্পে আমাদের বলেছিলেন, "ওগো, অত নাম-জপ সম্মান-খ্যাতির কি আমার শক্তিতে হয়েছে? না, ওসব হজম করাই আমার ক্ষমতা? আমি সেই মস্ত বড় সভায় বলতে দাঁড়িয়েই—অতলোক একসঙ্গে, গিস্-গিস্ করছে দেখে কী যে বলব কিছুই বুঝতে পারিনি। কখনও অত লোকের সামনে কথা বলা অভ্যেস ছিল না। একদম তৈরী ছিলুম না। আমার বাহ্যজ্ঞান চলে গেল। আর দেখি কি, এই শরীরটার ভিতর ঠাকুর এসে, যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যখন বলা শেষ করে, বসে পড়লুম, তখনও আমি জানি না, আমি কি বললুম!"

[ গোলাপসুন্দরী দেবী ( গোলাপ-মা ) বলেন— ]

১৯১০, বাগবাজারে মায়ের বাড়ী। তখন আনকোরা নতুন ছোট্ট বাড়ী। বিজলী জ্বলেনি, মার জীবন নিঃশব্দে জ্বলত। দিবাভোজনে পরিবেশন করতে করতে গোলাপ-মা হেসে কুটোকুটি। "দ্যাখো যখনই চিংড়ীমাছ দিয়ে পুঁইশাক হয়, তখনই নরেনকে মনে পড়ে। আহা, সে বড্ড পছন্দ করত। একগাল হেসে বলতো, 'গোলাপ-মা—জুতো, জুতো! এর আর তুলনা নেই।' "

[ কুসুম দেবী গোলাপের মার শিষ্যা। গোপালের মার পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে সুপরিচিত ছবি আছে, তাতে পাখা হস্তে মহিলাই কুসুম দেবী। এঁর স্মৃতি ]

আমার তখন বয়স তের মাত্র। শ্বশুরবাড়ী পাণিহাটী। রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়া উৎসব দেখতে ঠাকুর গৌরাঙ্গের মত পথঘাট আলো করে প্রাণ মাতিয়ে নৃত্য কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন। আমি সেকালের ঘরের কনে-বৌ। ভাল করে দর্শন ঘটল না। ঐ দূর থেকে আবছা আবছা। সে খেদ পূর্ণ করলেন স্বামীজী। আমাদের কলকাতায় বাপের বাড়ীতে স্বামীজী অনেকবার এসেছিলেন। আমার পিসতুতো বোন ভাবিনী দেবী। সে তখন এইখানে আমাদের সঙ্গে। সে খুব ভাল রাঁধতে পারত। ভাগ্য খুব, ঠাকুরকে রেঁধে খাইয়ে খুশী করেছে।

আমাদের বাড়ীতে স্বামীজী কয়েকবার আপনার লোকের মত খেয়েছেন। কলায়ের ডাল ও কৈ মাছের ঝাল পছন্দ করেছিলেন মনে আছে। আমাদের দু'জনেরই তখন কন্যা বিয়োগে মন কাতর। তিনি সান্ত্বনা দিলেন। বাংলা যোগবাশিষ্ঠ পড়তে বললেন। সংসারটা খেলা মাত্র— এই বোধ আনবার চেষ্টা করতে বললেন। আমরা দু'জনে বিধবা তখনই। নির্জলা একাদশী সইবে না, অল্প কিছু শরবত, ডাব, মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করে খেতে বললেন।

তাঁর শরীর খারাপ। বেলুড়ে আমরা কয়েকজন মেয়ে তাঁকে দেখতে গেছি। তিনি নিজে কথা কইলেন না বেশী। শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে বললেন। আমাদের খেতে বেলা হয়েছিল। একটু হাতে প্রসাদ পেয়েই চলে আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবানন্দ মহারাজ ও স্বামীজীর অনুরোধে আমাদের ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ বসে পেয়ে আসতে হলো। এর জন্য সন্ন্যাসীদের আবার চালে ডালে চড়াতে হলো, তাও বুঝলাম। স্বামীজী নৌকা পর্যন্ত এসে আমাদের বিদায় দিলেন। বললেন, এর পর যখন আসবে, আগের দিন একখানা পোস্টকার্ড লিখে জানালে প্রসাদ প্রস্তুত থাকবে। জানতাম না যে, সে-ই আমাদের শেষ দর্শন।

কেদারবদরী যাবার ইচ্ছা তাঁর জীবদ্দশাতেই আমার ছিল। তাঁকে জানানোতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বললেন—'খুব ভাল। মন ভাল হবে।'

কিন্তু তিনি থাকতে থাকতে আর আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। হঠাৎ তাঁর দেহান্ত হলো।

এর আগে কাশীতে গোপাললাল ভিলাতে তাঁর কাছে গেছি। আমরা ভাগ্যযোগে কাশী রয়েছি। তিনি ঐ বাগানের গাছের ফুল ছিঁড়তে বারণ করলেন। দেখা হবার আগে কয়েকটি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। বললেন—'গাছেই যে পূজো হয়ে থাকে। ছিঁড়লে কেন ?'

আমরা সেই দলে কয়েকটি বিধবা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে। কে কি কাজ করে দিন কাটায়, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই একে একে নিজ নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। শেষে তিনি জোরের সঙ্গে বললেন—'কাশী তো ঘুমিয়ে

রয়েছে। শিবও ঘুমোচ্ছেন। তোমরা সাধনার দ্বারা তাঁকে জাগাও! কাশীনাথকে জাগাও! ফুল-চন্দন দিয়ে ঠাকুরপুজো ছাড়ো। গুরু-মূর্ত পরিষ্কার করে এইবার ঠাকুরসেবায় লাগো দেখি, নতুন ঢঙে।' রোগীর সেবায় নারায়ণ-পূজা ভাবটি আমি তাঁরই কৃপায় জীবনে কার্যে যথাসাধ্য পালন করে এসেছি।

[ মিরাটের ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা স্বামীজীদের পরিব্রাজক অবস্থার মিরাট পর্বমধ্যে সঙ্গলাভ করেন। পরে তিনি দেবেন্দ্র মজুমদার কর্তৃক দীক্ষিত হন। তিনি বলেন— ]

আমরা ছোট তখন। আমাদের পিসিমা বলতেন, 'তোমরা ওঁদের বিরক্ত ক'রো না। ওঁরা শান্তভাবে আপনাদের ধ্যান-পাঠ করছেন।' স্বামীজী কিন্তু আমাদের খুব ভালবাসতেন, কাছে ডাকতেন। তখন আন্দাজ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়। স্বামীজী বাবার সামনে তামাক খেতেন না। বাগানের দিকে একধাবে একঘরে তক্তাপোশের উপর বসে খুব তামাক খেতেন। হাসতে হাসতে বলতেন, 'বাবাকে যেন বলিস নি।' তখন তিনি তপস্বী, পরন্তু সদা আনন্দময়। আমাদের দুবোনকে, নিকষা মাসী, শূর্পণখা মাসী বলে খেপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন,—'তোরা চটিস্ কেন? ওরা দুজনে কি কম? স্বয়ং রাম যাদের নাক কেটেছেন; বিভীষণ একজনের ভাই।' চাটনি পরিবেশন সময়ে মজা করতেন—'দেখিস যেন লাল না পড়ে দিতে দিতে।'

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুড়ী দিয়ে গান গাইতেন। আলু কলাইশুঁটি সেদ্ধ জামবাটি ভরে খেতেন শীতকালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে। এই সময় গঙ্গাধর মহারাজকে আমরা ছোট স্বামীজী বলতাম। ছিপছিপে চেহারা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি। খড়ের গাদার উপর উঠে একলাটি বসে থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন "কেন একলা বসে আছে জানিস? ওর মা-মাসীর জন্যে চুপি চুপি কাঁদছে রে! কেউ না দেখতে পায়! কান্না কেন বাপু? দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়। তারা বোধ করি যেতে মানাই করেছে। আর এখান থেকে যাবে বা কি করে? এমন খ্যাঁটের বহর কোথা পাবে?" শুনে হো হো হাসি সবাই মিলে। আমরা সবাই মিলে যেন একটা সুবৃহৎ পরিবার। সাধু বলে সঙ্কোচ হতো না, পিসিমার হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও। ঘরের লোক, আপনজন মনে হতো।

স্বামীজী লাইব্রেরী থেকে বড় বড় বই আনাতেন, একদিনেই ফেরত দিতেন। একবার গ্রন্থাধ্যক্ষ এসে বললেন, 'মশাই, এ সব বই একমাসে কেউ শেষ করতে পারে না। আর আপনি এ কি করছেন?' স্বামীজী বললেন, "এসব বই থেকে আপনাদের যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।" তাঁরা পরখ করে অবাক্।

স্বামীজীর দুখানি গাওয়া গান মাঝে মাঝে মনে আসে—'ভজন পূজন কিছুই নাহি জানি। জানি মা তোর চরণ সার।'

'পরাণ পুতুল মোর ওমা হর রমা।'

আমাদের বাড়ীতে বহু ওস্তাদ আসতেন, আসর হতো। বাগানে আলাদা ঘরে ওঁদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। বাবা বলতেন, 'আপনারা জল তুলবেন না ইঁদারা থেকে। আগে শরীরটা সব সেরে নিন।'

[ বলরাম বসুর প্রথমা কন্যা কেষ্টময়ীর প্রথমা কন্যা, দৌহিত্রী দলের প্রধানা শ্রীমতী রাধা তখন খুকী—আট নয় বছর বয়স। তিনি জানিয়েছেন— ]

স্বামীজী যেন আমাদের খেলাঘরেরই একটি পরম সুন্দর পুতুল। অন্য পুতুলকে খোকাখুকুরা খাবার দেয়, কিন্তু এই জীবন্ত পুতুল? মজার বালিকাদের টোস্ট মাংস খাওয়াতেন। আমোদ করতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মামাবাবু ( রামকৃষ্ণ ) সকলকে নিয়ে স্বরচিত গীত গাইতেন—"তাথৈয়া, তাথৈয়া নাচে ভোলা," হলঘর সরগরম। মাকে ( কৃষ্ণময়ী ) বলেছিলেন—( মার মেয়ের পর মেয়ে, ছেলের ভারি সখ ) 'তুই ভাবছিস কেন? তোর ছেলে হবে।' তাঁর দেহান্তের বহু পরে তা ঘটে।

[ শ্যামবাজার নিবাসী মহিলা। ডাকনাম মেনী। ইনি স্বামীজী-শিষ্য গৌড়ের দিদি। এঁর স্মৃতি— ]

বলরামবাবুর বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ঘরের লোকের মতন ব্যবহার। তখন নয়-দশ বছরের মাত্র মেয়ে আমি। স্বামীজী তখনও বিলেত-টিলেত যাননি। একদিন বলরামবাবুর বাড়ীর ভিতরের দোতলার বারান্দায় আমরা সব ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি খেলাধুলো করছি। স্বামীজী ভিতরে এসেছেন। কী তাঁর তখন মনে হলো, কে জানে, আমি তখন মন্তরও বুঝি না, ঈশ্বরও বুঝি না, ভজন ধ্যান জপ এসব কিছুই বুঝি না, হঠাৎ তিনি আমাকে ডাকলেন, সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বলে দিলেন এবং আজ্ঞা করলেন—'তুই এখন থেকে রোজ, এইটি জপ করবি।' এই তাঁর কাছ থেকে আমার পরম পাথেয় পাওয়া। আমার দীক্ষা হওয়া।

[ শ্রীমতী গৌরমণি বলেন— ]

যোগীন পিসিমার ( পাড়া সুবাদে ) সঙ্গে বলরাম-গৃহে গেছি। স্বামীজী গান গাইছেন—'চিন্তায় মম মানস হরি, চিদ্ঘন নিরঞ্জন।' অপূর্ব কণ্ঠ। আমি গোপালের মার শিষ্যা, এই পরিচয় বলাতে দু'হাত নেড়ে বললেন, "খুব ডাকো, খুব ডাকো।" যোগীন-পিসিমা বললেন, 'তুমি শক্তি দাও।' স্বামীজী বললেন, "তাঁরই শক্তি, তিনিই চতুর্দিকে ছড়াচ্ছেন, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। কুড়িয়ে নাও, কুড়িয়ে নাও, যদি বাঁচতে চাও, যদি মঙ্গল চাও।"

[ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামী সারদানন্দের ভাই, অল্প বয়সে জাপান হয়ে মার্কিন দেশে যান। যাবার আগের দৃশ্য তাঁর কথায়, ]

স্বামীজী বেলুড় মঠের লনে সিংহের মত পায়চারী করতে করতে বলছেন—

'যা—বাইরে। চোখ ফুটুক। ঘুরে দেখে আয়। খুব কাজ কর্। কিন্তু ভারতের spirituality ছাড়িসনি। তাহলেই মুসকিলে পড়বি। (সারদানন্দের দিকে ফিরে) কি রে সর্‌তা, তোর এই ভাইটাকেও সাধু হতে বল্‌না? সারদানন্দ বললেন,—আমি কি জানি, ওর যখন সময় হবে—হবে।

[ চূর্ণীর মূর্তি-গঠন-বিদ্যায় সুদক্ষ দীর্ঘজীবী—১৯২৪ সালে বয়স ছিল প্রায় একশ সাত বৎসর ] শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল মহাশয় স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন— ]

'দেখ্ জীবনে অনেক আসরে ঢের শোনবার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু বাপু, তেমনটি পাখোয়াজ!—মিঠে বড় মিঠে!—বাজনা আর কারোর হাতে শুনিনি। আর তাঁর শিল্প দৃষ্টি খুব পাকা ছিল সব সময়ই। আমাকে খুব ভালবাসতেন, যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।

## স্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষ্য-ভক্ত ও অনুরাগী

### স্বামী সদানন্দ

১৮৮৮ সালের শেষের দিকে স্বামীজী পরিব্রাজক হয়ে বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বারে উপস্থিত হন। পথশ্রমে ও অনাহারে ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে বসে থাকতে দেখে স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত মশায় মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি এই সৌম্যদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভায় আকৃষ্ট হলেন এবং স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর ক্ষুৎ-পিপাসার প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষুধার কথা প্রকাশ করলেন। শরৎবাবু তাঁর বাসায় স্বামীজীকে নিয়ে যান এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আহারের আয়োজন করেন। স্বামীজীও অত্যধিক ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। তাই নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী পরমতৃপ্তি সহকারে ভোজন করলেন—ক্ষুধার হল নিবৃত্তি, ক্লান্তির হল অবসান।

শরৎচন্দ্র গুপ্তকে সৌম্য ও সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী স্বামীজীকে দেখে এবং আলাপ করে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগে বিনয়াবনত হন। স্বামীজীকে সেখানে কিছুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করেন।

পরে শরৎ বাবু স্বামীজীর কাছে কিছু উপদেশ শুনতে চাইলে 'বিদ্যাসুন্দরের' মালিনীর একটি গান স্বামীজী গেয়ে শোনালেন ঃ

'বিদ্যা যদি লভিতে চাও
চাঁদমুখে ছাই মাখো,
নইলে এই বেলা পথ দেখো।'

তরুণ অনুরাগী ভক্ত শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ বেশভূষা পরিত্যাগ করে ভস্ম মেখে উপস্থিত এবং সন্ন্যাসী বেশে স্বামীজীর সঙ্গে সর্বস্ব ত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত হন।

স্বামীজী আবার ভারত-ভ্রমণে বের হয়ে পড়েন। স্বামীজীর নির্দেশে শরৎবাবু ভিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। স্বামীজী খুশিমনে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। হাতরাস ত্যাগ করার সময় স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দেন। স্বামীজীর সঙ্গে শরৎবাবু একবার হৃষীকেশ যাত্রা করেন। স্বামীজী শরৎবাবুকে সন্ন্যাস-নাম দেন 'সদানন্দ'। তাঁর অসুস্থতার সময় স্বামীজীর সেবায় তিনি সুস্থ হন ও স্বামীজীর সেবায় বিমুগ্ধ হন। হৃষীকেশে শুরু হয় তাঁর কঠোর সাধনা। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁরা বরাহনগর মঠে ফিরে আসেন। তারপর সব কিছু ত্যাগ করে সদানন্দ বরাহনগর মঠে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। বিদেশ-প্রত্যাবর্তন বা অন্যান্য সময়েও স্বামীজী সব-সময় তাঁকে সঙ্গী হিসেবে নিতেন—এই নিবিড় সম্পর্ক ছিল উভয়ে।

১৮৯৮-তে স্বামী সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮-তে প্লেগ-মহামারীর সময় সেবাকাজে নিবেদিতাকে তিনি সহায়তা করতে থাকেন। প্লেগ-সেবা সমিতির সম্পাদিকা ও অধ্যক্ষা ছিলেন স্বয়ং নিবেদিতা। বিপজ্জনক সংক্রামক এই রোগে সদানন্দ সবার আগে সেবার জন্য এগিয়ে আসেন। শিবজ্ঞানে জীব সেবা—স্বামীজীর সেই চিরন্তন বাণী ও আদর্শকেই যেন কর্মে রূপায়িত করতে তাঁর এই কর্মোদ্যোগ।

উত্তর-ভারত ভ্রমণেও তিনি স্বামীজীর সঙ্গী হন। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০-তে মায়াবতী গমন করেন—স্বামীজী কাপ্তেন সেভিয়ারের পরলোক গমনে শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দান করার জন্য। সঙ্গী হন সদানন্দ মহাশয়। নিবেদিতার সঙ্গেও তিনি ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করেন কর্মব্যাপদেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 'গুপ্ত মহারাজ' স্বামী সদানন্দ সম্পর্কে এই পর্যন্ত তথ্যই যথেষ্ট।

### আলাসিঙ্গা পেরুমল

দাক্ষিণাত্যের যে-সকল যুবক স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অনুগত শিষ্য হয়েছিলেন, আলাসিঙ্গা পেরুমল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। পরিব্রাজক হয়ে স্বামীজীর মাদ্রাজে থাকাকালীন সময়ে পেরুমল তাঁর সংস্পর্শে আসেন। মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং হিন্দু-ধর্মের পুনর্জাগরণ ও প্রচার বিষয়ে, বিশেষতঃ শিকাগোর ধর্ম মহাসভায়—বিশেষ উৎসাহ দেন স্বামীজীকে। মহাসভা-গমনের পাথেয় সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেন পেরুমল।

কর্মের প্রথম জীবনে আলাসিঙ্গা একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ও শিক্ষকতায় তাঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। স্বামীজীর শিষ্য হয়ে সব ত্যাগ করে গুরুসেবায় নিয়োজিত হন। পাথেয় সংগ্রহকালে তিনি হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, রামনাদ গমন করেন। স্বামীজীর বিদেশ গমনকালে বোম্বাই-এ পেরুমল তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা যাত্রার পথে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে অনেকগুলি পত্র লেখেন—তা থেকে তাঁর প্রতি বিবেকানন্দের অনুরাগ উপলব্ধি হয়। তাতে তিনি আলাসিঙ্গাকে দৃঢ়চিত্তে, একনিষ্ঠভাবে, সাহসিকতার সঙ্গে মানবসেবার উপদেশ দান করেছেন।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য—আলাসিঙ্গাকেই স্বামীজী বিদেশে অর্থকষ্ট ও পরে তাঁর সাফল্যের খবরাখবর জানাতেন। পরে ৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪-তে লেখা চিঠিতে স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। পরে সেইমত কাজ করেন পেরুমল, এবং স্বামীজী দেশে ফিরে তার কাজে সাহায্য করেন। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজী পেরুমলকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ থেকে ২০শে নভেম্বর ১৮৯৬-এর মধ্যে প্রায় ৪১টি পত্র লিখেছেন। সে সকল পত্রের মূল

বিষয়ই হচ্ছে স্বামীজীর কাজের রূপায়ণে উদ্দীপনা সঞ্চার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের পথ-নির্দেশ।

বিদেশ থেকে প্রথম স্বামীজী ফিরলে পেরুমল তাঁর সঙ্গে কলকাতা আলমবাজার মঠে আসেন। পরে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং গেলে পেরুমলও তাঁর সঙ্গী হন। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদনা কাজে তাঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। উপদেশনায় ছিলেন স্বামীজী স্বয়ং।

পরিশেষে স্বামীজী তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে আলাসিঙ্গা-সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন—তা উল্লেখ করা যেতে পারে—"আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প, অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প···।'—এর থেকেই আলাসিঙ্গার যথার্থ পরিচয়টি পরিস্ফুট হবে।

**স্বামী কৃপানন্দ ( ল্যাণ্ডসবার্গ )**

স্বামী কৃপানন্দের পূর্বনাম ছিল হেরলিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ। ইনি ছিলেন রাশিয়াবাসী ইহুদী, পরে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। আমেরিকায় স্বামীজীর তিনজন সন্ন্যাসী-শিষ্যের ইনি ছিলেন অন্যতম। সহস্রদীপোদ্যানে ইনি সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। স্বামীজীর ধর্ম-প্রচার-কার্যে ইনি বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন স্বামীজীকে ছেড়ে গেলেও, পরে ব্যাকুল-চিত্তে আবার ফিরে আসেন। আমেরিকায় কিছুদিন স্বামীজী তার গৃহে ছিলেন। মিস্ হেলকে লেখা চিঠিতে তিনি ল্যাণ্ডসবার্গের সাহসিকতা, মহত্তম ব্যক্তিত্ব এবং অকপট-চিত্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ল্যান্ডসবার্গ নিউইয়র্কের একটি খবরের কাগজে কাজ করতেন। সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে স্বামী কৃপানন্দ আমেরিকায় সফলভাবে বেদান্ত-প্রচার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, বিভিন্ন শহরে সভা-সমিতি করে বেদান্ত-দর্শনকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁরা এই কাজে নিযুক্ত থেকে অনেকগুলো নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কাজে নিরন্তর উৎসাহ যোগাতেন স্বামীজী। সুইজারল্যান্ড থেকে লেখা একটা চিঠিতে স্বামীজী লেখেন ঃ

'পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও। মুহূর্তের জন্য ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না—তা হলেই আলো দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী, কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

১৮৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় কৃপানন্দের যে চিঠি প্রকাশিত হয়, তাতে এই সময় স্বামীজীর প্রভাব কতদূর প্রসারিত হয়েছিল ও বেদান্তপ্রচার কি সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, তা জানা যায়।

**'কিডি'**

ইনি ছিলেন সিঙ্গার ভেলু মুদালিয়র, মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, হিন্দুধর্মের কঠোর সমালোচক। পরিব্রাজক হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করছেন—তখন তাঁহার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯২ সালে স্বামীজীর কন্যাকুমারিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মাদ্রাজে সিঙ্গারভেলু তাঁর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। আলাপান্তে স্বামীজীর চিন্তাধারার গভীরতায় মুগ্ধ হন ও সব পূর্ব-ধারণার পরিবর্তন ঘটে। স্বামীজীর অনুরক্ত শিষ্য হয়ে ওঠেন। নাস্তিকতার পরিবর্তে আসে ঈশ্বরে আস্থা, আস্তিকতা। পরে স্বামীজী তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'Caesar said, 'I came, I saw, I conquered'. But Kidi came, he saw, but he was conquered.' অর্থাৎ কিডি জয় করতে এসে নিজেই বিজিত হল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ এবং 'কিডি' নামে সম্বোধন করতেন। এই নামটির একটি সুন্দর তাৎপর্য আছে। দক্ষিণভারতে তামিলভাষায় 'কিডি' শব্দের অর্থ 'পাখি'। সিঙ্গারভেলু পাখির মতো অল্প আহার করতেন। তাই মজা করে স্বামীজী তাঁকে 'কিডি' সম্বোধন করতেন ও উভয়েই আনন্দ পেতেন।

তিনি স্বামীজীর কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। বিবেকানন্দেরই নির্দেশে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে পত্রিকার বিনাবেতনে ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন।

স্বামীজী কিডিকে লেখা চিঠিতে শিক্ষা, ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে উচ্চভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামীজী বলছেন ঃ

(১) শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।

(২) ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।

এত স্বল্প ও সহজ কথায় এত নিবিড় ও গভীর তত্ত্ব তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এক সময়ে কিডি সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, স্বামীজীর উপদেশে তা স্থগিত থাকে।

প্রথমবার বিদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় স্বামীজীর সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে অতিবাহিত করতেন দিনগুলো। তিনি স্বভাবে ছিলেন খুবই সরল ও আমোদপ্রিয়, তাঁকে নিয়ে মঠের সবাই বেশ আনন্দ করতেন। তিনি মঠের ভক্তদেব জন্য 'রসম্' ও 'করম্বু'—দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য রান্না করতেন। স্বামীজীর দার্জিলিং গমনকালেও তিনি সঙ্গে যান।

বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস না নিলেও—মনে-প্রাণে ছিলেন ত্যাগের আদর্শ। শেষ জীবনে পুরোপুরি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন-যাপন করতেন—পরলোকগমন পর্যন্ত।

**স্বামী বোধানন্দ**

স্বামীজীর যে তিনজন সন্ন্যাসী-শিষ্য আমেরিকা গিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন—স্বামী বোধানন্দ তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ব নাম ছিল হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হাওড়া জেলার বাগান্ডা গ্রামে ১২৭৭ সালে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী বিমলানন্দ (খগেন্দ্রনাথ) ছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই।

১৮৮৬ সাল নাগাদ স্বামীজী যখন বহুবাজার ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন—তখন হরিপদবাবু সেখানকার ছাত্র ছিলেন। তখনই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে-মাধুর্যে আকৃষ্ট হন তিনি। আর তখন থেকেই তিনি মনে মনে সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। স্বামী বোধানন্দ নিজের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে আমার যোগদান' নামক প্রবন্ধে এবিষয়ে নিজেই বর্ণনা করেছেন।

১৮৯০ সালে তিনি জগৎবল্লভপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। রিপন কলেজেই পড়াকালে তাঁর 'শ্রীম'র সঙ্গে পরিচয় হয় ও পরে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ হয়, এরও পরে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভ করেন। এখানে বিভিন্ন ধর্মীয়-সভায় আলোচনায় যোগদান করতেন।

রিপন কলেজে বি-এ পাশ করে জগৎবল্লভপুরে এক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আলামবাজার মঠে উৎসব দেখতে আসেন। স্বামীজী এই সময়ে গোপাললাল শীলের বাগান বাড়িতে থাকতেন। একদিন হরিপদ স্বামীজীকে দেখতে যান। যেন উভয়ে বহুদিনের পরিচিত—এইভাবে দুজনে আলাপচারি হলেন। সেখানেই তাদের সন্ন্যাস-নেবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজার দিন স্বামীজী চারজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেন এবং দু-একজন শিষ্যকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন। এ সময়েই হরিপদর ১৮৯৭ সালে আলমবাজার মঠে যোগদান ও ১৮৯৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ সমাধা হয় এবং তিনি 'স্বামী বোধানন্দ' নামে পরিচিত হন।

এরপর বোধানন্দ তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়ে স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ সালে বেদান্ত প্রচারে আমেরিকায় গমন করেন। ১৯২২ সালে নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের স্থলে বেদান্ত-প্রচারে নিযুক্ত হন। এখানেই আজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯২৩-শে একবার ভারতে এসেছিলেন। ১৯৫০ খৃ-এর ১৮ই মে (১৩৫৭ সালের ৪ঠা জৈষ্ঠ) নিউইয়র্কে তিনি দেহত্যাগ করেন।

**স্বামী শুদ্ধানন্দ**

স্বামী শুদ্ধানন্দের পূর্বনাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি কলকাতার এক অভিজাত বংশে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী ছিলেন নিষ্ঠাবান, উদারচেতা ও ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। ছাত্রাবস্থায় দুবার গৃহত্যাগ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিটি কলেজে এফ. এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষায় না বসে গৃহত্যাগ করে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দেন।

কলেজে পাঠকালে বন্ধুবর্গের সঙ্গে ধর্মালোচনায় ধর্মানুরাগ জন্মে। ১৮৯০ সালে ১৮ বছর বয়সেই তিনি বরাহনগর ও কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠের সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যলাভ করেন।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে চারিদিকে নতুন উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যায়। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর সংবাদ ও তাঁর বক্তৃতা পাঠ ক'রে সুধীরচন্দ্র স্বামীজী-সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনেছেন।

স্বামীজী সমবেত দর্শকবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধীরচন্দ্রের হৃদয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। স্বামীজী ঘোড়ার গাড়িতে রিপন কলেজের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন সুধীরও তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। তারপর সুধীরচন্দ্র স্বামীজীকে ভালভাবে দেখলেন—স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানে দীপ্ত, ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, জ্যোতি যেন ফেটে বার হচ্ছে, তবে মুখমণ্ডলে ভ্রমণের ক্লান্তি।

স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কবছে। আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটাকেই manifest করছে।

কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান বাড়ীতে থাকাকালে সুধীর স্বামীজীকে দর্শন করতে যেতেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করতেন, উপনিষদ কিছু পড়ছ? বলতেন, হ্যাঁ দেখছি। স্বামীজী তখন তাঁকে কঠোপনিষৎ হতে আবৃত্তি করতে বললেন, কিন্তু মুখস্থ না থাকায় সুধীর বললেন, ওটি মুখস্থ নেই। তিনি তখন গীতা থেকে কিছু আবৃত্তি করতে স্বামীজী তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

স্বামীজী যখন মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন, তখন সুধীরচন্দ্র ছিলেন লিপিকার।

১৮৯৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে সুধীরচন্দ্র আলমবাজাব রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেন। এবং ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হন। ঐ বৎসরই তিনি স্বামী নিবঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন, তখন থেকেই তাঁর নাম হয় স্বামী শুদ্ধানন্দ।

স্বামীজীব গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ শুদ্ধানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দ্বিতীয় কীর্তি স্বামীজীর আদেশে Diary করা। ঐ Diary থেকে মঠের সমস্ত তথ্য জানা যায়।

১৮৯৯ খৃঃ উদ্বোধন পত্রিকার সূচনা হয়। তখন তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারীরূপে সম্পাদনায় যোগ দেন। পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ উদ্বোধনের দ্বিতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯২৭ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে ১৯৩৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্ব বহন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ঐ পদে থাকাকালীন ১৯৩৮ খৃঃ ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন।

**হরিদাস বিহারীদাস দেশাই**

বাবু হরিদাস বিহারীদাস দেশাই জুনাগড়ের দেওয়ান ছিলেন। তাই স্বামীজী তাঁকে 'দেওয়ানজী সাহেব' এবং 'হরিদাস ভাই' বলে সম্বোধন করতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করে জুনাগড়ে দেওয়ানজীর অতিথি হন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গ লাভে মুগ্ধ হন। এবং প্রতি সন্ধ্যায় স্বামীজীর সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত আলাপ করে কাটাতেন। কোন কোন দিন কিভাবে কাটত কেউ বুঝতে পারত না। জুনাগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীর উদারমত সমূহ, ধর্ম-পরায়ণতা, প্রাণস্পর্শিতা, বাগ্মিতা, এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

জুনাগড়কে কেন্দ্র করে স্বামীজী চতুর্দিকের স্থানগুলি দর্শন করেন। গীর্নার-পর্বতে খাপড়া-খোদির গুহা ভৈরো ঝাম্পা এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে স্বামীজী অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জুনাগড়ে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় নিয়ে স্বামীজী ভুজ-রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দেওয়ানজী স্বামীজীর মাতার সঙ্গে এবং মঠের সাধুদের সঙ্গে দেখা করেন। দেওয়ানজী স্বামীজীর মা ও ভাইদের দেখতে গিয়েছিলেন বলে ২৯শে জানুয়ারী ১৮৯৪, শিকাগো হতে স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করে দেওয়ানজীকে পত্র লেখেন। মায়ের প্রতি স্বামীজীর গভীর ভালবাসার কথা প্রকাশ পায়। মঠের সাধুরা এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেওয়ানজীর যথোচিত সম্মান ও যত্ন করায় ১৮৯৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ শিকাগো হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে স্বামীজী শিক্ষা বিস্তারে ভারত-বাসীর কর্তব্য নির্দেশ করছেন ঃ

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থী। আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নেই। কারণ মূর্তি পূজায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে তাদের মনে এমন ধারণা জন্মেছে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হবার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করতে হবে।

**অধ্যাপক রাইট**

ডক্টর জন হেনরী রাইট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বোস্টনের নিকটে 'ব্রিজি মেডোজে' স্বামীজী যখন অবস্থান করেন, তখন অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সমগ্র আমেরিকাবাসীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করার এটাই একমাত্র পথ।

রাইট সাহেব বলেন, স্বামীজী, আপনার নিকট পরিচয়-পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার আলো দেবার অধিকার দেওয়া একই কথা নয়। তাঁর সঙ্গে ঐ ধর্মমহাসভার অনেক

বিখ্যাত ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির জানাশোনা ছিল। অধ্যাপক রাইট সভার কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি লিখে দিলেন, বিশেষতঃ প্রতিনিধি নির্বাচন সমিতির সভাপতিকে লিখলেন, ইনি এমন একজন ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকদের বিদ্যা একত্রে করলেও তাঁর বিচার সমান হয় না।

অধ্যাপক রাইটের সংগে স্বামীজীর অত্যন্ত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্বামীজী কয়েকবার তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

২রা অক্টোবর, ১৮৯৩ খৃঃ লেখা পত্রে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অপূর্ব কথা আছে ঃ

আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, তিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার শৈলে কিংবা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন এবং দেখাবেন, সাহায্য করবেন। আমি জানি তিনিই তাঁদের পাঠিয়েছেন—আমি শুধু নির্দেশ পালন করে যাব। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ; তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী যখন ক্লাস করতেন, তখন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক রাইট ছিলেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে এই অধ্যাপকদের নিয়ে তামাশা করতেন। কৌতুক করে তাঁকে 'ডকি' বলতেন। অধ্যাপক রাইট শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন, প্রতিবার আলোচনার পরে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে স্বামীজী, শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, আমি ব্রহ্মা, আমি শাশ্বত। পরে যখন ডক্টর রাইট ক্লাসে সামান্য দেরিতে আসতেন, তখন স্বামীজী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখে হাস্যোদ্দীপক মিট মিট ভাব এনে বলতেন, 'এই ব্রহ্মা আসছেন, এই দেখ শাশ্বত।'

## মিস্টার স্টার্ডি

উত্তর ভারত ভ্রমণকালে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ আলমোড়ায় গিয়েছিলেন। এই সময় একজন উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি থিয়োজফি চর্চা করতেন—ইনিই মিস্টার স্টার্ডি। ১৮৯৩ খৃঃ শেষের ঘটনা। স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁর নিকট স্বামীজীর কথা ও পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচারকার্য সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং স্বামীজীকে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করতে আমন্ত্রণ করবেন বলেন।

মিঃ ই. টি স্টার্ডি ইংলণ্ডের একজন অবস্থাপন্ন বিদ্বান ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ছিলেন। মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীকে লণ্ডনে বিরাট কর্মক্ষেত্রে তাঁর সাধ্যমত স্বামীজীকে সহায়তার আশ্বাস দেন।

১৮৯৫ খ্রীঃ স্বামীজী প্যারিস পৌঁছান। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ইংলণ্ডে পদার্পন করেন। স্টার্ডি ও মিস মুলার তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। লণ্ডনে স্বামীজীর ক্লাসগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য স্টার্ডি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। স্বামীজীর বেদান্ত প্রচার কার্যে তাঁর খুব উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল।

স্বামীজীকে লেখা একখানি পত্রে মিঃ স্ডার্ডি বলেছেন : কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই

কোন মহৎ কার্য হয় না ; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাকচাতুরী—এদের কোনটিরই মূল্য নেই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতি সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সব কাজ সম্পন্ন করতে থাকেন। যাঁরা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করেছেন, যাঁরা অসীমের স্পর্শ লাভ করেছেন, যাঁদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ; অর্থ, যশ ও ক্ষমতার স্পৃহা মাত্রহীন—তাঁরাই জগৎ তোলপাড় করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পুনরায় ১৫ই এপ্রিল ১৮৯৬, লন্ডনে যান। স্বামী সারদানন্দ ১লা এপ্রিল কলকাতা হতে এসে মিঃ স্টার্ডির অতিথি হয়েছেন। মিস্ মুলার ও মিঃ স্টার্ডির অতিথিরূপে স্বামীজী সারদানন্দের সঙ্গে সেণ্ট জর্জে'স রোডে অবস্থান করেন।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় স্বামীজীর সঙ্গে মিঃ স্টার্ডিও ছিলেন। স্বামীজী ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে লন্ডনে ফিরে আসলে জনসাধারণ যাতে স্বামীজীর ভাষণ শুনতে পায়, তার জন্য মিঃ স্টার্ডি ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি বড় ঘর ভাড়া করেন।

স্বামীজী যখন লন্ডনে চলে আসেন, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ দেন। বিদায় সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অক্লান্ত কর্মী মিঃ স্টার্ডি, তিনি তাঁর সকল বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করেন এবং নিজে সভাপতি হন। এক পত্রে স্বামীজীর সম্বন্ধে বলেন, আমি যে বস্তু সারা জীবন ধরে আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, স্বামীজীর মধ্যে তাহা পেয়েছি। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯৫ স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে জানালেন, মিঃ স্টার্ডি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তিনি বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন।

মিঃ স্টার্ডি ভারতীয় চিন্তাধারায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, নিজের জীবনে ভারতীয় ভাবধারা রূপায়িত করতে ভারতে আসেন এবং হিমালয়ের নিভৃত পার্বত্যনিবাসে আলমোড়ায় বহু দিন কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। স্বামীজী গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের কাছে লন্ডনে চলে আসেন। কিছু দিন পর স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় চলে গেলে ইংলন্ডের প্রচারকার্য মিঃ স্টার্ডি একাই চালাতে থাকেন। মিঃ স্টার্ডি শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর উপর তাঁর পূর্ব শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি।

### স্বামী কল্যাণানন্দ

স্বামীজীর যে-কয়জন সন্ন্যাসী-শিষ্য সাক্ষাৎভাবে আর্ত-মানুষের সেবায় নিজ-জীবন সমর্পণ করেন—স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁদের অন্যতম। কনখলে (হরিদ্বার) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কল্যাণানন্দের অতুলনীয় কীর্তি। ১৯০২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বছর তিনি এখানে সেবাকাজে ব্রতী ছিলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেবা কাজের জন্য ১৯১১ সালে তিনি দরবার-পদক প্রাপ্ত হন।

তাঁর পূর্বনাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজিরপুরের সন্নিকট হানুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম—১৮৭৪ সালে। পিতার নাম—উমেশচন্দ্র গুহ। প্রথম বয়সে বানারীপাড়া হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ২৪ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে

তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করেন। মঠে যোগদান করার পর তিনি বেলুড় ও পাশের গ্রামের আর্ত ও রুগ্নদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৯ সালে জুনমাসে দ্বিতীয়বার স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার আগে দক্ষিণারঞ্জনকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেন ও তাঁর নাম হয় স্বামী কল্যাণানন্দ।

১৮৯৯ সালে বেলুড় মঠ থেকে কল্যাণানন্দ তীর্থদর্শনে কাশী যান। ১৯০০ সালে ডিসেম্বরে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ পরিক্রমায় যান। কল্যাণানন্দ তখন রাজপুতানায়। স্বামীজী দেশে ফিরলে তিনি বেলুড়ে আসেন। এই সময় স্বামীজীর অসুস্থতার সময় কল্যাণানন্দ তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন।

কনখল সেবাশ্রমে স্বামীজীর শিষ্য নিশ্চয়ানন্দ কল্যাণানন্দের সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়গুরুর আর্ত-সেবাকাজ আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথামৃত-কার শ্রীম এই গুরুভাই-দুজনকে অভিন্নাত্মা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৯৩৭ সালের ২১শে অক্টোবর মাসে, ৩৬ বছর একযোগে আর্তসেবায় নিযুক্ত থেকে স্বামী কল্যাণানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন।

**আলোয়ারের রাজা**

১৮৯১ সালে এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করেছিলেন। এই সময় আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান সেই সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন ও স্বামীজীর আগমনের সংবাদ আলোয়ার-মহারাজকে অবগত করান। স্বামীজী তখন দেওয়ানের গৃহে অবস্থান করছেন। সংবাদ-অবগত হয়ে মহারাজা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে তাঁর পাণ্ডিত্য, নির্ভীকচরিত্র ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হন; হিন্দুধর্ম মতে মূর্তিপূজার কারণ ও অন্যান্য অনেক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গভীরতত্ত্ব আলোচনা হয়। এবং ক্রমে মহারাজা মঙ্গল সিং, মূর্তিপূজা সম্পর্কে স্পষ্ট-ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। আগের অনেক অন্ধবিশ্বাস ও ভুল ধারণা তাঁর অপসারিত হয়ে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হয়। স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ভাব ও অনুরাগ এবং ভক্তি সঞ্চারিত হয়। স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। স্বামীজী স্মিতহাস্যে বলেন—একমাত্র ভগবান্ ছাড়া কৃপা করার আর কে আছে? আপনি তাঁরই শরণাগত হোন, শান্তিলাভ করবেন।

স্বামীজী চলে গেলে দেওয়ানজীর পরামর্শে ও আগ্রহাতিশয্যে মহারাজা স্বামীজীকে কিছুদিন তাঁর গৃহে অবস্থান করার আমন্ত্রণ জানান। স্বামীজী সে অনুরোধ রাখেন—তবে একটি শর্ত ছিল। শর্ত এই এখানে থাকাকালীন যাঁরা দেখা করতে আসবেন, সকল শ্রেণীর মানুষকে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে। দেওয়ানজী ও মহারাজ-মশায় আনন্দের সঙ্গে স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হলে তাঁর গৃহে স্বামীজী কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

**অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার**

১৮৯৬ সালে ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসেন। এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো জগদ্বিখ্যাত স্বনামধন্য পণ্ডিত-দার্শনিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মে বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের আমন্ত্রণে তাঁর গৃহে যান। ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় তিনি ম্যাক্সমূলার সাহেবের পাণ্ডিত্যের, ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারকে তিনি সহৃদয়তার মূর্তিমান প্রতীকরূপে চিহ্নিত করেন। তাঁরই আমন্ত্রণে মি. স্টার্ডি ও স্বামীজী অক্সফোর্ড কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকাগার পরিদর্শন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ম্যাক্সমূলার সাহেবের গভীর বিশ্বাস ও নিবিড় ভক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সত্তর বছর বয়সেও তাঁর মুখপ্রসন্ন থাকত সদাই, ললাট ছিল শিশুসুলভ নির্মল ও উজ্জ্বল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী। ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের উপর ছিল অধ্যাপকের অসাধারণ অনুরাগ। অর্ধ-শতাব্দী-কাল তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সুনির্মল আকাশে বিচরণ করেছেন। সংস্কৃত-শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। স্বামীজী অধ্যাপককে ভারত-আগমনে আমন্ত্রণ জানান। ম্যাক্সমূলার স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ধারা জগতের কাছে প্রচারিত করার কর্ম-প্রচেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখনই তিনি বিস্তৃত বিবরণ পেলে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিস্তৃত জীবনী-লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এটা শুনে বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের ভার দেন। পরে এই উপকরণাবলম্বনে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী' নামক একখানি জগদ্বিখ্যাত সুন্দর পুস্তক রচনা করেন।

১৮৯৬ সালের আগষ্ট সংখ্যার 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় ম্যাক্সমূলার 'A Real Mahatma' নামে প্রবন্ধ লেখেন, এরপর ১৮৯৮ সালের নভেম্বরে তাঁর 'Ramkrishna : His Life and Sayings' (First Edition) প্রকাশিত হয়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ-সাহায্যার্থে 'ঋগ্বেদ' ও পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'Sacred Books of the East' গ্রন্থমালারও সম্পাদনা করেছিলেন। আজীবন স্বামীজী ও ম্যাক্সমূলারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয়েছিল।

**শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী**

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, প্রথমবার তিনি ( বিবেকানন্দ ) ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁকে দর্শনের জন্য অনুরাগী-ভক্তের হামেশাই ভিড়। অনেকেই তাঁকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়া রামকৃষ্ণ-ভক্ত

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বামীজী এসেছেন। বহুলোক দেখতে এসেছেন। শরৎচন্দ্রও খবর পেয়ে দেখতে এলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীজী তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করে পূর্বে পরিচিত ছিলেন এখন চাক্ষুষ-পরিচয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বহুলোকের ভিড়ে আলাপে বিঘ্ন ঘটছে দেখে স্বামীজী তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে একান্তে আলাপ-আলোচনা করলেন। জগৎ-সংসার পারাবার উত্তীর্ণ হবার উপদেশ দান করলেন। আচার্য শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থখানি পাঠ করার নির্দেশ-উপদেশ দান করলেন। ১৮৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্বামীজী-কর্তৃক মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হন।

শরৎবাবু সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রাদিতে ছিলেন প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর কথাবার্তা প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় চলত এবং পত্রও লেখা হতো সংস্কৃতে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। স্বামীজী তাঁকে মাঝে মাঝে 'বাঙ্গাল' বলে সম্বোধন করে রসিকতা করতেন। স্বামীজী প্রায়ই এই গৃহীভক্তের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে এসব বিস্তৃতভাবে ধরা আছে। ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে এগুলো মূল্যবান তথ্য। এই গ্রন্থটি রচনা করেই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। শরৎবাবুর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাধু নাগ-মহাশয়'। এছাড়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কিছু সংস্কৃত স্তবও রচনা করেছিলেন।

**স্বামী স্বরূপানন্দ**

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হবার পর স্বামীজীর ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে বহুযুবক কাজে যোগ দেন। তাদের একজনের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ বছরের তরুণ যুবক। অল্প বয়সেই বিবাহিত। মানবজীবনে সেবাধর্মের আদর্শকে পাথেয় করে তিনি স্বামীজী-সান্নিধ্যে আসেন। পরে তিনি নিজেই স্বামীজীকে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্বামীজী তাঁর বুদ্ধি, বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য ও অমায়িকতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করেও এই জীবনের কঠোরতা ও সংযত-চিত্ততার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করে দেন। সবকিছু জেনেশুনে এ-জীবনে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ স্বামীজী দেন। পরে যেন ভিন্ন-পথ গ্রহণের ইচ্ছা না জাগ্রত হয়। অজয়হরি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে—সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছে—এই সংকল্প ব্যক্ত করে।

পরিশেষে ১৮৯৮ সালের ২৯শে মার্চ স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন, তার নাম হয়—স্বামী স্বরূপানন্দ। তাঁকে সন্ন্যাসী হিসেবে পেয়ে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য-শিষ্যদের বলেন, 'We have made an acquisition to-day'—'আজ আমরা একটি রত্ন লাভ করলাম'।

১৮৯৮ সালের জনু মাসে মাদ্রাজে ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদক বি. আর, রাজম্‌ পরলোকগমন করলে, এর কার্যালয় মাদ্রাজ থেকে মায়াবতীতে উঠিয়ে আনা হয় এবং স্বরূপানন্দ এর সম্পাদনার ভার প্রাপ্ত হন ১৮৯৯ সালে। মঠে যোগদানের পূর্বে তিনি কিছুদিন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ডন' নামে ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন যুগ্মভাবে। তাই সম্পাদনায় ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। ফলে, 'প্রবুদ্ধ ভারত' সু-সম্পাদনায় বেশ জনপ্রিয় হয়।

তিনি ছিলেন নিবেদিতাকে গীতা শিক্ষাদানের গুরুও। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদও তিনি করেছিলেন,—সেটা তাঁর অক্ষয়কীর্তি। ১৯০৩ সালে এলাহাবাদে তিনি দুইমাসকাল বক্তৃতা দেন। কাংড়া জেলার ধর্মশালা নামক স্থানে ভূমিকম্পেও নিযুক্ত ছিলেন সেবাকাজে।

পরে তিনি স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করার ভার পান। একাজের জন্য তিনি বহু পরিশ্রমে বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, একাজ বহুদূর এগিয়েও ১৯০৬ সালে ২৭শে জুন তাঁর পরলোক গমনে সে কাজে বিঘ্ন ঘটে। পরে মিসেস্‌ সেভিয়ার ও স্বামী বিরজানন্দের প্রযত্নে তা সম্পন্ন হয়। মাত্র আট বছরের সন্ন্যাসজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে স্বরূপানন্দের অবদান সত্যিই গৌরবের দাবি রাখে।

**স্বামী বিমলানন্দ**

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর-থানার বাগাণ্ডা গ্রামনিবাসী ধর্মনিষ্ঠ বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র খগেন্দ্রনাথ—পরবর্তীজীবনে বিমলানন্দ নামে পরিচিত হন। পরে তিনি আন্দুলগ্রামে এবং কলকাতার পটলডাঙ্গায় বাস করেছিলেন। ১৮৭২ সালে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অন্যদিকে ধর্মভাবের অধিকারী ছিলেন। সদাচার, ব্রহ্মচর্য ও আদর্শনিষ্ঠা ছিল—তাঁর বিশেষ সদ্‌গুণ। তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেকেই স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পরে রিপন কলেজে পাঠকালে তিনি 'কথামৃত'-কার শ্রী'ম'র সান্নিধ্যে আসেন। এরপর তাঁরই পরামর্শে খগেন্দ্রনাথ কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যান মঠে আসেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তদের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে ১৮৯২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের সান্নিধ্য পান—বরানগর মঠে। তিনি ১৮৯৪ সালে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি, স্বাস্থ্যের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী বিদেশের জয়মাল্য মাথায় করে ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর কলকাতায় আগমনের সংবাদ শুনে খগেন্দ্রনাথ শিয়ালদহে, অসুস্থ শরীরে বন্ধুবর্গসহ উপস্থিত হন। স্বামীজী গাড়ি থেকে নামলে ছাত্রেরা ও ভক্তেরাই তাঁর গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিজেরাই গাড়ি টানতে শুরু করে। এরপর তিনি স্বামীজীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শোনেন ও আলমবাজার মঠ ও কাশীপুরের গোপাললালের বাগানবাড়িতে ধর্মপ্রসঙ্গও

শোনেন। এরপরই খগেন্দ্রনাথ অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে সর্বকিছু ত্যাগ করে স্বামীজীর শরণ নেন। স্বামীজী তাঁকে সাদর-প্রীতিতে গ্রহণ করেন ও সন্ন্যাসী-দীক্ষা দেন—তাঁর নাম হয় স্বামী বিমলানন্দ। তিনি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

পরবর্তীকালে তিনি মায়াবতীতে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কার্যব্যাপদেশে ১৯০০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯০৩ সালে তিনি আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠে আসেন। তারপর কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে থেকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে মঠে যান সেখান থেকে বাঙ্গালোরের মঠে। স্বাস্থোদ্ধারের নানা চেষ্টা করেও কিছুই হোল না। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগে তিনি শোকে-দুঃখে আরো ভেঙে পড়েন। ১৯০৮ সালের ২৪শে জুলাই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ৩৬ বছর বয়সে মহাপ্রয়ান লাভ করেন। তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ দীর্ঘদিন সাধু-সন্ত-শ্রেণীকে পথ দেখিয়েছে।

### স্বামী বিরজানন্দ

১৮৯৭ সালে পাশ্চাত্ত্য-দেশে বেদান্ত-প্রচারের বিজয় পতাকা উড়িয়ে ফিরে এলেন স্বামীজী। এরই কিছুদিন পরে আলমবাজার মঠে চারজনকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষা দেন—স্বামী বিরজানন্দ যাঁদের অন্যতম। ১৮৯১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগদান করে তিনি সুদীর্ঘ ৬০ বছর যুক্ত ছিলেন—মানব সেবাধর্মের কাজে তাঁর পূর্বনাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু।

১৮৭৩ সালের ১০ই জুন কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন তৎকালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। ছেলেবেলা থেকেই কালীকৃষ্ণের ছিল ধর্মানুরাগ। ছাত্রাবস্থাতেই স্বামী বিমলানন্দের প্রভাব তাকে বিচলিত করে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে পরবর্তীকালে মঠের সন্ন্যাসী হয়ে বিখ্যাত হন স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ।

রিপন কলেজে পাঠকালে ইংরেজীর অধ্যাপক মাষ্টার মহাশয়, শ্রী'ম (কথামৃতকার)-র সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান ও বরাহনগর মঠে যাতায়াত শুরু হয়। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী সন্ন্যাসী ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৭ বছরবয়সে কালীকৃষ্ণ বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। ১৮৯১ সালে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে জয়রামবাটী গিয়ে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় সঙ্গ পান। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাড়ীতে থাকাকালে শ্রীশ্রী মা তাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন। পরে স্বামীজী আলমবাজার মঠে এলে তার সাক্ষাৎ লাভ করেন। বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বি যুবককে দেখে স্বামীজীও খুশি হন। পরে স্বামীজীর দ্বারা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা লাভ করেন। স্বামীজী তাঁকে আর্তসেবা ও মানবকল্যাণ কাজে উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৮৯৮ সালে ঢাকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য বিবেকানন্দের নির্দেশে বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে পাঠানো হলো। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশালে তাঁরা

সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার-কার্য সমাধা করলেন।

ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লে—বিরজানন্দ তাঁর সেবার কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ সালে স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করলেন। বিরজানন্দকে হিমালয়ের নতুন আশ্রম মায়াবতীর পরিচালন ভার অর্পন করে গেলেন। দেশে ফিরে তিনি মি. সেভিয়ারের পরলোকগমনের সংবাদ পান ও মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা-দানের জন্য মায়াবতী আসেন। স্বামীজী এখানে দু'সপ্তাহ ছিলেন। এ সময়ে স্বামীজীর দেখা-শোনার ভার ছিল বিরজানন্দের ওপর।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধির দিন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচারের কাজে আমেদাবাদ গেলেন বিরজানন্দ। ১৯০৬-এ মায়াবতীর অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগে ওখানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন স্বামী বিরজানন্দ। "প্রবুদ্ধ-ভারত" সম্পাদনা ছাড়াও তিনি স্বামীজীর সুবৃহৎ ইংরেজী জীবনী প্রকাশ ও বক্তৃতাবলী সঙ্কলন করেন—অন্যান্য শিষ্যদের সহায়তায়। ১৯১৪ সালে হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করেন 'বিবেকানন্দ আশ্রম।' ১৯৩৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনি সম্পাদক ও ১৯৩৮ সালে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালের ৩০শে মে ৭৮ বছর বয়সে বেলুড় মঠে তাঁর মহাসমাধি ঘটে।

## রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি

পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯২ সালে স্বামীজী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় রামেশ্বরের অভিমুখে গমন করেন। পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রামনাদের রাজা স্বামীজীর এত গভীর অনুরক্ত ও গুণগ্রাহী ছিলেন যে, তিনি অবশেষে সাক্ষাতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামীজী দেশজননীর সুসন্তান ও কর্মবীর মহাপুরুষ হিসেবে তাঁর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন। স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পাথেয় সংগ্রহে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিজয়বার্তায় স্বীয় গুরুর সম্মানে গৌরব ও পুলকিত বোধ করতেন।

২৬শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ সালে স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশের কয়েকজন শিষ্যসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। রামনাদের রাজা স্বামীজীকে রামেশ্বরে আমন্ত্রণ জানালেও অবশেষে নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পাম্বান বন্দরে উপস্থিত হন। যাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশ গমন ও ধর্মমহাসভায় বেদান্ত-প্রচার সম্ভব হলো তাঁদের মধ্যে রামনাদের রাজা অন্যতম ছিলেন—তাই এই মুহূর্তে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত বোধ করলেন ও আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলেন। বন্দরে সমস্ত পাম্বানবাসীদের তরফ থেকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ও স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সভা-শেষে স্বামীজী রাজ-বাটিতে গমন করেন। গাড়ির ঘোড়া মুক্ত করে রাজা-সহ অন্যান্য

শিষ্যরা নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগলেন। পাম্বানে রাজ-তত্ত্বাবধানে থাকাকালে তিনি নানান দেবমন্দির দর্শন, আর্ত-সেবা, দরিদ্রদের অন্ন-বস্ত্র-দান প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত থাকেন। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার করে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ভারতে গমন করে যেখানে পদার্পণ করেছিলেন সেই পবিত্র স্থানটিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজা ভাস্কর সেতুপতি স্থানটিতে পাথরের একটি স্মারক-স্তম্ভ তৈরী করে দেন—১৮৯৭, ২৭শে জানুয়ারী তারিখে, খোদিত হয়—'সত্যমেব জয়তে' শব্দগুলি।

রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ সভায় স্বামীজীকে সম্মান জানানো হয়। প্রত্যভিবাদনে স্বামীজী রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। সত্যিই মহানুভব এই রামনাদরাজ ভাস্কর সেতুপতি একাধারে রাজা ও ঋষিই ছিলেন।

## স্বামীজীর স্মৃতিকথা

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

### স্বামীজীর সব কথাই ছিল দীক্ষা

স্বামীজী অতি সাধারণ কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে করতে অতি গভীর কথা ব'লে যেতেন অনর্গল। মন্ত্র-দীক্ষা না পেলেও এভাবে অন্তরের দীক্ষা যে কত লোক পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা হয় না। একবার দুই বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কাশীতে। কথা পেড়েছেন যেমন লোকে ব'লে থাকে—'শরীর কেমন?'

'আ—র শরীর! বাঙালীর শরীর হেগে হেগেই গেল।' এই ভূমিকা থেকে বাঙালীর স্বাস্থ্য ও পশ্চিমে লোকের স্বাস্থ্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলেন। ক্রমশঃ দুনিয়ার সব জাতের খাওয়া-দাওয়া আর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রসঙ্গ শেষ করলেন 'অন্নই ব্রহ্ম'—এই কথায়। যে যেমন অন্ন খায়, তার দেহ মন সেই রকম গঠিত হয়—তদনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা হয়।

যে ভদ্রলোক কথা পেড়েছিলেন, তিনি প্রায় চল্লিশ মিনিট ধ'রে এই বক্তৃতা শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। পরে বলেছিলেন, 'এমন অদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনিনি। এই সামান্য আহার—তার মধ্যে এত গুরুত্ব!'

বেলুড় মঠে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি কেরানী। কেরানীর কাজ কেমন ক'রে করতে হয়,—কেমন ক'রে ফাইল (files) রাখতে হয়, হাতের লেখা কেমন গোটা গোটা ও স্পষ্ট হওয়া উচিত, ইত্যাদি খুঁটিয়ে বলতে থাকলেন প্রায় পঁচিশ মিনিট ধ'রে। এই কাজ শুধু যে অন্নের জন্য তা নয়, দেশের দশের কাজ—ক্রমে 'কর্মই ব্রহ্ম' এই ভাবে সকলের মনটা তুলে দিলেন, এ একটা অনুভূতি। যাঁরা শুনতেন, তাঁরা যে শুধু কথাগুলি শুনতেন, তা নয়—সেই বাণীর পিছনে একটা শক্তি কাজ ক'রত, কিছুক্ষণে মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার চেতনায়। সেই ভাবটিই সারা জীবনের পাথেয় ও সাধনাস্বরূপ হয়ে উঠত। এই যে ব্যাপারটি, তা যে শুধু স্বামীজীর মধ্যেই দেখা যেত, তা নয়। মহারাজদের (স্বামীজীর গুরু-ভাইদের) অনেকেরই এই গুণটি ছিল। তবে স্বামীজীর স্বভাব ছিল সব বিষয়ে একটা জোর দিয়ে বলা এবং তাঁর কথার মধ্যে আশ্চর্য এক শক্তি থাকত, তা মনকে অনুভব করিয়ে দিত।

স্বামীজীর 'লেকচার' যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের কাছে আমি শুনেছি—তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যেতেন এবং শেষে এক 'ব্রহ্মই আছেন সর্বসত্তাময়'—এই ভাবটি সকলের ভিতরে ঢুতে যেত।

অনেক সময় হাসি-তামাসার মধ্যেও স্বামীজী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ভাবটি ভিতরে ঢুকিয়ে ছাড়তেন। ভক্তরাজ মহারাজ একবার তাঁর অট্টহাস্য দেখেছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ পর্যন্ত তটস্থ! অট্ট অট্ট হাসি। সেই শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গ ধাপে ধাপে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠছে—মনও সেই সঙ্গে উপরে উঠে যাচ্ছে। এক বিরাটের মহিমায় সব ছেয়ে গেল!

আমরা যে-সব আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলিকে জীবনের চরম লক্ষ মনে করি, তাঁদের কাছে সে-সব যেন ছেলেখেলা! হাসতে হাসতেই মনটাকে নিরোধ ক'রে দিলেন। একটা হাসি বা ঠাট্টার মধ্যেই অন্তরে এমন ইঙ্গিত ও স্পর্শ দিয়ে দিতেন যে, ওইতেই সব কাজ হয়ে যেত। এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়, কারণ কে বুঝতে যাচ্ছে ও-কথা! কিন্তু যারা তাঁদের কাছে গিয়েছে, দেখেছে—তাদের কাছে এ-সব কথা নূতন নয়।

**রাজনীতি-সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব**

রাজনীতি বলতে আমরা তখন বুঝতাম—দেশের স্বাধীনতা। ইংরেজদের অধীন ছিল দেশ; অনেক যুবকের মনেই সেজন্য দুঃখ ছিল। স্বামীজী নিজেও ভারতবাসী হিসাবে এই পরাধীনতার গ্লানি অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। কোন কোন ব্যক্তির কাছে তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে অতি কঠিন মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু ওইটাই তাঁর একমাত্র ভাব মনে করলে ভুল হবে। ইংরেজদের গুণের কথাও আবার বলেছেন। ইওরোপের লোকেদের কর্মশক্তির প্রশংসা বার বার করেছেন। কিন্তু অত্যাচার বা মনুষ্যত্বের অবমাননা যে কেউ করুক, তার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন। একবার একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তাঁকে ইংরেজদের অনাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তাঁকেই প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'তবে এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রছ কেন?' তিনি বললেন, 'কি ক'রব?' স্বামীজী উষ্ণস্বরে বললেন, 'কেন? ওদের গলা টিপে সাগরে ভাসিয়ে দাও।' এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না। অপমান সহ্য করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে মিলিটারী ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হ'য়ে তাদের দুটিকে বগলদাবাই ক'রে বলেছিলেন, 'দরজা থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।' এটা হ'ল—তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান করলে তার প্রতিক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হোক—তাও তিনি চাইতেন। তবে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি গুরুভাইদের এবং মঠকে রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে আলাদা রেখেছিলেন। কোন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল—স্বামীজী স্বয়ং বড়লাট বা তাঁর কোন সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু 'সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ'—এই কথা তিনি অক্ষরতঃ পালন করেছিলেন। মঠের প্রতি তদানীন্তন সরকারী দপ্তর বিশেষ ক'রে 'সি. আই. ডি.'র বড় সাহেব বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু ঐ ইংরেজ মহোদয় স্বামীজীকে যে কি চোখে দেখলেন, তা তিনিই জানেন! কিন্তু তাঁর মুখ থেকে আপনিই এই কথাগুলি বেরিয়ে এল—'তুমি আমার ঈশ্বর—তুমিই যিশু।' তাঁর প্রভাবে পরে লাট-দপ্তরের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

স্বামীজী ভবিষ্যতের উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তখনই দেখেছিলেন মঠের ভবিষ্যৎ। সকলকে নিয়ে—সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে, সর্ব ভাবের মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘকে চলতে হবে, তা তিনি জানতেন। রাজনীতিক আন্দোলনে ছিলেন, এমন অনেক লোক যদিও মঠে স্থান পেয়েছিলেন, তবু মঠকে সাক্ষাৎ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হ'তে তিনি প্রবলভাবে নিষেধ করেছিলেন।

ভূপেনবাবুকে বলতে শুনেছি—'স্বামীজী আর কিছুদিন পরে এলে রাজনীতিক আন্দোলন চালাতেন।' তাঁকে তিনি যুগ-পরিবর্তনকারী শক্তি বলেই দেখেছেন। তবে তাঁর ভাবকে রাজনীতির মধ্যে সীমিতই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী সব গণ্ডির বাইরে ছিলেন। মহামানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সর্বদেশের মঙ্গল কামনা ক'রে গেছেন। আমাদের নিজেদের দেশের আত্মচেতনা জাগুক—এ ইচ্ছা তো হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্যে ত্যাগী একদল সন্ন্যাসী গঠন ক'রে গেছেন, যাঁরা তাঁর সেই ভাবকে জীবনে জাগ্রত ক'রে রাখবে আর বাইরের জগতে কর্মের মধ্যে তাকে রূপ দেবে।

**সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা**

সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কেও কিছু লোকের ধারণা আছে: তিনি রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সায় না থাকলে তা সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে স্বামীজী রাজনীতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন—এই কথাই তাঁরা বলতে চান। কিন্তু স্বামীজী নিজে এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই। কাশীতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাও হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের তুলনামূলক দোষগুণ বিচার করেছিলেন ও নিজের স্পষ্ট মতামতও জানিয়েছিলেন। সেই সময় ধর্মের স্থান রাজনীতির ঊর্ধ্বে, তাও অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন।

সিস্টার ছিলেন আইরিশ দুহিতা। তখনও আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন হয়নি। তাঁর মনে ভারতের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে স্বামীজী কারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিস্টার নিবেদিতা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হারিয়ে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাও তিনি চাইতেন না। তাই তাঁকে ভারতের ভাবধারা বুঝে সেবা করতে বলেছিলেন। গুপ্ত মহারাজ তাঁকে বাংলা শেখাতে যেতেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারীরাও তাঁর খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু তাঁকে মঠ থেকে আলাদা থেকেই নিজের ইচ্ছা ও ভাব অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে বলেছিলেন। ভারতের পুরাণ ও উপনিষদ সিস্টার খুব ভালভাবে জেনেছিলেন। এবং তিনিও মনেপ্রাণে ভারতের একটি মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র স্নেহ ছিল তাঁর ওপর ; এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শেই নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ভারতের কল্যাণে বিলীন করেছিলেন।

একটি মেয়ে-ইস্কুল খুলে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবন গঠন করতে তাঁর

সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর আত্মবিলুপ্তি। তাঁর মতো প্রতিভা ও বাগ্মিতার শক্তি নিয়ে একজন রাজনীতিক নেত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি একটি ছোট্ট ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত ক'রে যে-কাজ ক'রে গেছেন, বাহিরে তার প্রকাশ বেশী বোঝা না গেলেও অন্তর্জগতে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করেছে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এই মহাবাক্য সিস্টারের জীবনে অক্ষরে অক্ষবে পালিত হয়েছিল। স্কুলের সামনের গলিটি অপরিষ্কার থাকায় বহুবার নিজের হাতে সমস্ত পথটি সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। পাড়াব সব বাড়িতেই মহিলারা নিজেদের মেয়েদের সাবধান ক'রে দিতেন—'ওবে! রাস্তায় কিছু ফেলিস্ না, ফেলিস্ না। এখুনি 'মেম সায়েব' ঝাঁটা-হাতে নিজে পরিস্কার করতে আসবে।'

মেমসাহেবকে সকলেই ভালুবেসেছিলেন, তাই তো তাঁকে এত ভয় ছিল! ছেঁড়া-কাগজ বা পাতা, খেলনা-ভাঙা—কিছুই ফেলবার জো ছিল না। সেদিন সিস্টারকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। তাবাই এখনও বলতে পারেন—সিস্টার ও শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা কি প্রকার ছিল। মানুষ-গঠন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। সিস্টার স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়েরও অজস্র স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন এবং মেয়েদের শিক্ষাও এই দেশেরই ভাবধারা অনুযায়ী দিতে চেয়েছিলেন। এই জন্যই সিস্টারও রাজনীতিকে প্রাধান্য দেননি। যদি রাজনীতিকে সিস্টার নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করতেন, তা হ'লে তাঁর ন্যায় গুণবতী ও ওজস্বিনী মহিলা সেদিকেও বড় কিছু ক'রে যেতেন। ইচ্ছা করেই তা তিনি নেননি। তবে সম্পূর্ণ এড়িয়েও যাননি। হয়তো এই জন্যই বাহ্য-সন্ন্যাসও তিনি নেননি। তবে তাঁকে হালকা রঙের গেরুয়া পরতে দেখেছি এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তা থেকেই তাঁর আন্তঃসন্ন্যাসের ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যেত। এই রাজনীতির জন্যই সম্ভবতঃ তিনি মঠের থেকেও আলাদাভাবেই ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর জীবনের লক্ষ্য এই কর্মজগতেব মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বেদান্তের চবম অনুভূতিই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। স্বামীজীর ইচ্ছায় কর্মকে তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং ছোট ছোট কাজে 'সেবার আদর্শ' নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেজন্য নানা প্রকার সাধনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। স্বামীজীও সংক্ষেপে রাজযোগের উপর অধিক ঝোঁক দিয়েছেন মনে হয়। তবে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞান—এই তিনটির সামঞ্জস্য করতে বলেছেন বারে বারে. এই সাধনার ভিত্তি একজন সৎ মানুষের গুণাবলী। অধ্যাত্ম-রাজ্যের দর্শনাদি বা 'ভাব' সমূহকে তিনি প্রধান বলতেন না। সমগ্র জীবনটাই সাত্ত্বিক ও সুন্দর হ'তে হবে—এইটাই হ'ল মূল কথা। এরই নাম হ'ল কর্মযোগ।

**সকল কর্মই কর্মযোগের উপায়**

স্বামীজী যে-কোন কর্মকেই কর্মযোগে পরিণত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু

সেই সঙ্গে গুরুর বা গুরুতুল্য ব্যক্তির প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। যে-কোন ব্যক্তির জীবনে ধর্মলাভের পিপাসা যতই প্রবল হোক, 'বেহেড্' হওয়া পছন্দ করতেন না। বুদ্ধি ও যুক্তি সহায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়া বেশী ভাল ; কিন্তু ভাব-বিহ্বলতা, বিচার বিমুখতা —এ সকল গুণকে অধিক প্রশ্রয় দিতেন না। 'মেনিমুখো হ'স্‌নি', 'বীর হ তোরা', 'কাজে লেগে যা'—এই সব ছিল তাঁর কথা। এইগুলি আমরাও বলি, কিন্তু তাতে শক্তি নেই। স্বামীজীর এই সব অতি সাধারণ কথাও শুধু কথা নয়—'মন্ত্র' বলা যেতে পারে। শুধু কথা দিয়ে যে এ-সব ভাব তিনি বুঝিয়ে দিতেন, তা নয়। ঐ কথার পিছনে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছিল—একবার শুনলে মনে গেঁথে যেত। ওই-গুলি পালন করতে গিয়ে সারা জীবনটাই পালটে যেত। স্বামীজী বা তাঁর গুরু-ভাইদের কাছে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সুচারুরূপে কর্ম করার শিক্ষা পেয়েছেন। কর্ম করতে করতে 'যোগ' হবে বা ভগবান লাভ হবে—এই রকম একটা ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ভগবদ্‌ভাবটি কি, তা তাঁদের কাছে গেলে মনে কেমন ভাবে যেন মুদ্রিত হয়ে যেত। আমি আমার জীবনে পরবর্তীকালে নানা সাধুসন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বাতাসেও অন্তরীক্ষে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ত কোন দিন উপলব্ধি করিনি। ভগবান সর্বত্র বিরাজিত, সব কাজই 'তাঁর কাজ', কাজের ছোট বা বড় নেই। চিন্তা-ভাবনা, লেখা-পড়া ধ্যান-ধারণা—সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে, যেন একমাত্র ঐ কাজটি ঠিকমত করার উপরই জীবন-মরণ সমস্ত সমস্যা নির্ভর করছে।—এই রকম ঐকান্তিক অনুরাগ ও চেষ্টার নাম 'শ্রদ্ধা'। কর্ম এই শ্রদ্ধা-সহযোগে 'যোগে' পরিণত হয়। মন ও বুদ্ধি যেখানে নিরুদ্ধ, ভগবান শুধু সেখানেই আছেন তা নয়। সমস্ত বিশ্বে সমস্ত কিছুই তিনি। এমন কোন কাজ নেই, যা 'পুজো' নয়। ঘরটি মোছা, বাজারটি করা, হিসেব রাখা—সব কাজেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ও উপলব্ধি থাকা চাই। তবে তো কাজ ক'রে আনন্দ পাওয়া যাবে। আর তবেই যেখানে সেখানে বসেও তাঁর ধ্যান হওয়া সম্ভব হয়। এত কর্মের কথা যিনি বলতেন, সেই স্বামীজী কিন্তু কর্মজগতের মানুষ ছিলেন না। তাঁর সমস্ত বৃত্তি ছিল অন্তর্মুখী, এমন এক ভাব-রাজ্যের—যা আমাদের চোখে ধরা দিত, কিন্তু যেন সদা সর্বদা নাগালের বাহিরে থেকে যেত। তাঁর কথা, তাঁর মুখ মনে পড়লেও সেই অপূর্ব ভাবজগতের কথাই মনে ওঠে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি—এ-সব কিছুই মনে থাকে না। 'আচার্যকোটী'রা আসেন এই ভাবে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিতে—তার জন্য কোন যোগ বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে সেই ভাবটুকু রক্ষা করার জন্য সমগ্র জীবনটাই লেগে যায়, আর তারই নাম 'কর্মযোগ'।

# তৃতীয় অধ্যায়

## স্বামীজীর পাদমূলে বিদেশিনী

১। স্বামী বিবেকানন্দের একজন বিদেশিনী শিষ্যার নাম সবার কাছেই পরিচিত, তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। কিন্তু তিনি ছাড়াও স্বামীজীর একাধিক বিদেশিনী শিষ্যা ছিলেন, যাঁরা বিবেকানন্দকে প্রণাম করে অগ্নিশিখার মতো উত্থিতা হয়েছিলেন। অর্থ, প্রেম, সেবা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের কল্যাণকামনায় নিঃশেষে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। এই ভাবেই তাঁরা ঈশ্বরস্বরূপ স্বামীজীর ভারতবর্ষকে ভাল বেসেছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর দুঃখে হারানো মায়ের পেটের বোনগুলিকে যেন এঁদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। ……বিবেকানন্দের নির্ধারিত পুরুষকে আনন্দে সঞ্জীবিত রাখার মতো বিরাট দায়িত্ব তাঁরা অজান্তে পালন করে গেছেন! স্বামীজী মিসেস্ ওলী বুল সম্বন্ধে বলেছিলেন: "যতই ওঁর কথা ভাবি ততই গীতার সাত্ত্বিক দয়ার কথা মনে আসে……মিসেস বুলই জানেন, ঠিক কিভাবে দিতে হয়, কত নিঃশব্দে, কদাপি ভুল না করে।"

২। উনিশশো দুই সালের ৫ই জুলাই তারিখের ঘটনা। বেলুড়ের গঙ্গাতীরে চিতা জ্বলছে। স্তব্ধ নিথর নিবেদিতার মুখের উপর চিতার অগ্নিশিখার আলোক লিপিতে লেখা হয়ে যাচ্ছে কোন দিব্যবাণী কে জানে! সহসা তিনি চমকে উঠলেন—তাঁর আস্তিন স্পর্শ করে ডাকছে কে? কেউ নয়—মাত্র একটি বস্ত্র খণ্ড—চিতা থেকে উড়ে এসেছে।"

## ভগিনী নিবেদিতা

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল মহিয়সী বিদেশী মহিলা ভারত ও ভারতবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জনমানসে চির-ভাস্বর হয়ে আছেন। আইরিশ দেশীয় এই মহিলার পূর্ব নাম ছিল মিস মার্গারেট ই, নোব্‌ল্‌। আয়ারল্যাণ্ডে ( উত্তর ) ১৮৬৭ সালে তাঁর জন্ম। পিতা স্যামুয়েল নোব্‌ল্‌ ছিলেন প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক। নোব্‌ল্‌ দম্পতির এই চতুর্থ সন্তানটিকে রেখে পিতা অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন।

কলেজে পাঠ শেষ করে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন নিবেদিতা। ১৮৯৫ সালে লণ্ডনে তিনি নিজেই 'রাস্কিন স্কুল' নামে স্কুল খোলেন। বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে শিক্ষকতার কাজ করতেন তিনি। সঙ্গে চলত নানান সামাজিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম। ছিলেন সুবিখ্যাত 'মিসেস' ক্লাবের সদস্যাও।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহানগরীতে বাসকালীন শিক্ষণ, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বহুমুখী প্রতিভাকে বিকশিত করার অবাধ সুযোগ আসে তাঁর জীবনে। তাঁর যুক্তি-বাদী এবং ভাবপ্রবণ মন বিভিন্ন ধর্মের তথ্যসংগ্রহে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জীবনের চলার পথে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে ধর্মের প্রতি, জীবনের প্রতি আগ্রহ আরো বেশি করে দেখা দেয়।

১৮৯৫-তে স্বামীজী হিন্দুধর্ম প্রচারের কাজে বেরিয়ে আমেরিকার পর লণ্ডনে উপনীত হন। ইংলণ্ডে তিনি কিরূপ সমাদৃত হবেন, এ নিয়ে সন্দেহ মনে থাকলেও, লণ্ডনে তিনি উপস্থিত হলে যখন বিপুলভাবে সমাদৃত ও অভিনন্দিত হন, তখন তাঁর পূর্ব-সন্দেহ দূরীভূত হল। ক্রমে মাসাধিককাল অবস্থানের সময় তিনি লণ্ডন-বাসীর চিত্ত জয় করে নেন।

এই সময়েই মিস্‌ নোব্‌ল্‌ স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন। ও তাঁর ধর্মোপদেশের উদারতা ও দার্শনিক চিন্তার গভীরতায় মুগ্ধ হন। দর্শনশাস্ত্র ও ভারতীয় বেদান্ত-শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা স্বামীজীর প্রতি তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধান্বিত করে এবং তিনি অচিরেই স্বামীজীকে 'গুরু' পদে বরণ করেন। 'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি' ('The Master as I Saw Him') গ্রন্থে নিবেদিতা তার বিস্তৃত চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

১৮৯৬ সালে স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গেলে মার্গারেট স্বামীজীর আদর্শকে অনুসরণ করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। অবশেষে ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। স্বামীজীর আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করলেন পুরোপুরি ভাবে। আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায় ক্রমে তিনি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় নারীতে

পরিণত হয়ে উঠলেন। ভারতীয় নারী জাতির মধ্যে জীবন উৎসর্গ করে মানবসেবায় আত্মোৎসর্গের প্রবণতা লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ বিদেশী এই রমণীর সাহায্যে একদল নারী-কর্মীকে সেবার কাজে নিয়োগের কথা ভাবলেন।

১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ মার্গারেট শ্রীমাসারদাদেবীর দর্শন লাভ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। ঐবছরই ২৫শে মার্চ স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন, মার্গারেট 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অভিহিত হন। এরপর শুরু হয় তাঁর সুকঠোর সেবাময় কর্মজীবন। ১৮৯৮-৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ রোগের মাড়কে তিনি প্রাণপণ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবন গঠনে স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণ বিশেষ সহায়ক হয়। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে নিবেদিতা তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

১৮৯৮ সালে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে ১২ই নভেম্বর ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাদানের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় আজও তাঁর আদর্শকে বহন করে স্ত্রী-শিক্ষার কাজে মহান ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই আদর্শেরই সম্যক রূপায়ণের জন্য নারী শিক্ষার কাজকে প্রসারণ কল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন।

নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারিণীও। সেই প্রতিভার ফসল এই বিখ্যাত গ্রন্থগুলি—'The Master as I saw Him', 'Notes of some wanderings with Swami Vivekananda', 'Web of Indian Life,' 'Craddle Tales of Hinduism'।

ভারতের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, জন ও সমাজকল্যাণ এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরদিন। ভারতের তৎসময়ের দেশ-সেবক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমাজের সব স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রমুখের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়; শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে নিবেদিতপ্রাণ ভগিনী নিবেদিতা সুমহান মহনীয়তায় তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাসগৃহে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

### স্বামী অভয়ানন্দ ( মেরী লুই )

স্বামীজীর ত্যাগ ও মানব-সেবা-ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ ও মহিমান্বিত করেছিলেন যে সকল পাশ্চাত্য মহিয়সী মহিলা—স্বামী অভয়ানন্দ তাঁদের অন্যতম। এঁর পূর্বনাম ছিল মাদাম মেরী লুই, ইনি ছিলেন ফরাসী দেশবাসী মহিলা। ২৫ বছর আমেরিকায় বসবাস করেছিলেন এবং ঐ দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে এঁর জীবনেতিহাস সত্যিই বিস্ময়াবহ। দু'এক কথায় তা

বলা যাক। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল তিনি রাজনীতির মধ্যে অতিবাহিত করেন। উদারপন্থীদের কাছে তিনি একজন জড়বাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী বলে পরিগণিত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের এক বছর পূর্বে তিনি 'মানহাটান লিবারেল ক্লাবে'র সদস্যা ছিলেন। সে-সময়ে লেখনী পরিচালনে, পত্রিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখায় ও বক্তৃতা মঞ্চে তিনি ছিলেন ভয়শূন্য ও প্রগতিশীল নারী-জাতির প্রতীক স্বরূপ। সর্বদা তিনি সংগ্রামের পুরোভাগে নেতৃ-রূপে গণ্য হতেন।

এ হেন এক প্রতিভাময়ী ব্যক্তিত্ব স্বামীজীর আমেরিকা গমনকালে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং স্বামীজী মেরী লুইকে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দান করেন এবং তাঁর নাম হয় 'স্বামী অভয়ানন্দ'। তিনি স্বামীজীর একজন একনিষ্ঠ-শিষ্যা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

স্বামীজী ইংলণ্ডে থেকে আমেরিকায় শিষ্য-সম্প্রদায়ের সাহায্যে-বেদান্ত-প্রচার-কার্য চালাচ্ছিলেন সাফল্যের সঙ্গে—তখন অভয়ানন্দ বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেন। নিউইয়র্ক ও অন্যান্য শহরে বেদান্তদর্শন প্রচারের জন্য সাপ্তাহিক সভা ও অন্যান্য আয়োজন করেন। এইভাবে বাফেলো ও ডেট্রয়েট-সহ অন্যত্রও এই প্রচারকার্য বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, স্বামীজীর বহু ভক্ত জোটে।

অভয়ানন্দ স্বামীজীর আমেরিকা-ত্যাগের পরও স্বীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, মানসিক শক্তি, উৎসাহ ও আন্তরিকতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত-প্রচার অব্যাহত রাখেন। মাত্র চার-সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের প্রশংসালাভ কবেন। পরে জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি 'অদ্বৈত সমিতি' স্থাপন করেন।

স্বামী অভয়ানন্দ ১৮৯৯ সালে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর ভারতে আগমনের সূত্র অবগত হওয়া যায় স্বয়ং স্বামীজীর লেখা মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে: 'অভয়ানন্দ ভারতে এসেছে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তার খুব সংবর্ধনা হয়েছে, আগামীকাল সে কলকাতায় আসবে এবং আমরাও তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছি।'

স্বামী বিরজানন্দ যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন স্বামীজী অভয়ানন্দকেও ঢাকায় পাঠান। সেখানে তিনি অনেকগুলি সভায় বক্তব্য রাখেন। তারপর বিরজানন্দ তাঁকে নিয়ে ময়মনসিংহ, বরিশাল গমন করেন। তারপর অভয়ানন্দজী বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করেন, সর্বত্রই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং পরে আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করেন।

## শ্রীমতী মেরী হেল তথা হেল-পরিবার

আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তব্য রাখার জন্য স্বামীজী আমেরিকায় উপনীত হয়ে, অধ্যাপক রাইটের পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে শিকাগোর পথে যাত্রাকালে পথভ্রষ্ট হন, রাইট সাহেবের দেওয়া ডক্টর ব্যারেজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেন। অচেনা বিদেশের বিশাল শহর শিকাগোয় পথ হারিয়ে তিনি বড়ই বিপন্ন

বোধ করেন। পথচারীকে জিজ্ঞাসা করেও যখন কোন সুরাহা হোল না, তখন তিনি সন্ধ্যা নেমে এলে কোন পথ না পেয়ে নিরাশ হয়ে স্টেশনের মালগাড়ির পাশে পরিত্যক্ত একটা খালি কাঠের বাক্সয় রাত্রি যাপন করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে তিনি আবার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। রাস্তার দুপাশে কোটীপতিদের প্রাসাদ। স্বামীজী বড়ই ক্ষুধার্তও হয়ে পড়েছেন, পথশ্রমে শরীর-মনও ক্লান্ত। অথচ পথের দুদিকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। সন্ন্যাসী স্বামীজী বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভিক্ষাদানে এবং মহাসভার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেও বিফল মনোরথ হলেন। সবাই অবজ্ঞাভরে অপমান করে বিদায় দিল। কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। অবসন্ন মনে তিনি পথের পাশে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

সেই সময়ে সম্মুখের সুরম্য অট্টালিকা থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে স্বামীজীকে এই অবস্থায় দেখেন এবং তাঁকে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কিনা জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁর দুর্দশার কথা বলেন। মহিলা তখন তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। স্বামীজীর যথোচিত সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। আহারাদির পর স্বামীজীকে ঐ রমণী ধর্মমহাসভায় পোঁছোনোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন, স্বামীজীর সব সমস্যা ও দুশ্চিন্তার অবসান হল।

এই ভদ্রমহিলার নাম শ্রীমতী মেরী হেল—স্বামীর নাম মি. জর্জ ডব্লিউ হেল—যিনি শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি। স্বামীজী—এভাবে সব সমস্যার সমাধা হওয়ায়—এ যেন অদৃশ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরমলীলা বলে মনে করলেন।

শ্রীমতী হেলের সহায়তায় স্বামীজী যথাসময়ে ধর্মসভায় উপস্থিত হন। তারপরে ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর সেই বিশ্ববিশ্রুত ভাষণ ও তাঁর জগৎজুড়ে খ্যাতি ও সমাদর আজ সর্বজনবিদিত।

এরপর স্বামীজী হেল-পরিবারের আহ্বানে—তাঁদের ৫৪১ নং, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, শিকাগো—ঠিকানার বাসভবনে কিছুকাল অতিবাহিত করেন ও নানা সভায় বক্তব্য রাখেন। হেল-পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিস্টার হেল, মিসেস হেল ও তাঁদের সন্তানাদির সঙ্গে স্বামীজী প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীজী মিসেস হেলকে 'মাতা' এবং কন্যাদের 'ভগিনী' বলে সম্বোধন করতেন। আবার কখনো মিসেস হেলকে 'মাদার চার্চ' এবং মিস্টার হেলকে 'ফাদার পোপ' সম্বোধনও করতেন। স্বামীজীও এঁদের কাছে পুত্রবৎ গণ্য হতেন। হেল দুহিতাগণও স্বামীজীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো মনে করতেন। স্বামীজী যেন হেল পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন এবং এঁদের পরিবারের জীবনধারায় সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজী যখন অন্যত্র কার্যব্যাপদেশে যেতেন বা দেশে ফিরে আসতেন তখন পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন এঁদের সঙ্গে। এই রকম বহু পত্রের সন্ধান মিলেছে। এই সকল পত্র থেকেই বুঝতে পারা যায় এই হেল-পরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ-সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল।

হেল-দম্পতি এবং হেল-ভগিনীগণ স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবধারায় যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন। স্বামীজী তাঁর চিঠিপত্রে এঁদের মানসিক পবিত্রতা, চারিত্রিক উদারতা ও সরলতার কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী শিকাগো যখন যেতেন তখন হেল-পরিবারেই থাকতেন।

১৯০০ সালে মিস্টার হেল পরলোকগমন করলে মেরী হেলকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শোকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লিখতে ভোলেননি।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা গমন করে স্বামীজী কয়েকদিন হেল-পরিবারে থাকেন। ক্রমে এঁদের প্রতি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় মায়া কাটানো দুষ্কর হওয়ার আশঙ্কায় স্বামীজী এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং এরপরই হেল-পরিবারেব সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও পুনরায় সাক্ষাতের সম্ভাবনার সমাপ্তি ঘটে।

# ধীরামাতা

স্বামী তথাগতানন্দ

উপনিষদে দেখা যায় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। নব-ভারত গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে কি কঠোর তপস্যা করেছেন, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করলে। সাধারণে সে তপস্যার কল্পনাও করতে পারবে না। পাশ্চাত্যে তাঁর সংগ্রাম যে কী ভীষণ, কি অমানুষিক ছিল, তার সংবাদ কিছু কিছু পাই তাঁরই পত্রে। "এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্রি দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার ক'রে দু-চার হাজার টাকা করেছি—মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।" (১৮৯৫-এর ৯ই ফেব্রুয়ারির চিঠি)। অপর এক পত্রে (মে, ১৮৯৫)—"ক্লাসগুলি চলছে বটে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা যা দেয়, তাতে ঘরভাড়াও উঠে না। এ সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।" ১৮. ১১. ১৮৯৫-এর পত্রে—"'আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই।' দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ। ...বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত।" ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯-এর পত্রে—"দু বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে।" স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের আসল আকাঙ্ক্ষা—"নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। সেই ছিন্ন বস্ত্র (কৌপীন), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়! এগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।" (২৪. ১. ১৮৯৫-এর পত্র)।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার ও নব-ভারত গঠনের কাজে তিনি কি ভীষণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং হৃদয়হীন ও স্বার্থপর লোকের সমালোচনা তাঁর জীবনকে কত ব্যথাতুর করেছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর ৪৩০ নং পত্রে। অবশ্য তাঁর গুরুর আশীর্বাদে তিনি ওদেশে কয়েকজন সত্যিকারের দরদী বন্ধুকেও পেয়েছিলেন। এঁরা তাঁর আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং তাঁর অশেষ ক্লান্তিপূর্ণ জীবনকে একটু সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহ দিতে তৎপর। সেই জন-কয়েক চিহ্নিত সমব্যথীদের মধ্যে মিসেস্ ওলি বুল অন্যতমা। স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৪-এর কোন এক সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর উদারতা, বদান্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকার সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন, তাঁর অকৃত্রিম মাতৃত্ব, ধীর-স্থির ব্যবহার ও বয়সোচিত গাম্ভীর্যের জন্য স্বামীজী তাঁকে "ধীরামাতা" বলেও সম্বোধন করতেন। প্রত্যেক পত্রে তাঁর সন্তানোচিত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিশেষ উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন এক "আধ্যাত্মিক

ভাব।" তাঁর দান সাত্ত্বিক এ কথাও বলেছেন। এই মহীয়সী, সহৃদয়া নারীকে তিনি কি গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার উল্লেখ আছে ২৪. ১. ১৮৯৫-এর এক পত্রে—"এদেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু।" "জননীর ন্যায়" তাঁর সৎ পরামর্শের জন্য স্বামীজী বার বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি যে তাঁর গুরুর প্রেরিত এ সম্পর্কে তিনি জানান ২৫. ৪. ১৮৯৫-এর এক পত্রে "আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতই (অথবা যাকে আমি আমার গুরু মহারাজের প্রেরণা বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়েব মতো দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, তা আমি সর্বদাই মেনে চ'লব।" তাঁর বিচক্ষণতা, কার্যকুশলতা ও ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য স্বামীজী তাঁকে বেলুড় মঠের একজন ট্রাস্টি পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর জন্ম আমেরিকায়—আনুমানিক ১৮৫০-এ। বাবা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও ম্যাডিসনের (Madison) সেনেটর; মায়ের ছিল সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাল্যের নাম "সারা থরুপ" (Sara Thorp)। গানের প্রতি সারার ঝোঁক ছিল খুবই। এঁদের প্রাসাদোপম বাড়ীতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির আনাগোনা ছিল। এই ভাবেই সারা নরওয়ের বিখ্যাত (Violin) ভায়লিন শিল্পী ওলি বুলের সংস্পর্শে আসেন।

সেপ্টেম্বব, ১৮৭০-এ তাঁর বিয়ে হয় ওলি বুলের সঙ্গে। স্বামীর বয়স তখন ৬০। তাঁর কন্যা—সারা ওলিয়া—১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করে। সারা তাঁর স্বামীর কনসার্টেব সঙ্গে বহু দেশ ঘুরেছেন। স্বামী অত্যন্ত খেয়ালী, ধনী ও বিলাসী। সারা তাঁব বাস্তববুদ্ধি ও প্রতিভাবলে এই সব কনসার্ট ভ্রমণগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কবতেন। ১৮৮০ খ্রীঃ তাঁর স্বামীব মৃত্যু হয়। বোস্টনের কেম্‌ব্রিজ সহরে তাঁর স্বামীর প্রাসাদোপম বাড়ীতে তিনি আমৃত্যু বাস করেছেন।

তাঁর বাড়ীতে সেকালেব বিখ্যাত চিন্তাবিদ্‌দের প্রায়ই নানান্ বিষয়ে আলোচনা হ'ত। ধীরামাতা এগুলিকে বলতেন—The Cambridge Conferences." Prof. William James, Thomas Wentworth Higginson, Jossiah Royce, Jane Addams প্রভৃতি মনীষীগণের নানান্ বিষযে আলোচনা চলত। গ্রীনএকারে স্বামীজী তিন সপ্তাহ ক্লাশ করেন। অন্যদেব সঙ্গে ধীরামাতাও ছিলেন। (আগস্ট ১৮৯৪)। এখানের কাজের সাফল্যের পশ্চাতে ছিল ধীরামাতার উচ্চ আদর্শবোধ। "You have been consecrated and chosen by the Lord as a channel for converting this thought into life, and every one that helps you in this wonderful work is serving the Lord." এখানের কাজে স্বামীজী অত্যন্ত উৎসাহ পান। তিনি ধীরামাতার নামে জমি কিনতে চেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমের জন্য। এখানে পরে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দজী ক্লাস করেন। এখানেই সর্বপ্রথম স্বামীজী অবধূত গীতার অদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

ধীরামাতার বাড়ীতে এলোমেলোভাবে সুধীবৃন্দের আলোচনা হোত না। ধারাবাহিকভাবে রীতিমত আলোচনা চলত। Dr. Lewis G. Janes-এর প্রসঙ্গে উল্লিখিত

হয়েছে, "He later became the director of the Cambridge Conferences, an annual series of lectures for the 'Comparative study of ethics, religion and philosophy' that Mrs. Bull had started in her home". স্বামীজী অত্যন্ত ক্লান্ত—মানসিক ও শারীরিক, বিশ্রাম চান। ধীরামাতার আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে তিনি ৯/১০ দিন ছিলেন ১৮৯৪-এর অক্টোবরে। দ্বিতীয়বার আসেন ৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৪-এ, তিন সপ্তাহ ছিলেন। প্রথমবারেই বোধ হয় অধ্যাপক জেমস্-এর সঙ্গে তাঁর এখানেই সাক্ষাৎ হয়। আলোচনা ও সমাধির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে জেমস্ অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। তাঁর বিখ্যাত "Varieties ot Religious Experience"-এর পাঠক মাত্রেই এ সব জানেন।

দ্বিতীয়বারে (৫. ১২. ১৮৯৪—২৮. ১২. ১৮৯৪) তিনি রীতিমত ক্লাস নিয়েছেন প্রত্যেক দিন সকালে ধীরামাতার বাড়ীতে। ১৮৯৬-এর ২৫শে মার্চ বিখ্যাত হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন এখানেই তার সূত্রপাত। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রিয় ভগিনী মেরী হেলকে লেখা এ সময়ের চিঠিতে পাই···"I am kept pretty busy the whole day." বহু ছাত্র ও অধ্যাপকের প্রচুর লাভ হয়েছিল এখানে তাঁর সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার ফলে। অন্য একটি বিশেষ ঘটনা এখানে (১৮৯৪ খৃঃ-এর শেষে) ঘটে। ধীরামাতার অনুরোধে তিনি "ভারতীয় নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁরা স্বামীজীর মাকে (শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবীকে) শ্রদ্ধা জানিয়ে এক অভিনন্দন পত্র পাঠান, কারণ হিন্দু নারী সম্পর্কে মিশনারীদের প্রচার শোনার পর স্বামীজীর বক্তৃতায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ পান। (যুগনায়ক ২/২৭৪)। বলা বাহুল্য, স্বামীজী পরে জানতে পেরে স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হন। স্বামীজী ভারতে আসার পূর্বেই তাঁর কাজের জন্য ধীরামাতার নিকট থেকে উদার দানের প্রতিশ্রুতি পান। স্বামীজী তা তখনই গ্রহণ করেননি। স্বামীজী ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৭-এর জানুয়ারিতে। পরের বছর এলেন নিবেদিতা। ধীরামাতা আসতে চান ভারতে। স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় জানালেন ঃ "বলাই বাহুল্য আপনাদের এখানে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হবো ; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর।" মিস্ ম্যাকলাউড ও ধীরামাতা এলেন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮। বেলুড় মঠের নূতন জমি কেনা হয়েছে। সেখানের পুরানো বাড়ীটিকে বসবাসের উপযুক্ত করে বাস করতে লাগলেন এঁরা। এঁরাই মঠের প্রথম বাসিন্দা—মার্চ ১৮৯৮।

৬ই মে, ১৮৯৮। স্বামীজীর সঙ্গে এঁরা চলেছেন আলমোড়া ও নৈনিতাল দর্শনে। জুন মাসে আলমোড়া ত্যাগ করে সবাই যান কাশ্মীরের পথে। প্রায় এক মাস তাঁরা কাশ্মীরের হাউস-বোটে বাস করেন। স্বামীজী অক্টোবরে মঠে চলে আসেন, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে এঁরা তিন জন উত্তর ভারতের বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতা ফেরেন। অবশ্য নিবেদিতা আগেই চলে আসেন।

এঁরা তিন জনেই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ধীরামাতার বিশেষ আগ্রহেই শ্রীশ্রীমার প্রথম ফটো তোলা হয়। এক চাঁদনি রাতে এঁরা তিন জনে নৌকাযোগে কামারহাটীর গোপালের মাকে দর্শন করেন এবং তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে বিশেষভাবে আনন্দিত হন। ধীরামাতা ১৮৯৯-এর জানুয়ারিতে মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারত ত্যাগ করেন। আবার দ্বিতীয়বার আসেন নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারিতে। এপ্রিল মাসে আবার চলে যান মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে। স্বামীজীকে এই তাঁদের শেষ দেখা।

১৮৯৮-এর গোড়ায় মঠের সূচনাকালে ধীরামাতার অর্থসাহায্যেই ঠাকুরঘর তৈরী হয়। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। এছাড়াও তিনি স্বামীজীর আত্মীয়দেরও সাহায্য করতেন। নিবেদিতাকে তিনি মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। রামকৃষ্ণগোষ্ঠী ছাড়াও ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি শুধু দানই করেননি, দিয়েছেন উৎসাহ এবং জানিয়েছেন তাঁর গভীর সহানুভূতি। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর লোকের মতই বিভিন্ন সময়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। নিবেদিতার স্কুল, ডাঃ বোসের বিজ্ঞানচর্চা, নিবেদিতার নানান্ পরিকল্পনা সবই তাঁর দানে পুষ্ট। ১৯১০-এর এক পত্রে নিবেদিতা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—"...You know this School is yours, and my writings are really yours, and the Science books are yours, the 'laboratory' will be yours." মৃত্যুর পূর্বে উইল করে ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরি ও নিবেদিতার স্কুলের জন্য টাকা রেখে যান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১১ সালে। নিবেদিতা ছিলেন তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে।

তাঁর মাতৃত্ব সর্বজনবিদিত। প্রথমে আলমোড়ায় এবং পরে (১৯০০-এর সেপ্টেম্বরে) ব্রিটানীতে নিবেদিতার মানসিক উদ্বেগের দিনগুলিতে ধীরামাতার সান্নিধ্য ও বিচক্ষণতা নিবেদিতাকে দিয়েছে শান্তি। স্বামীজীকে মাতৃসুলভ উপদেশ-দেবার অধিকার ছিল তাঁর। এঁর উপদেশেই নিবেদিতাকে শান্তি পাওয়ার পথে সাহায্য করে। তাঁর মাতৃসুলভ অকৃত্রিম স্নেহ ও বিচক্ষণতা শুধু নিবেদিতাকে নয়, স্বামীজী ও সারদানন্দজীর জীবনেও বৈচিত্র্য ও প্রেরণা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সারদানন্দজী তাঁকে 'দিদিমা' বলে ডাকতেন ও মঠ মিশনের কাজে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং অনেক সংবাদ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতেন। সময়মত তিনি স্বমীজীকে কিছু কিছু বলতেন। স্বামীজীর প্রখর আদর্শবাদ, অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যুৎ-গতিতে কাজ করার শক্তি সবার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তিনি নেতা, তাঁর গুরু-ভাইরা প্রায়ই তাঁর অভিপ্রায় মত দ্রুত কাজ করতে পারতেন না। এজন্য স্বামীজী তাঁর ভাইদের ভীষণ তিরস্কার করতেন। নিবেদিতার মত সারদানন্দজীও এই সব প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার দিনগুলিতে ধীরামাতার স্নেহ ও বিচক্ষণতায় অশেষ তৃপ্তি লাভ করেছেন। তিনি দরদী মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বহুবার। স্বামীজীকে উপদেশ দিয়েছেন কখন বা "তিরস্কার" করেছেন। মিস্ ম্যাকলাউড ও ধীরামাতার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা স্বামীজীর গুরুভাইদের সেকালে অশেষ শান্তি দিয়েছে।

আত্মভোলা স্বামীজী তাঁর শিশু-সুলভ মনোভাব নিয়ে মিস্ ম্যাকলাউডকে এক পত্রে (৫০৮) লেখেন ঃ "মিসেস্ বুলকে এ সকল সংবাদ লিখো এবং ব'লো যে, তিনিই বরাবর ঠিক বলেছেন, আর আমারই ভুল হয়েছে। সেজন্য আমি সহস্রবার তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছি।" ধীরামাতা কে লেখেন, "কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের মুখ দেখলেই আমি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলে তার ভিতর কি আছে, তা প্রায় অভ্রান্তভাবে জানতে পারি, আর এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুশি করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্যন্ত প্রকাশ করব না।" নানান বিষয়ে পরামর্শ ছাড়াও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বেদান্ত প্রচারের কাজ দেখাশুনার জন্য তিনি ধীরামাতাকে ভার দিয়েছিলেন। ১৯০০-এর ২রা এপ্রিলের পত্রে তাঁকে লিখছেন, "Her (Mother's) power is on you. I am sure she will lead you to what is right."

'নিবেদিতা লোকমাতা'য় একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৯৯-এর ৫ই নভেম্বর স্বামীজী নিবেদিতা ও ধীরামাতাকে এক টুকরো গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে বলেছিলেন ঃ রামকৃষ্ণের দেওয়া শক্তি আমি তোমাদের সব দিচ্ছি। মার (কালী) কাছ থেকে যা এসেছিল তা তোমাদের দিয়ে শান্তি বোধ করছি। "Women's hands will be the best anyway to hold what came from a woman—from Mother."

ধীরামাতাকে এক পত্রে স্বামীজী লিখছেন—"তোমার ধার আমি কোন কালে শুধতে পারব না।" আবার—"এ-যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্তু এখন ঘটনা-পরম্পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন ; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্ম-প্রণালী বিষয়ে মনে ক'রব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে চ'লব।" আবার লিখছেন—"আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশি বিশ্বাস করি।"

একথা মনে করা ঠিক নয় যে, সর্ব বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। মতভেদ থাকাই খুব স্বাভাবিক। স্বামীজী সর্বদাই ভাবতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের যন্ত্রমাত্র। ঈশ্বরের বাণী প্রচারই করেছেন তিনি। মেরী হেলকে লেখেন—"তুমিও যদি মিসেস্ বুলের মতো ভাবিয়া থাকো, আমার কোন বিশেষ কার্য আছে, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব…।" এই পত্রটিতে কঠোর সন্ন্যাসীর সত্য স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও দেখা যায় ধীরামাতা ও স্বামীজীর সঙ্গে "দীর্ঘ তুমুল তর্ক" এবং স্বামীজীকে "ভৎর্সনা"র কারণ স্বামীজীরই কাজের সাফল্যের জন্য। তার অন্য কোন কারণ

ছিল না,—স্বামীজী তাই তাঁর উপর সর্বদাই নির্ভর করতেন। দেশ ছেড়ে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা থাকা এবং সর্বদাই গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করা সেদিনে কি ভীষণ ব্যাপার, তা আমরা অনুমান করতে পারি। এতে "বীর সন্ন্যাসী"ও মাঝে মাঝে খুব "ঘাবড়ে যেতেন"। ধীরামাতার স্নেহ, উৎসাহ এবং সাহায্য স্বামীজীকে শান্তি দিয়েছে। তাঁর কাছেই স্বামীজী তাঁর প্রাণের বেদনা নানা সময়ে জানিয়েছেন। পুত্রের আবদার নিয়ে মায়ের উপর রাগ করেছেন। ধীরামাতা সর্বদাই দেবতার মত তাঁকে নানান্ বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। বোধ হয়, এই জন্যই একবার স্বামীজী তাঁকে "Sacred Cow" বলে সম্বোধন করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন "কামধেনু।" শ্রীরামকৃষ্ণভাব প্রচারে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বামীজীর ভাষায় সত্যিই তিনি "মহীয়সী নারী ও অকৃত্রিম বন্ধু"। তাঁর পুণ্য জীবন-কাহিনী আমাদের প্রত্যেকের বিশেষভাবে জানা দরকার। তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

# ভগিনী ক্রিশ্চিন

**ব্রহ্মচারী শ্যামল**

ডেট্রয়েট। ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্বদিকের এই শহরটিতে গতানুগতিকতার ধারা পালটে গিয়েছিল এক নূতন ব্যক্তির আগমনে--দূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এক হিন্দু সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ। বড় বড় পত্রিকাতে বিস্তৃত আলোচনা চলল এই বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বটিকে নিয়ে। মিশিগানের ভূতপূর্ব গভর্নরের স্ত্রী মিসেস বাগলির বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন নবাগত এই সন্ন্যাসী। সুধীগুণগ্রাহীদের ঔৎসুক্য ক্রমাগতই বেড়ে চলেছিল এঁকে নিয়ে আর তার সাথে বেড়ে চলেছিল এই "সাইক্লোনিক হিন্দুর" বিরুদ্ধে গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরীদের সরব নিন্দার ঘনঘটা। সেই শীতে ডেট্রয়েট শহরে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন আরও অনেকে। কিন্তু গতানুগতিক নিষ্প্রাণ এই বক্তৃতাগুলি সত্যানুসন্ধিৎসুদের নতুন কিছুই দিতে পারেনি, বরং এনেছিল চিরাচরিত হতাশার পুনরাবৃত্তি।

এমনিই এক সময়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪-এর অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় এক "আশাবাদী" শ্রোতা মিসেস ফাঙ্কি নিয়ে এসেছিলেন আর একজন সহযাত্রীকে—ক্রিশ্চিন গ্রিনস্টাইডেল। অনেকটা অনিচ্ছুক এবং সন্দিগ্ধ হয়েই এসেছিলেন সেদিন ক্রিশ্চিন ইউনিটেরিয়ান চার্চের দোরগোড়ায় অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে। এসেছিলেন শুধু ফাঙ্কির অনুরোধে যিনি বিশ্বাস করতেন এভাবেই খেপার মত খুঁজে খুঁজে হয়ত কোনদিন বা পাওয়া যাবে পরশপাথর।

জীবনের কত বড় একটা নবদিগন্তের দর্শন যে সেদিন পেতে যাচ্ছিলেন এবং এই নতুন দিগ্‌দর্শন যে তাঁর জীবনে কত বড় আমূল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছিল তার সামান্যতম আভাসও স্বামীজীর দর্শনের আগে ক্রিশ্চিনের মনে ওঠেনি। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল "মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব"—যে দেবত্বের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন। "নরেন্দ্রকে আমি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি", বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভাষণ শুরু হবার কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই গভীর অনুভূতির ভাবরাজ্যে ডুবে গিয়েছিলেন সেদিনকার এই দুই শ্রোতা—ফাঙ্কি আর ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের ভাষাতেই তাঁর দীর্ঘ অনুভূতির কিছুটা তুলে ধরছি—"নিঃসন্দেহে পূর্বের অগণিত জন্মজন্মান্তরেও আমরা এত বড় একটা পদক্ষেপ কখনো নিইনি। কারণ বিবেকানন্দকে পাঁচ মিনিট শোনার আগেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম সেই পরশপাথরের সন্ধানই পেয়েছি যা আমরা এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। এক নিঃশ্বাসে দুজনেই বলে উঠেছিলাম, 'ভাগ্যিস এসেছিলাম!'"[১]

---

১ Reminiscences of S. Vivekananda p. 160

ধার্মিক লোক শীর্ণকায় হয় এইতো সবাই জানতো। কিন্তু শক্তিমান আধ্যাত্মিক পুরুষের কথা কে কবে শুনেছিল? এই অদ্ভুত ব্যক্তিটির কাছ থেকে শক্তির যে বিচ্ছুরণ হচ্ছিল তার তুলনায় সকলকেই অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মানসিক ব্যক্তিত্বটাই প্রথম বিরাটের সাড়া জাগিয়ে ছিল আমাদের মধ্যে···আমরা অনুভব করেছিলাম এরকম একটি মন সাধারণের এমনকি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদেরও বহু ঊর্ধ্বে, এঁর প্রকৃতিটাই স্বতন্ত্র ধরনের। এঁর মনের ধারণাগুলি এত স্বচ্ছ, এত শক্তিশালী এবং এত ঊর্ধ্বজাগতিক প্রতিভাত হয়েছিল যে, আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই সব ভাব কোন একটি সীমায়িত মানুষের অন্তর থেকে আসতে পারে।"[২]

ক্রিশ্চিনের জীবনস্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি সেদিনের প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজী কত বহুবিচিত্র সুরে ও কথায় কখনও হাসি, কখনও গভীর চিন্তা, কখনও আশা, কখনও উচ্চতম আদর্শবাদ এবং কখনও গভীরতর হৃদয়াবেগ ও করুণ সুরে বারবার ব্যক্ত করেছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার চূড়ান্ত বাণীটি—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সিংহ আর মেষশাবকের গল্পটিও ব'লেছিলেন। ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি অভিভূত আনন্দে শুনেছিলেন "মানুষ ভ্রমবশতঃ দরিদ্রের বেশে চিরদিন হেঁটে চলেছে স্বর্ণখনির ওপর দিয়ে।" তাঁর দেবত্বকে ধীরে ধীরে জানতে হয় না, ক্রমে ক্রমে বিকাশও করতে হয় না, তা একটি চিরন্তন সত্য এবং চিরদিনই বর্তমান। শুধু অনুভব করলেই হল। অনুভূতির তীব্রতায় ঋষিকণ্ঠ সেদিন ফেটে পড়েছিল শ্রোতাদের অন্তর উদ্ভাসিত করে উপনিষদের বাণী নিয়ে— "তত্ত্বমসি" আর "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। সেদিন ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্লাটফর্ম থেকে ক্রিশ্চিন যা শুনেছিলেন তা শুধু বক্তৃতা নয়, দর্শনচর্চা নয়, মনন-শীলতা নয়, বুদ্ধির প্রাখর্যও নয়। ক্রিশ্চিনের ভাষায় তা হ'ল "a trumpet-call to awake. One felt one never knew what music was until one heard that marvellous voice." "জাগরণের তূর্যনিনাদ। সে অমৃতস্যন্দী কণ্ঠস্বর শোনার আগে সঙ্গীত কাকে বলে তা যে অজানা থেকে যায়,—তা অনুভব না করে পারে না কেউ।' "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—কাবমুখনিঃসৃত এই দেবভাষা সেদিন তাঁদের অন্তরকে জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু ঊর্ধ্বে এক "purer and rarer atmosphere, his own radiant atmosphere"-এ, 'পবিত্রতর দুর্লভতর পরিবেশে, তাঁর সান্নিধ্যের আনন্দ-ভাস্বর পরিবেশে' তুলে নিয়েছিল। সেখান থেকে বক্তৃতাশেষে ফিরে এসে দুজনেই অনুভব করেছিলেন "was it possible to hear and feel this and ever be the same again?"[৩] 'এ শোনার পরও, এরূপ অনুভূতির পরও কি আগের মতোই থাকা যায়?'

সে অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চের অগণিত শ্রোতার মধ্যে

বিবেকানন্দের দেববাণীর কি প্রভাব পড়েছিল আজ প্রায় ৮০ বছরের ব্যবধানে তা সঠিক জানা সম্ভব নয়। তবে ডেট্রয়েট নগরীতে সংবর্ধনার কথা আমরা কিছু পাই সমসাময়িক সংবাদপত্র-মারফত। মিশনারীরা হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে-পরিমাণ দলবদ্ধ বিরোধিতা ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ করেছিল তা মেরী লুই বার্ক "Climax at Detroit and the warrior Prophet" ইত্যাদি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের অজ্ঞ এবং কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রচলিত হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী তাঁর মা তাঁকে কুমীরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন কিনা, ভারতীয়েরা বিধবা পোড়ায় কিনা; অথবা জগন্নাথের রথের তলায় ইচ্ছে করে প্রাণবিসর্জন করে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন। সহজেই অনুমেয় যে, সেদিনের বহু শ্রোতার মাঝখান থেকে ক্রিশ্চিনের মতো স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্যা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর উদ্ভব বিবেকানন্দ-জীবনের এক অভিনব আবিষ্কার।

ক্রিশ্চিনের জন্ম জার্মানীর নুরেনবুর্গ শহরে ১৮৬৬ সালের ১৭ই আগস্ট। কান্ট-হেগেল-স্পিনোজার দেশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল গভীরমননশীল এবং সত্যানুসন্ধী এই চরিত্রটির ধমনীতে। দার্শনিক চিন্তাশক্তিতে ছিল ক্রিশ্চিনের জন্মগত উত্তরাধিকার। তিন বছর বয়সে শিশু ক্রিশ্চিনকে নিয়ে পিতামাতা সুদূর জার্মানী ছেড়ে চলে এসে-ছিলেন আমেরিকার ডেট্রয়েট নগরীতে স্থায়ী বসবাসের জন্য। পিতা ফ্রেডারিক গ্রীনস্টাইডেল ছিলেন একজন জার্মান পণ্ডিত। তাঁর চরিত্রে ছিল উদারতা ও স্বাধীন চিন্তার প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের অভাব। তাই সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেননি। মাত্র সতের বৎসর বয়সে যেদিন পিতাকে হারিয়েছিলেন ক্রিশ্চিন, সেদিন থেকে প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর তাঁকে কঠোর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পিতা কিছু রেখে যেতে পারেননি। দুঃখিনী মা আর পাঁচটি ছোট বোনের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কার্য যুক্তরাষ্ট্রের মত জীবনযাত্রার উচ্চ মানের দেশে যে কতখানি দুঃসাধ্য কর্ম তা আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারব না। ক্রিশ্চিন ছিলেন জন্মগত শিক্ষয়িত্রীও বটে, যার পরিচয় উত্তরজীবনে আমরা বিস্তৃত-ভাবে পাব। ক্রিশ্চিন শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডেট্রয়েট ফ্রি পাবলিক স্কুলে। আর তার সঙ্গে যুঝেছিলেন পারিবারিক দারিদ্র্যের অসহনীয় জ্বালার বিরুদ্ধে। বিধাতার এই কঠোর বিধান নিতান্ত অল্পবয়সেই ক্রিশ্চিনের জীবনে এনেছিল দুটি ভাবের সমন্বয়। একটি সাংসারিক আনন্দের প্রতি অনাসক্তি আর একটি সংসারের পরপারে কোন মহাজীবনের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। চরম দুঃখের দিনেও ধর্মকে ক্রিশ্চিন ছাড়েননি। কিন্তু সেদিনকার নিষ্প্রাণ বাক্‌সর্বস্ব শতধাবিভক্ত ক্রিশ্চান চার্চের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন এই নারী। ডেট্রয়েটের প্রথম ক্রিশ্চান সায়েণ্টিস্ট দলের সদস্য হয়েছিলেন ক্রিশ্চিন। কিন্তু সেখানেও মেলেনি জীবনসমস্যার সমাধান। উত্তরকালে জীবনসায়াহ্নে স্বামীজীর দৈব-সান্নিধ্যের উল্লেখ করে ক্রিশ্চিন বলেছিলেন, "সকলেই তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, নানা

সমস্যার উত্তর জেনে নিয়েছিল। আমার কিন্তু স্বামীজীকে এই কষ্ট দেবার কথা মনেই ওঠেনি।...সেই জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে এসেই সব সন্দেহের অবসান হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার প্রথম ক'টি বাক্য শোনার পরে সবসময়েই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।"[৪] এই বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হতাশা-উদ্দীপনার টানাপোড়েনের মধ্যে অনেকটা ঈশ্বরের সান্নিধ্যের মতোই নেমে এসেছিলেন যুগর্ষি বিবেকানন্দ। আবাল্যের জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন ক্রিশ্চিন।

প্রাচ্যদেশীয় অর্থে 'গুরু' কাকে বলে জানতেন না পাশ্চাত্য নারী। কিন্তু প্রথম দর্শনেই ক্রিশ্চিন এই অপরিজ্ঞাত ভারতীয় ঋষির পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। প্রথম বক্তৃতার অনুভূতির গভীরতায় ক্রিশ্চিন অনেকটা দিব্যভাবেই অনুভব করেছিলেন, "যদিও এই ভাবগুলি অত্যাশ্চর্য এবং এই বিস্ময়কর বক্তার অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত অতীন্দ্রিয় এক সত্তা ( intangible something ) দৈবভাবেই আমাদের স্পর্শ করেছিল, তবুও মনে হয়েছিল এসব আশ্চর্যভাবেই আমার পূর্ব-পরিচিত। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠেছিলাম, 'পূর্বে কোথাও না কোথাও আমি জেনেছি এই ব্যক্তিত্বটিকে।' সূর্যরশ্মিঘনীভূত আলোর মত এক স্বর্ণাভ রক্তিম আভায় স্বামীজী সেদিন ফেটে পড়েছিলেন আমাদের ওপরে।"

"রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য"—ক্রিশ্চিনের মনে সেদিন পূর্বজন্মজন্মান্তরের অস্ফুট স্মৃতির কতখানি উদিত হয়েছিল তা বলা দুঃসাধ্য। তবে উত্তরকালের বিবেকানন্দগতপ্রাণ এই মহীয়সী নারীর ত্যাগ আর সাধনোজ্জ্বল জীবন দেখে প্রথম দর্শনের এই স্মৃতি অভ্রান্ত বলেই মনে হয়। স্বামীজীর সেবারের ডেট্রয়েটের প্রতিটি বক্তৃতাতে গিয়েছিলেন ক্রিশ্চিন আর তাঁর আশাবাদী বন্ধু ফাঙ্কি। সাগ্রহে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আরও দশজনকে। বলেছিলেন, "এসো। এই আশ্চর্য বক্তার কথা শোনো। এরকম আমরা কখনও আগে শুনিনি।"

সেবার স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি কারও। ধূমকেতুর মত বক্তৃতাসফর শেষ করে মাত্র কয়েকদিন পরেই ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ স্বামীজী চলে গিয়েছিলেন ডেট্রয়েট শহর ছেড়ে। পেছনে ফেলে গিয়েছিলেন দুই অপরিচিত ভাবী শিষ্যাকে। ক্রিশ্চিন আশা ছাড়েননি, ফাঙ্কিও। কোন এক অজ্ঞাত প্রেরণায় দু'জনেই বিশ্বাস করতেন—"কোনওখানে, কোনওভাবে গুরুদেব আমাদের আবার তাঁর দৈবসান্নিধ্যে শিক্ষা দেবেন।"[৫]

### সহস্রদ্বীপোদ্যানের স্বর্গীয় দিনগুলি

মুমুক্ষু প্রাণের এ আশা কল্পনাতীতভাবেই সফল হয়েছিল অচিরে। জনসমাকীর্ণ ডেট্রয়েটের পরিবর্তে সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপরে নির্জন বনমধ্যস্থ জনকোলাহল-

থেকে বহু দূরে সহস্রদ্বীপোদ্যানের শান্তিময় আবহাওয়ায় স্বামীজীকে পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি। ক্রমাগত বক্তৃতা করে ক্লান্ত হয়েছিলেন স্বামীজী, আর অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন এ রকম বক্তৃতাসফর করে পাশ্চাত্যের বুকে বেদান্তের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কতগুলি পবিত্র জীবনে উচ্চতম বেদান্ত-সত্যগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে। এ ভাবে গড়ে ওঠা মুষ্টিমেয় কয়েকটি চরিত্রই দৃঢ়ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করবে বেদান্তধর্মকে। স্বামীজী খুঁজ-ছিলেন কয়েকটি অনুরাগী পবিত্র জীবন আর একটি উপযুক্ত স্থান। দুটোই এসেছিল। মিস্ ডাচার নামে স্বামীজীর এক অনুরাগী সহস্রদ্বীপোদ্যানে তাঁর বাড়ীটি সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামীজীকে আহ্বান করলেন বেদান্ত শিক্ষা দেবার জন্য, আর নিষ্ঠাবান ভক্তরাও এসেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "যারা তিন শ' মাইল পাড়ি দিয়ে এই নির্জন আশ্রম-পরিবেশে আসতে পারে তারাই আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত।"[৬]

তিন শ' নয়, সাত শ' মাইল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভাবী গুরুর পদপ্রান্তে এসে পড়েছিলেন দুই শিষ্যা, ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি। কেউ ডাকেনি, খবরও কেউ দেয়নি, শুধু শুনেছিলেন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে চলে এসেছেন। এসেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৩ই জুন এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিতে, অজানা পার্বত্য পথে। দুজনেই আগ্রহে অধীর, সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। সন্ধান করে জানলেন মিস ডাচার নামে জনৈকা ভদ্রমহিলার বাড়ীতে এক অদ্ভুতদর্শন ব্যক্তি এসেছেন। দুজনেই বুঝলেন ঠিকানা মিলেছে। দ্বারপ্রান্তে যখন এসে পৌঁছালেন ওপরে শোনা গেল স্বামীজীর সেই কণ্ঠস্বর যা ডেট্রয়েটের সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় মহাজীবনের ডাক দিয়েছিল। অভূতপূর্ব আবেগে দুজনেই কাঁপছিলেন, শুনতে পাচ্ছিলেন নিজেদের হৃদস্পন্দন।

জন্মান্তরের গুরুসান্নিধ্য। দর্শনমাত্রেই পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলেন দুজনে। গভীর আবেগে ক্রিশ্চিন বলেছিলেন, "আজ ভগবান যীশু পৃথিবীতে স্থূল শরীরে থাকলে আমরা যেভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে আসতাম, আপনার কাছে সে আশা করেই এসেছি।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "হায়, যদি যীশুর মতই আমিও এখনই তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম!" উত্তরকালে এই দুই মহাপ্রাণ শিষ্যার সম্বন্ধে বলতেন স্বামীজী, "শত শত মাইল অতিক্রম করে আমাকে খুঁজতে এসেছিল এরা, আর এরা এসেছিল এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে।"

যে বারজন মার্কিন নরনারী সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কাছে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র ক্রিশ্চিনকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ভারতের সেবিকা হিসাবে। দীক্ষার পূর্বদিন স্বামীজী মানসনেত্রে ক্রিশ্চিনের ভবিষ্যৎ ভারত-জীবনের পূর্ণ ছবি দেখেছিলেন এবং অবিশ্বাস্য ভাবেই তাকে জানিয়েছিলেন অনাগত দিনের

৬ Reminiscences p. 126

ইতিহাস—ভারতে কোথায়, কিভাবে, কতদিন তার জীবন কাটবে। মানস নেত্রে দেখেছিলেন এই মহীয়সী নারীই হবে ভারতের বেদীতে বিবেকানন্দের প্রথম উৎসর্গীকৃত ফুল আর এই সেবার ফলশ্রুতি হিসাবে এই জীবনেই ক্রিশ্চিনের তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে, তাও দেখেছিলেন গুরু বিবেকানন্দ।[৭] মহামায়ার কাজের জন্য পুণ্যভূমির বেদীতে স্বামীজী দিলেন পাশ্চাত্যের একটি পবিত্রতম জীবন। সহস্রদ্বীপোদ্যান। ১৮৯৫।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের সাতটি সপ্তাহ স্বামীজীর স্বল্পায়ু জীবনের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নিউইয়র্কের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা আর নানা বাধাবিপত্তির বেড়াজাল চিরমুক্ত সন্ন্যাসীমনটিকে করে তুলেছিল শান্ত ও মুক্তজীবনের জন্য লালায়িত। সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে মানুষটি এসেছিলেন তিনি "cyclonic Hindu" নন, "Warrior prophet" নন, বৈদ্যুতিক বক্তা নন, বরং ঠিক তার বিপরীত—আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ ঋষি, করুণাময় বুদ্ধহৃদয়, মায়ামুক্ত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক, তরুতলবাসী সন্ন্যাসী, যাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল—মুক্তি। এখানেই তিনি লিখেছিলেন মুক্তির মহাসঙ্গীত—Song of the Sannyasin। উত্তরকালে এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে[৮] স্বামীজী বলতেন, পাশ্চাত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছিল এই ধ্যানক্ষেত্রে।

সেন্টলরেন্স নদীর ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। অধিকাংশই নির্জন বনানীসংকুল। দূরদিকচক্রবাল-বিসর্পিত অসীম আকাশ, অখণ্ড স্তব্ধতা। এরই মাঝখানে সবচেয়ে বড় দ্বীপটি হল সহস্রদ্বীপোদ্যান। খাড়া পাহাড়ের ওপর আশ্রম-পরিবেশে বাড়ীটি অবস্থিত। সকাল সন্ধ্যা বিকেল রাত্রি স্বামীজী সকলকে ভরিয়ে রাখতেন এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক ভাবের নেশায়। শরীরধারণের নিতান্ত প্রয়োজনগুলোর বাইরে সেই সাতটি সপ্তাহ ধরে বিবেকানন্দগতপ্রাণ শিষ্যেরা একটি বস্তুই অনুভব করেছিলেন—ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য।

সাধারণতঃ সকলকে নিয়ে স্বামীজী বসতেন সন্ধ্যার পরে। বক্তৃতা করতেন না। গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যেতেন, সে সব স্বর্গীয় বাণী জনৈকা শিষ্যা মিস ওয়াল্ডো অথবা সিস্টার হরিদাসী অমূল্য Inspired Talks (দেববাণী) নামক বইটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সে বৈদ্যুতিক বাণীর স্পর্শে শিষ্যদের মন উঠে যেত এক ঊর্ধ্বজাগতিক রাজ্যে। আবার কখনও সব ভাষা নীরব হয়ে ডুবে যেত ধ্যানের গভীরতায়। স্বামীজী ডুবে যেতেন গভীর ধ্যানে। সে মহামৌন ধ্যান কখন চলত মধ্যরাত্রি কিংবা শেষরাত্রি পর্যন্ত। স্বামীজী যেন আবার তাঁর নিজস্ব ধ্যানসমাধির জগৎকে ফিরে পেয়েছিলেন সহস্রদ্বীপোদ্যানের মৌনমহান নিঃশব্দ অরণ্যের গভীরতায়। তাই পাশ্চাত্যে থাকাকালীন এখানেই প্রথম স্বামীজী সমাধিমগ্ন হন,

৭ Prabuddha Bharata, 1930 p. 421

৮ Reminiscences, p. 165

যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন মিসেস্ ফাঙ্কি তাঁর স্মৃতিকথায়। ধ্যান-স্তিমিত স্বামীজীর সান্নিধ্যে শিষ্যরাও ডুবে যেতেন গভীর ধ্যানে। কোন কোন দিন ধ্যান সুদীর্ঘ হোতো না। স্বামীজী আবার সুরু করতেন দেববাণী। অদ্ভুত আকর্ষণ সে সব কথার। দৈবপ্রেরণার উম্মাদনায় কতদিন সারারাত কেটে গিয়েছে, ভোরের আলো এসেছে। শিষ্যরা বুঝতেও পারেননি স্বামীজী কি ভাবে, কেমন করে তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন জগদতীত এক রাজ্যে যেখান থেকে প্রাত্যহিক জগতে নেমে আসাটা ছিল এক বেদনাময় অনুভূতি।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলিই ক্রিশ্চিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অধ্যায়। স্বামীজীর স্বল্পায়ু দেবদুর্লভ জীবনেও এই সাতটি সপ্তাহ এক অবিস্মরণীয় সময়। মর্মস্পর্শী ভাষায় ক্রিশ্চিন এই অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে বর্ণনা করেছেন। সপ্তর্ষির একজন, অখণ্ডের ঘরের অধিকারী জগতের সমস্ত মায়িক বন্ধনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এখানে গেয়েছেন মুক্তির মহাসংগীত—The Song of the Sannyasin, যে মুক্তির আনন্দে 'গণ্ডারবৎ' বিহার করতেন এই আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ কৌপীনবান সন্ন্যাসী, অসীম করুণায় সেই মুক্তির অমৃতধারা বয়ে এনে দিতে চেয়েছিলেন মুষ্টিমেয় এই কয়েকটি মুমুক্ষুর জীবনে। মর্মস্পর্শী সুরে কখনও বলতেন 'Ah, if I could only set you free with a touch'—'হায়, যদি কেবলমাত্র স্পর্শ দিয়েই তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম।'[১] আবার পর মুহূর্তেই পিঞ্জরমুক্ত কেশরীর মতো যখন শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন "This indecent clinging to life" 'জীবনের প্রতি এই ঘৃণ্য আসক্তি' এই বলে, তাদের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য সরে যেত সমস্ত মায়িক বন্ধন; উদ্ভাসিত হত মুক্তির নবদিগন্ত। "সাবধান! মায়া সবচেয়ে বড় ছলনা, মুক্ত হও। কত শতবার আমরা এই মুক্তিকে বিকিয়ে দিয়েছি চিনির পুতুলের আকর্ষণে। আর নয়, এই অমূল্য সম্পদকে বিকিয়ে দিয়ো না কতগুলো ভ্রান্তির পিছনে ছুটে" — বলতে বলতে উন্মত্ত হয়ে যেতেন আত্মস্বরূপ বিবেকানন্দ, অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টি নিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উন্মত্তের মত ছুটে যেতেন শিষ্যদের একজনের কাছে আর চীৎকার করে ফেটে পড়তেন—"মনে রেখো ঈশ্বরই একমাত্র সত্য", "উন্মত্তের মত". ক্রিশ্চিন লিখেছেন, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্য, উন্মত্ত"।

কি পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন এই অবিস্মরণীয় দিনগুলির মধ্যে? তিনি কি আভাস পেয়েছিলেন মুক্তস্বরূপের? তিনি কি অনুভব করেছিলেন ঊর্ধ্বদৈহিক আত্মাকে? অথবা তিনি কি আস্বাদ পেয়েছিলেন সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত নির্বাণশান্তির? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে নিজের জীবনের একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "জগতের কোন শব্দের দ্বারা এই ভাব বর্ণনা করা যাবে না। কারণ এর মধ্যে জাগতিক কিছুই নেই। শুধু নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা আর স্তব্ধতা। এই কি নির্বাণশান্তি? জীবনের জটিল প্রবাহ আর ঘূর্ণিবাত্যা এই প্রথম

১ Prabuddha Bharata, 1930, p. 420

সম্পূর্ণ স্তব্ধতায় ডুবে গেল। এতে নেই কোন আবেগ, নেই আশা, নেই ভয়, আনন্দ অথবা দুঃখ। না না, নেতি নেতি। কখনও আর এত গভীর শান্তি অনুভব করিনি। সুগভীর শান্তির নিদ্রায় ডুবে গেলাম।[১০]

**ভারতবর্ষ**

স্বামীজীর কাছ থেকে আর একটি নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। তা হল—ভারতবর্ষ। স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলেন ভারতের পূর্ণতার রূপ; স্বামীজীর কণ্ঠে শুনেছিলেন ভারতের চিরন্তন বাণী। ক্রিশ্চিন লিখেছেন, স্বামীজী যেদিন "India" কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিনই তাঁর মধ্যে প্রথম জেগেছিল ভারতের প্রতি ভালবাসা। কখনও বা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, folklore থেকে প্রাচীন আখ্যান বলতেন স্বামীজী, আব র কখনও বা উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মনে আনতেন গভীরতর আলোড়ন। স্বামীজীর কণ্ঠে যখনই উচ্চারিত হত "India"—ক্রিশ্চিন অনুভব করতেন এক মহাসংগীতের ঐক্যতান যার মধ্যে তিনি শুনতেন নানা সুর—কখনও "love", কখনও "passion", কখনও "pride", কখনও "longing", কখনও "adoration', কখনও "tragedy", আর সর্বোপরি প্রেম। শত শত বই পড়েও ভারতের প্রতি যে প্রেম কখনও জাগত না, স্বামীজীর একটি কথাতেই শ্রোতারা অনুভব করতেন এই পুণ্যভূমির প্রতি সেই উচ্ছ্বসিত প্রেম। ক্রিশ্চিনের ভারতপ্রেমের সূচনা ডেট্রয়েটের এই বিবেকানন্দ-বক্তৃতাবলী। জীবন-স্মৃতিতে ক্রিশ্চিন বলেছেন, "এর পর থেকে ভারতবর্ষই হয়েছিল আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সবকিছু—তার জনগণের ইতিহাস, স্থাপত্য, রীতিনীতি, তার নদী পর্বত সমতলভূমি, তার সভ্যতা, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব এবং তার শাস্ত্র—এ সবই আমার কাছে হয়ে গিয়েছিল পরম আগ্রহের বস্তু এবং জীবন্ত। এইভাবে শুরু হয়েছিল এক নতুন জীবন—পড়াশুনার এবং ধ্যানের। The centre of interest was shifted."[১১]

ভারতে আসার আহ্বান ক্রিশ্চিন পেয়েছিলেন সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলো থেকেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আরও ৭টি বছর কেটে গিয়েছিল এ আহ্বানে সক্রিয় সাড়া দিতে। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে ক্রিশ্চিন পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেন ছোট বোনদের মানুষ করে। মায়ের মৃত্যুর পর চলে এলেন ভারতবর্ষে। প্রথমে উঠেছিলেন নিবেদিতার কাছে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে, যেখানে ৪ বৎসর আগে থেকেই ভারতীয় ধারায় প্রথম নারীশিক্ষার পত্তন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ক্রিশ্চিনের ধ্যানের ভারতবর্ষ। যে কয়দিন বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে ছিলেন প্রায়ই গুরুদর্শন করতে যেতেন বেলুড়মঠে, গঙ্গার ওপর দিয়ে খেয়া

১০ Reminiscences, p. 163
১১ Prabuddha Bharata, 1930, P. 420

পেরিয়ে। অপ্রত্যাশিত মহাসমাধির পূর্বে শেষ দু'মাস স্বামীজী প্রেমে, আশীর্বাদে, অনুপ্রেরণায় তার অভয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন সদ্যভারতাগত এই বিদেশিনী শিষ্যাটির অন্তর। এ সময়কার একটি স্মৃতি বড় মর্মস্পর্শী। প্রথম যেদিন বেলুড় মঠে এসেছিলেন তখন এপ্রিলের শুরু, ১৯০২। জীবিতাবস্থায় এই শেষবারের মত সবেমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দর্শন শেষ করেছেন স্বামীজী। ক্লান্ত, কিন্তু ক্রিশ্চিনকে অভ্যর্থনা করলেন পিতৃহৃদয়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ দিয়ে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকেই সেই দিনটির স্মৃতি তুলে ধরছি :

"আগে থেকেই খবর এসেছে তাই আজ বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যস্ততা। স্বামীজী সিস্টার ক্রিশ্চিনকে তাঁর ঘরের সামনে বসে খাওয়াবেন। ই সঙ্গে নিজেও বসে খাবেন। সব সরঞ্জাম প্রস্তুত। ঐদিন ঘরের ভিতরে বেশি একটি টেবিল আনা হয়। কন্যারত্নের পানসীখানি ঘাটের কাছে দেখা যাওয়া মাত্রই স্বামীজী তাঁর উপরের ঘরের জানালা থেকে হাত তুলে অভিনন্দন জানালেন। ক্রিশ্চিনও স্বামীজীর প্রতি চোখ পড়ামাত্র পানসীর উপর দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বহস্তে নমস্তে করলেন। সর্বপ্রথম স্বামীজীর শ্রীমুখ সন্দর্শন করবেন এই আশা বুকে নিয়ে আসছিলেন। অলক্ষ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তা পূর্ণ করলেন। কি অপার আগ্রহ, আকুতি, মুখে চোখে বৈরাগ্যের শ্রী, জগৎভ্রান্তির রেখা।"[১২]

মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে বোধহয় জ্ঞাতসারেই স্বামীজী ক্রিশ্চিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আলমোড়ায়। অপ্রত্যাশিত এই মহাপ্রয়াণের পরে ক্রিশ্চিনের মানসিক অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন। সুদূর আমেরিকায় গৃহপরিজন ছেড়ে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে প্রায় নিঃসম্বল হয়েই তিনি ভারতে এসে-ছিলেন স্বামীজীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ত্যাগসমুজ্জ্বল পবিত্র এক সন্ন্যাস-জীবন যাপনের জন্য। এই অপ্রত্যাশিত বজ্রাঘাতে সে সংকল্পের উপর সামান্যতম সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল বলে আমরা জানি না। গুরু নেই। কিন্তু গুরু-নির্দেশিত পথ রয়ে গেছে। জাগতিক সহায় হয়ত অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু হৃদয়ে স্বামীজীর জাজ্বল্যমান উপস্থিতি, আর অন্তরে অফুরন্ত প্রেরণা অনুভব করে-ছিলেন। ক্রিশ্চিন সেদিন গুরুভগিনী নিবেদিতার মত গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শান্ত, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে পা বাড়ালেন নতুন এই জীবন-সাধনার পথে। ওয়াহ্ গুরুজীকী ফতে।

পরবর্তী দীর্ঘ ১২ বছর এবং পরে আরও দু'বছর ভারতবর্ষে এবং ১৬ বছর আমেরিকায় ক্রিশ্চিন এই নীরব মুক্তি সাধনাই করেছিলেন চরম পবিত্রতা, প্রেম, সেবা আর নিঃশব্দ শান্ত আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে নারীশিক্ষাদানের আদেশ স্বামীজীই তাঁকে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় নারীসমাজকে কি করে শিক্ষা দিতে হবে

১২ Reminiscences, p. 224

সে বিষয়ে আমেরিকায় বহুবার সবিস্তারে স্বামীজী আলোচনা করেছিলেন শিক্ষাব্রতী এই শিষ্যার সঙ্গে। যে বিভাগটিকে শিক্ষিত করে তোলার কথা স্বামীজীর মনে হয়েছিল সেটি হল—বালবিধবা; সমাজে একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষী এবং নীরব যন্ত্রণায় কাতর এই নারীসমাজ। এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বিহ্বল হয়ে পড়তেন। ক্রিশ্চিন লিখেছেন—'নারীসমাজের এই শ্রেণীটিকেই স্বামীজী বিশেষভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। অর্থোপার্জনের দিক দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তুলতেই হবে।" স্বামীজী বলতেন।...আর বলতেন, "এদের শিক্ষিত করে তোলা অবশ্যই দরকার।[১৩]

## নারীজাগরণের নতুন তীর্থ

"আধুনিক ভারতের নারীজাগরণের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতার এক অখ্যাত পল্লীতে—বাগবাজার, ১৭ নং বোসপাড়া লেন—অবতারলীলাসঙ্গিনী শক্তিরূপীণী শ্রীশ্রীমা আর যুগাচার্য বিবেকানন্দ। সেদিন ছিল ১৮৯৮, ডিসেম্বর। প্রথম কর্ণধার হয়েছিলেন নিবেদিতা—ভারতের বেদীতে উৎসর্গীকৃত শিখাময়ী, লোকমাতা, সিংহিনী আইরিশ নারী মার্গারেট নোবল্। তাঁরই সঙ্গে আজ ৪ বছর পরে ১৯০৩ সালের শরৎকালে এসে জুটলেন ক্রিশ্চিন। যে বাণীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছিল আগামী যুগের ভারতীয় নারীর জন্য, তার কাঠামো তৈরি করলেন, রসদ যোগালেন নিবেদিতা। আর নিপুণ তুলিকায়, নিরলস সাধনায় এবং একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনে মূর্তিটির পূর্ণাঙ্গ রূপদান করলেন ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের আগে চলেছিল ছোট ছোট মেয়েদের ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য একটি experiment। ক্রিশ্চিনের আগমনের পরে এ শিক্ষা একটি নির্দিষ্টরূপে ফুটে উঠল। সাত বছর পরে (১৯১০ খ্রীঃ) ক্রিশ্চিনের এই অবদানের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ভারতীয় নারীদের জন্য সমগ্র কার্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের একাগ্রতা, দৃঢ়সংকল্প ও উদ্দেশ্যের একতানতা এবং আত্মত্যাগের ফলেই এই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। পূর্বে আমি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে মেয়েদের যে শিক্ষা দিতাম তাতে কিছু কিছু ফল হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ভগিনী ক্রিশ্চিন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করে বিবাহিতা ও বিধবা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যার ফলে আমাদের কাজের প্রসার বিশেষরূপে বৃদ্ধি পেল।"[১৪]

নিবেদিতার এই 'স্বীকারোক্তিটি' অনেক দিক দিয়েই মূল্যবান। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরেই শিখাময়ী নিবেদিতা ফেটে পড়েছিলেন বৃহত্তর ভারতের বহুবিস্তৃত

কর্মক্ষেত্রে—শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান আর মনীষীদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ছড়াবার এক aggressive zeal নিয়ে। নারীজাগরণের যে অমূল্য ভিত্তি-প্রস্তরটি স্থাপন করেছিলেন তার ওপর সৌধনির্মাণের মত সময়, ধৈর্য ও একাগ্রতা নিবেদিতার পক্ষে দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক এই সময়ে ক্রিশ্চিনের আগমন, বিদ্যালয়ের "সমগ্র" কার্যভার বহন এবং "বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ" সত্যদ্রষ্টা গুরুরই এক অভিপ্রেত আশীর্বাদ। নিবেদিতা বই লিখে চলেছেন—The Web of Indian Life—কিন্তু তা কেবল এই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যই। ক্রিশ্চিন তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর্থিক অনটনের জন্যই নিবেদিতাকে আমেরিকার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে যেতে হয়েছিল। এমন কি ক্রিশ্চিনকেও স্থানান্তরে শিক্ষকতাগ্রহণ করে কিছুকালের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে হয়েছিল বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে গুরুর স্বপ্ন—বিবাহিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার—ক্রিশ্চিন জীবনের ব্রত করে তুললেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্বোধন হ'ল পুরস্ত্রী বিভাগ। সমগ্র বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ক্রিশ্চিনের। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্যা মিসেস ওলি বুলের অর্থানুকূল্যে আরম্ভ হল এই বিভাগ। প্রথমে ৬০ জন ছাত্রী। পরে আরও আসতে শুরু করল। একদিন যেখানে দুই ভগিনীকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ছাত্রী খুঁজতে হত, আজ এমনিতেই তারা এল। পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন মহিলা গোঁড়া হিন্দুসমাজের মেয়েদের জন্য নিবেদিতা-ক্রিশ্চিনের পক্ষ থেকে বাংলা ও সংস্কৃত শেখাতে আরম্ভ করলেন।[১৫] কলকাতার তৎকালীন গোঁড়া সমাজও অনুভব করলেন বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যাদ্বয়ের প্রকৃত মহত্ব। নিবেদিতা লিখেছেন, "পরিশ্রমের ফলে আমরা আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, সমাজের লোকেরাও আমাদের আপন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, সবচেয়ে গোঁড়া পরিবারের পর্দানসীন মহিলারাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে আসতে চাইলেন তাঁদের ভগিনী অথবা পুত্রবধূদের নিয়ে। শুধু আমাদের দিক থেকে একমাত্র অসুবিধা হল শিক্ষা দেবার সাজসরঞ্জামের অভাবহেতু, আর মেয়েদের দিয়ে আসা আর নিয়ে আসার অসুবিধার জন্য ছাত্রীসংখ্যা সীমিত রাখতে হল।·····বাস্তবিকপক্ষে, হিন্দুসমাজ তাদের নারীদের একটি নতুন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির জন্য বিশেষভাবে সচেতন এবং ভগিনী ক্রিশ্চিনের পরিচালনায় বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (Vivekananda School) ফান্ডস্ এবং বিল্ডিং নিয়ে বড় আকারে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই গোঁড়া হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবে।"[১৬]

দুই ভগিনীই পাশ্চাত্যের "নতুন শিক্ষা" (New Education)-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং এ শিক্ষা দেবার জন্য আশ্চর্যভাবে তৈরী হয়ে

১৫ Prabuddha Bharata, (1930) p, 32

১৬ নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ( নিবেদিতা বিদ্যালয় ) পৃঃ ১২৮

এসেছিলেন ক্রিশ্চিন। আমেরিকায় থাকাকালীন অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন ধরে লাভ করেছিলেন তিনি। আর তার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন হিন্দু নারীর পবিত্রতা, সহনশীলতা এবং ধর্মবোধের আদর্শ। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় নারীর মহত্তম গুণাবলীর এই সমাবেশের জন্য সেদিনকার রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজের কাছেও ক্রিশ্চিন আদর্শ ভারতীয় নারীর সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এ গৌরবের পেছনে ছিল স্বামীজীর পুণ্যভূমি "ভারতবর্ষের" সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ যা ক্রিশ্চিন নিবেদিতার মতই পুরোপুরিভাবে লাভ করেছিলেন। দেখলে মনে হত বিদেশিনী। মিশলে মনে হত ভারতীয়ের চেয়েও ভারতীয়। সহায় নেই, সম্বল নেই, অর্থ নেই, ঘর নেই, আসবাবপত্র নেই—অথচ শিক্ষা আর শিক্ষার্থিণীর প্রতি কি গভীর ভালবাসা! জনৈক ছাত্রীর স্মৃতিকথা থেকে কিছুটা তুলে ধরছি—"আমি প্রথম স্কুলে যোগদান করি। তখন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে ছিলেন না। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি ; স্কুলের ভার ছিল সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানার উপর। যতদিন নিবেদিতা আসেননি. ক্রিশ্চিয়ানা আমাদের ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন। তিনি এত মাধুর্যময়ী ছিলেন যে, তিনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশী মনে করতাম ; যেন তিনি আমাদের কত আপনজন। তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়ার সময় ভুল করলে তাঁর সেই ক্ষমাপূর্ণ হাসি এখনো মনে হয়। ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা অনেকবার আমাদের কাছে তাঁর দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহস ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেছেন যা শুনে আশ্চর্য হতে হয়।"[৭]

স্বভাবের দিক দিয়ে দুই ভগিনী যেন বৈপরীত্যের সমাবেশ। নিবেদিতা—প্রচণ্ড তেজস্বিনী with aggressive missionary zeal, emotional এবং রুদ্র-বীর্যের প্রতীক আর ক্রিশ্চিন—শান্ত-মধুর অথচ সুগভীর, দৃঢ় ও অনমনীয়। একটি পত্রে নিবেদিতা লিখেছিলেন এই গুরুভগিনীর সম্বন্ধে, "শান্ত নির্ভরশীল—তার স্বভাবে ঔদ্ধত্য নেই, অনুগত ও সহৃদয়।"[১৮] সেদিনকার ১৭নং বোসপাড়া লেনের ভগিনীদের গৃহটি ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে এক শক্তি ও প্রেরণার উৎস। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাদ্বয়ের ত্যাগবহ্নিময় জীবনের দ্যুতি এবং মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সেদিন যেসব সুধী গুণগ্রাহী আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশনেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রীঅরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিকিৎসক নীলরতন সরকার, বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ বোস, লেডী অবলা বসু, লেখিকা-দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু, শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার, সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশবাবু তাঁর "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্যে" ভগিনী নিবেদিতার কথাপ্রসঙ্গে

একজায়গায় লিখেছিলেন—"নিবেদিতার এক সঙ্গিনী ছিলেন—ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, স্বভাবটি মিছরীর মত মিষ্টি।"

এই মিষ্টি স্বভাবের জন্য ক্রিশ্চিন মায়ের স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর ছাত্রীদের জীবনে। একবার যাঁরা এই পূতচরিত্রা ত্যাগী মহীয়সীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা আর কোনদিনই তাঁকে ভুলতে পারেননি। শিক্ষিকা হিসাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ছাত্রীর অন্তরের সহজতম সান্নিধ্যে আসার জন্যই ক্রিশ্চিন এর বিবেকানন্দ-বিদ্যালয়ের বিবাহিতা কিংবা বিধবা ছাত্রীরা এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। ১৯০৩ সালে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল একটি স্বল্পপরিসর গৃহে—সেলাই-এর কাজ, সুতোর কাজ, ছবি-আঁকা আর মুখে মুখে রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের গল্পসল্প দিয়ে, ১২ বছর পরে এ সাধনার ফলশ্রুতি হয়েছিল বিরাট আকারে, যার বিস্তৃত পরিচয় পাই ১৯১৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের পক্ষ থেকে তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে।

শুধু সমাজসেবিকা অথবা মিশনারী মনোবৃত্তি নিয়ে ক্রিশ্চিন আসেননি। ভারত তাঁর কাছে মুক্তিসাধনার পুণ্যস্থল। জনৈক অনুরাগী ভক্ত লিখেছিলেন, "তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর অনুভব করতাম ভারতবর্ষে থাকা আর ভারতবর্ষের সেবা করা এক মহা সৌভাগ্য।" তাই যে ব্যক্তিত্বটি ঢেকে ক্রিশ্চিন সহজভাবে একান্ত আত্মগোপন করে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন সেটি হ'ল—ব্রহ্মবাদিনীর রূপ। জনৈক পাশ্চাত্যবাসী ভারতে এসে এই পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর বিস্ময়ে লিখেছিলেন —"যে কণ্ঠটি আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল তা এত স্বচ্ছ ও মৃদু, এত মধুময়, এত অনুরণিত অথচ এত পবিত্র ও পূর্ণতর এবং সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত যে, ক্রিশ্চিনের প্রথম কথাটি শোনার পরই তাঁর পবিত্র, মাধুর্যময় এবং পূর্ণতায় ভরা আধ্যাত্মিক রূপটি প্রকৃতরূপে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সেই শীর্ণকায় ব্যক্তিত্বটির ঋজু স্থিরতা, গৌরবের ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ানো—পরিষ্কার যেন বুঝিয়ে দিল তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত নারী। প্রত্যেকটি চালচলনই যেন এই একই ভাব প্রকাশ করছিল।...মুখের সেই জ্বলজ্বলে আভা...এবং মাধুর্যমণ্ডিত, করুণ অথচ সুদৃঢ় রূপটি, এবং সর্বোপরি পরদুঃখকাতরতার ছাপটি, ছাঁচে ঢালা মুখটি যা রাজপুতানার শিল্পরীতিতে আঁকা তেজোময়ী সীতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়... যার মধ্যে সবসময় জ্বলছিল প্রাচ্যের ভঙ্গীতে তৈরী তাঁর বিস্ফারিত দুটো চোখ—যা হচ্ছে প্রাচ্যদেশীয় সাধিকার চোখ। ধ্যানস্তিমিত, প্রায়ই বাইরের জগৎ থেকে আবৃত...পদ্মপলাশ নেত্র যার নীল-কালো-আবছাসাদা পর্দার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল অন্তরের আলো।"[১৯]

আশ্চর্য! পাশ্চাত্যবাসীও অভিভূত না হয়ে পারেননি। বিবেকানন্দ-শিষ্যার আধ্যাত্মিক মহত্ত্বে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে জনৈক পাশ্চাত্য সাংবাদিকের কথা যিনি

১৯ Prabuddha Bharata (1930), P. 422

আমেরিকায় বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিতদের কয়েকজনকে দেখে লিখেছিলেন, "There is a glow about everyone who is in some or other way associated with Vivekananda"

ভারতের নারীজাগরণের আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এতবড একটি পদক্ষেপ, একটি যুগান্তর আনার জন্য যে সুদীর্ঘ একটানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ফলে ভগিনী নিবেদিতার জীবনাবসান হ'ল নিতান্ত অল্প বয়সেই—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মাত্র ৯ বৎসর পরে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা হিমালয়ের কোলে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন। মাত্র কয়েক মাস আগে বস্টনে চিরবিদায় নিয়েছিলেন ক্রিশ্চনের জীবনের আর এক পরমাত্মীয়া মিসেস ওলি বুল—স্বামীজীর ধীরামাতা।

মিসেস বুল আর নিবেদিতার অন্তর্ধানের পরে ক্রিশ্চন পড়ে রইলেন একা গুরু-নির্দিষ্ট সাধনার প্রদীপটি জ্বালিয়ে অতি যত্নে। মিসেস বুলের অর্থানুকূল্য আর নিবেদিতার বিরাট সহযোগিতার অভাবের জন্য ক্রিশ্চনকে একাকী আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলতে হল আরও তিনটি বছর, বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু সব সংগ্রামেরই মূল্য দিতে হয়। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯১৪ সালে ক্রিশ্চনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। এই অসুস্থতা থেকে উঠে ক্রিশ্চন ফিরে চললেন আমেরিকায়—পুরানো আত্মীয়স্বজনকে একবার দেখবার আশায়। পেছনে পড়ে রইল স্বামীজীর ভারতবর্ষ। আর বোসপাড়া লেনের ছোট্ট বিদ্যালয়টির সাধন-জগৎ আর জীবন-সংগ্রামের পরাজয় ও পরমুখাপেক্ষীর গ্লানি থেকে মুক্ত অগণিত ছাত্রীর জন্য শুভেচ্ছা, ভালবাসা আর আশীর্বাদ।

**বেদান্ত-প্রচার ঃ**

১৯১৩। প্রতীচ্যের পুরানো ঘরে মেয়ে আজ ফিরে এসেছে প্রাচ্যের তপস্বিনীর রূপে। সেই ডেট্রয়েট—যেখানে ২০ বছর আগে পরশমণির সন্ধান পেয়েছিলেন ক্রিশ্চন। আজ সেই পরশমণির ছোঁয়ায় আর তপস্যার আগুনে জ্বলে ক্রিশ্চন ফিরে এসেছেন পুরানো ঘরে সংসার-সুখের আত্মীয়স্বজনের স্নেহচ্ছায়ায় ডুবে যাবার জন্য নয়, পাশ্চাত্যে শ্রীগুরুর বাণী বহন করতে। বহুদিন আগে স্বামীজী তাঁদের কাছে বলেছিলেনঃ "আমেরিকানরাই আমেরিকাতে যেদিন বেদান্তপ্রচার করবে সেদিনই ঠিক হবে।" আজ এতদিন পরে দৈবনির্দেশেই যেন ক্রিশ্চন গুরুর আর একটি দায়, আর একটি স্বপ্ন সফল করতে এসেছেন।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী বলেছিলেন, "দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষি-মুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।"

দেশীয় নারী যাবার বহুবর্ষ আগেই ক্রিশ্চন গিয়েছিলেন বৈরাগ্যদীপ্তা ভারত-বাসিনীর বেশে পাশ্চাত্যের দ্বারে।

আমেরিকাবাসিনী ক্রিশ্চন সেদিন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি—পোশাক, পরিচ্ছদে, চিন্তায়, কাজে কথায় আর ধ্যানে।

গিয়েছিলেন আত্মীয়দের প্রতি তাঁর কর্তব্যপালন করে কর্মভূমি ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন ভেবে কিন্তু বিধাতা সে সংকল্প ভেঙে দিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ। আমেরিকাতে তার সুদূরপ্রসারী ফলে যে গোলযোগ শুরু হ'ল তার জন্য দীর্ঘ দশ বছর ক্রিশ্চনকে আমেরিকাতেই থাকতে হ'ল। ক্রিশ্চনের উপস্থিতিতে বেদান্তে উৎসাহী একদল ছাত্রছাত্রী নতুন করে অনুপ্রেরণা পেলেন। তাদের কাছে ক্রিশ্চন এ সময়ে ভারতবর্ষ ও বেদান্তদর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতাদি দিতেন। প্রাচ্যের ব্রহ্মবাদিনী সন্ন্যাসিনীর মুখে এই বেদান্তব্যাখ্যা যাঁরা সেই সময় শুনেছিলেন তাঁদের একজন Elizabeth King লিখেছিলেন: "তাঁর নির্ভুল ভাষা, সুললিত স্বর, যেন কোন প্রাচীনকালের মন্দির থেকে আগত নারী-পুরোহিতের রূপ—এ সবের জন্য বক্তৃতা শোনাও ছিল অসীম আনন্দের ব্যাপার। কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা ছাড়া, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ভারতবর্ষকে জানতে এবং ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, তাঁর সব ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল একটিই—যা ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত করা যায়—"By Me all this world is pervaded in My manifested aspect. Having manifested this universe with one fragment of My glory, I remain." "কিন্তু এই তত্ত্বটিকে এত বহুল গল্প-কথার মাধ্যমে এবং এত বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রোতৃবৃন্দ গভীরভাবে সেই তত্ত্বের ভাবে ডুবে যেতেন।"[২০]

**শেষ তপস্যা:**

১৯২৪ সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আরম্ভের দশবছর পরে ক্রিশ্চন আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে পুরানো কাজে আবার আত্মনিয়োগ করবেন বলে। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং আরও নানা কারণে পুরানো তীর্থ ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীটি, যেখানে নিবেদিতার সঙ্গে তিনি থাকতেন, ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে এবং দশ বৎসরে ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের পর বিদ্যালয়টি অন্য ব্যবস্থাপকদের হাতে চালিত হচ্ছে। কিছুদিনের জন্য ক্রিশ্চন অবসর নিলেন বিদ্যালয়ের কাজ থেকে। কিন্তু চুয়ান্ন বছরের ভগ্নশরীর আবার অসুস্থতার মধ্যে পড়ে গেল এবং সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেওয়ার আশা ক্ষীণতর হ'য়ে উঠল। অনেক দিক দিয়েই এই সময়টি ক্রিশ্চনের জীবনের আর একটি দুঃখ এবং কষ্টের অগ্নিপরীক্ষার অধ্যায়। কিন্তু অন্তরে তিনি অনুভব করতেন স্বামীজীর জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা আর অমোঘ আশীর্বাদ। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ১৮৯৬ সালে স্বামীজী আমেরিকায় ক্রিশ্চনকে একটি ছোট কবিতা উপহার দিয়েছিলেন যার মধ্যে হয়ত বা ছিল এই

২০ Prabuddha Bharata (1930). P. 421

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সান্ত্বনা আর শক্তিসঞ্চার—যেদিন ক্রিশ্চিন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন একদিকে স্থূলশরীরে স্বামীজীর সান্নিধ্যের অভাব, আর অন্য একদিকে শুরু হয়েছিল জাগতিক বিপর্যয়ের একটি নতুন অধ্যায় :

What though thy bed be frozen earth,
Thy cloak the chilling blast ;
What though no mate to cheer thy path
The sky with gloom overcast,
What though if love itself doth fail,
Thy fragrance strewed in vain ;
What though if bad over good prevail,
And vice over virtue reign :—
Change not thy nature, gentle bloom,
Thou violet sweet and pure,
But ever pour thy sweet perfume
Unasked, unstinted, sure !"[২১]

এ যেন ঠিক ক্রিশ্চিনের জীবনের প্রতিচ্ছবি। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ক্রিশ্চিনের আজীবন দুঃখসংঘাতময় সাধনার এবং শেষ সিদ্ধির একটি প্রাণস্পর্শী ছবি স্বামীজী এঁকেছিলেন এই ছোট কবিতাটিতে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহুদিন আগের আর একটি স্মৃতি। নিউইয়র্কের রাস্তায় চলেছিলেন ক্রিশ্চিন স্বামীজীর সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণে। সঙ্গে চলেছিল কতগুলি নিত্যসহচর—যারা রোজই এ সময়টিতে স্বামীজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান—বৃদ্ধ, হতাশায় মুহ্যমান, সর্বাঙ্গে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আর পরাজয়ের ছাপ। মহাপুরুষের স্বল্প সান্নিধ্যই তাঁদের পক্ষে হয়েছিল বেঁচে থাকার শেষ সম্বল। তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য আর শক্তি নিয়ে স্বামীজীর কাছে তখন এসেছেন শিষ্যা ক্রিশ্চিন বেদান্তব্যাখ্যা শোনার জন্য। অবাঞ্ছিত অতিথিদের দিকে তাকিয়েই মনে মনে শুধু একটু ভেবেছিলেন, 'এ সব অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিদের কেন স্বামীজী টেনে এনেছেন ?' চিন্তা শেষ না হ'তেই না-বলা প্রশ্নের উত্তর ভেসে এল। স্বামীজীর কণ্ঠে বুদ্ধের করুণার মূর্ছনা, "দেখছ না, আহা, বেচারীরা জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছে !" সেই মুহূর্তেই শ্রোতা নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন গুরুর কাছে যেন তার জীবনেও দুঃখ-দারিদ্র্য আর হতাশার দিনে গুরুর আশীর্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে। নীরবেই উত্তর পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন। লিখেছিলেন, "তাঁর নীরব আশীর্বাদের মধ্যে লুকিয়েছিল বিরাট শক্তি।"[২২] দুঃখময় জীবনটার জন্য

---

২১ Reminiscences. p. 217

২২ Prabuddha Bharata (1930), P. 423

ভগিনী কোনদিন দুঃখপ্রকাশ করেননি। সামান্যতম হতাশাকেও মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন শুধু গুরুর প্রতি ভক্তিবিশ্বাসের প্রগাঢ়তায়। জনৈক অনুরাগী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমি কি কখনো অন্যরকম জীবন হ'লে খুশী হ'তাম? না, হাজার বার আমি 'না'ই বলব। কারণ এই পৃথিবীতে একজন বিবেকানন্দের মত ব্যক্তির আগমন অতি বিরল। যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হাসিমুখে আমি আরও হাজারগুণ দুঃখ সইতে রাজী আছি আমার জীবনের এই বিরাট সৌভাগ্যের জন্য।"[২৩]

দুঃখের জীবনটাকে করে তুলেছিলেন ক্রিশ্চিন মুক্তির তপস্যা; ভয় পাননি, নিরুৎসাহ হননি, সামান্যতম অবিশ্বাসকেও অন্তরে স্থান দেননি। গুরুর অমোঘ আশীর্বাদকে ক'রে নিয়েছিলেন একমাত্র রাজসম্পদ। যে-পথে ভয়ের আকার দেখেছেন, সে-পথে 'রাজার দোহাই' দিয়েছেন। গুরুর শেষ আশীর্বাদ এসেছিল ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই, মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে। "আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্বে সর্বদা আমার আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হ'লেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই। জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পন করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। এ-কথা নিশ্চয়ই জানি যে, কোনও অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোনও বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জনও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না।"

অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল স্বামীজীর আশীর্বাদ। চরম দারিদ্র্য, অর্থাভাব আর শারীরিক দুঃখকষ্ট হাসিমুখে উপেক্ষা করে ক্রিশ্চিন ১৯২৪-১৯৩০ পর্যন্ত শেষ কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন আমেরিকায়। জীবন-সায়াহ্নে একটা গভীর শান্তিতে ভরে থাকতেন এই মহীয়সী নারী। জীবন সায়াহ্নে পেছনের তপস্যাপূত দিনগুলির দিকে তাকিয়ে বলতেন, "এত দীর্ঘ, এত দুঃখময় জীবনটি। তবুও মুহূর্তের জন্য অন্তর্নিহিত সর্বশক্তিমত্তাকে ভুলে যাইনি, জীবনটাকে দিনের পর দিন ইচ্ছামত তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কত ভুল করেছি, কত যন্ত্রণা সয়েছি আর কতবার হতাশা এসেছে দীর্ঘ বছরগুলিতে। যুগের পর যুগ কেটেছে। শেষে এ জীবনে ইচ্ছা-শক্তিটাকে করে তুলেছি দুর্জয়। অদ্ভুত শক্তি এই তপস্যাপূত ইচ্ছার। কখনও মনে হয়েছে আমি নক্ষত্রগুলিকেও কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারি। এখনও এত শক্তি অনুভব করেছি যে, যম এলে বলতে পারতাম, 'এই পর্যন্ত তুমি এগোতে পার, আর একটি পদক্ষেপও নয়।' অলঙ্ঘ্য বাধাকে লঙ্ঘন করেছি আমি। এই ইচ্ছা-শক্তিই আমাকে টেনে এনেছিল ভারতে। মানুষের পক্ষে অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে এই ইচ্ছাশক্তিই আমাকে এই দেহে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর আজ

২৩ Prabuddha Bharata (1930) p. 423

এই ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছি প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে। এবার আমার নয়, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”[২৪]

মহাসঙ্গীতের শেষ সুরধ্বনি। কন্যা ক্রিশ্চিনকে জগজ্জননীর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন রামকৃষ্ণের নরেন। আজ সেই সমর্পণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'ল সমর্পিতার শেষ সন্ধ্যায়। প্রিয় বন্ধুর বাড়ীতে নিউইয়র্কে ১৯৩০ সালে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন ক্রিশ্চিন। খুব শান্তভাবে, বেশ একটা আনন্দের ঘোরে, সজ্ঞানে শেষ সমাধিতে ডুবে গেলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে দু-এক জন অনুরাগী ভক্ত দেখেছিলেন দুঃখসাগর থেকে অমৃতসাগরে উত্তরণ হল এক মহাজীবনের—বিবেকানন্দ-কন্যা ক্রিশ্চিনের।

২৪ Prabuddha Bharata (1930), p. 423

# বিবেকানন্দ-বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলাউড

ব্রহ্মচারিণী রত্না

"...আমি সেই সময় মোহিনীমোহন চ্যাটার্জী অনূদিত গীতা পড়ছিলাম। একদিন আমরা দুই বোন হাডসন নদী দিয়ে নিউইয়র্ক আসি, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার বাসনায়। সেদিন তাঁর বক্তব্য ভগবদ্গীতা। শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত—সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। যখন স্বামীজী বলতে শুরু করলেন...আমি চোখ তুলে দেখলাম, হ্যাঁ— এই চোখ দিয়েই দেখলাম (নিজের চোখ দেখিয়ে) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে গীতা শোনাচ্ছেন! সেই আমার প্রথম আশ্চর্য দর্শন। আমি তাকিয়েই রইলাম—আমার সামনে শুধু একটি মূর্তি, আর সব অদৃশ্য।"[১]

উপরোক্ত উক্তিটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-আন্দোলনে চিহ্নিতা তীক্ষ্ণধী মার্কিন মহিলা মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডের। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অকৃত্রিম বন্ধু!

নিখিলের নিয়ন্তা ভগবান বৃন্দাবনে রাখালদের ক্রীড়াসঙ্গী, তিনিই গাণ্ডীবী অর্জুনের চিরসখা পার্থসারথি—সে মধুর সখ্যভাব ধর্মীয় সাহিত্যে অবিস্মরণীয়! বিশ শতকেও এমনিই এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দুই অসম ব্যক্তিত্বের মধ্যে—একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, শত সহস্র হৃদয়ে শ্রদ্ধেয় ধর্মাচার্য, অন্যজন সুশিক্ষিতা, অশনে ভূষণে আধুনিক, সামাজিক মর্যাদাসচেতন, আমেরিকান রমণী। তাঁদের অন্তরঙ্গ সখ্যের স্বীকৃতি জোসেফিনের নিজের ভাষায়, "আমি তাঁর বন্ধু ছাড়া আর কিছু ছিলাম না।"[২] স্বামীজীর সঙ্গে মিস্ ম্যাকলাউডের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সদানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "সে (জো) হল বন্ধু...তিনি আর জো খুব সুন্দর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেন। আর জোর উপর তাঁর কি অগাধ বিশ্বাস!"[৩] নিবেদিতা বলেছিলেন যে জোসেফিন তাঁর সর্বাধিক খাঁটি, ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বন্ধু।

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। মানবতাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, সঙ্গীতময়তা ও চিন্তাশীলতা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চরিত্রের একেকটি উজ্জ্বল দিক। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ, উদাত্ত কবি, আদর্শ আচার্য, কুশলী বাগ্মী, নির্ভীক নেতা। তিনি সত্যদ্রষ্টা, বেদমূর্তি। প্রসারিত হৃদয়ের আহ্বানে, তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে সমবেত হয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু মানুষ, ধন্য হয়েছেন তাঁর মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করে বা সত্যদর্শনে। সেই সত্য ধীরে ধীরে তাঁদের জীবনে পবিত্র ধর্মের রূপ ধারণ করেছে। 'জীবনে ধর্মহীন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, সবই পবিত্র।' "সব সময় একটা কথা মনে রাখবে—তোমরা যে আমেরিকাবাসী স্ত্রীলোক হয়ে জন্মেছ সেটা নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার। স্বরূপতঃ তোমরা সবাই, সেই এক ঈশ্বরের সন্তান। দিনরাত নিজেকে এই আত্মপরিচয় দিতে থাক এবং কখনও নিজেকে ভুলো না।"[৪] এই

বিবেকানন্দ বাণীর আলোকেই ম্যাকলাউড নিজেকে শিক্ষিত করেন—এই সত্যকে জীবনে পরিণত করেন। তাই স্বামীজীর প্রেরণায় জোসেফিনের রূপান্তর বিবেকানন্দ বন্ধু, 'জো জো' তে।

বিবেকানন্দ সত্যের প্রতিভূ। আত্মার মহিমায় সদা জাগ্রত। তাঁর বন্ধুত্বের অর্থ সত্যকে নির্ভীক চিত্তে বরণ করা। জোসেফিন ম্যাকলাউড, এই জ্বলন্ত সত্যকেই অনুসন্ধান করেছেন। তাই বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণায় তাঁর মহান্ বিস্ময় ও প্রত্যয়ঃ "তিনি ঠিক কি বলেছিলেন, তা আজ আর স্মরণে নেই, কিন্তু অচিরে সব কথাই আমার সত্য বলে বোধ হল। তাঁর প্রথম বাক্যটি সত্য ছিল, দ্বিতীয়টি—তাও সত্য, তৃতীয় বাক্যটি, তা আরও সত্য। এর পর সাত বৎসর ধরে আমি তাঁর বাণী শুনেছি, সেই উচ্চারিত বাণীর প্রত্যেকটিই আমার কাছে সত্য। সেই বিশেষ মুহূর্তে জীবন যেন এক নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হল। মনে হল, তিনি মনে করিয়ে দিলেন, তোমরা অনন্তে অবস্থিত। তার পরিবর্তন নেই, পরিণামও নেই। (সে অনুভব) সূর্যের মতো ভাস্বর, একবার দর্শন করলে তা কখনই ভোলা যায় না।"[৫]

যে কয়জন পাশ্চাত্য মহিলা স্বামীজীর আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য অভিযান সার্থক করেছিলেন, মিস্ ম্যাকলাউড তাঁদের অন্যতম। স্বামীজী অনেক বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। জো-র উদ্যম ও উৎসাহ তাঁকে অনুপ্রেরণা দিত। লণ্ডন থেকে স্বামীজী জোকে লিখছেন—"সংস্কারবশেই আমার মন চারিদিকে সেই চেনা মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে মুখে কখনও নিরুৎসাহের রেখা পড়ত না, যা কখনও পরিবর্তিত হত না আর যা ছিল সর্বদা সহায়ক, আনন্দময় ও শক্তিপ্রদ।"[৬] কয়েক বছর পর আবার লণ্ডন থেকে লিখলেন, "আসল কথা হচ্ছে, জো, লণ্ডনে কোন কাজ হবে না. কারণ তুমি এখানে নেই। তুমিই দেখছি আমার নিয়তি।"[৭] নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, "যখন সে (জো) আমার সঙ্গে থাকে, সবই সুষ্ঠু ভাবে চলে, আর আমি প্রচুর সাফল্য অর্জন করি। আমেরিকায় সে আমার সঙ্গে ছিল—এবং ইংলণ্ডেও আর (সেইজন্যেই) সব কিছু ঠিক ছিল। তারপর তাকে ছাড়া আমি ভারতে এলাম—এবং কোথাও সেরকম সুব্যবস্থা দেখলাম না।...আমাকে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি তাকে ছাড়া কিছু করতে পারি না।"[৮]

পত্রে বিভিন্নজনের কাছে তিনি জোসেফিনের বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য প্রণালীর প্রশংসা করেছেন। স্বামীজী শেষবার তখন আমেরিকায় লেগেট পরিবারের অতিথি। ফ্রান্সিস্ এইচ্ লেগেট নিউইয়র্কের একজন ধনী শস্য ব্যবসায়ী। তিনি বিয়ে করে-ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউডের সহোদরা বেটী স্টার্জিস্কে। এদের বিবাহে এর আগেরবার পাশ্চাত্যভ্রমণ কালে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। ফ্রাঙ্কের (ফ্রান্সিস্) অতিপ্রিয় রমণীয় বাসস্থান, নিউ ইয়র্ক থেকে ত্রিশ মাইল দূরে হাড্সন নদীর তীরে কাট্স্-কিল পর্বতস্থিত 'রিজলী ম্যানর'। মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে লেগেট পরিবারের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, বলা যায় তিনি একরকম এই পরিবারভুক্তই

ছিলেন। এই সময় স্বামীজী এখানে প্রায় আড়াই মাস থাকেন। হঠাৎ খবর এল মিস্ ম্যাকলাউড ও বেটী লেগেটের একমাত্র ভাই লস্ এঞ্জেলস্-এ খুবই অসুস্থ। দ্বিরুক্তি না করে জোসেফিন বেরিয়ে পড়লেন। স্বামীজী বেরনোর সময় তাঁকে সংস্কৃতে শুভ কামনা জানিয়েছিলেন ও বলেছিলেন,—"গোটা কয়েক ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেলো, তা হলেই আমি হাজির হব।"[৯] আর সত্যই স্বামীজী সেখানে ছয় সপ্তাহের মধ্যে হাজির হয়েছিলেন এবং ছ-সাত সপ্তাহের আগে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন নি।

সে যুগে পাশ্চাত্য নারীর সহজভাব, কর্মক্ষমতা, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। জোসেফিনের মধ্যে এই সব কটি বৈশিষ্ট্যই ছিল। তাই জীবনের শেষ বৎসরেও তিনি মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন—"আমরা এক-সঙ্গে কাজ করব—এ মায়ের আদেশ, এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে, আরও অনেক লোকের কল্যাণ সাধিত হবে।"[১০]

স্বামীজী মূলতঃ অর্থ সংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে যান এবং সেই অর্থে তাঁর গরীব ভারতবর্ষের যদি কোন কল্যাণ সাধন করতে পারেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। পাশ্চাত্য মহিলাদের মধ্যে ধীরামাতা (মিসেস্ ওলি বুল) তাঁকে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য করেন। মিস্ ম্যাকলাউডও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। একবার আটশ ডলার এনে তিনি স্বামীজীর হাতে দেন, দিয়ে প্রথম 'উদ্বোধন' (বাংলা মুখপত্র)-এর জন্য প্রেস কেনা হয়। যখনই স্বামীজীর কোন কিছুর প্রয়োজন হয়েছে, কোনদিক চিন্তা না করে ম্যাকলাউড সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর এই সহৃদয় সাহায্য স্বামীজী ভোলেন নি। একাধিকবার পত্রে পাই—"আমি যতটা সাহায্যের যোগ্য, তুমি তার চেয়েও বেশি সাহায্য আমায় করেছ। আমার অসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবে।"[১১] "জো তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক্—তুমি দেবতার মতো আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করছ।"[১২]

স্বামীজী জানতেন জোসেফিন সাধারণ মেয়েদের থেকে আলাদা। স্বামীজী তাঁকে তাঁর সমপর্যায়ের সহকর্মিরূপে দেখতে চেয়েছেন। মেয়েদের, বিশেষ করে ভারতীয় মেয়েদের পরনির্ভরশীলতা তাঁকে প্রতিপদে পীড়া দিয়েছে। তাই তিনি পাশ্চাত্য থেকে ভারতীয় মেয়েদের জন্য প্রকৃত সিংহিনী সংগ্রহ করে এনেছেন। এসেছেন ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, কিন্তু মিস্ ম্যাকলাউডকে তিনি রেখে-ছিলেন তাঁর পাশে, কারণ স্বামীজী জানতেন দৈব ইচ্ছাতে জোসেফিন নারী, কিন্তু অন্তর তাঁর একই শক্তিতে ভরপুর, মন তাঁর উঁচু সুরে বাঁধা। তাই তাঁকে লিখেছেন, "জো, শরীর ও আত্মাকে চাঙ্গা রাখো,...গৌরব এবং সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং মুক্তি।...কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তুমি বড় হবে, যেমন তুমি বড় আছ, আমাদের প্রিয় অনাড়ম্বর চিরন্তন জো!"[১৩] জোসেফিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি আজীবন কুমারী থেকে গিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে শুধু জোসেফিনকে লিখেছেন, তা নয়, নিবেদিতাও এ প্রসঙ্গে

অনেক শুনেছেন তাঁর কাছে। নিবেদিতার চিঠিতে আছে, "অপরেরা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই পরিবর্ধিত হয়েছেন, কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই পূর্ণ বিকশিত।"[১৪] এমন যে অসামান্যা নারী, তাঁর অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব প্যারী ফ্যাশানে অগ্রণী, তৎকালীন ইওরোপীয় উপর মহলে সুপরিচিতা, সৌখীন, সুন্দরী জোসেফিন সর্বত্র আছেন, অবাধে মিশছেন সবার সঙ্গে কিন্তু তিনি সবার নাগালের বাইরে। পিতার কাছ থেকে পাওয়া চরিত্রগত অস্থিরতা তাঁর ছিল আর সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণের জন্য প্রবল আগ্রহ। বাইরের প্রকৃতি চঞ্চল হলেও অনন্তের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। বিবেকানন্দকে অনন্তরূপে তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী জানতেন জো সর্বদাই তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁর সবরকম আবেগজনিত বিস্ফোরণ অন্যেরা সহ্য করতে অপারগ হলেও জো সহ্য করবে। বিবেকানন্দ জীবনে জো-র অসাধারণ ভূমিকা নিবেদিতাও অনুভব করেন—"[তুমি] কখনও বিচ্যুত হও নি। পূর্ণ তোমার প্রেম। তাতে ত্রুটির চিহ্নমাত্র নেই।"[১৫] জোর স্বভাবে ছিল এক চিরন্তনতা—সেখানে চাওয়া নেই, আছে শুধু দেওয়া। তাই পত্রশেষে নির্দ্বিধায় তাকে প্রণাম জানিয়েছেন স্বামীজী, তিনি জানতেন তা গ্রহণ করার ক্ষমতা জো-র আছে।

১৮৯৯তে ধীরামাতা, নিবেদিতা ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে স্বামীজী হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। স্বামীজী মাঝে মাঝেই নিঃসঙ্গ থাকতেন—জো কখনও তাঁর এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। একবার তিনদিন অনুপস্থিতির পর স্বামীজী তাঁর সঙ্গিণীদের নিজের ছোট বাড়িটিতে ডেকে পাঠালেন এবং মধুর হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে ম্যাকলাউড লিখছেন, "আমরা তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। তাঁর প্রতি কোনরকম মনোযোগ দিই নি। আমরাও তাই তাঁর বোঝাস্বরূপ হই নি।"[১৬] স্বামীজীর এ ব্যবহারের জন্য ম্যাকলাউডের কোন অভিযোগ নেই ববং তাঁকে আনন্দ দিতে পেরেছেন ভেবেই তৃপ্ত। তাই বোধহয় তিনি স্বামীজীর এত প্রিয় ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর এই পাশ্চাত্য বন্ধুটি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। স্বামীজী একবার আসর জমিয়েছেন মিসেস ব্লজেটের বাড়িতে লস এঞ্জেলেস-এ। মিস্ ম্যাকলাউডও আছেন ব্লজেটের গৃহে অতিথিরূপে। একদিন সেখানে তিনটি অপরিচিতা মহিলা এলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এসে স্বামীজী জোকে বললেন, 'এই মহিলারা হচ্ছেন তিন বোন, আর এঁদের ইচ্ছা যে আমি প্যাসাডোনায় এঁদের বাড়িতে যাই।' জো বললেন, 'যান না।' স্বামীজী বললেন, 'ঠিক হবে তো?' জো বললেন, 'ঠিক হবে, আপনি যান।' সঠিক তারিখ জানা না গেলেও এই 'মিড ভগিনী'দের বাড়ি স্বামীজী চলে গিয়েছিলেন। এতটাই ছিল স্বামীজীর জো-র প্রতি বিশ্বাস আর জো-ও জানতেন স্বামী বিবেকানন্দ ছোট্ট গণ্ডিতে থাকবার জন্য আসেন নি, তাঁকে ছড়িয়ে পড়তেই হবে, তাই সেদিন জোসেফিনের কোন দ্বিধা ছিল না।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য অভিযানের

শেষে স্বামীজী তখন ম্যাডাম কালভে, মিস্ ম্যাকলাউড প্রভৃতির সঙ্গে মধ্য ইওরোপের ঐতিহাসিক শহরগুলি দেখে মিশরে এসেছেন। হঠাৎ এক সকালে তিনি জোসেফিনকে বললেন, 'আমি এখুনি চলে যেতে চাই। আমায় ভারত ফিরে যেতে হবে।' জো পূর্ণ হৃদয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন, 'যান না'। এই ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড—যাঁকে স্বামীজী ছায়ার মতো বিশ্বস্ত ভাবতেন। নিবেদিতা লিখছেন, "পিছন ফিরে তাকালে দেখি, আমাদের সকলের মধ্যে তুমি সর্বাধিকভাবে তাঁর সমস্তরে থেকে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছ—তিনি স্বরূপতঃ কি, তা তুমিই সর্বাধিক জেনেছ।"[৭] শুধু তাই নয়, অন্য আরেকটি কারণে নিবেদিতা তাঁর 'য়ুম'-এর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। নিবেদিতার ভাষায়—"তুমি আমায় শিখিয়েছিলে কি ভাবে স্বামীজীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে হয়, না হলে আমি হয়তো এখনও অন্ধকারেই হাতড়াতাম!—প্রতিদিন তা আমি অনুভব করি।"[১৮]

শক্ত জ্ঞানাবরণের তলায় স্বামীজীর ছিল একটি আবেগপূর্ণ নরম মন যার পরিচয় পেয়েছেন অন্তরঙ্গ দু-একজন। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' হিন্দু-সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করেও তিনি তাঁর ভাব বিতরণ করে গেছেন, কিন্তু তাঁর সকল আবেগ ও প্রেরণার উৎস হৃদয়দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে তিনি সযত্নে রেখেছিলেন অন্তরের মণিকোঠায়, ভালবাসার টানে নিয়ে গিয়েছেন পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু লোকচক্ষুর সামনে তাঁকে বার করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসায় তিনি তাঁর গোলাম হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই স্বামীজী ভাবাপ্লুত হয়ে পড়তেন। কিন্তু বন্ধুত্ব একটি স্বতন্ত্র সম্পর্ক। সেখানে মনের কথা, হৃদয়ের আর্তি নির্দ্বিধায় নিবেদন করে দুঃখ, আনন্দকে ভাগ করে নেওয়া যায়, ভাগ করে তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্বামীজীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর এই পবিত্র সম্পর্কের অধিকারিণী ছিলেন আমেরিকান মহিলা জোসেফিন—ভৌগোলিক ব্যবধান সেখানে মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে নি। স্বামীজীর হৃদয়বীণার গভীর সুরের মূর্ছনা খুব বেশীবার ধ্বনিত হতে শোনা যায় নি।

১৮ এপ্রিল ১৯০০ স্বামীজীর লেখা বিখ্যাত সেই চিঠি—"যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে!…যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, (সংসারের ভালমন্দ সংসারীরা দেখুক) (তুই ও সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!—যাই প্রভু যাই!'"[১৯] এই চিঠিকে মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর সমস্ত চিঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ

করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যের দিব্যস্মৃতি এর ছত্রে ছত্রে। জো-এর প্রাপ্তির আনন্দে মশগুল—হয়তো তিনি এ চিঠির গভীর তাৎপর্য—মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। স্বামীজী তখন সাফল্যের চরম শিখরে—আকস্মিক তিরোধানের প্রস্তুতি তিনি ভিন্ন আর কারই বা ছিল, যদিও জো-র কাছে তিনি প্রাণ খুলেই সে কথা প্রকাশ করেছেন।

জোসেফিন চেয়েছিলেন ভারতে আসতে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সাবধান করেছিলেন, "হাঁ, আসতে পার যদি তুমি আবর্জনা, অবনতি, দরিদ্র দেখতে চাও ও কৌপীন পরিহিত মানুষের মুখে ধর্ম শুনতে চাও। এতদ্ব্যতীত আর কিছুর আশা রাখলে এস না। আমরা আর একটাও সমালোচনা শুনতে প্রস্তুত নই।"[১০] মিস্ ম্যাকলাউড এসেছিলেন, একবার নয়, বারবার, স্বামীজী অপ্রকট হবার পরেও।

জোসেফিন তখন এখানে। একদিন স্বামীজী জোসেফিনকে বললেন, "আমার নিজের একটি পয়সাও নেই। আমি এতদিন যা পেয়েছি সবই আমি দিয়ে দিয়েছি।" ম্যাকলাউড তাঁকে আজীবন প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখুনি দুশ ডলার দিয়েছিলেন। কিন্তু চার মাস শেষ হবার আগেই স্বামীজী মায়াতনু ত্যাগ করেন। জহুরী জহর চিনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু একবারও ভাবেন নি আর শুনতে পাবেন না 'নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের সঙ্গীত।'

তখন জোসেফিন ইংল্যাণ্ডে রাজার হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে গেছেন। কেবল্ পেলেন, 'স্বামী নির্বাণ লাভ করেছেন।' জো হতবাক হয়ে গেলেন। অশ্রু বাধা মানল না। একাদিক্রমে কয়েক বছর তিনি কেঁদেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল মেটারলিঙ্কের লেখা, 'তুমি যদি কারও দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাক, জীবনে তা প্রমাণ কর, চোখের জলে নয়।' জোসেফিন আমেরিকায় ফিরে গেলেন। মনে পড়ল একদিন তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাকে সর্বাধিক কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?' বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতকে ভালবেসে।' সে স্বর তাঁর কানে ঝঙ্কৃত হতে থাকে।

ভবিষ্যতে জোসেফিন ম্যাকলাউড পরিচিত হয়েছিলেন 'সেইন্ট' 'প্রফেটেস্' নামে। স্বামীজী সংকীর্ণতাকে মৃত্যুতুল্য মনে করতেন। তাঁর মতে প্রসারণই জীবন। জোসেফিন তাই প্রসারিত হয়ে গিয়েছিলেন। বেড়ে গিয়েছিল তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি। বাহ্যিক দিক দিয়ে তাঁর বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। জোসেফিন কোথাও স্থির থাকতে পারেন নি, ছুটে বেড়িয়েছেন আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, অবাধে মিশেছেন সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে, শুনিয়েছেন বিবেকানন্দ বার্তা। তিনি জানতেন বিবেকানন্দ যে জন্য এসেছিলেন, সে কাজ তিনি শুরু করে গিয়েছেন, তা পরিপুষ্টি লাভ করে নি। বন্ধুত্বের এ বিরাট দায় তিনি স্বেচ্ছায়, সানন্দে বহন করেছেন। আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি। বিশ্রাম নিয়েছেন চলন্ত গাড়িতে, উপাধান ছিল মাথার টুপি আর ব্যাগে

থাকত কয়েকশ ডলারের খুচরো, যদি কোন কাজে লাগে। হঠাৎ হাজির হতেন বাড়িতে, আবার হঠাৎই চলে যেতেন কোন অসমাপ্ত কাজের তাগিদে। মিস ম্যাকলাউডকে দেখে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "স্বামীজী মঠ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন—যতদিন না ১০, ০০০ লোককে রামকৃষ্ণের নাম নেওয়াতে পারছি ততদিন ফিরব না—এই প্রতিজ্ঞা করে। সেই একই কাজ তুমি এখন করছ—সারা পৃথিবী ঘুরছ আর মানুষকে স্বামীজীর নাম নেওয়াচ্ছ।"[২১] জো! বার বার ভারতে এসেছেন, আবার ফিরে গেছেন পাশ্চাত্যে। সেখানে যে তাঁর অনেক কাজ বাকি! স্বামীজী তাঁকে পত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, "এককাট্টা হয়ে লেগে যাও, কর্ম থেকে কারও নিস্তার নেই।"[২২] কর্মবিরতি তিনি পাবেন কোথায়?

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি মন্দির নির্মাণে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল বেলুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যখন বেলুড় বিদ্যামন্দির স্থাপিত হল, জোসেফিন তাতে প্রথম অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এত যে বিবেকানন্দের প্রতি নিবিড় একাত্মবোধ, তিনি কিন্তু হিন্দু হয়ে যান নি। তাঁর কথায়, 'তাঁর (বিবেকানন্দের) দয়াতেই আমি আজ একজন অপেক্ষাকৃত ভাল রকম খ্রীশ্চান।... আমি বললুম, 'স্বামিন্, আমি কি হব?' তিনি দৃঢ় গম্ভীর স্বরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "Joe! be yourself."[২৩] এই ভাবে বন্ধু বিবেকানন্দ তাঁকে জাগিয়েছিলেন। তিনি পূর্ণই ছিলেন, কেবলমাত্র বিবেকানন্দ সাহচর্যে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গিয়েছিল। জোসেফিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর সমাধির উপর লেখা থাকবে—'রেডিনেস্ ইজ অল্।' বিবেকানন্দ তাঁকে এভাবে জীবন কাটাতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে মানুষ ছিলেন না, পরিণত হয়েছিলেন আদর্শে। আদর্শের মৃত্যু নেই, তাই গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলতেন, 'তিনি ছিলেন বলো না, তিনি আছেন, তিনি আছেন'। তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে একটাই সুর বাজত 'ভারতকে ভালবাস'—যে ভারতের সমাজ বিবেকানন্দের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

যখন কর্মক্ষমতা গেছে—তখন অন্তরটি বিবেকানন্দ আলোকে প্রজ্বলিত রেখে সময় আরও ভাল কাটিয়েছেন, পরিবার থেকে বহুদূরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্তমঠে, বিবেকানন্দ হোমে। তাঁর ঘর নয়, তিনি স্বয়ং ছিলেন বিবেকানন্দ স্মৃতিপীঠ। নিজের বয়স গণনা করতেন, ১৮৯৫ এর জানুয়ারি, যেদিন স্বামীজীকে প্রথম দেখেছিলেন সেদিন থেকে। অথচ তখন তাঁর প্রকৃত বয়স সাঁইত্রিশ। জীবনের শেষ সাতটি বছর বিবেকানন্দ হোমের বাইরে যান নি। কিন্তু সাদা চুলের তলায় নীল দুটি দীপ্তিমান চোখ প্রাণপ্রাচুর্যের সাক্ষ্য দিত। ১৯৪৯ এর ১৪ অক্টোবর বিবেকানন্দ হোমে যেদিন তিনি ৯১ বছরের শরীর আর ৫৪ বছরের মন ফেলে রেখে চলে গেলেন, সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের সবচাইতে কাছের আরেকজন মানুষ হারিয়ে গেল।

আকর গ্রন্থ নির্দেশ।

১ Vivekananda in west, New discoveries, The World Teacher, Part-I, Marie Louise Burke, pp. 26
২ Reminiscences of Swami Vivekananda, lst Ed., pp. 237
৩ Letters of Sister Nivedita, Part I, lst Ed., pp. 109
৪ Reminiscences of Swami Vivekananda, lst ed., pp. 234
৫ Ibid. pp. 233
৬ বাণী ও রচনা, (১ম সং), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০
৭ তদেব (১ম সং), ৮ম খণ্ড, পৃ ৫৯
৮ Letters of Sister Nivedita, Part I, lst Ed., pp. 128
৯ Reminiscences of Swami Vivekananda, lst Ed., pp. 247
১০ বাণী ও রচনা, (১ম সং), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
১১ তদেব, পৃঃ ১০৬
১২ তদেব, পৃঃ ২০৩
১৩ বাণী ও রচনা, (১ম সং), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
১৪ Letters of Sister Nivedita, Part II, lst Ed., pp. 1095
১৫ Ibid., pp 569
১৬ Reminisces of Swami Vivekananda, lst Ed., pp. 242
১৭ Letters of Sister Nivedita, Part II, lst Ed , pp. 769
১৮ Ibid., pp, 669
১৯ বাণী ও রচনা, (১ম সং), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২

# চতুর্থ অধ্যায়

## আধুনিক মননের আলোকে
## প্রসঙ্গঃ বিবেকানন্দ

"বিবেকানন্দের কথা ভাবিলে বারে বারে আমার বিটোফেনের কথা মনে পড়ে। বিবেকানন্দ যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বিরাজ করিতেন, তখনো তাঁহার তরণীর পালে সকল দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া লাগিত। পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পাখির মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতা নহে—শক্তির আবেগ তাঁহার সিংহ-হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত।"

—**রোম্যা র‍ঁল্যা**

## বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

স্বামী সারদেশানন্দ

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া, ব্রিটিশ বণিকগণ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারত দখল করিলেন। ভারতের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিমান ব্রিটিশজাতির আধিপত্য প্রভাব বিস্তৃত হইল সারা পৃথিবীতে। বিদেশী বণিকগণ এদেশ হইতে কাঁচামাল নিজেদের দেশে লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানিক কৌশল সহায়ে অল্পায়াসে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এদেশেই আবার আনয়ন করেন বিক্রয়ের জন্য। ভারতের রক্ষণশীল জনসাধারণ প্রথমে ঐসকল বিলাতি দ্রব্যে তেমন রুচিপ্রদর্শন বা আগ্রহপ্রকাশ না করিলেও সুচতুর বণিকদল নানা প্রকার ছলেবলে কলে-কৌশলে ঐসব দ্রব্য বাজারে চালু করিতে থাকেন।

বিলাতি জিনিসের কাটতি বাড়িয়া চলিলে দেশী শিল্পিকুলের সর্বনাশ আরম্ভ হইল। তাহারা পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা গুটাইয়া পেটের দায়ে ছুটিতে লাগিল এদিক-সেদিক। ফলে দেশী মহাজনগণ নিঃস্ব হইতে লাগিলেন, আর বিদেশী মহাজনগণের সিন্দুক ভরিতে লাগিল ধনদৌলতে। বিদেশী জিনিসের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিলে অনুকূল ক্ষেত্রে ভারতেও ইংরেজের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

বিদেশী বণিক-রাজের স্বদেশ ইংল্যাণ্ডের স্বার্থসাধনে দিনে দিনে ভারতের ঘোর অবনতি, ভীষণ দুরবস্থা ঘটিল। ইংরেজ বণিকগণ প্রথমে গাঁটরি কাঁধে বহিয়া যাহাদের দরজায় ফেরি করিত, সেই সকল বিদেশী ফেরিওয়ালার দল ভাগ্যবশে বিধির বিধানে দেশের হর্তা-কর্তা হইয়া দাঁড়াইল। ভারতের ধনসম্পদ হইল ইংরেজদের করতলগত। ভারতকে শোষণ করিয়া ভারতেরই সম্পদরাশি তাহারা চালান দিতে শুরু করিল তাহাদের স্বদেশ বিলাতে। ভারতবাসী দুর্ভিক্ষে অনাহারে শুকাইয়া মরিলে তাহাদের ক্ষতি কি ?

ইংরেজ বণিকগণের ব্যবসা পরিচালনার সহায়করূপে তদনুচর এদেশীয় ব্যবসায়ী দলের প্রাদুর্ভাব হইল। তাহারা স্বয়ং যথেষ্ট ধন উপার্জনে সক্ষম হইলেও, তাহাদের ব্যবসায়ে, দেশের সম্পদরাশি বিদেশেই চালান হইতে লাগিল বেশির ভাগ। সুচতুর বণিকগণ রাজশক্তি হস্তগত করিয়া শাসন শোষণ, দুইই প্রবল উৎসাহ-উদ্যমে চালাইলেন একসঙ্গে। কোন কোন চিন্তাশীল দেশপ্রাণ ব্যক্তি নিজেদের দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টান্বিত হইলেও সকল উদ্যম-যত্ন বিফল হইতে লাগিল, নিজেদের মধ্যে একতা ও সংগঠন-শক্তির অভাবে। তাহা বুঝিতে পারিয়া বণিকরাজ অত্যধিক সাবধান হইয়া দৃঢ়ভাবে আটঘাট বাঁধিতে লাগিলেন। ফলে ভারতবাসীর দাসত্ব-শৃঙ্খল কঠিন হইতে কঠিনতর এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। দেশবাসীর শক্তি সামর্থ্য নষ্ট ও জাতির

সুদৃঢ় মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিবার জন্য বুদ্ধিমান ইংরেজ রাজপুরুষগণ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। রাজশক্তির সাহায্যে ও প্ররোচনায় বিদেশী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ভারতে তাহাদের ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। বিদেশ হইতে দলে দলে খ্রীষ্টধর্মযাজক পাদরীগণের আমদানি হইতে থাকিল, ভারতের সর্বত্র -থাপিত হইতে লাগিল গির্জা, খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের অস্তিত্ব দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে প্রভু যীশুর অনুচরগণের মধ্যেই একজন তাঁহার অভিপ্রায়মতে নবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্বদেশে ভ্রমণ করিতে ক রতে ক্রমে ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী সেই ভগবদ্ভক্ত সাধু-মহাত্মাকে পরম সমাদরে নিজেদের দেশে রাখেন। তিনিও ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণতা ও ভগবদ্ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া স্থায়িভাবে এদেশে অবস্থান করিয়া স্থানীয় লোকদিগকে যীশুর প্রেমধর্মের মহিমায় মোহিত ও দীক্ষিত করিয়া তদনুবর্তী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ-ভারতের কেরল প্রদেশে পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে নিজেদের ধর্মাচরণপূর্বক বাস করিয়া আসিতেছেন। অপর একদলের মতে, পূর্বদেশে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে খ্রীষ্টানগণের ভিতর মতবিরোধ, দলাদলি ও বহু অবান্তর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একদল অপর দলের সহিত ঝগড়াদ্বন্দ্ব করিতে থাকায় মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এমনকি শক্তিশালী দল দুর্বলগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ ক'রে। তখন তাহারা দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। এইভাবে একদল পলাতক খ্রীষ্টান ভারতে আগমন করিয়া এদেশের লোকের সহানুভূতি লাভ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। কেহ কেহ আবার অনুমান করেন ইসলামের অভ্যুদয় ও রাজ্যবিস্তারকালে সিরিয়া হইতে একদল খ্রীষ্টান ভারতে আসেন। তখন আরবদেশের সহিত ভারতের সুবৃহৎ বাণিজ্য-ব্যাপার ছিল। উভয় দেশে নৌকাযোগে মালপত্র আমদানি-রপ্তানি হইত, বিশেষভাবে মালাবার উপকূলে। এই সময়ে সিরিয়া-ত্যাগী-খ্রীষ্টানগণ কেরলে আসিয়া সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্তিতে বাস করিতে থাকেন।

কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের সময় যে-সকল খ্রীষ্টান ও মিশনারিগণ ভারতে আসিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ভিন্নপ্রকারের। তাঁহারা স্বীয় জন্মভূমি, স্বদেশবাসী স্বধর্মাবলম্বিগণের স্বার্থসাধনের জন্যই তৎপর। ভারতবর্ষকে তাঁহারা পরদেশরূপেই দেখিতে এবং নিজেদের মতলব সিদ্ধ করিয়া স্বদেশেই ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশ্য ইংরেজদের মধ্যে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তিও ছিলেন যাঁহারা ভগবান্ যীশুর পদানুসরণ করিয়া দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিচারে সকল মানবের উপকার-ব্রতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল মহান পুরুষ এদেশবাসীর উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা ও মহৎ কাজ করিয়াছিলেন। ভারতবাসী এখনও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। নবাগত মিশনারিগণ ভারতের নিম্নশ্রেণীর ও আদিবাসীর মধ্যেই সহজে স্বীয় প্রভাব ও কর্মকেন্দ্র বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন।

কারণ উহারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। তথাকথিত উচ্চবর্ণ কর্তৃক ভারতের এইসব হতভাগ্য অশিক্ষিতগণ অস্পৃশ্য বিবেচিত হইয়া দুঃখকষ্টে জীবন-যাপন করিত। ভারতের সনাতন ধর্ম ও উচ্চবর্ণকে দেশের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী করিয়া এবং ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি অতি হীন প্রতিপন্ন করিয়া, মিশনারিরা চতুর্দিকে জোরগলায় প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং অনেক পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভারতবাসীর সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম-উপাসনাপ্রণালীর বিরুদ্ধে মিশনারিগণ প্রকাশ্যে প্রচার বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহকারী অনুচরবর্গও সনাতন-ধর্মের তথা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সকল প্রাদেশিক ভাষায় কুৎসাপূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া সর্বত্র প্রচারে লাগিয়া গেলেন। রাজসাহায্যপুষ্ট মিশনারিগণ নানা প্রলোভনে প্ররোচিত করিয়া দুর্বলচিত্ত দরিদ্র দুঃখী অধিবাসিগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক স্থানে স্থানে নবধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন সমাজধর্মে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারতবাসী আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। রাজশক্তি, ধন ও বিদ্যাবলে বলীয়ান সঙ্ঘবদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মতো শক্তিশালী কোন সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় তখন ভারতে ছিল না। তথাপি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, আপনাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম ও গৌরব প্রচার করিতে সচেষ্ট হইলেন।

মিশনারিগণ ভারতীয় সমাজের দোষ উদ্ঘাটনে তৎপর হওয়ায়, ভারতবাসী নিজেদের দোষস্খালনে উদ্যমী হইলেন। এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রাচীন সমাজে বহুকাল-সঞ্চিত জঞ্জালরাশির প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং ঐসকলের সংস্কার সাধনে উদ্যমী হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশীয় উন্নত জাতি-সমূহের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সমৃদ্ধি-ঐশ্বর্য-ধনবল-বিদ্যাবল দেখিতে পাইয়া এদেশবাসীর অন্তরেও ধীরে ধীরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সমান আসনে উপবিষ্ট হইবার ও তাহাদের ন্যায় উন্নতিলাভ করিবার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। সারা ভারতে পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রয়াস দেখা দিল। এইসময় নবভারতের আবাহনকারিগণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। রামমোহন তিনটি মহৎ কার্য সম্পাদনে চেষ্টান্বিত ছিলেনঃ বেদান্ত-প্রচার, স্বদেশ-প্রীতির উদ্বোধন এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। অবনত ভারতে তিনিই প্রথম অতুলনীয় সাহসোদ্যমে প্রাচীন রক্ষণশীলতা ভগ্ন করিয়া ইউরোপ গমন ও বিশ্বমানবের সহিত ভারতের মিলন ও আদান-প্রদানে যত্নবান হইয়াছিলেন। মিশনারিগণের কুৎসার প্রতিবাদকারী অথচ নিজের দোষ ও দুর্বলতার প্রতিকারকামী রাজা বেদ ও বৈদিক-ধর্মকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সূচনা করেন। কালে সারা ভারতে উহার প্রভাব এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের কার্যে ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে প্রবল বাধা দান করে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মোহিত প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতির বিরোধী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক ধর্মে শ্রদ্ধা ও

ধর্মভাবের সঞ্চার হয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপুস্তকাদি দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত করিবার জন্যই মিশনারিগণ ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র (ছাপাখানা) স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি ও প্রচার হইয়াছিল। নিজেদের ধর্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে মিশনারিগণ এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারেও মনোযোগী হন। তাহাতে দেশেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে নিঃসন্দেহে। বিদেশীয়গণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় উদারহৃদয় পরোপকারী শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিগণও ছিলেন, যাঁহারা নিজেদের সব কিছু দিয়া ভারতেরই সেবা করিয়াছেন, এদেশবাসীর শিক্ষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ভারতবাসী অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ।

ইংরেজগণ প্রথমে এদেশে আসিবার পর সকলেই এদেশের ভাষা, ব্যবহার, আদব-কায়দা, রীতিনীতি ভালভাবে শিক্ষা করিতেন; এমনকি কেহ কেহ আহার এবং পোশাকেও ভারতীয়দের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু শাসক হইবার পর রাতারাতি সবই বদল হইয়া গেল। কলিকাতাকে লণ্ডন শহর ও ভারতবাসীকে ইংরেজের অনুকৃতি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ইংরেজ রাজ-পুরুষগণ। রাজদরবারে, অফিসে আদালতে সর্বত্র সাহেবিয়ানার প্রচলন আরম্ভ হইল—অনেকক্ষেত্রে তাহা বাধ্যতামূলক হইল। ভারতে প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যার্থীকে শিক্ষা ও অন্নদান, এবং রুগ্নকে ঔষধপথ্য দান রাজার দায়িত্ব ছিল। ধনীব্যক্তিগণও ঐসকল কার্যে যথাসাধ্য সহায়তা করা স্বীয় কর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন। অতিথি-অভ্যাগতকে আদরযত্ন সহকারে সেবা-পূজা সকলেই যথাসাধ্য হৃষ্টচিত্তে সম্পাদন করিতেন। ইংরেজ আমলে প্রাচীন ব্যবস্থা দিনে দিনে বদল হইয়া গেল,—বিদ্যালয়, ঔষধালয় সর্বত্রই বেচা-কেনা, বিনামূল্যে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। অন্ন বিক্রয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের নকলে হোটেল খোলা হইল সর্বত্র। ক্ষুধার্ত অতিথিকে গৃহস্থ দেখাইয়া দিতে লাগিলেন হোটেলের রাস্তা। রাজা, রাজ-অমাত্য ও বিচারকগণ প্রাচীনকালে প্রজাপালন এবং তাহাদের নিরাপত্তা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। সূর্যালোকের ন্যায় অকাতরে, ধর্মাধিকরণে ন্যায়বিচার বিতরিত হইত। উহা রাজার দেয় এবং প্রজার প্রাপ্য। দীন-দরিদ্র সকলের পক্ষেই সুবিচার সহজলভ্য ছিল। কিন্তু বণিকরাজের রাজ্যে উহাও মূল্য দিয়া কিনিবার নিয়ম হইল এবং ঐসকল নিয়ম-বিধি-বিধান দিনে দিনে এরূপ জটিলাকার ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিতে লাগিল যে, সর্বসাধারণের পক্ষে ন্যায়বিচার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

বিদেশী বণিকগোষ্ঠী নিত্যনূতন অর্থোপার্জনের ফন্দি বাহির করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে রাজকার্য ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ ও প্রয়োজন বাড়িল। একমাত্র ইংরেজীনবিসের রোজগারের পথ সুগম, রাজদরবারে খাতির! কে কত কুড়ি ইংরেজী শব্দ জানেন তাহা গনিয়া যোগ্যতার বিচার করা হইত বলিয়াও শোনা যায়। ইংরেজী-শিক্ষিত নব্যবাবুরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ইংরেজের 'এজেন্ট', এদেশে ইংরেজীয়ানা, সাহেবিয়ানা

প্রচারের হেতু। ইংরেজ প্রভুগণ ভারতের হর্তাকর্তা, ভারতবাসী তাহাদের গোলাম; গোলামের ধর্মকর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আহার-পোশাক সকলই অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত খারাপ। প্রভুদের মর্জি ঠিক রাখার জন্য, দিলখুস করার নিমিত্ত বাবুরা সাহেবদের অনুকরণে সাহেব সাজিতে লাগিলেন। এইভাবে ময়ূরপুচ্ছধারি কাকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। ধর্মপ্রাণা, অতীব রক্ষণশীলা, অন্তঃপুরবাসিনী মাতৃমণ্ডলী বহু চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিলেন, নিজেদের প্রাচীন আচারব্যবহার গৃহধর্ম সুস্থির রাখিতে। কিন্তু পতিপুত্রের সঙ্গে মতান্তর, মনান্তর কতদিন চলে? তদুপরি পাদরিগণ ধাওয়া করিলেন অন্তঃপুরের দিকে, ভারতীয় মা-ভগিনীকে গৃহের অন্ধকার হইতে টানিয়া বাহিরে আনিয়া আলো-বাতাস খাওয়াইবার জন্য। বহু শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষা, ব্রত-উপবাস, গৃহাশ্রমের সেবাকার্য পরিত্যাগ করিয়া আধুনিকা ভারত-ললনা ছুটিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার স্রোতে অবগাহন করিতে, হাবুডুবু খাইতে!

নগরীর পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জনা স্তূপের মতোই মনুষ্যসমাজের স্বাভাবিক দোষ দুর্বলতার পরিচায়ক শৌণ্ডিক-গণিকালয় কুৎসিৎ হেয় স্থান বলিয়া সর্বত্র নিন্দনীয় লোকালয়ের বহির্ভাগেই চিরকাল স্থান পাইয়াছে। বণিকরাজ্যের অর্থাগমের পন্থা সুগম করিয়া দিয়া ঐসকল এখন নগরীবক্ষে ভদ্রপল্লীর সন্নিকটেই স্থান লাভ করিল। ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার অঙ্গরূপেই এই দুই ভীষণ সমাজশত্রুর প্রভাব ছড়াইতে লাগিল দেশের সর্বত্র। এমনকি এই দুই ব্যসনে অনুরক্তি নিন্দনীয় হওয়া তো দূরের কথা, আভিজাত্য গৌরবের নিদর্শনরূপেই গণ্য হইয়া উঠিল। হায় রে পোড়া কপাল! ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে, ঐসকল হীন কার্যের প্রতিরোধ ও আমূল সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। সেই সময়ে আবার একদল লোক গোপনীয় তান্ত্রিক-সাধনা বামাচারকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ্যেই পানাসক্তি ও রক্ষিতা-রক্ষণাদি দুষ্কর্মের সমর্থন করায় সমাজের দুঃখদুর্দশা বাড়িতেছিল। সেইসকল অনাচার ও অন্যান্য দুরাচারের প্রতিকারের জন্য রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজেও স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে উন্নত, ব্রিটিশ জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সেইসকল ধীমান পুরুষ ব্রিটিশের সুখসমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজিত জাতিসমূহের উন্নতির কথাও ভাবিতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নব নব আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্যে যে উন্নতির সূচনা হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ভারতেও ঐরূপ উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইংরেজ মনীষিগণ ভারতের উন্নতির জন্য যত্নবান হইয়া তদানীন্তন ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রাদির জ্ঞানলাভের জন্য ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অত্যাবশ্যক। সেইজন্য ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইল। উচ্চশিক্ষার বাহন করা হইল ইংরেজী ভাষাকে। প্রাচীনকাল হইতে

দেবভাষা সংস্কৃতই উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল; ভারতের মহান গৌরবের বস্তু ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শিল্পকলাদি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছিল। সংস্কৃত ভাষা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল দেশের সর্বত্র; স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ছিল, অধ্যাপক ছিলেন, গ্রন্থাদি প্রচুর পাওয়া যাইত। ঐসকল সুপরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য দেশবাসী অকাতরে ধনব্যয় করিতেন। স্থায়ী সম্পত্তি বৃত্তিব্যবস্থাও ছিল প্রচুর। ইংরেজী-ধরনের শিক্ষার প্রচলন ও দেশের সর্বত্র সকল কার্যে ইংরেজী ভাষার একাধিপত্য বিস্তৃত হইতে থাকিলে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি-শিক্ষার বিলোপ হইতে থাকিল। রাজকীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই প্রাচীন অধ্যাপকগণ নিজেদের বিদ্যালয়ে বিদ্যাদানপ্রণালী সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা না থাকিলে কতদিন টিকিয়া থাকা সম্ভব?

দেশবাসী নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন শিক্ষায় অনাদর করিতে আরম্ভ করিলে দিনে দিনে বহু পুরাতন বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতে লাগিল। রক্ষণশীল ভূস্বামী ও ধনিক সম্প্রদায় অর্থব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে কিছু প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি-কেন্দ্র রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেও ক্রমশঃ ঐসকলে শিক্ষার্থীর অভাব দেখা দিল। যেহেতু ঐহিক উন্নতির মূল রাজানুগ্রহ, সেই অনুগ্রহের অভাবে রাজকার্যে প্রাচীন শিক্ষার আর স্থান সমাদর রহিল না। সর্বপ্রকার কাজকর্মে, ব্যবহারে, চালচলনে ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতা আপনার প্রভাব বিস্তার করিল। দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ নিজেদের শিক্ষাসংস্কৃতির বিলোপ-বিস্মৃতি।

বহুচেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া ইংরেজরাজ এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রচলনে যত্নবান হইলেও অতি অল্প সংখ্যক লোকই উহাতে অধিকার লাভ করে। কারণ বিদেশী ভাষায় প্রত্যেক শব্দ মুখস্থ করিয়া বস্তু ও ভাবের সহিত পরিচয় ও লাভ কঠিন ব্যাপার। উহাতে বহু সময় ও অধ্যবসায় আবশ্যক। সেজন্য ইংরেজ-রাজত্বের সুদীর্ঘ কালের চেষ্টাতেও দেশে শিক্ষা বিস্তার অধিক হয় নাই। অধিকন্তু ভারতের জনসাধারণ নিজেদের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি হারাইয়া, আধুনিক নবশিক্ষাপ্রণালীও আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অতিশয় হীনাবস্থায় পতিত হইল।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা লর্ড মেকলে এবং তাঁহার সহযোগিগণ প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেই পাঠক বুঝিবেন ঐসকল তাঁহাদের নিকট অতীব হেয় অসার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। মেকলে ও তাঁহার সহকারিগণ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সম্যক্ পরিচয় না পাওয়াতেই এরূপ বিপরীত ধারণা করিয়াছিলেন। পরে বিদ্বন্মণ্ডলীর চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডারদ্বার ইউরোপবাসীর নিকট উন্মুক্ত হওয়ায় এখন মেকলের বংশধরগণ উহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়াছেন নিঃসন্দেহে। "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুরাণশাস্ত্র

এমনই অপকৃষ্ট যে, যাহারা ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহাদের সকলের অন্তর কলুষিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপকৃষ্ট মনোবিজ্ঞান, অপকৃষ্ট ভূগোলবিদ্যা, অপকৃষ্ট জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রণালী বর্তমান। ইহা সেইরূপ পৌত্তলিক ধর্মও নহে যাহা শিল্প-বিজ্ঞানের মর্যাদা দেয়; হিন্দুগণের দেবদেবীগোষ্ঠীর মধ্যে তুমি প্রাচীন গ্রীসের মতো সৌন্দর্যপূর্ণ শৌর্যবীর্যপূর্ণ চিত্তবিমোহনকারী মূর্তির সাদৃশ্য খুঁজিলে সকল পরিশ্রম বৃথা হইবে তোমার!" (লর্ড মেকলের পার্লামেণ্টে প্রদত্ত বক্তৃতাংশের অনুবাদ)

"প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মানে হীন নীতিজ্ঞান, মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা দর্শনশাস্ত্র, মিথ্যা মনোবিজ্ঞান।" (স্যার এইচ. এস. মেইন)

"বিশাল আহাম্মকীর দুর্গপ্রাকারের মধ্যে প্রাচীন অজ্ঞতা, পৌত্তলিকতা পৃথিবীতে এখনও এইখানে সংরক্ষিত। ইহার বনিয়াদ নিচের দিকে অন্ধকার পাতাল গহ্বরে, ইহার প্রাচীর-স্তম্ভসকল অনেক শতাব্দীর কুসংস্কার ছাপপূর্ণ হইয়া ঊর্ধ্বে মেঘের অন্তরালে গিয়াছে। ইহা ত্রিশ কোটি দেবদেবীর দ্বারা সুরক্ষিত, তাহাদিগকে মূর্তিমান 'মন্দ' বলা যায় এবং তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি কেবল সপ্তম নরকের প্রেতগণের সহিত তুলনার যোগ্য। এই দুর্ভেদ্য দুর্গে পঁচিশ কোটি মানব রুদ্ধ হইয়া আছে। স্বেচ্ছায় সর্বাপেক্ষা কদর্য, মিথ্যা ভ্রমের মধ্যে নিজদিগকে ঠেলিয়া দিয়াছে; অজ্ঞান-অন্ধকারের রাজাই যাহার একমাত্র শাসক। বহুত্ববাদ, একত্ববাদ, অতীন্দ্রিয়তাবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও ভীষণাকারে জড়োপাসনা যুক্তিতর্ক ও প্রচলিত প্রথা, সর্বপ্রকার হীন আচারে বিশ্বাস, তৎসহ উপবাস স্নানাদি, কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্ত্রতন্ত্র, আহাম্মকের অকর্ম এবং বর্বরোচিত রক্তপাত, বলিদান, অসংখ্য প্রকারের প্রাণিহত্যা যাহা সংসারে দেখা যায় তদপেক্ষা অধিক। এই সকল আহাম্মকগণের, ভীষণ নরকবাসীদের পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে যে, নিজেদের জ্ঞানদৃষ্টি অন্ধ হওয়ায় সত্য উপেক্ষা করিয়া বিপথগামী হইয়া অপর জ্ঞানী লোকের পক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গে নিজেদের রক্ষাকর্তাগণের দ্বারা সুরক্ষিত নরকে বাস এবং উদ্ধারের অযোগ্যরূপে ভ্রম ও মিথ্যার সহিত প্রীতি-বন্ধনে সম্বন্ধ থাকা।" ('ভারত ও তাহার ধর্মপ্রচারকগণ'—ডাঃ ডাফ)। খ্রীষ্টান মিশনারি ডাফ সাহেব ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং মেকলে সাহেবের পূর্ব হইতেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যম করেন।

একদিকে মিশনারিগণের প্রবল প্রচার অন্য দিকে প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রাজ-পুরুষের ভীষণ অত্যাচার, দেশবাসীকে নিরুপায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজশক্তি-পুষ্ট ও অনুগৃহীত, নীলকর ইংরেজগণের নৃশংস অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিলে এখনও হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। উহাদের নাম শুনিতে ঘৃণা হয়। আফ্রিকার উপনিবেশসমূহ দখলাধিকার ও আবাদ করিবার জন্য বণিকরাজ ছলেবলে-কৌশলে ভারতের বহু নিরীহ অধিবাসীকে চালান দিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে শুধু নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য। নিরুপায় বিধবাগণের জীবিকার্জনের একমাত্র সম্বল চরকা ও অসংখ্য তাঁতি-সম্প্রদায়ের ব্যবসা বস্ত্রবয়ন

নিষিদ্ধ করিবার জন্য ফিরিঙ্গিগণ কত কূটনীতি অবলম্বন এবং অত্যাচার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দরিদ্র ভারতবাসীর আহার্যের প্রধান উপকরণ লবণের উপর শুল্ক ধার্য ও উহা আদায়ের জন্য বণিকরাজ যে-সকল নৃশংস কান্ড করিয়াছে তাহা সত্যসত্যই হৃদয়বিদারক। দিনে-দিনে শিল্প ব্যবসা বিলোপ ও অসংখ্য লোক বেকার ও নিরন্ন হইতে লাগিল এবং ইংরেজ প্রভু ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ একবাক্যে প্রচার করিতে লাগিলেন ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি ধর্মকর্মই এই দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী; খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেই ভারতের উন্নতি ও ভারতের দুঃখকষ্ট দূর হইবে; মুক্তিলাভের জন্য ইহাই একমাত্র পন্থা। দেশবাসী নিরুপায়। অজ্ঞ সাধারণের অন্তরের ঈশ্বরবিশ্বাস ও প্রাচীন ধর্ম-কর্মে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। বহুলোক মিশনারিগণের আশ্রয় লাভ ও ইংরেজের অনুকরণে দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইয়া অধিকতর দুর্দশায় পতিত হইলেন। একূল-ওকূল দুকূল যাইবার উপক্রম হইল তাহাদের। ভারতের এই ঘোর দুর্দিনে অনেক মনীষী অন্তরে গভীর ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। সাধ্যমত তাহার প্রতিকার করিতেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। কারণ পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ও তাহার ফলে পাশ্চাত্য জাতির অত্যধিক ঐহিক অভ্যুদয়-উন্নতি, রাজ্যবিস্তার ও দুর্বল জাতিসমূহের উপর ক্ষমতালাভ সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। পরাধীন জাতিসমূহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাহাদের অনুকরণে বাধ্য হইতেছিল। ভারতেও পাশ্চাত্য-প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ঘোরতর আলোড়ন শুরু হয়, নানাভাবে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তন্মধ্যে কোন কোন দল নিজেদের প্রাচীন ধর্মকর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন এবং কোন কোন দল, পাশ্চাত্য স্রোতে সম্পূর্ণভাবে গা ভাসাইবার পক্ষপাতী হইলেন। আবার উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নপর বহু লোক অগ্রসর হইয়া সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু সমগ্র দেশে মানুষের নিজেদের উপর অবিশ্বাস এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ঘটনার স্রোতকে কেহই ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। যাহারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলন প্রয়াসী, তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ এই দুঃসময়ে ভারতবাসীকে নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্মশিক্ষা-প্রণালীকে আত্মস্থ ও নিজেদের উন্নত করিবার পথ দেখাইয়া কিঞ্চিৎ ভরসা আনয়ন করে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা-প্রণালীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে অধিকতর খাপ খাওয়াইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন ধর্মভাবের প্রেরণা অধিকতর উজ্জ্বল ও স্বীয় জীবনে তাহার প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতায় অনুরাগী নব্য শিক্ষিত যুবকগণের নিকট অতীব চিত্তাকর্ষক ও আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বড় বড় নগরে, সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও ব্রাহ্মমতে ধর্মোপাসনা আরম্ভ করেন। প্রায় সমসাময়িক কালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে

স্বামী দয়ানন্দ আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠাপূর্বক বহু শিক্ষিত লোককে বৈদিক ধর্মানুরাগী করিলে পাশ্চাত্য-প্রভাব বিস্তারে প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। সারা ভারতের সকল শ্রেণীর লোককে একত্রে মিলিত করিবার জন্য আর্যসমাজ বিশেষ চেষ্টান্বিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষা ও বেদপাঠ, বৈদিক হোমের প্রচলন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথা রহিত করা, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। মধ্যভারতে রাধাশ্যামী সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নবভাবে পরিবর্তন করিয়া কালোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বহুলোক উক্ত সম্প্রদায়ে যোগ দেন। দক্ষিণদেশে থিয়োসফি সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ধর্মপ্রণালীর মিলনে এক নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়া কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেন। এইরূপে ভারতবাসী দেশের উন্নতি ও প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতি রক্ষার নানা-প্রকার চেষ্টা করিলেও ঐসকলের প্রভাব কিন্তু সুদূরপ্রসারী মোটেই হয় নাই। সারা জগতে পাশ্চাত্য জাতির আধিপত্য লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছিল; পাশ্চাত্য-শিক্ষাসংস্কৃতির বিস্তার, স্বধর্মে অনাস্থা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছিল। ফলে লোকের অন্তরে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, কর্মফলভোগ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিশ্বাস ও ধর্ম আধ্যাত্মিকতার ভাব সমূলে উচ্ছেদ হইতে থাকে। পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক অভ্যুদয় ও নাস্তিকতার ভাব প্রবল হইলে, তাহার বিস্তার হইতে লাগিল পৃথিবী জুড়িয়া। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশে এমন কোন ধর্মবেত্তা প্রকট ছিলেন না, যিনি এই ঘোর অন্ধকারে মানব-সমাজকে পথ দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিবেনঃ "ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য; আমি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি, আইস তোমাকেও দেখাইব।" ভারতের এহেন ধর্মগ্লানির সময়েই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনভূমি নাস্তিকতামূলক আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কলিকাতা-নগরীর অনতিদূরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ। আর তাঁহারই অমৃত-বার্তা জগতে ঘোষণা ও মানব সম্প্রদায়কে সন্মার্গে প্রবর্তিত এবং স্বদেশের উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নির্মাণ করিয়া দিলেন তাঁহার ভাব ও বাণীবাহক নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দকে। পরবর্তীকালের ইতিহাস বলিবে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও কর্মতপস্যা কিভাবে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করিয়াছিল।

# রামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

এই বিশেষ কালে রামকৃষ্ণের বাণী আলোচনার আগে যাচাই করা দরকার এই শিল্প-বাণিজ্যিক যুগে, যখন মানুষ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ'র চরম সীমায় পেঁছে বাস করছে যন্ত্রদানবের তাঁবে, তাঁর মতবাদ ভারতের তথা পৃথিবীর লোকের কোন কাজে আসবে কি না।

এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আত্মসংযম, আত্মত্যাগ এবং সমাজ-সেবার অনন্য প্রচেষ্টা বিশ শতকের অসংখ্য হিন্দুর কাছে জীবন্ত ধর্মরূপেই প্রতিভাত। এ ছাড়া, আধুনিককালে রামকৃষ্ণ সব পার্থিব সমাজে বহু সম্মানিত পুরুষ।

—কিন্তু মনে রাখা দরকার রামকৃষ্ণকে কোন বিশেষ দেবতা, ধর্মমত, শাস্ত্র বা সম্প্রদায়ের সংগে জড়িত করা চলে না। তিনি কোন ধর্মপ্রচার করেন নি, কোন বিশেষ নীতিশাস্ত্র আওড়ান নি। কোন নির্দিষ্ট উপদেশাবলী—যাকে বলে 'Do's and donot's—'

তিনি বেঁধে দিয়ে যান নি। তাঁর কথামৃত গ্রন্থে এ সব কিছুই নেই। নেই জাতিতত্ত্বের কচ্‌কচি বা সমাজোন্নয়নের কোন বয়েৎ। রাজনীতি তিনি এড়িয়ে গেছেন ষোল আনা।

তা হলে রামকৃষ্ণের 'জাদু'র কারণ কি? সমস্ত পৃথিবীতে তিনি কেন এত উচ্চাসনের অধিকারী? উত্তর মিলবে কতগুলি একেবারে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয়—সাধারণ মানুষের কাছে যার সমাধান অত্যাবশ্যকীয়—সে সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কর্ণধার-রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি রক্ত মাংসের মানুষকে সোজাসুজি অন্তস্তলে ডাক দিতেন উদাত্ত কণ্ঠে এবং যে সব মানবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষ জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও মার্জিত করেছেন কল্যাণ হস্তে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিটি মানুষ কয়েকটা সহজাত ভীরুতায় ভোগে—রামকৃষ্ণের বাণী উচ্চনীচ সকলকেই ভীরুতা জয় করতে সাহায্য করে তাদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে।

রামকৃষ্ণাশ্রিত মানুষ সবরকম ভীরুতা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়, সাহসের সঙ্গে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। তাঁর বাণী মূলতঃ দার্ঢ্যের জয়গান, যে দৃঢ়তা স্থিতধী মানুষের লক্ষণ, যা মানুষকে জীবন পথের শতসহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ

বাধাকে অগ্রাহ্য করতে, অতিক্রম করতে শেখায়, সাহস দেয়।

আমাদের মতে এই হচ্ছে মূল কারণ, যার জন্য রামকৃষ্ণকে ভগবদিচ্ছার ব্যাখ্যাতা-রূপে আপামর জনসাধারণ গ্রহণ করেছে—রাজা থেকে প্রজা, সুউচ্চ প্রাসাদবাসী ধনী থেকে ঝোপড়ির মধ্যে অর্ধমৃত মনুষ্যনামধেয় প্রাণী, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, কবি, লেখক, পণ্ডিত সবাই। বিপুল পৃথিবীর সর্বত্র এই মহাপুরুষের বাণী যোগাচ্ছে প্রেরণা, উদগত করছে আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপ্ত করেছে প্রাণসচেতনতা, যা মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এবং বাধা বিপদ অন্যায় অবিচারের সামনে মাথা তুলে চলতে উৎসাহিত করে। এ কারণেই একটা বিশেষার্থে রামকৃষ্ণ যৌবনের দেবতা, নূতনের উদগাতা—কি সমাজে, কি ব্যক্তিগত জীবনে। আত্মিক বিশ্বজয়ের অস্ত্র যুগিয়েছেন তিনি জগতের সকলের কাছে।

অমৃতময়ী বাণী ছড়িয়েছেন তিনি বিশেষ করে গৃহস্থের জন্যে—যাদের জীবন সংকীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ, যারা বেঁচে থাকে ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্তুংগ নয়—যারা বলে 'ধন নয়, মান নয়—একটুকু বাসা ; করেছিনু আশা।' তাঁর অমরবাণী—'জীব-শিব'—মানুষকে শিখিয়েছে 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর,' বুঝিয়েছে নর-নারায়ণ কথাটা কেবলমাত্র সমাসবদ্ধ পদই নয়, পরন্তু চিরন্তন সত্য। তিনি বারবার বলেছেন স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই মহত্ত্বের বীজ—সংসার ত্যাগে নহে, সুষ্ঠু জীবনবোধই মহাত্মার লক্ষণ, জীবনকে শিব-সুন্দর করাই সত্যিকার যোগাভ্যাস। তিনি ছিলেন সর্বোপরি প্রত্যক্ষবাদী—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক কর্তব্যকর্মের শিব-সুন্দর রূপ তাঁর বাণীতে মূর্ত।

অপরদিকে, আত্মিক শক্তির অলৌকিক ক্ষমতাও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন, বলেছেন, আত্মার পরিশুদ্ধিই পার্থিব সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে পারে। আত্মার বন্ধনমুক্তি ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

বর্তমানে নির্দ্বিধায় বলা চলে, পৃথিবীতে রামকৃষ্ণের সাম্রাজ্য সুদৃঢ়রূপেই প্রতিষ্ঠিত। এ যেন আধুনিক যুগের 'হিন্দু-সাম্রাজ্য'—যা পরিব্যাপ্ত হয়েছে আত্মিক উপনিবেশ হিসেবে এশিয়ায়, য়ুরোপে, আফ্রিকায় এবং দুই আমেরিকায়। আধুনিক বৃহত্তর ভারতের এই সব উপনিবেশের মূল ঋক হচ্ছে মনুষ্যত্বের এবং সৌভ্রাত্রের জয়গান। এই অপূর্ব আত্মিক সাম্রাজ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে, 'যত মত তত পথ' বিবেকের মুক্তি এবং জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি—কোন কলহ থাকবে না মতবাদ নিয়ে, যে যার 'ভাব নিয়ে থাক'।

রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখবে কারা? ধনী নয়, রাজনৈতিক নেতা নয়,—একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যাঁদের কোন চালচুলো নেই, যাঁদের কণ্ঠে রামকৃষ্ণ মন্ত্র, যাঁদের হৃদয়ে প্রেম, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য জীবে প্রেম ও জীবসেবা, যাঁদের দেবতা রামকৃষ্ণ এবং পুরোধা বিবেকানন্দ। বিশ্বজগৎ এঁদের কাছে 'চক্রবর্তী' ক্ষেত্র, স্রষ্টার একচ্ছত্রাধিপত্য সেখানে বিরাজিত। এই আধ্যাত্মিক সৈন্য-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বিবেকানন্দ এবং যোদ্ধা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এঁদের প্রয়োজনীয়তা অসীম—বিশেষ করে আজকের দিনে।

হিন্দুধর্ম চিরকালই 'চরৈবেতি' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মিক দিগ্বিজয়ে অনুপ্রাণিত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। অথর্ববেদোক্ত 'পুরুষ' বলছেন ঃ

অহম অস্মি সহমান
উত্তরো নাম ভূম্যাম
অভিষাদস্মি বিশ্বষাদ্-
অশম, অশম বিশাসাহী।

'আমি বিরাট, আমি নামে শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে আমি জয়ী, সর্বজয়ী, সকল দেশ সম্পূর্ণ জয় করি।'

মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন বৈদিক যুগের মহর্ষিরাই। উপনিষদ, বৌদ্ধ 'ধর্মপদ', বেদান্ত এবং গীতা একইরূপে মানুষকে তার নিজ পরাক্রম চিনতে শিখিয়েছেন, জাগ্রত করেছে তাদের জগৎকে পরিবর্তিত ও উন্নততর করার মহান ইচ্ছাশক্তি ও কর্তব্যকে। পুরাণে ও তন্ত্রে একই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। মানব মনের এই পরিবর্তন ও সমাজের অগ্রগতিই হচ্ছে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত 'যুগ-পরিবর্তন',—হিন্দু-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ।

হিন্দুশাস্ত্রের 'শক্তিযোগ' এবং 'চরৈবেতি' যোগ হিন্দু-সভ্যতার কোন যুগেই নির্বাপিত হয় নি। উনিশ শতকের যুগাবতার রামকৃষ্ণের কণ্ঠে পুনর্বার উচ্চারিত হল ভীরুতা, দুর্বলতা এবং হীনমন্যতার বিরুদ্ধে প্রাচীন পুরশ্চরণ; মানুষ যে অমৃতস্যপুত্রাঃ তা—আরও একবার কম্বুকণ্ঠে প্রচার করলেন রামকৃষ্ণ এবং তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী বিবেকানন্দ এবং জগৎকে বীর্যবান করার ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে বিবেকানন্দ বেছে নিলেন উপনিষদকে।

ভারতের মহামানবের সাগরে যুগে যুগে যে অসংখ্য ধারা এসে মিশেছে, তার ভাবগত সমন্বয়সাধন হিন্দুশাস্ত্রের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। কি বিচিত্র এই প্রচেষ্টা, যার যথার্থ উত্তরপুরুষ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং যার প্রাণদ স্রোতধারা এখনও আবিল হয় নি। ১৮৮৬তে গুরু রামকৃষ্ণের তিরোধানে হয়তো তা কিছু ক্ষীণ হয়ে যেত, কিন্তু বিবেকানন্দ সবল হাতে শৈবালদাম সরিয়ে যথার্থ ভগীরথ হলেন। আবার ১৯০২তে স্বামীজীর তিরোধানে এ আশংকা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু স্বামীজীর স্বহস্তে, সযত্নে শিক্ষিত ও তাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতের পুরাতন অথচ সজীব ভাবস্রোতকে স্বখাতে বইয়ে নিয়ে চলেছেন। এ এক আধুনিক 'মিরাক্‌ল'—যা রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দকে অমরতা দিয়েছে।

এঁদের অনেকেই ১৯০৫ সালের 'ভাবধারার' অংশীদার এবং তাকে উপযুক্ত কাজে লাগাবার কুশলী-শিল্পী। রামকৃষ্ণদর্শন ও রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের তৃতীয় স্তরের এঁরাই মণিকার। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানপূত এই সন্ন্যাসীর দল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভাব ও ভাবনা-স্রোতকে বইয়ে নিয়ে চলেছেন সামাজিক ক্লেদ অপসারণ-

কল্পে, পূর্ণ উদ্যমে ও সাফল্যের সঙ্গে। একেই আমরা বলেছি রামকৃষ্ণ × বিবেকানন্দ= রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। এই সমন্বয়েরই ফলশ্রুতি হচ্ছে ত্রিজগতে বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠত্বর অবিসম্বাদী স্বীকৃতি এবং ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণে পূর্ণ দেবত্ব আরোপ। [ ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন, 'এমন একদিন আসবে যখন ঘরে ঘরে (নিজেকে দেখিয়ে) এর পুজো হবে।' ]

একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, মহামুণি শাক্যবুদ্ধের প্রভাবও এত অল্পকালমধ্যে এতটা স্থিতিলাভ করে নি।

১৯৩৬ সালের প্রথম রামকৃষ্ণশতবার্ষিকীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্প্রদায় যে কর্মপটুতা এবং সাংগঠনিক অক্ষমতার পরিচয় দেখিয়েছিলেন এবং যে বিচিত্র ভাব-ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রত্যন্তভাগ থেকেও, তা থেকেও এঁদের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রভূত প্রমাণ মিলবে। বিদগ্ধমণ্ডলী এ সময়ে এসেছিলেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, বর্মা, সিংহল, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থান থেকে 'শক-হূণ দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' হওয়ার ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

আন্তর্জাতিক ঔদার্য হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমাজের প্রধান লক্ষণ, যার জার্মান প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Weltanschauung-এর জোরেই মুখত্য এঁরা বেঁচে থাকবেন জনকল্যাণার্থে। ( World-view )।

উপর্যুক্ত শতবার্ষিকীর অঙ্গ হিসেবে 'নিখিল বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন'-এ সর্বধর্ম-মতের উদার প্রকাশ এবং বিস্তৃত আলোচনাও লক্ষণীয়। রামকৃষ্ণের মহাবাণী 'যত মত তত পথ' মূর্ত হল এই মহাধর্ম সম্মেলনের মহৎ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মহামন্ত্র 'চরৈবেতি' দৃঢ়স্কন্ধে বয়ে চলেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজ।

Ramkrishna Institute of Culture-এর প্রতিষ্ঠা ঐ একই কুলধারার অংশ। এতে রামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রাকৃত জীবনে রূপায়িত করার বহুমুখী প্রচেষ্টা চলবে সর্বজাতির সমবেত হস্তে। বিভিন্ন বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে মূলগত ঐক্যের সূত্রটি খুঁজবেন এঁরা, দেবেন এবং নেবেন, মেলাবেন এবং মিলবেন—কাউকে বিমুখ করবেন না, কেউ ফিরে যাবে না এ মহামিলন ক্ষেত্র থেকে। সর্বচিন্তা, জগতের সারাংশ শ্রবণ-মননের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় আত্মিক ভিত্তিস্থাপন এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

'Peace on earth and good will to all men'—মহামানবের মহাবাণীকে মূর্ত করে তুলতে এঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

মোটামুটি বিচার দ্বারা একটা কথা সুস্পষ্ট—রামকৃষ্ণরূপ অমৃতখনির উৎস নিঃশেষ হয়ে যায় নি বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে। তার অমলিন কল্যাণদ স্রোতধারাকে স্বখাতে চালিয়ে রাখবার দায়িত্ব বর্তেছে উপযুক্ত সবল হস্তে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের হস্তে। ভবিষ্য-কল্যাণের অমর-বীজ উপ্ত রয়েছে এঁদের কার্যধারার মধ্যে।

এ বীজ অত্যন্ত সবল ও পুষ্ট—এর পূর্বসূরীরা মহেঞ্জোদরোর যুগ থেকে যে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, এঁরাও তারই পুরশ্চরণ করে চলেছেন। সে মন্ত্র হচ্ছে কেবলমাত্র অতীত রোমন্থন না করে পূর্ণদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকান,—তাদের জন্য সৎ, জ্যোতি এবং অমৃতের ভাণ্ডারকে পূর্ণতর করে তোলবার মন্ত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যে 'ভারতীয় আত্মিক সংস্থার' সভ্য (Indian Spiritual Service) তাঁদেরও মন্ত্র এই,—ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অমৃতের উৎস কানায় কানায় ভরে রাখা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সমাজ হিন্দুকে তার হৃদয় উন্মুক্ত করতে বলছেন ইসলামের অমূল্য সম্পদের জন্য এবং অন্যান্য মতের জন্যও তাঁদের বুঝতে বলছেন যে গভীরে ডুব দিলে 'ইসলাম' ও 'হিন্দু সনাতন ধর্ম' মূলত একই। এবং এঁরা বলছেন যে এই-ই হয়—সকল মতের লক্ষ্যস্থল সেই একস্থান, মানুষকে মানুষ করে তোলা।

রামকৃষ্ণখনির শ্রেষ্ঠ রত্ন, 'যত মত তত পথ' আজ বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই। হিন্দুর চিন্তাধারার সার্বজনীনত্ব, তার বিশাল উদারতাকে পরিব্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার মহান প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত এই স্বল্পায়তন গোষ্ঠীকে স্বাগত জানাই। জাতির পাঁতি চূর্ণ করা এবং মুসলমানদের প্রতি বিকৃত মনোভাবের পরিবর্তন, এ দুই-ই আশু প্রয়োজন আমাদের সমাজের গতিশীলতা বজায় রাখবার জন্য এবং এই মহাব্রতের ধারক ও বাহক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সমাজ চিরঞ্জীব হোক—এই কামনা প্রত্যেক হিন্দুর হওয়া প্রয়োজন। সকলে প্রাচীন মন্ত্র একসাথে বলুক।

'অসতো মা সদ্গময়,  
তমসো মা জ্যোতির্গময়।  
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।।'

অনুবাদক—জ্ঞানান্বেষক

## মানুষ বিবেকানন্দ

**স্বামী লোকেশ্বরানন্দ**

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে স্বামীজী নরঋষি, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছেন। তিনি স্বামীজীকে স্তব-স্তুতি করতেন। গুরু শিষ্যকে এতটা মর্যাদা দিচ্ছেন, এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। পরে অবশ্য তাঁর দেশী ও বিদেশী শিষ্য-শিষ্যারা মর্যাদা তাঁকে অনেক দিয়েছেন। গুরুভাইরাও দিয়েছেন, পরিচিত ও অপরিচিত অনেক ব্যক্তিও দিয়েছেন। ছেলে বেলাতেও দেখছি তাঁরবাবা তাঁকে যথেষ্টই খাতির করছেন। তিনি আইন-ব্যবসা করতেন, রোজ সন্ধ্যায় তাঁর কাছে যেমন মক্কেলরা আসতেন, তেমন অনেক বন্ধুবান্ধবও আসতেন। বেশ একটা মজলিস জমে উঠত। তখন ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত—নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। স্বামীজী এই মজলিসে অনেক সময় উপস্থিত থাকতেন। তাঁর উপস্থিতি আমাদের কাছে খুব বেমানান মনে হয়। তাঁর পিতৃবন্ধুদের কাছেও নিশ্চয়ই তা মনে হয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই তাঁর পিতৃদেবের এতে সমর্থন ছিল, না হলে এটা সম্ভব হত না। বোধহয় তাঁর পিতৃদেব চাইতেন এইসব আলোচনা শুনে তাঁর জ্ঞান ও বিচার ক্ষমতার প্রসার ঘটুক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আলোচনার মাঝখানে তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করতেনঃ 'এ বিষয়ে নরেনবাবু কি মনে করেন?' 'নরেনবাবু'ও গম্ভীরভাবে তাঁর মত জানিয়ে দিতেন। আমরা অনুমান করতে পারি তাঁর মত প্রকাশের সময় তিনি যুক্তি এবং প্রমাণও দিতেন। এও অনুমান করতে পারি, তাঁর প্রকাশভঙ্গি বা ভাষার মধ্যে কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকত না। অর্থাৎ তাঁর মত চেয়ে তাঁর বাবা যে তাঁকে অপ্রত্যাশিত এক সম্মান দিয়েছেন, তা তিনি মনে করতেন না। বরাবরই তিনি আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী। স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী। বাবার মজলিসে যেমন, পরে তাঁর গুরুদেবের মজলিসেও তেমনি তিনি আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিমূর্তি। তাঁর বাবার বন্ধুরা বোধহয় তাঁকে 'ডেঁপো' মনে করতেন। তাঁর গুরুদেবের শিষ্য ও ভক্তরা মনে করতেন 'বকাটে'। কিন্তু যেমন তাঁর বাবা তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর গুরুদেব তাঁকে ততোধিক প্রশ্রয় দিয়েছেন। গুরু মাঝে মাঝে কোন বয়স্ক মাননীয় ও পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে নরেনের তর্ক বাধিয়ে দিতেন। ভাষা বাংলা বা ইংরেজী। প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে বলতেনঃ "নরেন খাপখোলা তরোয়াল, অন্যের কথা কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দেয়।" মাথায় তোলা আর কাকে বলে! স্বামীজীর মা বলতেনঃ 'শিবের ভূত।' দিদিরা কি বলতেন জানতে ইচ্ছে হয়। তাদের পিঠে দু'চারটে কিল-চড় মেরে পালিয়ে যেতেন। তারা তাড়া করলে বাড়ির বাইরে খোলা নর্দমার মধ্যে নেমে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর দিদিদের দিকে তাকিয়ে নানা রকমের মুখভঙ্গি করতেন। তারা অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। স্বামীজী জানতেন

তারা তাঁকে ছুঁতে পারল না। ছুঁলে মা তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে পাঠাবেন। বেচারীরা!

এসবই তো মানুষের ব্যাপার। এগুলি আমরা বুঝি। কিন্তু যা বুঝি না তা হচ্ছে তাঁকে যখন দেবতার আসনে বসানো হয়। দেবতা হলে তিনি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তিনি আমাদের মতো একজন মানুষ, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁকে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে স্বামীজীর চেহারা নিয়ে একটু আলোচনা করি। চেহারা মানুষের একটা বড় মূলধন। 'পহেলা দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি।' স্বামীজীর বেলাতে এই কথাটা বিশেষভাবে খাটে। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন: "কোথাও তাঁকে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় ভাবতে পারা যায় না।" এটা তাঁর চেহারার গুণে। আমেরিকায় নাটক দেখতে গেছেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। চারিদিক থেকে দর্শকদের কৌতূহল কোথাকার 'রাজা'? চিকাগোর ধর্ম সম্মেলনেও তাই। সবার দৃষ্টি তাঁর উপর। কেউ কেউ মনে করেন ভক্তরা তাঁর চেহারা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন। এই বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী আমেরিকার সংবাদপত্র। সেই যে কবে চিকাগোর সম্মেলনে তাঁর আবির্ভাব ঘটল, সেই অবধি আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি তাঁর চেহারা নিয়ে কত না প্রশস্তি লিখে গেল। 'রাজা' বিবেকানন্দ এই ছিল তাদের কারও কারও বর্ণনা। ঐ চেহারা রাজা ছাড়া আর কারোর হয়? কিন্তু এর তুলনায় ভারতের সংবাদপত্রগুলি স্বামীজীর চেহারা নিয়ে প্রায় নীরব। কিছু বললেও বাড়াবাড়ি আদৌ নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবাদপত্র বা মানুষ ভুল করতে পারে, ঝানু ব্রিটিশ-শাসক বা ধর্মযাজক গোষ্ঠীর মানুষও ভুল করে কি করে? তারা তো ভারতবাসীদের দাস বা বর্বর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। সত্যিকারের রাজা হলেও না। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন স্বামীজীর সঙ্গে জাহাজে ভারতে ফিরছিলেন। এ ঘটনা স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরছিলেন তখনকার জাহাজে ঘটেছিল। পাঠক যদি 'রেমিনিসেন্সেস্ অব বিবেকানন্দ' বইটিতে রীভস ক্যালকিন্স-এর প্রবন্ধটি পড়েন, তাহলে দেখবেন তাদের মধ্যে কি কৌতূহল ও উত্তেজনা—কে এই মানুষটি? এই প্রবন্ধে ক্যালকিন্স স্বামীজীর চোখের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "আমেরিকার একদল বোকা মেয়ে তাঁর চোখ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল।" কিন্তু শুধু আমেরিকার বোকা মেয়ে কেন, তাঁর অতি বুদ্ধিমান গুরুদেব ও গুরুভায়েরাও তাঁর চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। নিবেদিতার ডায়েরিতে দেখি তিনি কখন কখন স্বামীজীকে 'রাজা' বা 'পিতা' বলে সম্বোধন করছেন। গুরুকে 'পিতা' বলা স্বাভাবিক, কিন্তু 'রাজা' কেন? নিশ্চয়ই চেহারার জন্য। রাজকীয় চেহারার জন্য। কেউ কেউ আবার তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতেন। সেও তাঁর চেহারার জন্য। তাঁর ধ্যানমূর্তির কথা চিন্তা করুন। ঠিক যেন বুদ্ধ! অনেকে আবার তাঁকে খ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য চেহারার জন্য নয়, চরিত্রের জন্য। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর মধ্যে বুদ্ধকে দেখতেন, যীশুকেও দেখতেন। এঁদের

মতো তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে।

চোখের কথায় আবার একটু ফিরে যাই। ঐ চোখ সম্বন্ধে গান আছেঃ 'পদ্মপলাশ-লোচন।' ঠিক কথা। পদ্মপাতার মতোই তাঁর চোখ ছিল। কিন্তু কেউ কি ভাবতে পারে ঐ চোখ দিয়ে আবার অগ্নিবর্ষণ হত? কখন? তাঁর দেশকে বা সমাজকে বা তাঁর দেশের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করলে। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যারা একবার তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় এক অনুরাগীকে দেখে হেসেছিল। খালি গা, গায়ের রং কালো, তার উপর বহু বিচিত্র ভঙ্গিতে আঁকা তিলক। এরকম দৃশ্য পাশ্চাত্যদেশীয়দের কাছে হাস্যোদ্দীপক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ অপমান তাঁর দেশের সংস্কৃতির উপর; কি করে স্বামীজী সহ্য করবেন? যেমন চোখ দিয়ে, তেমনই জিহ্বা দিয়ে তক্ষুণি অগ্নি বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ চোখ দিয়ে হৃদয় নিঙড়ানো করুণার বারি! ভারত থেকে কয়েকটি চিঠি এসেছে, তার একটি পড়ে স্বামীজীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা। দেখে আমেরিকার ভক্তরা নির্বাক। কি এমন সংবাদ আসতে পারে যা এই শক্তিমান পুরুষকে বিচলিত করতে পারে? তারা তাদের গুরুকে সব সময় 'যুধ্যমান' দেখেছে। একবার কেউ তাঁর দেশকে আক্রমণ করে দেখুক না! তার রক্ষা নেই। এই সংবাদপত্রগুলি প্রায় তাঁর গুরুর মতোই বলতঃ 'খাপখোলা তরোয়াল' যা দেখে তাঁর গুণগ্রাহীরা বলতঃ "স্বামীজী, আপনার উপযুক্ত স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে নয়।" কিন্তু সেই স্বামীজীর চোখে জল? কিসের জন্য? স্বামীজী একটু শান্ত হলে খুব সাবধানে এক শিষ্য প্রশ্ন করলেনঃ "আপনার বাড়ী থেকে কি কারোর মৃত্যুসংবাদ এসেছে?" আমরা জানি স্বামীজীর কি উত্তর। তাঁর আত্মীয়-বিয়োগের চেয়েও বেশি। একজন ভারতীয় অনাহারে আত্মহত্যা করেছেন। অন্নপূর্ণার দেশে কি করে এই ঘটনা সম্ভব হল? এই তাঁর বিস্ময় ও দুঃখ। স্বামীজীর আর একবারের কান্নার কথা মনে পড়ে। বেলুড় মঠে স্বামীজী শাস্ত্রের ক্লাস করছেন। সাধু-ব্রহ্মচারীরা ছাত্র। এমন সময় গিরিশ ঘোষ এলেন। স্বামীজী গিরিশ ঘোষের সম্মানে তাড়াতাড়ি ক্লাস বন্ধ করে দিলেন। গিরিশ ঘোষ সাহিত্যিক, নাট্যকার, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ। কাউকে তোয়াক্কা করতেন না, কিন্তু স্বামীজীকে করতেন। জানতেন প্রতিভাবান পুরুষ। অবশ্য সেটা কারণ নয়, বড় কারণ তাঁর গুরুদেব স্বামীজীকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন। স্বামীজী গিরিশচন্দ্রকে যে সমীহ করতেন তা অনুমান করতে পারি। অন্য কারণ ছাড়াও তাঁদের উভয়ের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। হঠাৎ স্বামীজী গিরিশচন্দ্রকে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি জি. সি, এসব (অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত) তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।" একটু কৌতুক করেই স্বামীজী এই প্রশ্ন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র কি উত্তর দিলেন? তিনি বললেনঃ "কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার

নেই।" একটু থেমে আবার বললেনঃ "হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে;...অমুক জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এসকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?" গিরিশবাবু এসব কথা এমন আবেগের সঙ্গে বললেন যে শুনতে শুনতে স্বামীজীর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। কিছুতেই আর তিনি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন। গিরিশবাবু তখন শিষ্যকে (শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে) বললেনঃ "দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!"

স্বামীজীর হৃদয়ের কথা যখন উঠল, তখন তাঁর নিজের একটা উক্তির কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিই। সময়টা স্বামীজীর প্রথম বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে। যাবেন ঠিক হয়ে গেছে। এই সময়ে আবু পাহাড়ে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা। দুজনেই পরিব্রাজক জীবনযাপন করছিলেন। অকস্মাৎ দেখা। বোধ হয় কার কি অনুভূতি হয়েছে বা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী যে উক্তি করেছিলেন সেইটি তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেছিলেনঃ "হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথাবোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।" কথাগুলি বলতে বলতে স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেন, তাঁদের হৃদয়টাও তখন খুব বড় হয়ে যায়। সর্বভূতে তাঁরা তখন ঈশ্বরকেই দেখেন। তখন শুধু প্রেম, সকলের প্রতি প্রেম। জাতিধর্ম নির্বিশেষে; এটা কিরকম স্বামীজীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তার দু-একটা নমুনা দিই। স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে ফিরছেন। ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরে কায়রো শহরে এসেছেন। এর পরেই জাহাজে উঠবেন, বম্বে নামবেন। কায়রো পর্যন্ত কিছু বিদেশী ভক্ত তাঁর সঙ্গে আছেন। একদিন তাঁদের নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী একটু এগিয়ে গেছেন। একা। পথ ভুলে এমন একটি অঞ্চলে এসে গেছেন যেখানে বারবনিতারা থাকে। অদ্ভুত চেহারা, অদ্ভুত পোশাক। তারা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ততক্ষণে স্বামীজী তাদের কাছে এগিয়ে গেছেন। তাঁর মুখ বেদনা-কাতর। মাতৃজাতির এ কি দুর্গতি! তিনি বলতে লাগলেনঃ "আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা ওদের সৌন্দর্যের

পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!" স্বামীজীর দু-চোখ জলে ভরে গেল। তাই দেখে মেয়েগুলি লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেল। তাদের একজন সামনে ঝুঁকে স্বামীজীর পোশাকের প্রান্তভাগ চুম্বন করে বলল: "ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ···ইনি ভগবানের লোক।" অন্য একটি মেয়ে লজ্জা ও সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। ইতিমধ্যে স্বামীজীর সঙ্গী-সাথীরা সেখানে এসে উপস্থিত। তাঁরা ধমকিয়ে ঐসব মেয়েদের সরাতে চাইলেন। স্বামীজী তাঁদের নিষেধ করলে তারা ক্ষান্ত হলেন। স্বামীজী মেয়েদের আশীর্বাদ করলেন এবং দু-চারটে মিষ্টি কথা বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

আবার দেখি বেলুড় মঠে কুলি-মজুরদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার। মঠের জমি বড্ড নিচু, মাটি দিয়ে তা ভরাট করা দরকার। বহু সাঁওতাল মজুর কাজ করছে। তাদের কাজের তদারকি করছেন গোপালদা (বুড়ো গোপাল অর্থাৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ)। স্বামীজী তাদের মধ্যে গিয়ে বসেন, তাদের কাজ দেখেন। তাঁব দৃষ্টিতে এরাই ভারতবর্ষ। নূতন ভারতবর্ষ এই তথাকথিত শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবীদের মধ্য থেকেই আসবে। এক টুকরো রুটি পেলে তারা ত্রিভুবন জয় করতে পারে। তাই এদের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন কলকাতা থেকে কোন 'বাবু' এলে দেখা করেন না। এরাই তাঁর আপন জন, প্রিয়জন। বলতেন: "আমি গরিব, তাই গরিবদের এত ভালবাসি।" এদের সর্দার কেষ্টা। তাকে প্রায়ই ডেকে পাঠান। তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চান। এতে কাজের ক্ষতি হয়, কেষ্টা আপত্তি করে। তবু ডেকে পাঠান। বলেন: "কেউ কিছু বলবে না, আমার সঙ্গে কথা বল।" একদিন তাদের লুচি মিষ্টি খাওয়ালেন। কোন তরকারি নয়, কারণ নুন দিয়ে রান্না করা জিনিস খেলে তাদের জাত যাবে। তারা তৃপ্তির সঙ্গে খেল। স্বামীজী বললেন: "আজ আমার নারায়ণ সেবা হল।"

স্বামীজী থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক-এ আছেন। কয়েকজন বাছাই-করা শিষ্য ও শিষ্যা নিয়ে তাঁদের ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় ভিজতে ভিজতে দুটি মেয়ে এসে উপস্থিত। তারা শুনেছিল স্বামীজী ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন। তারাও ধর্মশিক্ষা চায়। তাঁর বক্তৃতা তারা শুনেছে। অপূর্ব! তাদের মনে হয়েছিল স্বামীজী ঈশ্বরের দূত। তাই অনেক খোঁজ করে অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতে অত্যন্ত বিনয় করে বললে: "যীশুখ্রীষ্ট যদি মর্তধামে এখনও থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছে যেমন করে আসা উচিত এবং উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তেমনিভাবে আপনার কাছে এসেছি।" কিন্তু কি বললেন স্বামীজী? বললেন: "শুধু যদি আমার যীশু-খ্রীষ্টেরই মতো শক্তি থাকত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার!"

তাঁকে অনেকে বৌদ্ধ মনে করতেন। বুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে খুব আবেগের সঙ্গে তিনি বলতেন। তাই তিনি বৌদ্ধ এরূপ ধারণা করা খুব স্বাভাবিক।

একবার একজন জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি কি বৌদ্ধ ?" উত্তরে স্বামীজী বললেন : "আমি বুদ্ধের দাসের দাস, তার দাস।" যখন প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরলেন, তখন তাঁকে স্পেশ্যাল ট্রেনে বজবজ থেকে কলকাতায় আনা হয়। শেয়ালদা স্টেশনে যখন নামলেন, তখন হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"জয় বিবেকানন্দ কী জয় !" স্বামীজী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : "করছ কি ? যিনি একমুঠো ধুলো নিয়ে লাখ বিবেকানন্দ গড়তে পারতেন, তাঁর জয় দাও। বল 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী জয়'।"

শিকাগো ধর্মসম্মেলনের সাফল্যের পর তিনি কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন : "একদিন আমি অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী ছিলাম, তা-ই আমার প্রকৃত পরিচয়। এতদিন মুক্ত ছিলাম, আজ আমি বন্ধ।" এতেই তিনি কেঁদেছিলেন। শ্রীশ্রীমা একদিন তাঁর খুব প্রশংসা করছিলেন। প্রতিবাদ করে স্বামীজী বললেন : "মা, আমার যদি কিছু সাফল্য হয়ে থাকে, সে তো তোমারই আশীর্বাদে হয়েছে।" আর একবার বলেছিলেন : "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই !" মার কাছে আসতেন বার বার গঙ্গাজল স্পর্শ করে ও খেয়ে। মা যে 'পবিত্রতাস্বরূপিণী !' মায়ের আদেশ সব সময়েই শিরোধার্য। ভৃত্য চুরি করেছে, তাকে বিদায় করা হয়েছে। কিন্তু মায়ের আদেশে পুনর্বহাল করা হল। প্লেগের রিলিফের জন্য টাকা দরকার। স্বামীজী চাইলেন মঠের জমি-জায়গা বিক্রি করতে। মা বললেন : 'না।'। কাজেই বিক্রি হল না। মঠে দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলী হবে কিনা প্রশ্ন উঠল। স্বামীজীর ইচ্ছা, বলি হবে। কিন্তু আবার মায়ের নিষেধ। স্বামীজীর সাধ্য নেই সেই নিষেধ অমান্য করা। কাজেই হল না।

এই মায়ের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা নেই। বলরাম মন্দিরে সভা বসেছে, তাঁকে কিছু মাসোহারা দেওয়া যায় কিনা। সবাই একবাক্যে বললেন : "হ্যাঁ, নিশ্চিত। কিছু দেওয়া উচিত।" কিন্তু কত ? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল মাসে সাত টাকা করে দিলে যথেষ্ট হবে। ব্রাহ্মণের বিধবা তো, কি এমন তাঁর প্রয়োজন ? স্বামীজী বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন : "তোমরা ভাবছ মা শুধু গুরুপত্নী। মা আমাদের সঙ্ঘজননী। কিছুতেই তাকে মাসে পঁচিশ টাকার কমে আমি দিতে পারব না।" তাঁর আবেগ দেখে সর্বসম্মতিক্রমে তাই ধার্য হল।

গর্ভধারিণী মাকে খুব ভালবাসতেন স্বামীজী। হঠাৎ হঠাৎ চলে যেতেন তাঁর কাছে বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ। আর তাঁর উচ্ছিষ্ট ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়ে বলতেন : " 'অমৃত !' এর জন্য বার বার জন্ম নিতে আমি প্রস্তুত।" মাতৃভক্তি ! শেষপর্যন্ত মার কাছে তিনি 'বিলে'ই ছিলেন। মা মাঝে মঝে বেলুড় মঠে গেছেন। স্বামীজী দোতলায় তাঁর ঘরে আছেন। নিচে থেকে মা ডাক দিয়েছেন—'বিলে'। 'যাই মা'—এক ডাকেই উত্তর দিয়েছেন। আর তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছেন। যেন

কত বাধ্য ছেলে! তবে এত বাধ্য ছেলেবেলায় ছিলেন কি?

স্বামীজীর কি বাস্তব বুদ্ধি খুব ছিল? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কতটা ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যেন সমতা থাকে—এর উপর খুব জোর দিতেন। "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না"—তাঁর বিখ্যাত উক্তি। "সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না"—এও তাঁর এক মন্ত্র। এ-মন্ত্র নিজে সাধন করেছেন, জাতিকেও দিয়ে গেছেন। এর জন্য কত লোকের অপ্রিয় হয়েছেন। সত্যই উদ্দেশ্য, সত্যই উপায়। এর মধ্যে বিকল্প কিছু নেই। "সত্য কলিযুগের তপস্যা"—তাঁর গুরুদেব বলতেন। "ন হি সত্যাৎ পরো ধর্মো"—মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে। এটি ভারতের শাশ্বত আদর্শ। তাই সত্যের উপর এর জোর দিতেন। "শাকের কড়ি মাছে যেন না ঢোকে"—একথা বলে বারবার সতর্ক করে দিতেন সবাইকে। এই সত্যনিষ্ঠার উপরেই রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি।

সব মানুষকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন স্বামীজী। স্টার্ডিকেও খুব বিশ্বাস করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বদলে গেল। প্রথমে স্বামীজী গুরু সে শিষ্য। পরে যেন সেই গুরু, স্বামীজী শিষ্য। স্বামীজীকে কত উপদেশ, কত ভর্ৎসনা! সন্ন্যাসী হয়ে কি তামাক খাওয়া উচিত? স্বামীজী যেন পাঠশালার ছাত্র। স্টার্ডির এত নির্বুদ্ধিতা ও অহংকার। তবু তার জন্যে কত দরদ ও চিন্তা! শুধু তার জন্যে নয়, তার স্ত্রীর জন্যেও। তবে স্বামীজীর এই অহেতুক স্নেহ বৃথা যায়নি; পরে স্টার্ডি ঠিক পথে আবার ফিরে এসেছিলেন।

দুনিয়ায় কাউকে যিনি তোয়াক্কা করেন না সেই স্বামীজী যে আবার বিনয়ী হতে পারেন, এমন একটা চিত্র কল্পনা করতে আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বামীজীর বিনয় আমাদের কল্পনাতীত। একবার মঠে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করার জন্যে। তর্ক সংস্কৃত ভাষায় হচ্ছে। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় তর্ক করে অভ্যস্ত, কিন্তু স্বামীজী একেবারে অনভ্যস্ত। তর্কের সময় স্বামীজী একবার 'অস্তি'র জায়গায় 'স্বস্তি' বলে ফেলেন। পণ্ডিতেরা ছাড়বেন কেন—হেসে লুটোপুটি। স্বামীজী তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন, আর বললেন: "পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্"। অর্থাৎ পণ্ডিতদের দাস আমি, আমার এই ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করবেন। এতটা নম্রতা পণ্ডিতেরা বোধহয় আশা করেননি। শোনা যায় তাঁরা যাবার সময় স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করে যান।

ঠিক এইরকম আর একটা চিত্র মনে মনে ভেসে আসছে। ঘটনাটা ঘটেছিল মাদ্রাজে। একদল পণ্ডিত এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে। তাঁদের কেউ কেউ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছেন বা কাগজে পড়েছেন। তাঁদের ধারণা স্বামীজী সমাজ সংস্কারের নামে সমাজকে ভাঙতে বসেছেন। এঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন 'হিন্দু' পত্রিকার

সম্পাদক। তর্ক হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। স্বামীজীর মতে তাঁদের যুক্তিগুলি একেবারে অসার, শিশুসুলভ। অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে স্বামীজী তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই বুঝবেন না। তাঁরা যেন তর্কের জন্যেই তর্ক করছেন। তখন স্বামীজী বিরক্ত হয়ে বললেনঃ "আপনাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ আপনারা তো সব moustached babies!" অর্থাৎ আপনারা তো সবাই শিশু, যদিও আপনাদের গোঁফ-দাড়ি উঠেছে।

মাদ্রাজে ব্রাহ্মণরা তাঁকে বলেছেনঃ "আপনি তো শূদ্র, আপনার গেরুয়া পরার কি অধিকার আছে?" একথা শুনে স্বামীজী আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেনঃ "আমি যদি শূদ্র হই, তবে আপনারা সব পারিয়া, পারিয়ার চেয়েও পারিয়া।" অর্থাৎ সমাজের সবচেয়ে নীচ যদি পারিয়া হয়, তাহলে আপনারা পারিয়ারও অধম।

বহুদিন পরে স্বামীজী শিষ্যশিষ্যাদের নিয়ে আলমোড়ায় বেড়াতে গেছেন। সেই সময়ে বিখ্যাত দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ছুটি কাটাতে আলমোড়ায় এসেছেন। তিনি লোকমুখে শুনতে পেলেন কে একজন সাধু এসেছেন। রোজ ভোর-বেলায় তাঁকে ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সাহেব-সুবোরাও তাঁর সঙ্গে থাকে। তাঁরা তাঁর শিষ্য। অশ্বিনীবাবু বুঝলেন এ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি খোঁজ নিয়ে একদিন যে বাড়ীতে স্বামীজী থাকতেন, সেই বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা তাঁকে তাক লাগিয়ে দিল। দেখলেন এক সাহেব ভক্ত স্বামীজীর বুটজুতো খুলে দিচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখবেন তা তিনি কখনও ভাবেননি। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আচ্ছা, আপনি যে মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের পারিয়া বলে গালি দিয়েছিলেন, এটা কি ঠিক করেছিলেন?" স্বামীজী কি উত্তর দিলেন? সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ "একদম না। কিন্তু কি করব তারা আমাকে শূদ্র বলাতে রাগ চড়ে গেল, তাই বললাম।"

আমেরিকায় এক হোটেলে ঢুকতে পেলেন না। ম্যানেজার বললেনঃ "তুমি নিগ্রো, নিগ্রোদের এখানে স্থান নেই।" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী ফিরে এলেন। ভক্তরা বললেনঃ "আপনি কেন বললেন না যে আপনি নিগ্রো নন?" স্বামীজী উত্তর দিলেনঃ "কি, অপরকে ছোট করে আমি বড় হব? আমি তো পৃথিবীতে সেজন্য আসিনি!" এরকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল একবার। আমেরিকায় এক রেল স্টেশনে একদল নিগ্রো এসে স্বামীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেনঃ "তুমি আমাদের গর্ব, আমাদেরই একজন, অথচ এত বড় হয়েছ।" স্বামীজী তাদের ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু বুঝতে দিলেন না যে তিনি নিগ্রো নন।

স্বামীজী তাঁর অনুগতদের আশীর্বাদ করেছিলেনঃ "তোরা খাট্‌তে খাট্‌তে মরে যা।" কি রকম? নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন—I will wear out, never rust out"। আবার বলেছিলেনঃ "আমি চল্লিশে পৌঁছব না।" ঠিক তাই হল, চল্লিশের আগেই চলে গেলেন। খাট্‌তে খাট্‌তে মরা কাকে বলে দেখিয়ে দিলেন; লোহার

মত শক্ত শরীর তিল তিল করে তা দান করলেন মানুষের সেবায়। বেলুড় মঠে স্বামীজীর দেহ চলে গেছে। সেদিন রাত্রে মাদ্রাজে তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বপ্নে দেখলেন স্বামীজী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন: "Sashi I have spat out the body"—শশী, থুতুর মতো শরীরটাকে ফেলে দিয়ে এসেছি।

কি প্রার্থনা করব জগন্মাতার কাছে তা স্বামীজী আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন: "মা আমায় মানুষ কর।" কী রকম মানুষ, তাও দেখিয়ে গেলেন, নর-ঋষি, নর-সিংহ, নরোত্তম।

মাদাম ই. কালভে

অনুবাদ : প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঈশ্বরের সাথে যিনি বিহার করেছেন এমন একটি মহৎ প্রাণ সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও প্রকৃত বন্ধুর সাথে পরিচিতি আমার জীবনের মহা সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তিনি আমার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। আমার ধর্মীয় আদর্শ ও ধারণাকে বিস্তৃত ও স্পষ্টতর করে তুলেছেন, সত্যকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধির শিক্ষা দিয়েছেন। আমার আত্মা চিরতরে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

এই অসাধারণ মানুষটি হচ্ছেন একজন বেদান্তবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী, নাম স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকায় এঁর ব্যাপক পরিচিতি তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার জন্য। আমি যখন শিকাগোয় ছিলাম তখন তিনি একবছর ধরে সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমার কিছু বন্ধুকে তিনি যেভাবে মানসিক-দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন তা দেখে আমার নিজের জন্য আমি তাঁর কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার জন্য একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হল। আমি তাঁর বাড়িতে পৌঁছনো মাত্রই আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এর পূর্বে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, যতক্ষণ তিনি আমাকে সম্বোধন না করেন ততক্ষণ আমি যেন কোনও কথা না বলি। কাজেই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি ধ্যানের মহান ভঙ্গিতে বসেছিলেন : তাঁর জাফরান হলদে আলখাল্লা মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল, তাঁর মাথার চতুর্দিক ঘিরে ছিল পাগড়ি বাঁধা, সামনের দিকে ঈষৎ নোয়ানো। তাঁর দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে নত। একটু পরে তিনি দৃষ্টি নত রেখেই বললেন 'বৎসে, কি ঝোড়ো আবহাওয়াই না তুমি নিয়ে এলে। শান্ত হও। এটা প্রয়োজন।'

তারপর খুব শান্ত স্বরে এই মানুষটি যিনি আমার নামও জানেন না, অনুদ্বিগ্নভাবে আমার উদ্বেগ ও গোপন সমস্যা সম্পর্কে বলে গেলেন। তিনি এমন সব ঘটনা বললেন যা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও জানেনা। এটা আমার কাছে ছিল অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার।

শেষপর্যন্ত আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'কি করে এসব আপনি জানলেন? আমার সম্পর্কে কে আপনাকে বললো?'

তিনি স্মিত হাস্যে আমার দিকে তাকালেন যেন অবোধ শিশু আমি, বোকার মত প্রশ্ন করেছি।

'কেউ আমাকে বলেনি'—শান্তভাবে তিনি বললেন। 'তুমি কি মনে কর তার প্রয়োজন আছে? খোলা বইয়ের পাতার মত তোমার ভেতর আমি পড়তে পারছি।'

শেষপর্যন্ত আমার বিদায় নেবার সময় এল। আমি উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেনঃ 'তোমায় এসব ভুলতে হবে। আগের মতো প্রফুল্ল ও খুশী থাক। স্বাস্থ্যের উন্নতি করো। দুঃখটাকে মনে গুমরে রেখোনা। তোমার আবেগকে কোন ভাবে প্রকাশ কর। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য এটা প্রয়োজন। এটা তোমার কাছে তোমার শিল্পের দাবি।'

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কথাবার্তায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম, মনে হল, আমার মাথায় যত জটিলতা ছিল সব তিনি দূর করে দিলেন। পরিবর্তে সেখানে তাঁর স্বচ্ছ ও শান্ত চিন্তাধারা পরিপূর্ণ হল।

তাঁর শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তিকে ধন্যবাদ—যার প্রভাবে আমি আবার প্রাণবন্ত ও হাসিখুসী হয়ে উঠলাম। তিনি আমার উপর কোন সাধারণ সম্মোহন বা যাদু প্রয়োগ করেননি। যা আমাকে প্রত্যয় এনে দিয়েছিল তা হল তাঁর চারিত্রিক শক্তি, তাঁর উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও তীব্রতা। যখন তাঁকে আমি আরও ভালোভাবে জানলাম তখন আমার এটা মনে হয়েছে যে, যাতে তাঁর উপদেশের প্রতি কেউ সম্পূর্ণভাবে মন দিতে পারে সেইজন্য তিনি কারও বিশৃঙ্খল চিন্তাধারাকে শান্ত বশ্যতায় প্রশমিত করতেন।

তিনি প্রায়ই নীতিমূলক রূপক কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বা তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য প্রায়ই উপমার সহায়তা নিতেন। একদিন আমরা অমরত্ব এবং মৃত্যুর পরে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য কতটা বজায় থাকে তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি পুনর্জন্মে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলছিলেন যেটা তাঁর শিক্ষার একটা মূল অংশ ছিল।

'আমি এই ধারণাকে মেনে নিতে পারছি না'—আমি ঘোষণা করলাম; যতই নগণ্য হোক না কেন আমি আমার ব্যক্তিবৈশিষ্টকেই আঁকড়ে থাকতে চাই। আমি শাশ্বত একতার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই না।'

স্বামীজী উত্তরে বললেনঃ 'বিশাল সমুদ্রে একদিন একবিন্দু জল পড়েছিল। সেই অবস্থায় নিজেকে দেখে জলবিন্দুটি কাঁদতে আরম্ভ করল এবং অভিযোগ করতে থাকল,—ঠিক যেমন তুমি করছ। বিশাল সমুদ্র জলবিন্দুর দিকে চেয়ে হাসল আর বলল, "আমি বুঝতে পারছিনা তুমি কাঁদছ কেন! যখন তুমি আমার সঙ্গে মিশেছ তুমি তোমার আর সব ভাই বোনের সঙ্গেই মিশেছ। তাদের দিয়েই তো আমি তৈরী। তুমি নিজেই সমুদ্র হয়ে গেছ। যদি তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও তবে সূর্যরশ্মির সাহায্যে তোমায় কেবল মেঘমণ্ডলে যেতে হবে। যেখান থেকে তুমি আবার একটি ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর বুকে আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়তে পারবে।" '

স্বামীজী ও তাঁর কিছু বন্ধু এবং অনুরাগীদের সাথে আমি তুর্কি, ঈজিপ্ট ও গ্রীসে এক স্মরণীয় ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের এই দলে ছিলেন স্বামীজী স্বয়ং, ফাদার হিয়াসিন্থে লয়সন, তাঁর বোস্টনবাসী পত্নী, সুন্দরী অত্যুৎসাহী স্বামীজীপন্থী শিকাগোর মিস ম্যাকলাউড, আর দলের বুলবুলি গায়িকা রূপে আমি নিজে।

কী ভ্রমণই না এটা ছিল! বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস—কোন কিছুই স্বামীজীর কাছে অজানা ছিল না। আমার চারপাশে যে সারগর্ভ ও জ্ঞানদীপ্ত আলোচনা হত আমি উৎকর্ণ হয়ে তা শুনতাম। আমি তাদের বাদ-প্রতিবাদে কখনই অংশগ্রহণ করতাম না। কিন্তু আমার রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক উপলক্ষেই গান গাইতাম। স্বামীজী সব রকমের প্রশ্ন নিয়ে ফাদার লয়সনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্। তখন খুবই আকর্ষণীয় লাগত যখন দেখা যেত ফাদার লয়সন যেখানে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন না স্বামীজী সেখান কোনও নথির সঠিক বিবরণ বা কোনও চার্চ কাউন্সিলের তারিখ সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হতেন।

যখন গ্রীসে ছিলাম আমরা ইলিউসিস দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি এর সম্বন্ধে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। বেদী থেকে বেদীতে, মন্দির থেকে মন্দিরে নিয়ে যেতেন—প্রাচীন কালে এর প্রতিটি স্থানে যেসকল শোভাযাত্রা সংঘটিত হয়েছিল তাব বর্ণনা দিতেন। প্রাচীন প্রার্থনা শোনাতেন এবং পুরোহিতদের আচার-অনুষ্ঠান-গুলো আমাদের দেখাতেন।

পরে ঈজিপ্টে, এক অবিস্মরণীয় রাতে নীরব স্ফিংসের ছায়ায় বসে রহস্যময় মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে তিনি আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে গেলেন। তিনি সবসময় এমন কি সাধারণ অবস্থাতেও ছিলেন আকর্ষণীয়। তাঁর কথার যাদুতে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। অনেকবারই এমন হয়েছে যখন আমরা কোন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে সময়ের কথা ভুলে আলোচনায় পুরো আবদ্ধ হয়ে গেছি, ট্রেন ধরতে পারিনি। এমন কি মিস ম্যাকলাউড যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ তাঁরও সময় ভুল হয়ে যেত। এর ফলে প্রায়ই আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে অনেক দূরে খুবই অসুবিধাজনক সময়ে ও জায়গায় অসহায় অবস্থায় পড়তে হত।

একদিন কায়রোয় আমরা পথ হারালাম, আমার মনে হয় গভীর মনোযোগের সাথে কথা বলার জন্যই এটা হয়েছিল। যেভাবেই হোক হঠাৎ দেখলাম দুর্গন্ধ ও নোংরা এক রাস্তায় আমরা এসে পড়েছি। এখানে অর্ধউলঙ্গ কিছু মেয়েছেলে জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল আর কিছু দরজার সামনে অলসভাবে বসেছিল।

স্বামীজী এসব কিছুই লক্ষ্য করেননি। যখন ভেঙ্গেপড়া এক বাড়ির ছায়ায় বেঞ্চে বসে থাকা কিছু মেয়েছেলে হাসতে হাসতে তাঁকে ডাকতে আরম্ভ করল, তখন

তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। আমাদের দলের একজন মহিলা তাড়াতাড়ি সবাইকে নিয়ে স্থান ত্যাগের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্বামীজী খুব ধীরভাবে আমাদের ছেড়ে বেঞ্চে বসে থাকা ঐ মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেনঃ 'আহা বেচারারা! দেবত্বকে এরা সৌন্দর্যের কাছে বলি দিয়েছে। এখন এদের দিকে চেয়ে দেখ।'

তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মেয়েগুলো নীরবে লজ্জিত হয়ে বসে রইল। তাদের একজন এগিয়ে এল। স্বামীজীর সামনে ঝুঁকে তাঁর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করল। স্প্যানিস ভাষায় অর্ধস্ফুট স্বরে বলতে লাগলঃ 'ইনি ঈশ্বরজানিত পুরুষ। ইনি ঈশ্বরজানিত পুরুষ।' আর একজন হঠাৎ ভয় ও লজ্জার ভঙ্গিতে তার হাত দুটো মুখের সামনে তুলে ধরল। সে যেন ঐ পবিত্র দুই চোখের সামনে থেকে তার সংকুচিত আত্মাকে আড়াল করতে চাইছিল।

এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণেই স্বামীজীকে আমি শেষবারের মত দর্শন করি। কিছুদিন পরেই তিনি জানালেন যে, তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবন অন্তিমের দিকে এগিয়ে গেছে। কাজেই যেখানে তিনি তার যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন আর যে-সম্প্রদায়ের তিনি পরিচালক ছিলেন সেখানেই তিনি ফিরে যেতে চাইছিলেন।

একবছর পর আমরা খবর পেলাম, তিনি আর ইহলোকে নেই। তাঁর জীবন পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয়েছে, যার একটি পাতাও ধ্বংস হয়নি। তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় এর মানে ইচ্ছামৃত্যু—অসুস্থতা বা দুর্ঘটনায় নয়—স্বেচ্ছামৃত্যু। শিষ্যদের তিনি তাঁর শরীরত্যাগের তারিখ আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কয়েক বছর পর আমি যখন ভারত ভ্রমণ করছিলাম তখন যে মঠে স্বামীজী তাঁর অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন তা দেখার ইচ্ছা হল। তাঁর মা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি মর্মরপ্রস্তরের সমাধি মন্দির দর্শন করলাম যা স্বামীজীর আমেরিকাবাসী বন্ধু মিসেস লেগেট তাঁর সমাধির উপর নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমি লক্ষ্য করলাম এর উপরে কোন নাম লেখা নেই। তাঁর ভাইকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব নম্র ভঙ্গিতে যে উত্তর দিলেন তা আজও আমি স্মরণ করতে পারিঃ 'তিনি চলে গেছেন।'

বেদান্তবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা তাদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও সরলতার মধ্যেই হিন্দুধর্মের শিক্ষাকে বহন করছেন। তাঁদের কোন মন্দির নেই, তাঁদের প্রার্থনা খুব সহজ সুরে তাঁরা জানান। তাঁদের ধর্মানুরাগকে উদ্দীপিত করার জন্য কোন সাঙ্কেতিক মূর্তি বা ছবি তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁদের সকল প্রার্থনা অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশে। তাঁদের প্রার্থনায় তাঁরা বলেনঃ হে অনামী, তোমাকে কেউ নাম দিতে পারে না। তুমিই সেই মহান্ অজানা।

স্বামীজী আমাকে এক ধরণের প্রাণায়াম প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই

বলতেন, দেবতার শক্তি ইথারের মাধ্যমে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং সেই শক্তিকে নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে গ্রহণ করা যায়।

স্বামীজীর গুরুভাই ও সন্ন্যাসীরা আমাদের সদয় সরল আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করলেন। একটা ছাউনির নীচে টেবিল পেতে তাঁরা আমাদের ফুল ও ফল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

আমাদের পায়ের সামনে দিয়ে বিশাল গঙ্গা বয়ে যাচ্ছিল, যন্ত্রবাদকরা আমাদের উদ্দেশ্যে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল, অপার্থিব প্রার্থনার করুণ সুর অন্তর স্পর্শ করছিল। একজন কবি প্রয়াত স্বামীজীর মহিমা কীর্তন করে বিষণ্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। দুপুরটা স্বচ্ছ ও শান্ত চিন্তার মধ্যে কেটে গেল। এই শান্ত দার্শনিকের সঙ্গে, যে দিনগুলো আমি কাটিয়েছিলাম এতদিন পরেও তা আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। এই সব পবিত্র ও সুন্দর পুরুষেরা মনে হয় আমাদের এই মাটির পৃথিবীর নন—অন্য এক উন্নততর ও আধ্যাত্মিক জগতের বাসিন্দা।

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Reminiscences of Swami Vivekananda গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বিবেকানন্দ দশমুখো ছবি।*

**বিনয়কুমার সরকার**

## বিবেকানন্দর দিগ্‌বিজয়

বিবেকানন্দ-পূজো দুনিয়ায় বাড়িয়া চলিয়াছে। বিবেকানন্দর দিগ্‌বিজয় এতদিন প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবদ্ধ ছিল। বৎসর খানেক হইল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা দেশে প্রচার কার্যে গিয়াছেন স্বামী বিজয়ানন্দ। সেদেশের লোকেরা এখানকার বেলুড় মঠের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইয়া খরচপত্র দিয়া বাঙালী প্রচারককে লইয়া গিয়াছে। সেদেশে বিজয়ানন্দকে কথাবার্তা বলিতে হয় স্পেনিশ ভাষায়। পয়সা খরচ করে ওরা, গুরুগিরি করি আমরা। ইহার নাম যুবক বাঙলা। জয় 'বিবেকানন্দ'র জয়!

মাস চারেক হইল জার্মানির ভীজবাডেন শহরের এক দর্শনকেন্দ্র হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী যতীশ্বরানন্দকে পাঠানো হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আজকালকার জার্মানি হিটলারি জার্মানি। হিটলার-শাসিত জার্মান-সমাজেও হিন্দুদর্শনের ডাক পড়িয়াছে। বাঙালী দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারককে হিটলারি-জার্মানি গুরুর পদে বসাইয়াছে। যে জার্মান নরনারী হিটলারি আইন-কানুনের প্রভাবে ইহুদি এবং অন্যান্য বিজাতীয় নরনারীর সঙ্গে আত্মিক সংশ্রব বর্জন করিতেছে, সেই জার্মান নরনারীই ভারত-সন্তানকে সাধিয়া-ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সেকালের ভারতধর্ম আর একালের বঙ্গদর্শন দুই-ই বিবেকানন্দ-শিষ্যের মারফৎ জার্মানিতে প্রচারিত হইতেছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন যে, জার্মান সমাজে ভারতীয় ও বাঙালী দর্শনের পশার বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। হয়ত তাঁহাকে জার্মানিতে বেশীদিন থাকিতে হইবে। জার্মানসমাজে বিবেকানন্দ'র নামে প্রতিষ্ঠিত জার্মান-কেন্দ্র এই প্রথম।

বিবেকানন্দর লেখালেখির ভিতর গরু হারাইলেও ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য এক বিপুল বিশ্বকোষ, ঠিক একখানা মহাভারত আর কি! কাজেই যার যখন যেমন খেয়াল সে তখন বিবেকানন্দর নিকট হইতে সেইরূপ পাঁতি বাহির করিয়া লয়। কখনো-কখনো বিবেকানন্দ আমার চিন্তায় ফরাসী নেপোলিয়নের জুড়িদার। বিবেকানন্দকে আমি ইংরেজ কার্লাইল সমঝিয়াও থাকি। আবার জার্মান-ইহুদী নীটশের সঙ্গে বিবেকানন্দকে এক আসনে বসানো আমার

* ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী কলিকাতার য়্যালবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম। অধ্যাপক সরকারের "বাড়তির পথে বাঙালী" ( ৫৪৯-৫৬৭ পৃঃ ) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

খেয়ালে দেখা গিয়াছে। মার্কিন হুইটম্যান অথবা ইংরেজ ব্রাউনিঙ ইত্যাদির সঙ্গে বিবেকানন্দর তুলনা করিয়া আমার আত্মা মাঝে-মাঝে আনন্দ পাইয়া থাকে। অধিকন্তু, একালের জার্মান যৌবনাবতার হিটলারকে বিবেকানন্দী আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর বিবেচনা করাও আমার দস্তুর। তাহা ছাড়া বিবেকানন্দকে সেকেলে বৌদ্ধবীরদের রাহুল-উপালি-মহাকচ্চায়ন ইত্যাদির সমকক্ষ সমঝিতেও আমি অভ্যস্ত।

আজ বিবেকানন্দর বিশ্বকোষ হাঁটকাইয়া এই দিগ্‌বিজয়ী বাঙালী বীরের কয়েকটা জীবন-মন্ত্র বাহির করিব। মন্তরগুলো হয়ত বা কোনো বকাবকির ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়ত বা কোনো প্রবন্ধের ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়ত বা কোনো মোলাকাতের ভিতর পাওয়া যাইবে। আর যদি বিবেকানন্দী বিশ্বকোষের ছাপা হরফে এই সকল বিবেকানন্দ-বাণী সশরীরে ঢুঁড়িয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে হয়ত সেই সব পাওয়া যাইবে বিবেকানন্দ মানুষটার ভিতর। কথাগুলা বিবেকানন্দী-নীতির অ, আ, ক, খ বিশেষ।

## "বাপের বেটা হ'স ত' একে একে লড়ে যা"

বিবেকানন্দ দুমুখো ছুরি। এই ছুরির কোনো মুখই ভোঁতা নয়। দুইই চকচকে, ধারাল, জোরাল,—যাহাকে আমাদের বিক্রমপুরে বলে "চোখা"। বিবেকানন্দ "মিছরির ছুরি" নয়। এই ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম—কোনো-কোনো লোকের পক্ষে, কোনো-কোনো দলের পক্ষে, কোনো-কোনো চিন্তাপ্রণালীর পক্ষে, কোনো-কোনো কার্যপ্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দর ব্যবসা দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাকা, আহাম্মুকদের বেয়াকুবিগুলাকে কুচিকুচি করিয়া কাটা আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাতপাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা।

ইয়োরামেরিকার দিকে, খৃষ্টানদের দিকে, সাদা-চামড়াওয়ালা নরনারীর দিকে, 'পশ্চিমা'দের দিকে বিবেকানন্দর এক মুখ। অপর মুখ পূবের দিকে, এশিয়ার দিকে, ভারতের দিকে আর বিশেষ করিয়া বাঙলার দিকে। পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ আর পূবমুখো বিবেকানন্দ, দুই বিবেকানন্দই জবরদস্ত শক্তিযোগী, দুই বিবেকানন্দই লড়াইয়েব পাঁয়তারা ঢুঁড়িতে অভ্যস্ত।

পশ্চিমাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলে, "আরে ভাই মার্কিন, আরে ভাই ইয়াঙ্কি, বাপের বেটা হ'স ত একে একে লড়ে যা।" আমেরিকানরা জিজ্ঞাসা করিতেছে ঃ—"আরে বিবেকানন্দ, কি হ'ল ছাই, বল্ ভাল ক'রে বুঝিয়ে।" বিবেকানন্দর জবাব নিম্নরূপ ঃ—"দ্যাখ্ আমেরিকান নরনারী, তোদের লম্ফঝম্প এত বেশী কেন জানিস্? তোদের টাকা আছে, তোদের বাড়ীঘর আছে, তোদের ব্যবসা আছে, তোদের ব্যাঙ্ক আছে, তোদের জাহাজ আছে, তোদের বেপারী আছে, তোদের কনসাল আছে, তোদের পল্টন আছে, তোদের এই ধরণের কত কি আছে। তোরা যখন লম্বাচোড়া কথা বলিস্ তখন তোদের পেছনে থাকে এতগুলা লোক, দল,

সঙ্ঘ, দপ্তর, অর্থশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, সমর-শক্তি। আর আমি বঙ্গচন্দ্র, গোলামের বাচ্চা। আমার না আছে পয়সা, না আছে নাম। আমাদের বাংলাদেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবি। বিবেকানন্দর নামগন্ধ পর্যন্ত কেহ জানে না। দু আনা, চার আনা, দশ আনা কুড়াইয়া কেহ-কেহ কোনো মতে আমাকে তোদের মুল্লুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমার জোর "কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"। কন্টেস্ট্ে সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া মার্কিন মুল্লুকে আসিয়া হাজির হইয়াছি। আমার পেছনে কেহ নাই—যদি থাকে ত ভগবান রামকৃষ্ণ। সেইজন্য বলি তোরা একজন করিয়া এই ন্যাংটা বাঙালী বাচ্চার সঙ্গে লড়িয়া যা, দেখি তোদের মুরদ কত।"

ইংরেজকেও বিবেকানন্দ বলে ঃ—"ভাই ইংরেজ তোকেও জানি, বেশ জানি, ভাল রকমই জানি। তোদের নিজের দেশে, বিলাতে, যতগুলা বড়-বড় ইস্কুল-কলেজ আছে তাতে তোদের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে আমাদের ছেলে-পিলেরাও পড়ে। আমাদের বাঙালী বা অন্যান্য ভারত-সন্তান যারা বিলাতী পাঠশালায় পড়িতে যায় তারা সকলেই যে বাছা-বাছা ভাল ছেলে তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি দেখি? বাঙালী ছোকরারা, অন্যান্য ভারতীয় ছোকরারা, তাদের কেহ-কেহ তোদের যতসব পয়লা দরের ছেলে তাদের অনেকেরই সমানে-সমানে চলে। বড়-বড় পারিতোষিক, মেডেল, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি যা-কিছু তোদের মোড়লেরা সব-সে-সেরা ছেলেদেরকে দিতে অভ্যস্ত তার অনেক-কিছুই আমাদের ছোকরারা মাঝে-মাঝে লুটিয়া আনিয়াছে ও আনিতেছে। কাজেই বলি—ভায়া হে, বাপের বেটা হস্ত একে-একে লড়ে যা। তারপর এই যে ভারতখানা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাহার ভিতরই বা কি দেখি? যে-যে দপ্তরে, যে-যে কাজে, যে-যে ব্যবসায় আর যে-যে পেশায় বাঙালীরা আর অন্যান্য ভারত-সন্তানেরা তোদেরই কায়েম-করা আইনের ফলে কিছু-কিছু ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই সকল কর্মক্ষেত্রে ইহারা তোদের স্বজাতীয় লোকের চেয়ে ছোট দাঁড়ায় নাই। উকিল, ডাক্তার, ইস্কুলমাষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, দপ্তরের ডিরেক্টার ইত্যাদি হিসাবে ইংরেজরা বাঙালী বাচ্চাকে অথবা অন্যান্য ভারতবাসীকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল কথা তোদেরই গেজেটে, খবরের কাগজে, তোদেরই পার্লামেন্টের দলিলে খোদা আছে। তাই বলছি, গবর্মেণ্টের মেজাজ ভুলিয়া, ফৌজ আর পল্টনী জাহাজের দেমাক ভুলিয়া, টাকাকড়ির গরম ভুলিয়া বাপের বেটা হ'স্ত একে-একে লড়ে' যা। দেখা যাউক, গবর্মেণ্টহীন, ফৌজহীন, ব্যাঙ্কহীন, কারখানাহীন, পদবীহীন মামুলি ইংরেজরা বাঙালী বাচ্চার চেয়ে, অনামী, অজ্ঞাতকুলশীল ডাল-ভাত-খাউয়া বঙ্গচন্দ্রের চেয়ে বড় কিনা।"

ফরাসীকে, ইতালিয়ানকে, জার্মানকে, দুনিয়ার সাদা-চামড়াওয়ালা সকল পশ্চিমা নরনারীকেই বিবেকানন্দ "কলা" দেখাইতেছে। আর বলিতেছে—"বাপের বেটা হ'স ত একে-একে লড়ে' যা। দেখা যাউক, কার কত মুরদ, কার মগজে কতখানি ঘী, কার চরিত্রে কতখানি মনুষ্যত্ব।"

এই গেল পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ। দুনিয়ার লোক, বিশেষতঃ পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল ঃ—"তাই ত, এ যে বিপ্লব, দুনিয়ার যুগান্তর। সংসারের ছোট, বড় ইত্যাদি শ্রেণী সম্বন্ধে এই প্রণালীতেও চিন্তা করা সম্ভব?" পশ্চিমারা এইরূপ ভাবিল আর বলিল ঃ—"বিবেকানন্দ বাপ্‌কা বেটা। এশিয়ায় লোক পয়দা হইয়াছে। বঙ্গচন্দ্রও পারিবে শাসিতে, হাসিতে-হাসিতে, সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে।"

## "বাঙালীর আবার বাণী!"

বাপ্‌কা বেটা বিবেকানন্দ, পশ্চিমা মেয়ে-পুরুষের চিত্তে যুগান্তর-সাধক বিবেকানন্দ, ইয়োরামেরিকায় বিপ্লব-প্রবর্তক বিবেকানন্দ এবার পূর্বমুখো হইল, বাঙালী-মুখো হইল। বাঙালীরা জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আরে ভাই বিবেকানন্দ, বল্ ত ভাই, আমাদের কি বাণী?" বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আরে পদা, কাদো বাণী শুন্‌বি?" পদা, যদু, হরা, ইস্‌মাইল, আবদুল সকলে একসঙ্গে বলিতেছে ঃ—"শুনতে চাই আমরা ভারতবাসীর বাণী, বাঙালীর বাণী, আধুনিক বাঙালীর বাণী, বর্তমান ভারতের বাণী।" পূবমুখো বিবেকানন্দ বলিতেছে—"বাঙালীর আবার বাণী!" বর্তমান ভারতের বাণী শুনতে চায়! বর্তমান বাঙলার বাণী শুন্‌তে চায়! ভারতবাসী ত ম্যাড়াকান্ত, বাঙালীরা ত গরু। ম্যাড়াকান্তগুলো গরুগুলো আবার চায় বাণী ফলাতে! এরা ত ভ্যাঁ ভ্যাঁ ম্যাঁ ম্যাঁ করে, এই সব নর-নারীর, এই গরুগুলোর আবার বাণী কিরে?"

পূবমুখো বিবেকানন্দর মুখ-ঝাড়া খাইয়া ভারতবাসীর আর বাঙালীর ত চক্ষু স্থির। বিদেশের লোক ভাবিল—"ইহার নাম বিবেকানন্দ'! এ ত চাবুক, এ যে জুতো!" বিশ্ববাসী বলিল—"ইহার নাম বিপ্লব, ইহার নাম যুগান্তর।"

বাঙালীর মাথায় এতদিনে প্রবেশ করিল ঃ—"তাই ত, বাঙালীর তবে সত্য-সত্যই কোন বাণী নাই।" ভারতবর্ষের অন্যান্য নরনারীও প্রথম ভাবিতে শুরু করিল ঃ—"তবে কি বাস্তবিক পক্ষে আমরা সকলেই গরু, ম্যাড়াকান্ত? দুনিয়ায় বর্তমান ভারতের কোন ইজ্জদ নাই?" বিবেকানন্দর জুতা খাইয়া ভারতসন্তান আর বিশেষতঃ বঙ্গচন্দ্র চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভারতের যে-সব লোক "নিজের বিচারে" নিজেকে হোমরা-চোমরা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে জুতাইয়া দুরস্ত করিল বিবেকানন্দ। দুনিয়ার বাটখারায় ফেলিলে আমাদের ভারতখানা যে আহাম্মুকের বাথান আর কাপুরুষের চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই বাণী যেই বাঙালীর, মান্দ্রাজীর, মারাঠার আর পাঞ্জাবীর কানে ঢুকিল তৎক্ষণাৎ ইহাদের নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার রেওয়াজ কাটিতে সুরু করিল। যুবক বাঙলার জন্ম হইল, জগতে যুবক ভারত দেখা দিল।

## মারে জুতা, খায় পুজো

বাঙলাদেশে আর গোটা ভারতে যুগের পর যুগ ধরিয়া অনেক বড় লোকের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোককে বিবেকানন্দ'র মতন জুতাইতে পারে নাই আর কেহ। বরং আমাদের দেশে যে যখন নতুন কথা বলিয়াছে সে তখন দেশের লোকের হাতে মার খাইয়াছে। "নতুন" একটা কাজের প্রস্তাবে আমাদের দেশের লোক কোনো সমাজ-সংস্কারককে বা স্বদেশ-সেবককে বড় শীঘ্র তারিফ করে নাই। জনসাধারণের মার খায় নাই এমন কর্ম্মিৎকর্মা বা চিন্তাশীল লোক বাঙলাদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দ'র কপাল ভাল। বিবেকানন্দ মুখ-ঝাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। তার বচন মাত্রই কষাঘাত। প্রতি মুহূর্ত্তে দেশের লোককে গাল দেওয়া, তিরস্কার করা, চাবুক লাগানো আর জুতাইয়া লম্বা করা, এই ছিল বিবেকানন্দ'র দস্তুর। কিন্তু মজার কথা, দেশের লোক বিবেকানন্দ'র জুতা যত খাইয়াছে ততই তাহাকে আরও বেশী সম্মান করিয়াছে। মারিয়াছে জুতা আর খাইয়াছে পুজা—এই হইল বাঙালীমুখো বিবেকানন্দর চরিতকথা।

## বিবেকানন্দ'র মক্কেল কেরাণী-বেপারী-জমিদার

বিবেকানন্দকে লোকেরা এত ভালবাসিল কেন? দেখা যাউক, বিবেকানন্দর মক্কেল কাহারা। মফঃস্বলের খবর যাহারা রাখে তাহারা জানে যে, রেলের কেরাণী, স্টীমারের কেরাণী, ডাকঘরের কেরাণী, আদালতের কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা বিবেকানন্দর ভক্ত। পাড়াগাঁয়ের ছোট-বড়-মাঝারি লাইব্রেরীতে যে দুশ পাঁচশ বই আর খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র থাকে তাহার ভিতর গল্পের বইএর পরেই কাটে বোধ হয় বিবেকানন্দর বইগুলা। আর বিবেকানন্দ-সাহিত্যের খাদকদের ভিতর বাঙালী মধ্যবিত্তের নানা শ্রেণীর বেশ পুরু দল। আজকাল বাঙলা দেশে হাজার খানেক গ্রন্থাগার চলিতেছে। তাহাদের কর্মকর্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দর বাজারটা বুঝিতে পারা যায়।

মফঃস্বলে আজকাল আর এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বীমার দালাল। গুণ্তিতে ইহারা হাজার কয়েক। অধিকন্তু সাড়ে সাতশ, আটশ বা হাজার "কুটির ব্যাঙ্ক" (লোন অফিস) চলিতেছে। এই সমুদয়ে চাকুরি করে বোধ হয় হাজার তিন-চার। এই দুই শ্রেণীর বণিকদের পরিবারে-পরিবারেও বিবেকানন্দর কাট্‌তি বেশ বেশী।

মধ্যবিত্তদের আর এক শ্রেণীর লোক জমিদারের মুহুরি ও অন্যান্য কর্মচারী। ইহারা অনেকেই সাবেকপন্থী। সেকেলে ধরণ-ধারণ ও মতিগতি, পাড়াগেঁয়ে চরিত্র ইত্যাদি এই সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ। এই সমাজে পড়াশুনার রেওয়াজ একটু-আধটু বাড়িতেছে। সেই রেওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে "স্বামীজী"র বচন, বক্তৃতা, মন্তর, উপদেশ ইত্যাদিও বাঙালী সমাজে শিকড় গাড়িতে সুরু করিয়াছে।

খবর লইয়া দেখিয়াছি যে, জমিদারেরাও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মক্কেল। জমিদারেরা ডিস্পেন্সারি রাখিতে অভ্যস্ত। সেই সূত্রে দু'একজন ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের সঙ্গে তাহাদের আনাগোনা স্বাভাবিক, ডাক্তার-কম্পাউন্ডারদের অনেকেই বিবেকানন্দর দু-একখানা বই বগলদাবা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত, অথবা বালিশের নীচে রাখিয়া সংসার চালানো তাহাদের দস্তুর। জমিদারেরা এই সংসর্গে পড়িয়া বিবেকানন্দর মক্কেলে পরিণত হয়। জমিদারদের আর এক সহায় হইতেছে নিজ-নিজ "গার্জিয়েন টিউটর" বা মাষ্টার মশায়। ইস্কুল প্রতিপালন করা বাঙালী জমিদার-গৃহস্থালীর এক প্রকার নিত্যকর্মপদ্ধতিস্বরূপ। সুতরাং কয়েকজন ইস্কুল-মাষ্টারও জমিদারদের আবহাওয়ায় সর্বদাই থাকে। গার্জিয়েন টিউটর আর ইস্কুল-মাষ্টারদের বোধ হয় কম্‌সেকম চার আনা খাঁটি বিবেকানন্দ-ভক্ত। কাজেই বিবেকানন্দর পসার পরোক্ষভাবে জমিদারের অন্দরমহল পর্যন্তও ধাওয়া করিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু, ছোকরা উকিলদের সঙ্গেও জমিদারদের ভাব কম নয়। ছোকরা উকিল-সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেকানন্দর গুণগ্রাহী। ফলতঃ জমিদারেরা নিজ ঘরোয়া লাইব্রেরীর জন্য বই কিনিবার সময় "বিবেকানন্দ এক সেট" অর্ডার দিতে ভুলেন না।

অপরদিকে জমিদারেরা একালের ইঞ্জিনীয়ার, রাসায়নিক, ব্যবসায়ী, বণিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখে। অনেক জমিদারই আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য শিখাইয়া আনিবার জন্য বাঙালী যুবাকে জাপানে, আমেরিকায়, জার্মানিতে পাঠাইবার কাজে অর্থসাহায্য করিয়াছে। স্বদেশী কারখানা চালাইবার জন্য চাঁদা দেওয়া অথবা শেয়ার কেনা ইত্যাদি কাজও জমিদারের মামুলি স্বদেশ-সেবার অন্তর্গত। এই সকল কাজে যে-সব যন্ত্রনিষ্ঠ বাণিজ্যনিষ্ঠ যুবা মোতায়েন তাহাদের অনেকেই কখনো না কখনো দেশে-বিদেশে বিবেকানন্দ-কথা প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছে। ইহাদের মারফতে ও জমিদারের আবহাওয়ায় বিবেকানন্দ-পূজা প্রসারিত হইতেছে।

একালে যাহারা মজুর-আন্দোলন চালাইতেছে তাহাদের বোধ হয় প্রায় সকলেই বিবেকানন্দকে নিজ-নিজ জীবন-প্রভাতে গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল। আজও "সোশ্যালিজম্‌" "কমিউনিজমে"র জোয়ার-কালেও বিবেকানন্দপূজা মজুরপন্থীদের মহলে বেশ-কিছু বজায় আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য "ন্যাশনালিষ্ট"-পন্থী স্বদেশ-সেবকেরা ও বিবেকানন্দকে নিজেদের ভগীরথ বা পথপ্রদর্শকরূপে চিরকালই পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর আছে ছেলে-ছোকরাদের দল। আজকাল শ এগার-বার ম্যাট্রিকুলেশন-ইস্কুল পড়ে প্রায় পোনে তিন লাখ ছেলে-মেয়ে। ফি বছর পুরস্কার বিতরণের সময় তাহারা সকলেই অন্ততঃ একবার বিবেকানন্দর "মা, আমায় মানুষ কর" আওড়ানো শুনিতে অভ্যস্ত। আওড়ায় বটে দশ বৎসরের বাচ্চা, কিন্তু শুনে শত-শত লোক—ছেলে-বুড়া, বাপ-মা, ইস্কুলমাষ্টার, ইস্কুল-সেক্রেটারি।

## হাতের কাছের কর্তব্য বনাম কালী-কৃষ্ণ-শিব-ব্রহ্ম

কেরাণীকে কেরাণী, মুহুরিকে মুহুরি, ইস্কুল-মাষ্টারকে ইস্কুল-মাষ্টার, এঞ্জিনীয়ারকে এঞ্জিনীয়ার, বণিককে বণিক, ডাক্তারকে ডাক্তার, জমিদারকে জমিদার দেখিতেছি বাঙালী সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই বিবেকানন্দ-ভক্ত। এত বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন বয়সের লোক বিবেকানন্দকে লইয়া মাতামাতি করে কেন? বিবেকানন্দর ভিতর এমন কি আছে যাহাতে পঁচিশ-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার আয়ের গৃহস্থ হইতে পাঁচহাজার-পতি, দশহাজার-পতি, লাখপতি পর্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সমানভাবে পূজাযোগ্য সমঝিতে অভ্যস্ত। জবাব অতি সোজা। গরীব মানুষ, মাঝারি মানুষ সকলেই বিবেকানন্দর ছোঁয়ায় তাতিতে আরম্ভ করে। বিবেকানন্দর কথাগুলায় যে-কোনো মানুষেরই প্রাণ ছ্যাঁক করিয়া উঠে। যে শুইয়া আছে সে উঠিয়া বসে, যে বসিয়া আছে সে খাড়া হইয়া পড়ে, যে খাড়া আছে সে চলিতে থাকে, আর যে চলিতেছে সে দৌড়াইতে লাগিয়া যায়। ঠিক যেন ছোকরারা জোয়ান হয়, আর জোয়ানরা পালোয়ান হয়।

বিবেকানন্দর কাছে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বয়সের আর অবস্থার উপযোগী কর্তব্যের হদিশ পায়। সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাহার নিজের একটা কিছু করিবার আছে। আর সেই কর্তব্যটা পাঁচ-সাত-দশ বৎসর বা পাঁচ-সাত-দশ জন্মের পর পালন করিলে চলিবে না। কর্তব্যটা এখনকার, এই মুহূর্তের, এই ক্ষেত্রের। প্রত্যেক কেরাণী, মুহুরি, জমিদার, ডাক্তার, ইস্কুলমাষ্টার, সমাজ কর্মী, মজুর-নায়ক, স্বদেশ-সেবকের নিকট বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত কর্তব্যের কথা বলে। বিবেকানন্দর বাণী সোজাসুজি সকলেরই নিজ-নিজ কর্তব্যজ্ঞানে ঘা লাগায়।

রামপ্রসাদের মতন "কালী বলে' বস্‌না ধ্যানে" প্রচার করিতে গেলে বিবেকানন্দ একালের বাঙালী সমাজে ফেল মারিত। সকলেই বলিত—"আরে ভায়া, সে-সব ত ঠানদিদির মালসী গানে।" "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌" আওড়াইলেও বিবেকানন্দর কল্কে জুটিত না। এদিকে ব্রহ্মপূজার মন্তর দিলেই কি বিবেকানন্দর মক্কেল জুটিত বেশী? তাহারও সম্ভাবনা কম।" "শিবোঽহম্‌", "শিবোঽহম্‌" হরদম চালাইলেও কেরাণী-বণিক-জমিদারের দল বিবেকানন্দর পূজায় সিধা জোগাইতে ভিড়িত না। এমন কি, "গীতা-নাম গীতা-নাম গীতা-নামৈব কেবলম্‌" অথবা বেদান্ত ছাড়া "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"— বুলিতেও একালের কলি গলিত না।

## আটপৌরে জীবনে শক্তিদাতা বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দর বকাবকির ভিতর কালী আছে, উপনিষৎ আছে, শিব আছে, ব্রহ্ম আছে, গীতা আছে, যোগ আছে, রামকৃষ্ণ আছে, আর বেদান্ত ত আছেই। বিবেকানন্দী বিশ্বকোষে এই সব ধর্ম, দর্শন, নীতি, দেবদেবী, হরিলুট, পাঁঠাবলি,

উপাসনা, প্রার্থনা, সাকার পূজা, দরিদ্রনারায়ণ, কাঙালীভোজন, তীর্থগমন ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব নাই। যাহার মাথায় ঘী আছে সে অনেক কিছুই আলোচনা করিতে পারে। বিবেকানন্দর মগজ ঘীয়ে ভরা ছিল। কাজেই তাহার সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভিতর আশমানজোড়া আলোচনা আছে।

কিন্তু মুহুরি, বণিক, বীমার দালাল, ইস্কুলমাষ্টার, দোকানদার ইত্যাদি লোক ভগবানের সামীপ্য লাভের লোভে মাতোয়ারা হয় নাই। ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য পাইবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা যে বাঙালী মধ্যবিত্ত বা ডাক্তার বাবু কিম্বা জমিদারের খুব বেশী তাহা বিশ্বাস করিবার কারণও নাই। লোকেরা চায় এমন কিছু যাহাতে রোজের কাজে রোজ সাহায্য পাওয়া যায়। প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনে উৎসাহদাতা, মন্ত্রদাতা, শক্তিদাতা আবশ্যক হয় দুনিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক নরনারীর।

এইরূপ শক্তিদাতাই বিবেকানন্দর মুখঝাড়া। ভগবান কাহাকে বলে, আত্মা কাহাকে বলে, এই সব কথা জানা থাকিলে নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরকাল কি বস্তু, ইহকালের সঙ্গে পরকালের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ে মাথা জবর রূপে খেলিলেও বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে আনাড়ী থাকা খুবই সম্ভব। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগাযোগ কায়েম করিবার হদিশ জানিয়া সংসারের কাজকর্ম বা গৃহস্থালী চালাইবার দর্শনে ফেল মারা বিশেষ কিছু নয়। এই সব বীজ বিবেকানন্দী বিশ্বকোষের বড় কথা, প্রধান কথা অথবা আসল কথা হইলে বিবেকানন্দর মুখঝাড়া খাইবার জন্য কেহ লালায়িত হইত না।

আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বিষয়ক কথা অতি মামুলি, শুনিয়া-শুনিয়া কান ঝালা-পালা হইয়া গিয়াছে, আর কপচাইয়া-কপচাইয়া দাঁতে খিল লাগিয়াছে, আর জিহ্বা ভোঁতা মারিয়া গিয়াছে। এই সব শব্দের ভিতরে বা পশ্চাতে বস্তু ঢুঁড়িয়া বাহির করা অতি কঠিন। এই সবের ভিতর জীবন কতটুকু আছে তাহার বিশ্লেষণও বড় সহজ কথা নয়। জীবন গঠনের পক্ষে এই সকল শব্দে কিছু মশলা পাওয়া যায় কিনা তাহার গবেষণা বেশ-কিছু জটিলতাপূর্ণ। বিবেকানন্দর বিশ্বকোষে সেই আলোচনা-বিশ্লেষণ-গবেষণা আছে সন্দেহ নাই। এই সব বিষয়ে বিবেকানন্দ নিজেই বড় ওস্তাদও বটে। কিন্তু এই সব গবেষণার পেছন-পেছন ছুটিয়া বাঙালী কেরানী-জমিদার-ইস্কুলমাষ্টার হয়রাণ হয় নাই। যতই বেয়াকুব হউক, একালের বাঙালী জাত এত আহাম্মুক নয়।

## নিরেট আত্মোন্নতির হদিশ

"যেই কৃষ্ণ সেই কালী"—এই ধরনের সমন্বয় বিবেকানন্দর পূর্বে অনেকেই চালাইয়াছে। বিবেকানন্দর মাথায়ও এই সমন্বয় আসিয়াছে। তাহার উপর আসিয়াছে খৃষ্টিয়ানে-বৌদ্ধে-হিন্দুতে-মুসলমানে, পূর্বে-পশ্চিমে নানাপ্রকার সমন্বয়ের মোসাবিদা। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজোড়া সর্বজাতি-সমন্বয়কারী

হিতোপদেশ বা ধর্মপ্রচার যদি বিবেকানন্দর বকাবকির ভিতর প্রধান "মুদ্দা" থাকিত,—একটা আমাদের মালদহী বোল ঝাড়া গেল,—তাহা হইলে কেরাণীরা বলিত —"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রামপ্রসাদের মালসীই আবার গাওয়া যাউক। অথবা বোষ্টম-বোষ্টমীর তুলসী-তলায় গিয়া নাচানাচিই বা করি না কেন? বিবেকানন্দ, তাহা হইলে তুমি চরে খাও বনে-জঙ্গলে,—অথবা আবার আমেরিকায়।" ইস্কুল-মাষ্টারেরা, বীমার দালালেরা আর বেপারীরাও ঠিক এইরূপই বলিতে বাধ্য হইত। এইরূপ অলীক বিশ্বধর্মের হিড়িকে ভাসিয়া যাইবার উন্মাদনা এ-যুগের বাঙালী না।

বিবেকানন্দ বলে :—"দ্যাখ্, তুই বোষ্টম, কি শৈব, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি আর-কিছু, কি সব-কিছু, তাতে বয়ে গেল, তুই যাই হস, তোকে সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লড়াই করিতেই হইবে। তোর জীবনকে উন্নত করিবার জন্য কতকগুলা কাজ করা আবশ্যক। সেই কাজগুলা তোকে এখনি করিতে হইবে। তুই যত বড় লোকই হস না কেন, তোর কতকগুলা অভাব আছে। সেই অভাবগুলা তোকে পূরণ করিতে হইবে এখনই। দায়িত্ব প্রত্যেকেরই নিজ নিজ। নিজের উন্নতি-সাধনই জীবনের আসল কাজ। তোর জীবন ব্যক্তিগত জিনিষ। তোর কর্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নিরেট কাজে।"

জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ বাঙালী সমাজকে তর্কশাস্ত্রের কচকচানির ভিতর আনিয়া ফেলে নাই। ভক্তিযোগী বিবেকানন্দর পাল্লায় পড়িয়া বাঙলার নরনারী একটা নয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ভক্তিবন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। কিন্তু বাঙলার নরনারী কর্মযোগী বিবেকানন্দর জুতা খাইয়া প্রতি মুহূর্তের ব্যক্তিগত কর্তব্য-নিষ্ঠায় চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ছোঁড়া-বুড়ারা মানবজাতির ধর্ম-বিশ্বপ্রেম, সর্বজাতি-সমন্বয়ের নীতি ইত্যাদি বুলিতে না মজিয়া নিজ-নিজ উন্নতি সাধন, নিজ-নিজ হাতের-কাছের কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হইতে শিখিয়াছে। ধরা-ছোঁয়া যায় এমন নিরেট আত্মোন্নতির হদিশ দিতে পারিয়াছে বলিয়াই বিবেকানন্দ একালের বাঙালীর যুগাবতার।

বিবেকানন্দর বাঙালী বলিতেছে :—"মা, আমায় মানুষ কর।" বলিতেছে না :—"মা দুনিয়াকে মানুষ কর" বলিতেছে না :—"রামাকে মানুষ কর, শ্যামাকে মানুষ কর, খৃষ্টিয়ানকেও মানুষ কর ইয়োরোপকে মানুষ কর, আমেরিকাকে মানুষ কর।" বলিতেছে :—"আমাকে মানুষ কর।" বলিতেছে না :—"আহাম্মুকগুলাকে মানুষ কর, কাপুরুষগুলাকে মানুষ কর।" বলিতেছে :—আমি আহাম্মুক, আমাকে মানুষ কর।" বলিতেছে :—"আমি কাপুরুষ, আমাকে মানুষ কর।"

## বিবেকানন্দী নীতির চার খুঁটা

বিবেকানন্দর মানুষ গড়ার কল অতি সোজা। ইহার ভিতর আদিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক বুজরুকি কিছুই নাই। ইহার পয়লা খুঁটা :—"লাগা কুস্তী জোরসে।"

বিবেকানন্দ বলিতেছে ঃ—"চাই হাতের জোর, চার পায়ের জোর, চাই কোমরের জোর, চাই কব্জার জোর। চেহারাটা দুরন্ত হইবা মাত্র তোর মনিব তোকে দেখিয়া সম্মান করিতে শিখিবে। সেলাম করিবে তোকে তোর অন্নদাতা। বুঝলি? আর তুইও প্রতি মুহূর্তেই মানুষের মতন জীবন চাখিয়া বেড়াইতে পারবি।"

মানুষ গড়ার দ্বিতীয় কথা ঃ—"খা দু বেলা পেট ভরিয়া।" বিবেকানন্দ বলিতেছে ঃ "আধপেটা-খাউয়া বাঙালী, একবেলা-খাউয়া ভারতবাসী, তোরা আবার বাণী চালাবি কি রে? লাগিয়া যা চাষে। লাগিয়া যা ব্যবসায়। লাগিয়া যা কুটির-শিল্পে। লাগিয়া যা ফ্যাকটরিতে। যার যেমন সুযোগ, মুরদ বা মর্জি। কর দেশের ধনবৃদ্ধি। খা দু বেলা পেট ভরিয়া। তাহা হইলেই বুঝিবি সিন্দুনীরে আর ভূধর শিখরে যাওযা, কিংবা গগনের গ্রহ তন্নতন্ন করিয়া স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া" কি চিজ। তাহা হইলেই দেখিবি যে, তোদেরও বাণী আছে আর সেই বাণী শুনিবার জন্য দুনিয়াও উদ্গ্রীব।

তৃতীয় খুঁটা হইল লোকসেবা। বিবেকানন্দ বলিতেছে ঃ—"নিজের শরীরটা তো বেশ পাকাইয়া তুলিতেছিস্। ভাল কথা। ডন-কসরত করিতে-করিতে নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে বুঝিতেছিস্। এইবার লাগিয়া যা তোর পাড়ার লোকের ভিতর ডন, কসরত্, কপাটি, ফুটবল ইত্যাদি কায়েম করিতে। লাগিয়া যা দেশশুদ্ধ লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে। অকাল মৃত্যু নিবারণের কাজে। যাদের শরীর দুর্বল, কর্ সাহায্য তাদেরকে সবল হইতে। ওষুধপত্র নাই যাদের কর তাদের জন্য দাওয়াইয়ের আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। খোল্ হাসপাতাল, খোল্ ডিস্পেনসারী। কর্ সর্বত্র জঞ্জাল পরিষ্কার, কর্ পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, দে লাগিয়ে জোড়া খালে-বিলে, দে ঝেড়ে ফেলে নোংরামি।" এই গেল শহরের-মফস্বলের ছোট-বড় সকল নরনারীর জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির পাঁতি। মুচিকে মুচি, মেথরকে মেথর, বিবেকানন্দর পাঁতিতে কেহই বাদ যাইবার নয়। প্রত্যেক গৃহস্থই মুচি-মেথরের স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান নিজ স্বাস্থ্যোন্নতিরই সঙ্গে-সঙ্গে স্বধর্ম-পালনের অন্তর্গত করিতে শিখিয়াছে।

লোকসেবার আর একটা বড় কথা—জলদান আর অন্নদান। বিবেকানন্দ বলিতেছে ঃ—"দু'বেলা নিজের খাবার ত বেশ জুটিয়াছে দেখিতেছি। এইখানেই শেষ করিলে চলিবে না। পাড়ার লোকগুলা খাইতে পাইতেছে কি না খুঁজিয়া দ্যাখ। চালা পল্লীগবেষণা, জেলায়-জেলায় আর্থিক অনুসন্ধান। কোন্-কোন্ পরিবারের ঘরে হাঁড়ি চড়িতেছে না, কোন্ কোন্ লোক দু'বেলা আঁচাইবার সুযোগ পায় না, বাহির কর বাড়ী-বাড়ী টহল করিয়া, মোলাকাৎ চালাইয়া। আর সঙ্গে-সঙ্গে কর খরচ গরীবদেরকে ভাতকাপড়ের মাপে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য। আর পারিস্ ত দে তাদের দু'মুঠো ভাত। খোল্ অন্নসত্র, খোল্ অনাথ আশ্রম।" এই পাঁতির ভিতরও আবার বামুন-সেবা, চামার-সেবা, মুর্দাফরাস সেবা সবই সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে।

লোকসেবার আর এক পাঁতি হইল বিদ্যাদান। বিবেকানন্দ বলিতেছেঃ—"লেখাপড়া ত শিখিয়াছিস দেখিতেছি ভালই। কিন্তু পাড়ার লোকগুলা কি নিরক্ষর থাকিবে? যা লাগিয়া পাঠশালা খুলিতে। দে হর রোজ ঘণ্টা খানেক করিয়া মুচির ছেলে-মেয়েকে, চাষীর ছেলে-মেয়েকে, অস্পৃশ্যের ছেলে-মেয়েকে, মায় নিরক্ষর বামুন-কায়েথ-বৈদ্যের ছেলে-মেযেকে কিছু-কিছু লেখাপড়া শিখাইবার জন্য।"

## খোলা-চোখের মহাপুরুষ

বিবেকানন্দী-নীতির এই সকল খুঁটা মুহুরিও বুঝে, বেপারীও বুঝে, আদালতের কর্মচারীও বুঝে, উকিল-হাকিমও বুঝে, জমিদারও বুঝে, ইস্কুলমাষ্টারও বুঝে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—মন্তর অনুসারে যে-কোনো লোকই জীবন গড়িয়া তুলিতে রাজি। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"—এই বয়েৎটা বুঝে না সংসারে এমন কোনো লোক নাই। তাহা ছাড়া জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান আর ঔষধদানের মারফৎ নারায়ণকে দরিদ্রের মধ্যে পাকড়াও করিতে পারিলে অথবা দরিদ্রকে ছুঁইয়া ভগবান পর্যন্ত পেঁছাইতে পারিলে সকলেরই জীবনে আশার সঞ্চার হয়।

বিবেকানন্দ সংসারের লোককে ডাকিয়া-হাঁকিয়া বলিতেছেঃ—"তুই যেখানে আছিস্ সেইখানেই নামজাদা বীর হইতে পারিস্। মহাপুরুষ বনিবার জন্য তোর গৃহস্থালী ছাড়িবার দরকার নাই, তোর বনে-জঙ্গলে যাইবার দরকার নাই। চোখ বুজিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় বসিবার দরকার নাই। খোলা চোখে রাস্তায় হাঁটিতে-হাঁটিতেই, দোকানদারি, উকিলি আর ইস্কুলমাষ্টারি চালাইতে চালাইতেই তুই দেবতা হইতে পারিস্।" যে বিবেকানন্দ চোখ বুজিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত সেই বিবেকানন্দর মুখেই এই বাণী। কাজেই কথাটার দাম লাখ টাকা আর লোকসমাজে ইহার আদর এত বেশী।

বিবেকানন্দ বলিতেছে সজোরে যেখানে-সেখানে আর যখন-তখনঃ—"পালোয়ান হইলে, ভাত-কাপড়ে কাহারও গলগ্রহ না থাকিলে, আর কুস্তীর আখড়া খুলিলে এবং অন্নসত্র-হাসপাতাল-পাঠশালা ইত্যাদি কায়েম করিলে নরদেবতা হওয়া সম্ভব, বাপ্‌কো-বেটা হওয়া সম্ভব, মানুষ হওয়া সম্ভব।" এই কথাটা যে-লোক শুনে সেই লোকের বুক চওড়া হয় আর আত্মা বাড়িয়া উঠে "তিন হাত"। তার রক্তের স্রোত ছুটিতে থাকে সবেগে আনন্দে। আর বাস্তবিক পক্ষে বাঙালী জাতির নানা শ্রেণীর পুরুষ-নারীকে বিবেকানন্দ'র বকাবকি "তিন হাত" চাঁড়িয়া তুলিয়াছেও। প্রতিদিনকার মামুলি খাওয়াপরায় আর চলাফেরায় মানুষকে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া বিবেকানন্দ বঙ্গসমাজের অলিতে-গলিতে দিগ্‌বিজয়ী বীর। মামুলি মানুষকে এই-রূপ বাড়তির পথে আনিয়া খাড়া করিবার ক্ষমতায়, সংগ্রামময় জীবনের কর্মক্ষেত্রে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতায় বিবেকানন্দ'র বিশ্বকোষ জগদ্‌বরেণ্য।

# স্বামী বিবেকানন্দ

---

**অজিত চক্রবর্তী**

ফাল্গুনের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভক্তির সহিত স্বামীজির "চরিতামৃত" পরিবেশন করিয়াছেন; যুক্তির সহিত তাঁহার চরিত ও কার্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মাগণ সম্বন্ধে গিরিজাবাবু যদি এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তবে তিনি যে একজন স্বভাবভক্ত ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ঘটিত না। কিন্তু ইংরাজীতে একটা প্রবাদ-বচন আছে যে, কোন জাতি বিশেষকে গায়ে আঁচড় কাটিলেই তাহার ভিন্ন জাতীয়ত্ব ধরা পড়িয়া যায়। গিরিজাবাবুর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ বাদে অন্য কোন মহাপুরুষের চরিত্রে আঁচড় লাগিলেই তাঁহার ভক্তির মাধুর্য যুক্তির চাতুর্যে পরিণত হইয়া পড়ে। "চৈত্রে"র নারায়ণে প্রকাশিত তাঁহার "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধ তার সাক্ষী।

"স্বামী বিবেকানন্দে"র চরিতালোচনায় গিরিজাবাবু গোড়াতেই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মানিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য বা রাজা রামমোহন রায় যেমন এক এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া যুগ-সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়াছিলেন ও নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য সকল ভক্তই নিজ নিজ ভক্তি ভাজন সম্বন্ধে এই সকল দাবী করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরোগ্য দাবীর সেরা প্রমাণ তাহারা জানে গায়ের জোর। যুক্তিপন্থী গিরিজাবাবু অবশ্য সে প্রমাণ আশ্রয় করিবেন না বলিয়া আশা করি, কারণ তাহা হইলে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা শক্ত হইবে।

যাহাই হোক গিরিজাবাবু বিবেকানন্দের আবির্ভাব সময়ে হিন্দু জাতির ও পাশ্চাত্য জাতির অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যে-কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত আরম্ভ করিবার মত উপযুক্ত উপক্রমণিকা হইয়াছে বটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার ভাষায়, "যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়িয়া কোন পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই···সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম" তখন বিবেকানন্দ "আবির্ভূত" হইয়া কি করিলেন? গিরিজাবাবু বলেন, তিনি "সংস্কার-যুগের প্রতিবাদ" করিয়া ও তাহার নানা দোষ দেখাইয়া "প্রতিক্রিয়া মূলক এক সমন্বয় যুগের ( ! ) সূচনা" করিয়া গেলেন। সেই সমন্বয়গুলি কি কি তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। "সমন্বয়" শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অবিরোধ'; অর্থাৎ অভিধানকার বলিতে চান্ যে সম্‌পূর্বক অন্বয় বলিতে কেহ যেন বিষম্‌পূর্বক অন্বয় না বুঝেন, এক কথায় খিচুড়ি না বুঝেন। গিরিজাবাবুর দাবী

অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিমা-পূজার 'সমন্বয়' করিয়াছেন। এটাকে আমরা 'বিষমন্বয়' বলি, কারণ শাস্ত্রকারদের মত হিসাবেই সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপের সঙ্গে সিঁড়ির সর্ব উচ্চ ধাপের ঠিক সমন্বয় বা অবিরোধ হয়, এটা বলা যায় না। তারপর বিবেকানন্দ স্বামী বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকারের সঙ্গে ধর্মের সাক্ষাৎ অনুভূতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, এই তাঁর দ্বিতীয় সমন্বয়। যিনি সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর দাঁড়ান, তিনি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা কেমন করিয়া হুবহু মানিতে পারেন তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রের সবই অভ্রান্ত বা সবই ভ্রান্ত, এই দুই মতের কোন মতই প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যেখানে 'অপরোক্ষানুভূতি'র বাক্য আছে তাহাই তাহার নিত্য অংশ; কিন্তু যে মহাত্মার নিজের 'সাক্ষাৎ অনুভূতি' হয় নাই, তিনি সেই নিত্য অংশগুলি আবিষ্কারই বা করিবেন কি উপায়ে, তাহার বিচারই বা করিবেন কি করিয়া? সুতরাং সাক্ষাৎ শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে কি?

গিরিজাবাবু বলেন যে; সামাজিক ব্যাপারে স্বামীজি পতিত ও অন্ত্যজ জাতিকে উদ্ধার করিবার প্রস্তাব করিলেও জাতিভেদের সমর্থন ও অসবর্ণ বিবাহের অসমর্থন করিয়াছেন। জন্মগত যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের দেশে দাঁড়াইয়া গেছে, তাহাতে যে যেখানে স্থান পাইয়াছে তাহার সেই স্থানই যে কায়েম। যে নীচে পড়িয়াছে, সে নীচেই থাকিবে; যে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য সে চিরকাল তাহাই থাকিবে। সুতরাং যে ভিত্তির উপর এই উচ্চ-নিচের ব্যবধান জিনিষটা প্রতিষ্ঠিত; সেই ভিত্তি সমানই থাকিবে অথচ ব্যবধানটা দূর হইবে—ইহা কেবল আরব্য উপন্যাসের রাজ্যেই সম্ভব হইতে পারে। গিরিজাবাবুর উক্তি অনুসারে জাতিভেদের-সমর্থনের সঙ্গে পতিত জাতির উদ্ধারের সমন্বয় যদি বিবেকানন্দ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এক খিচুড়ি হইয়াছে।

আমরা ভরসা করি বিবেকানন্দের ভক্তদল এই সকল উল্টা দাবী করিতে গিয়া খাবি খাইবার ইচ্ছা মোটেই করেন না। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য ধারনায় পৌঁছান অসম্ভব হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষত্ব কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে দুটো চারটে কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সংস্কার যুগের পরই প্রতিক্রিয়ার যুগ সর্বত্রই স্বভাবতই দেখা দেয়। ইউরোপের ইতিহাসে Reformation যুগের সঙ্গে সঙ্গেই Counter-Reformation যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল—এই দুই দিক্ মানব সমাজে হয় যুগপৎ একই সময়ে একই অবস্থায় নয় এক যুগ অন্তে অন্য যুগে অন্য অবস্থায় দেখা দিবেই। বাংলা দেশের ইতিহাসেও কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কারের যুগের পর যখন হিন্দু সমাজের ভিতর হইতে প্রতি-ক্রিয়ার চেষ্টা প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখনই বিবেকানন্দ সেই যুগের যুগ-সারথি হইয়া দাঁড়াইলেন।

অতএব, দেশের নিকট তাঁহার প্রধান দান—গিরিজাবাবু-কথিত তাঁহার সমন্বয় নয়; তাঁহার অপূর্ব অগ্নিময় দেশপ্রীতি। তিনি কিছুরই সমন্বয় করেন নাই; তিনি সমস্ত সমর্থন করিয়াছেন। দেশের কিছুই বর্জন করিতে তাঁহার মন চাহে নাই, দেশের সমস্তই স্বীকার করিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত উৎসুক ছিল। দেশকে এমন একান্তভাবে এমন নিবিড়ভাবে এমন সত্যভাবে তাঁহার মত এ যুগে আর কেহই ভালবাসিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রীতির তিনিই ভগীরথ—এই নূতন ভাবগঙ্গার ধারা তিনিই প্রবাহিত করিয়াছেন।

সেই জন্য তিনি তাঁহার সমন্বয় সাধনের জন্য নয়, তাঁহার "দরিদ্র নারায়ণ-সেবার" জন্যই আজও দেশের মধ্যে একটি অজেয় শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণে'র সেবার জন্য, বোধনের জন্য, তিনি সমস্ত দেশের পৌরুষ ও মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সেই তাঁহার "উদ্বোধন"—সেই ত তাঁহার "প্রবুদ্ধ ভারতের" কল্পনা।

বৃহৎ প্রতিভার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্ববিরোধ থাকে—কারণ অনেক সময় এই বড় রকমের স্ববিরোধেই বড় প্রতিভার পরিচয় হয়। অজ্ঞ লোকে ইহা বুঝে না; এই জন্য মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—"self—consistency is the hobgoblin of little minds।" কবি হুইটম্যানের একটি ছত্রে আছে—"I am large; there fore I carry contradiction।" এই জীবনের মধ্যে পদে পদেই স্ববিরোধ রহিয়াছে—কোন বিষয়ে গভীরতর দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে প্রসারতার দিকে ততটা পরিমাণ দৃষ্টি পড়ে না; আবার বৈচিত্র্যের দিকে বেশি অগ্রসর হইলে ঐক্যের দিকে সে পরিমাণে মনোযোগ যায় না। দেশবোধ ও বিশ্ববোধ এ দুয়ের মধ্যে যে এক জায়গায় একটা বিরোধ আছে, সেটার তাড়াতাড়ি রফা তাঁরাই করিতে উদ্যত হন, যাঁদের এ দুয়ের কোন বোধই হয় নাই। বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বোধই ছিল অথচ অবিরুদ্ধ ভাবে ছিল না। তাঁহার ভিতরকার বিশ্ব-মানুষটি তাঁহাকে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল; তাঁহার ভিতরকার স্বাদেশিক মানুষটি তাঁহাকে জাতিভেদ সমর্থন করাইয়াছিল। জাতিভেদের দোষ কেহ দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষের কোন্ institution-টা perfect? জাতিভেদের বদলে আমাকে 'better substitute' দাও। তখন তাঁহার মনেও হয় নাই যে ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণ' উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি সমাজে কোন দিন উচ্চতর অধিকারের দাবী করে, তবে এ উত্তরে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। অবশ্য তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসে জাতিধর্ম নাই। কিন্তু ছয় কোটি অস্পৃশ্য লোক ত সকলেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া দণ্ডী হইতে পারে না?

## স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, মহানির্বাণের অল্প কয়েকদিন পূর্বেই বুদ্ধদেব তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিবেন। আনন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, আপনি না থাকিলে আমাদের কি দশা হইবে ?' বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি, তোমরা আমার দিকে তাকাইও না, আমার বাণী ও উপদেশগুলি পালন করিবে। আমার অবর্তমানে আমার বাণীই যেন তোমাদিগকে পরিচালিত করে।'

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে এই পুরাতন কাহিনীই মনে পড়ে। তাঁহার নশ্বর দেহ এ-জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী ও উপদেশ আছে। আমেরিকা যাত্রা করিবার পর মাত্র দশ বৎসর তিনি এই ধরাধামে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, তাহা বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থাবলির মধ্যে তাঁহার যে অসংখ্য বাণী ও উপদেশ নিহিত আছে, তাহাই বর্তমান যুগে আমাদের পথ নির্দেশ করিবে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা দেশে ও সমাজে যে-কোন সংকটের অথবা সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন, তাঁহার বাণীর মধ্যেই সেই সংকট হইতে মুক্তির পথ ও সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইব। শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহার বাণী ও উপদেশ অনুধাবন করিলে জীবনে দুঃখ ও বিপদের দিনে শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইব; দেশের ও সমাজের সংকটে—তাহা যত বড়ই হউক না কেন—তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিলে আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

স্বামীজীর বাণী ও উপদেশ অসংখ্য হইলেও সবগুলিই কয়েকটি মূল শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি নূতন নহে, প্রাচীন ভারতের ঋষিরাই এই বাণীর উদ্গাতা। কিন্তু কালক্রমে আমরা এই সত্য ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহার ফলে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছিলাম। স্বামীজী তাঁহার উদাত্ত স্বরে সেই সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে নবযুগের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন, 'ওঠ জাগো'। মুমূর্ষু জাতিকে তিনি সঞ্জীবিত করিয়াছেন।

এই সত্যগুলির প্রথমটি—আধ্যাত্মিকতা। ইহার অর্থ এই যে, 'আমি' বলিতে এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহকে বুঝায় না, ইহার অভ্যন্তরে যে অমর অবিনশ্বর আত্মা আছে, তাহাই প্রকৃত 'আমি'। দেহের ক্ষয় ও বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মা অজর অমর।

দ্বিতীয় সত্যটি এই যে, আমার এই আত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ, সৃষ্টির

মূলাধার। আমরা অমৃতের পুত্র—বেদান্তের 'সোঽহম্'। সুতরাং সকল জীবই ভগবানের অংশ—সকল জীবেই ভগবান আছেন।

তৃতীয় সত্যটি এই যে, উল্লিখিত দুইটি সত্য কেবল শুনিলেই হইবে না, উপলব্ধি করিতে হইবে; জীবনের প্রতি মুহূর্তে—প্রতি কার্যে যেন এই উপলব্ধি দ্বারা আমরা পরিচালিত হই।

চতুর্থ সত্যটি এই যে, এইরূপ উপলব্ধির জন্য চাই ত্যাগ। ত্যাগ নেতিবাচক বর্জনমাত্র নয়—ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখ বর্জন করিয়া উচ্চতর স্থায়ী আনন্দ অর্জনের চেষ্টা; সেই আনন্দ-রসের সন্ধান পাইলে ঐহিক সকল আনন্দই অসার ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে এই সত্য-চতুষ্টয়ের প্রভাব যে কত বড়, তাহা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। এ-বিষয়ে নিজের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলিতে হইবে। তবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ও নানা অবস্থায় এই সত্য-প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার নির্দেশও স্বামীজীর বাণী ও উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাইবে। দেশের ও সমাজের সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ঐ সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে অভিভূত ভারতবাসী যখন নিজের অতীত গৌরব ভুলিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীন উদ্যমহীন হইয়া পৃথিবীতে নিজেকে ধিক্কৃত ও ঘৃণিত মনে করিয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই সময় স্বামীজী তাহাদিগকে প্রাচীন শাশ্বত সত্যের বাণী শুনাইয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। জগৎসভায় সেই শাশ্বত বাণীর ঘোষণা দ্বারা তিনি যেদিন হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিনই এই আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতির মনে আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া তিনি এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের জড় শক্তি অপেক্ষা যে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবাসীকে বাঁচিতে হইলে যে পুনরায় সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে—এই সত্যই তিনি বারবার নানাভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ভারত না জাগিলে জগতে ধর্মের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিকতা হইতেই স্বদেশপ্রেমের উদ্ভব। পরপদদলিত পরাধীন ভারতবাসীকে আবার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু 'ভারতবাসী' বলিতে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোককে বুঝায় না। এ-দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত দরিদ্র অন্ত্যজ ঘৃণিত অবহেলিত অপমানিত নিরন্ন অধিবাসী লইয়াই ভারত। ইহাদিগের মধ্যে দৈহিক মানসিক নৈতিক শক্তি জাগাইতে হইবে, তাহার পূর্বে ইহাদের অন্ন ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা চাই। শাশ্বত সত্য অনুযায়ী সকলেই আমার ভাই—বিরাটের অংশ; সুতরাং ইহাদের সেবাই ভগবানের সেবা। এই দরিদ্র-নারায়ণের পূজার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত। অস্পৃশ্যতা ও আনুষঙ্গিক আচার সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মের মূল সত্য বাদ

দিয়া হিন্দু ধর্ম যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—ইহাই তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারই ফলে যে আমরা সর্বনাশা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি, পুনরায় সেই শাশ্বত সত্যের আশ্রয় না লইলে যে এ-জাতির উদ্ধার নাই এবং উদ্ধার-লাভের উপায় কি, তাহাও স্বামীজী নির্দেশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম-সম্প্রদায় ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি আমাদের একজাতি-গঠনের প্রধান অন্তরায়—ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের নেতাগণ ঐক্য-সাধনের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এ-বিষয়েও স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, ভারতের ঐক্য আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ঃ যাহারা পরধর্মসহিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে, তাহাদের সমবায়েই এই জাতি সংগঠিত হইবে, ধর্ম-সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। ইহা ভিন্ন ভারতের জাতীয়তাবাদের আর কোন ভিত্তি সম্ভবপর নয়, ইহাই স্বামীজীর মত।

অনেকে জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন এবং বিশ্বমানবতার আদর্শকেই ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু এখানেও স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, ভারতে আধ্যাত্মিকতার বলে বলীয়ান্ এক জাতির অভ্যুত্থান হইলেই ভারত বিশ্বমানবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে পারিবে। আধ্যাত্মিকতার মহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবে, তাহারা সকলেই ভাই ভাই—কেবল তখনই জগতে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের সংঘাত থামিবে, নচেৎ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র জগৎ ধ্বংস করিবে। ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই ভারতীয় আদর্শ ও উপদেশ বিশ্বের মানব গ্রহণ করিবে ও ত্রাণ পাইবে। নচেৎ কেহই ভারতের বাণী শুনিবে না বা তাহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে যে নবযুগের বার্তা আনিয়াছেন ও পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রভাব আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—সকলেই যে স্বামীজীর বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অরবিন্দ ও গান্ধীজী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীজীর 'হরিজন' স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণে'র প্রতিধ্বনি। অস্পৃশ্যতা-বর্জনে তাঁহার জীবন-উৎসর্গ—স্বামীজীর আদর্শেরই রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথও যে এইভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কবিতায় ইহার বহু নিদর্শন আছে। দু-একটি উধৃত করিতেছি।

'—ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ·····
—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা……
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার— ।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।'

ভারতের কোটি কোটি দীন দরিদ্র লাঞ্ছিত নরনারী সম্বন্ধে এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি অতুলনীয় ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথমে তাহা ভারতবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। আবার স্বামীজী 'ছুৎমার্গ' সম্বন্ধে পুনঃ-পুনঃ ব্যঙ্গপূর্ণ, কিন্তু কঠোর ও মর্মন্তুদ ভাষায় অধঃপতিত হিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহারও প্রতিধ্বনি পাই।

# স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ

সরলাবালা সরকার

স্বামীজী বলিয়াছেন, "মানুষ সমাজে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন আছে। এই কথাটির সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়, সে কথাটি এই যে, কার্য-পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন দেশের পরস্পরের কাছে শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের কার্য-পরিচালন পদ্ধতি ঢিলাঢালা গোছের, আর পাশ্চাত্য পদ্ধতি 'তাড়-ঘাড়', অর্থাৎ যাহা করিবার করিয়া ফেল। সময়কে পাশ্চাত্য দেশ যেভাবে মূল্য দেয়, প্রাচ্য সেভাবে মূল্যদান করে না। পাশ্চাত্যে সব কাজই, তা ছোট ও বড় যেমনই হোক্ না কেন, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধন এমনভাবে বাঁধা যে, তাহার আর এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু প্রাচ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না।

স্বামীজী তাঁহার সঙ্ঘ সংগঠনে ও মিশনের কাজে এই নিয়মানুবর্তিতা পুরাপুরি-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই উভয়ই নিজের নিজের দিক দিয়া তৎপরতার পথে চলিয়াছে। মিশন হইল প্রেরণা, আর সঙ্ঘ হইল সম্মিলিতভাবে সেই প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে রূপদান। এই দুই ব্যাপারেই প্রচার-পত্রিকার যে কতখানি প্রয়োজন, স্বামীজী সেকথা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই গুডউইন যখন আমেরিকায় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজী সে প্রস্তাবে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন একজন আমেরিকান ভক্তকে যে পত্র লেখেন, সে পত্রখানির ভাব এইরূপ ঃ—"গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা সম্বন্ধে তোমাকে ডাকে পত্র দিচ্ছে। আমারও মনে হয়, বেদান্ত প্রচারকার্যটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই রকমের একটা কিছু দরকার। আমি অবশ্য সে যেভাবে কাজ করবার উপায় নির্দেশ করবে সেইভাবেই তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।"

মাদ্রাজেও এই সময় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। মাদ্রাজে স্বামীজীর যেসব গৃহী শিষ্য 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ছেলেদের জন্য একখানি পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা জানাইয়া স্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছেন, স্বামীজী সে পত্রের উত্তরে ১৪ই মার্চ যে পত্র লেখেন, তার ভাবার্থ এই ঃ—"তোমরা ছেলেদের জন্য যে কাগজ বার করবার প্রস্তাব জানিয়েছ, সে প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকা এবং এই পত্রিকাটি যদিও একই ধারা ধরে চলবে, কিন্তু তার মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য রাখতে হবে। এর লিখনভঙ্গী যেন সহজবোধ্য এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষী হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই পত্রিকাখানি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে প্রকাশিত হইল। মাত্র বারো পাতার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন মিঃ আলাসিঙ্গা ও ডাক্তার নঞ্জুণ্ডা এবং আর কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য।

মাদ্রাজ হইতে দুইখানি আর আমেরিকা হইতে একখানি, সর্বসমেত এই তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই পত্রিকাগুলকে প্রচারকার্যের বিশেষ সহায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ৮ই আগষ্ট যে পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যে কাজের ভার লইয়াছ, তাহা দেবকার্যের ন্যায় সমস্ত মন দিয়া করিয়া যাইবে। জানিবে যে, তাহারই সাফল্যের উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার নঞ্জুণ্ডা রাওকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যে কাজের ভার যাহার উপর আছে, সে তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিবে। যে কাজের উদ্দেশ্যে যে টাকা আছে, সে টাকা সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে,—সে কাজ যেমনই হোক না কেন—ব্যবহার করিবে না। ইহার জন্য যদি পরমুহূর্তে মরিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিবে। সদ্ভাবে কাজ করিবার ইহাই নিয়ম। প্রত্যেক কাজেই অদম্য কর্ম তৎপরতা আবশ্যক। তুমি যা কিছু কর না কেন, সে সময়ের জন্য সেই কাজটিই যেন তোমার ভগবৎ আরাধনা হয়। উপস্থিত ঐ কাজটিই তোমার ভগবান। এইরকমভাবে কাজ করিলেই তুমি কৃতকার্য হইবে।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাই কর্মযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই আদর্শ এবং এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাবধি পরিচালিত হইতেছে।

প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়, তখন সেই পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, তাঁহাদের অর্থব্যয় ব্যাপারে কতখানি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজীর এইভাবের নির্দেশে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

গুডউইন ও স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকা চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী কিছুদিন একাই ছিলেন, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বাহির হন। এই সময় তাঁহার শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রথমেই তিনি সুইজারল্যাণ্ড যান। জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিলেন মিস মুলার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার। সে সময় জেনেভায় এক প্রদর্শনী চলিতেছিল। স্বামীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া এক রাত্রি প্যারিসে থাকিয়া পরদিন জেনেভায় যান। সেখানে প্রদর্শনী দেখেন এবং প্রদর্শনীক্ষেত্রে দর্শকদের যে বেলুনে চড়ানো হইতেছিল, সেই বেলুনেও তাঁহারা সকলে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত।

জেনেভায় স্বামীজী তিনদিন থাকেন। তাহার পর সেখান হইতে চল্লিশ মাইল দূরে শামনিস নামে একটি গ্রামে যান। এই গ্রাম হইতে মঁ ব্লাঁ পর্বতের বরফে ঢাকা চূড়া চোখে পড়ে। পর্বতের সানুদেশে একটি হোটেল আছে। যাহারা পর্বতে

উঠিতে চায়, তাহারা সেই হোটেলে আসিয়া আস্তানা নেয়, সেখানে পথপ্রদর্শকও আছে। কিন্তু স্বামীজীকে সেই পথপ্রদর্শকেরা জানাইল যে, পাহাড়ে উঠা যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারা ছাড়া আর কাহারও এই খাড়া এবং বরফে পিচ্ছিল পাহাড়ে উঠা একেবারেই অসম্ভব। স্বামীজীও সেকথা বুঝিতে পারিলেন।

যাহাই হউক, তাঁহারা বরফের উপর দিয়া হাঁটিবার আনন্দ উপভোগের সুযোগ ছাড়িলেন না। পর্বত-শিখরের নীচে যে স্তূপাকার বরফ জমিয়াছিল, সেই পথের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহারা বরফের স্তূপ পার হইয়া পার্বত্য অধিত্যকার একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একটি ছোট হোটেল ছিল। হোটেলে এক কাপ চা পান করিতে পারিয়া তুষারের পথে ভ্রমণের পরিশ্রমের পর তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইলেন।

বরফ, বরফ, আর বরফ! চারিদিকে যেন এক সাদা আস্তরণ দিয়া ঢাকা। সূর্যোদয় হইলে সেখানের যে অপূর্ব শোভা হয়, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য গিরিরাজ হিমালয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজীর তখন কেবলই হিমালয়ের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সেই রুদ্রপ্রয়াগ, সেই কর্ণপ্রয়াগ ও সেই স্রোতবতী অলকানন্দা! ছয় বৎসর আগের সেই পার্বত্যপথে নিঃসম্বল ভ্রমণের দিনগুলি। সেইসব দিনের কাহিনী তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীদের কাছে বলিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে একটা সংকল্প দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আমার খুবই ইচ্ছা যে, হিমালয়ে সন্ন্যাসীদের একটি আস্তানা হয়। সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ত্যাগী ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়ে নিজের নিজের দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কার্যে প্রচারকরূপে গড়ে তুলতে হবে, আর আমার এই কর্মজীবনের শেষে অবসর নিয়ে সেখানেই ধ্যান ও ভজনের মধ্যে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারবো।"

স্বামীজীর এই কথা শুনিয়া ক্যাপ্টেন সেভিয়ার উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এইরকম একটা মঠ আমাদের করতেই হবে।" ইহাই মায়াবতী আশ্রম স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা।

ইহার পর তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের একটি গ্রামে প্রায় পনেরো দিন ছিলেন। সেই গ্রামে থাকিবার সময় স্বামীজী জার্মানীর 'কীল' নামক স্থান হইতে এক আমন্ত্রণ-পত্র পান। পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক পল ডয়সন। পল ডয়সন তাঁহাকে কীল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জন্য এবং তাঁহার বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থানের জন্য সেই পত্রে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই পত্রের উত্তরে স্বামীজী ইংলণ্ডে ফিরিবার পথে কীলে যাইবেন, একথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

অনবরত কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ইংলণ্ডে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সুইজারল্যাণ্ডের জলবায়ুর গুণে ও বিশ্রামে কতকটা ভাল হওয়ায় তিনি এখন আবার কাজের মধ্যেই ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন।

প্রথমে তিনি গেলেন লুকার্নে, তারপর জারমাট্রে. এটি সুইজারল্যান্ডের একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটি দেখিয়া তিনি রাইন নদীর উৎস দেখিতে গেলেন এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থান হিডেলবার্গ দেখিয়া রাইন নদী পার হইয়া কোলানে গেলেন।

কোলান হইতে বার্লিন। বার্লিন তখন পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ নগর। জার্মান সৈন্যদল কিরূপ সুশিক্ষিত, কেমন তাহাদের শারীরিক গঠন, রণনৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা—জার্মান জাতি কিভাবে ঐকান্তিক সাধনায় শিল্প কলাবিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রবল তাহাদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা। স্বামীজী এসমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং নিজের দেশের সহিত মনে মনে তুলনা করিয়াছিলেন।

এই অতি জ্বলন্ত দেশপ্রেম! সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে কি তাহা ঢাকা পড়িতে পারে? নিবেদিতা স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একটি জিনিস আচার্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল—যাহা তিনি কিরূপে ঠিকভাবে রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দশার প্রতিকারের ইচ্ছা। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম। দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না। তিনি "জাতীয়ত্ব" শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না বা বর্তমান যুগকে 'জাতিগঠনের যুগ' বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' কিন্তু তিনি মহাপ্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই ছিল তাঁহার আরাধ্য-দেবতা। একটি ঘণ্টাকে চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যে কোন শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জন্মভূমি-সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। ভারতের চারিসীমার মধ্যে যে কোন কাতর ধ্বনি উঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত। ভারতের প্রত্যেক ভীতিসূচক চীৎকার, দুর্বলতাপ্রসূত কম্পন, অপমানজনিত সঙ্কোচবোধই তিনি জানিতেন ও অনুভব করিতেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই ভারতীয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমান আনন্দ হইত—অথবা তাঁহার শ্রোতৃগণের সেইরূপ মনে হইত। তাঁহার এই সকল কথোপকথনে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখদিগের ধর্মবিশ্বাস, মারাঠাগণের শৌর্য, সাধুদিগের ঈশ্বরভক্তি এবং মহানুভবা নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা—এই সমস্তই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত। মুসলমানগণও এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িতেন না। তিনি ভারতকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে অপরের নয়, তাঁহার নিজেরই দোষ মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যাণী-মধ্যস্থ এক পর্বতপৃষ্ঠে

শয়ন করিয়া, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম "হর্ হর্ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু।"

নিবেদিতার এই বর্ণনায় স্বামীজীর যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, আছে কেবল এক পরিপূর্ণ অনুভূতি।

স্বামীজী কীলে পৌঁছিয়া সদলে একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু অধ্যাপক ডয়সন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বাড়িতে গিয়া প্রাতঃকালীন চা খাইবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, সেজন্য পরদিন সকালেই তাঁহারা অধ্যাপকের বাড়ি গেলেন।

অধ্যাপক ডয়সন একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, ভারতীয় দর্শনের তিনি বিশেষ ভক্ত। তিনি ইতিপূর্বেই সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তিনি উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছেন। ইনি ভারতের প্রতি এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, নিজের ডয়সন নামের পরিবর্তে নিজেকে 'দেবসেনা' নামে উল্লেখ করিতেন। স্বামীজী যে কয়েকদিন অধ্যাপকের বাড়ি ছিলেন, সেই কয়েকদিন দুজনে অধিকাংশ সময় বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই অল্প কয়েকদিনেই উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল। স্বামীজী যখন বিদায় লইবার কথা বলিলেন, অধ্যাপক তখন তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামীজীর তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তিনি সেখানে গিয়া ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা অধ্যাপক নিজেই ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "তা হলে আপনি প্রথমে হ্যামবুর্গে যান, সেখানে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং দুজনে এক-সঙ্গেই ইংলণ্ডে রওনা হব।"

সেই অনুসারে স্বামীজী প্রথমে হ্যামবুর্গ গেলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অধ্যাপক ডয়সনও সপরিবারে হ্যামবুর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হ্যামবুর্গ হইতে তাঁহারা প্রথমে গেলেন হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম শহরে। সেখানকার আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলেন, স্থানীয় অনেকের সহিত স্বামীজীর পরিচয়ও হইল। এইভাবে যেখানে যখন স্বামীজী গিয়াছেন সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ রোপিত হইয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে তিনি সেভিয়ার দম্পতির হ্যামস্টেডের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া মিস মুলারের উইম্বলডনের বাড়িতে চলিয়া যান। এখানে থাকিবার সময় "মানবসভ্যতায় বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে দুই সপ্তাহে দুইটি বক্তৃতা দেন। নিয়মিত ক্লাসও আরম্ভ করেন, সেই সব ক্লাসে প্রধানত 'রাজযোগ' সম্বন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ছাত্রদের নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হইলে কিভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধেও

স্বামীজী শিক্ষা দিতেন। যাহারা বিশেষ অধিকারী বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও তপস্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে মিস্টার স্টার্ডি স্বামীজীর ক্লাস করিবার জন্য ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি হল ভাড়া নিলেন এবং তারই কাছে ওয়েস্ট মিনস্টারে ১৫ নং গ্রে কোর্ট গার্ডেনে সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর জন্যে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। এই সময় স্বামীজী 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতাগুলিই একত্র করিরা 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

স্বামীজী এই সময় স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন। বরাহনগরের মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইরা তখন আলমবাজারে গিয়াছেন। স্বামীজীর পত্র পাইয়াই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্য সকলে অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

স্বামী অভেদানন্দেব গার্হস্থ্য-জীবনে নাম ছিল কালীপ্রসাদ। তাঁহার মা সন্তান-প্রাপ্তির জন্য শ্রীশ্রীকালীব অর্চনা করিযাছিলেন, সেই জন্য ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন কালীপ্রসাদ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কালীপ্রসাদের জন্ম হয়। লণ্ডন যাত্রার সময় তাঁহাব মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তিনি পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। তপস্যাব দিকে তাঁহাব বিশেষ অনুরাগ ছিল, এজন্য তাঁহার গুরুভাইবা তাঁহাকে কালী-তপস্বী বলিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে একটি জন্মগত দার্শনিক ভাব ছিল; অল্প-বয়সেই তাঁহার মনে 'কেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণের সার্থকতা কি, সেই সার্থকতা লাভের উপায়ই বা কি?' এইরকম প্রশ্ন উদয় হইত। তিনি যখন 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, তখনই তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য এবং পাতঞ্জল-দর্শন প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থও তিনি সেই সময়ে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অ্যালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া কালীর মন ধর্মসাধন এবং যোগাভ্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গুরু না থাকিলে ধর্মসাধনার পথ দেখাইবেন কে? উপযুক্ত গুরুই বা কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কোন গুরুর কথা জান?" উত্তরে যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "আমি একজনের কথা শুনেছি, লোকে তাঁকে পরমহংস বলে। তিনি গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাড়িতে থাকেন। শুনেছি তিনি নাকি একজন মহাপুরুষ।"

এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কোন পথে যাইতে হয় তাহা তিনি জানেন না। সোজাসুজি টালার পুল পার হইয়া একদিন খুব ভোরে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে সাতপুকুর নামক স্থানে

আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এ পথ দক্ষিণেশ্বরের পথ নয়, তখন আবার তাহারই নির্দেশমত চলিতে চলিতে অবশেষে বেলা ১১টার সময় যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ফটকের কাছে আসিলেন তখন পথ-শ্রমে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর একেবারে অবসন্ন। তাহার পর যখন শুনিলেন যে. 'পরমহংস মহাশয় মন্দিরে নাই, তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন হয়তো রাত্রে ফিরতে পারেন' তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না।

ভগবানের দয়ায় এই সময় তাঁহার দেখা হইল শশী মহারাজের সহিত। শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুরের কাছেই আসিয়াছিলেন, তিনিও শুনিলেন ঠাকুর কলিকাতা গিয়াছেন। দুয়ারের কাছে কালীপ্রসাদ মাটীতে বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিয়া লইলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি এত কষ্ট করে যাঁকে দেখতে এসেছ তাঁর দেখা নিশ্চয়ই পাবে। এখন এস, দুজনে গঙ্গায় স্নান করে আসি, তারপর মা কালীর প্রসাদ পেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি।"

সেইদিন রাত্রি নয়টার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন কালীপ্রসাদ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ইহার পর ২/৩ দিন অন্তর অন্তর কালী দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। আহিরীটোলায় নৌকায় উঠিয়া আসা যায়, কিন্তু নৌকা ভাড়া হয়ত হাতে থাকিত না, আবার বাবা ও মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসেন। এইভাবে তাঁহার দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর ক্রমশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় হইল এবং ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে তিনি তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু বাবুরামকেও দেখিয়া খুবই খুশী হইয়াছিলেন।

কাশীপুরের বাগান বাড়িতে ঠাকুরের অসুখের সময় যাঁহারা তাঁহার সেবার জন্য দিনরাত থাকিতেন কালীও সেই দলে ছিলেন। তিনি সেই সময় নরেন্দ্রনাথের উপর এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে. সকল কাজে এমন কি ধ্যান ধারণার ব্যাপারেও তাঁহার অনুকরণ করিতেন।

সেই তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুভাই আজ তাঁহাকে ইউরোপ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কার্যে সহকারী হইবার জন্য, ইহাতে অভেদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না।

কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাট হইতে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে তিনি রওনা হইলেন। নয়জন গুরুভাই তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজ ঘাটে আসিয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ অভেদানন্দ ডেকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভেদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া প্রথম স্বামীজীর সঙ্গে মিস মুলারের বাড়িতেই ছিলেন, তাহার পর গ্রে কোর্ট গার্ডেনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হইলে স্বামীজীর সঙ্গে তিনিও সেই বাড়িতে গেলেন। এখানে কিছুদিন স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার কার্য পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই যখন স্বামীজী

তাঁহার বক্তৃতা দানের দিন স্থির করিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, "২৭শে অক্টোবর ভারত হইতে আগত স্বামী অভেদানন্দ ব্লুমসবেরি স্কোয়ার ক্লাবে 'পঞ্চদশী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন" তখন অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর উৎসাহদান তাঁহার মনে শক্তি সঞ্চার করিল, তিনি মনের সকল দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যদিও ইহার আগে কোনদিন তিনি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই কিংবা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন নাই এবং যদিও সেই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা কিন্তু সেটি এমন সাবলীল ভাষায় হৃদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াছিল যে, বক্তৃতা শেষে শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন স্বামীজী নিজে। তিনি এই বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it."

"আমি এ জগৎ থেকে অন্তর্হিত হ'লেও এই সব প্রিয় অধরে আমার বাণী ধ্বনিত হবে এবং জগৎ তা' শুনবে।"

স্বামীজীর এই দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মত মনীষী তখনকার দিনে ইংলণ্ডে খুব কমই ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার মত পণ্ডিত পাশ্চাত্যে আর কেহই ছিলেন না। ইনিই সর্বপ্রথমে ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশ করেন। স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের জীবনের অলৌকিক কাহিনী সমূহ শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বামীজী ৩০শে মে তারিখের একখানি পত্রে ম্যাক্সমুলারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'য়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক। তাঁর বয়স সত্তর বৎসর হ'লেও তাঁকে যুবকের মত দেখায়। এমন কি তাঁর মুখে একটিও চিন্তার রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, তার অর্ধেকও যদি আমার থাকত!

"সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অপরিসীম এবং তিনি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে' তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি তাঁহাকে জগতের সম্মুখে প্রচার করিবার জন্য কি করিতেছেন?'

"শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন ইহা কি একটি সুসংবাদ নয়?"

যে শক্তির প্রভাবে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে আকস্মিক এক অপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল সে কোন্ অপার্থিব শক্তি? তাহারই সন্ধানে ম্যাক্সমুলার প্রথমে যাঁহার সন্ধান পান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের এইভাবে জীবনের গতি

পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই আবিষ্কার তাঁহাকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তিনি যখন স্বামীজীর মুখে শুনিলেন যে আজ হাজার হাজার লোক তাঁহার পূজারী হইয়াছে তখন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এমন লোক ছাড়া আর কাহাকে পূজা করিবে ?"

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অক্সফোর্ডের বাড়িতে স্বামীজী ও মিস্টার স্টার্ডিকে লাঞ্চ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার বাসায় গেলে তিনি পরমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজী ও স্টার্ডিকে সঙ্গে লইয়া অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী দেখাইলেন, তারপর স্বামীজী যখন তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া চলিয়া আসেন তখন তিনি তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী যখন তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া স্টেশন পর্যন্ত না আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন ঃ—

—"রামকৃষ্ণের শিষ্যের দর্শন প্রতিদিন পাওয়া যায় না।"

স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কি অসাধারণ মানুষ! কয়েকদিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা নয়,—আমি বোলবো—তাঁর প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যই গিয়েছিলাম—কেননা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি যে-কোনও জাতি, সম্প্রদায় বা মতেরই হউন না কেন, তাঁকে দর্শন করা আমার তীর্থ দর্শনেরই সমান। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা তে মে ভক্ত তমাঃ মতাঃ।"

# বিবেকানন্দ পরিকল্পনা

স্বামী নিরাময়ানন্দ

আমরা পরিকল্পনার যুগে বাস করিতেছি। পঞ্চবার্ষিক—দশবার্ষিক পরিকল্পনার সহিতই আমরা পরিচিত, কিন্তু আর একটি পরিকল্পনা—যাহা আমরা জানিয়াও জানি না—যাহা অদৃশ্য থাকিয়া বায়ুর মতোই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রাণ-ধারণে সহায়তা করিতেছে—যাহা সূর্যের আলোর মতো নিজে অদৃশ্য থাকিয়াও জগৎ প্রকাশিত করিতেছে—যাহা ইতিহাসের অলক্ষ্যেই শুরু হইয়াছিল—আমরা বিবেকানন্দ-পরিকল্পনার কথা বলিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঊর্ধ্বমুখী মন ধ্যানলোকে চলিয়াছে জ্যোতির্ময় 'অখণ্ডের ঘরে'—যেখানে সপ্তঋষি ধ্যানমগ্ন! তাঁহাদের মধ্যে প্রধান 'নর'—ঋষিকে স্নেহের আহবানে ডাকিয়া ধ্যান হইতে জাগাইয়া জ্যোতির্ময় শিশুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে'। 'ধ্যান ব্যুত্থিত ঋষির নয়ন হইতে জ্যোতিধারা নির্গত হইয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট মনেই উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা।

কাশীপুরে শেষ-শয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ, পার্শ্বে দণ্ডায়মান নরেন্দ্র—আত্ম-সমাহিত ধ্যানের ভিখারী! তিরস্কারচ্ছলে শিক্ষা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভেবেছিলাম—বিশাল বটবৃক্ষের মতো হয়ে হাজার হাজার লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না তুইও মুক্তির ভিখারী, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর?' শ্রীগুরুর আশীর্বাদে নরেন্দ্র গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনারত—মা ওর মনে একটু মায়া ঢুকিয়ে দাও, ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করাতে হবে।

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়—লোককল্যাণবাসনা লইয়া ঊর্ধ্বতম ধ্যানলোক হইতে নামিতে লাগিল প্রবুদ্ধ মন। রূপায়িত হইতে শুরু করিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা।

শ্রীগুরুর দেহত্যাগের পর গুরুভ্রাতাগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজকের বেশে বাহির হইলেন ভারততীর্থ দর্শনে—কাশী-বৃন্দাবন, তপোভূমি হিমালয়ের পর রাজপুতানা গুজরাট ও পশ্চিমভারত অতিক্রম করিয়া তিনি উপনীত হইলেন ভারতের দক্ষিণ সীমায়, কন্যাকুমারিকায়। হিমালয়ে যে ধ্যান তাঁহার হয় নাই—সমগ্র ভারতভূমি দর্শনের পর সেই গভীর ধ্যানে তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল—ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতের জ্ঞানগরিমা, বর্তমানের অভাবনীয় অধঃপতন—ভবিষ্যতের অতুলনীয় মহিমা!

বিবেকানন্দ-পরিকল্পনা সূক্ষ্মরেখার লাঞ্ছনে একটি চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিল

বিবেকানন্দ-মনে। স্বামীজী বুঝিলেন—কি তাঁহাকে করিতে হইবে ; বুঝিলেন, কি কি বিরাট দায়িত্ব তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছেন—দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল পূজারী! একটি অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত জাতিকে টানিয়া তুলিতে হইবে, আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইতে হইবে, ধর্মদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নূতন উদার যুগোপযোগী ধর্ম প্রচার করিতে হইবে। ভারতের সনাতন ধর্মকে পুনশ্চ বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সর্বোপরি স্বরূপবিস্মৃত মানবকে সচেতন করিতে হইবে তাহার চৈতন্যময় আনন্দময় সত্তা সম্বন্ধে।

ব্যথিত বিবেকানন্দ উত্তরমুখী হইলেন, সমাজমুখী হইলেন। মাদ্রাজে আসিয়াই তিনি তাঁহার নূতন উদার শান্তিপূর্ণ ভাবধারা যুবকদের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মধ্যে পাইল এমন একজন আচার্য যাঁহাকে তাঁহারা খুঁজিতেছিল—যিনি একাধারে উদার ও গভীর, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও দর্শনে সমান পণ্ডিত, যিনি ক্ষুরধার বুদ্ধি সত্ত্বেও অনুভূতি-কোমল হৃদয়-সম্পন্ন।

দক্ষিণ-ভারতে নব ভাবধারার সূচনার পরই অন্তরের অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে যাইতে হইল বর্তমান সভ্যতার নবতম রঙ্গভূমি আমেরিকায়। ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রাচীনতম ধর্মের নূতনতম ব্যাখ্যা করিয়া উদার ভাববন্যায় তিনি আমেরিকাকে প্লাবিত করিলেন, ইংলণ্ডে আহূত হইয়া বিজ্ঞানের ভাষায় বেদান্তের যে ভাব তিনি প্রচার করিলেন—তাহাই এ যুগের নবতম ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি।

পাশ্চাত্ত্যে ধর্মপ্রচারের ফলে ধর্মপ্রাণ ভারতের মনে তুমুল প্রতিক্রিয়া হইবে এই আঘাতে মূর্ছাপন্ন ভারত জাগিয়া উঠিবে—তাই অধুনা তমোগুণাপন্ন ভারতে ধর্ম-প্রচার অপেক্ষা রজোগুণসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্যে সত্ত্বগুণাশ্রিত বেদান্ত জ্ঞান বিতরণ করিলে একই সঙ্গে পৃথিবীর উভয়খণ্ডের কল্যাণ সাধিত হইবে—ইহাই ছিল বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।

১৮৯৭ জানুয়ারিতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী দেখিলেন—বহুযুগ-নিদ্রিত ভারত জাগিতেছে। প্রভাতী সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। ভারতে পদার্পণ করিয়া মাদ্রাজে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিলেন তাঁহার পরিকল্পনা. সেখানে 'My Plan of Campaign' বক্তৃতায় তিনি বলিলেন, 'ভারতের প্রাচীন আচার্যগণের ভাব অনুসরণ করাই আমার পরিকল্পনা···সংস্কারকগণকে বলিতে চাই—আমি তাঁহাদের অপেক্ষা বড় সংস্কারক, তাঁহারা চান ছোটখাট সংস্কার, আমি চাই শাখামূল সবশুদ্ধ সংস্কার, তাঁহাদের পদ্ধতি ধ্বংস, আমার পদ্ধতি গঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি বিকাশে বিশ্বাসী!' তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'সর্বপ্রথম যে কাজে আমাদের মনোযোগ প্রয়োজন,—তাহা এই যে—উপনিষদ শাস্ত্রে ও পুরাণে যে সকল আশ্চর্যতম সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে সেইগুলি পুঁথি হইতে মঠ-মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে এবং সারাদেশে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাই আমার পরিকল্পনা —ভারতে কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যুবকদের সত্যের প্রচারকরূপে শিক্ষিত

করিতে হইবে, তাহারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইহা প্রচার করিবে।...আমাদের প্রয়োজন শক্তির, আত্মবিশ্বাসী হও। মানুষগড়ার ধর্মই আজ একান্ত প্রয়োজন।'

ইহাই সংক্ষেপে নিজমুখে ব্যক্ত তাঁহার অপূর্ব পরিকল্পনা! ইহার পরবর্তী অধ্যায় কলিকাতায়—অভিনন্দন প্রভৃতির পর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, যাহার স্মারকলিপিতে সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়িত! এই সংঘের উদ্দেশ্য—মানবকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ও তদীয় জীবনে প্রদর্শিত সত্য প্রচার করা এবং অপর সকলকে ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঐগুলি কর্মজীবনে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

এই মিশনের কর্তব্য—সকল ধর্মকে এক সনাতন ধর্মেরই নানা রূপ জানিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন—যথোপযুক্তভাবে সেই কার্য পরিকল্পনা করা।

ইহার কার্যপদ্ধতি ঃ

(ক) এমন সব শিক্ষক শিক্ষিত করিতে হইবে যাহারা জনগণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইতে সমর্থ।

(খ) শিল্প এবং কলাকেও উৎসাহিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও ধর্মভাবগুলি যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রকটিত হইয়াছে—সেইভাবে প্রচার করিতে হইবে

(গ) ভারতীয় বিভাগের কাজ ঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা-প্রসারচিকীর্ষু গৃহস্থকে শিক্ষিত করিতে হইবে—যাহাতে তাঁহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন।

(ঘ) বৈদেশিক কার্যবিভাগ ঃ সংঘের শিক্ষিত সন্ন্যাসীকে ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হইবে—তাহাতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াও ভালো হইবে।

যে মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্তমানে ভারত জাগিয়া উঠিতেছে বিবেকানন্দ-কণ্ঠে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে, মানুষকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া পশু-মানবকে দেবমানবে পরিণত করা—বিধি-নির্দিষ্ট এই মহান্-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমার জননী জন্মভূমি—মহারাণীর মতই ধীর পদবিক্ষেপে ঐ আবার অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গে বা মর্ত্যে—এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহার গতি রোধ করিতে পারে।

## বিবেকানন্দ-পরিচয়

বিজয়া দাশগুপ্ত

মাত্র ৩৯ বৎসর ( ১৮৬৩-১৯০২ খৃঃ ) বয়সের মধ্যে দশ বৎসর—১৮৯৩ থেকে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্তই স্বামীজীর পার্থিব কর্মকাল। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই অত্যল্পকালে অনতিবিস্তৃত রচনা, পত্র ও বক্তৃতাবলীতে আমরা তাঁর যে পরিচয় লাভ করি, তা বিরাট ও বিচিত্র। এই বহুধাব্যাপ্ত বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য থেকে তাঁর আদর্শের একটি স্বরূপ নির্ণয় করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ বিবেকানন্দের কর্মকাল—যখন ভারতবর্ষ বৃটিশ-শাসিত এবং ভারতবাসী প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বে একান্ত বিচলিত। সেই দিগ্‌ভ্রান্তির কালে ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের বাণী ও পরিকল্পনার কতখানি প্রভাব ছিল, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা অনুভব করা যায়। তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন লোক অল্পই ছিলেন, যাঁরা বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রভাবিত হননি। প্রচলিত অর্থে তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালের বিখ্যাত একাধিক রাজনৈতিক নেতা বিবেকানন্দের প্রভাব-সৃষ্ট। তাঁর স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করবার জন্য তাঁর একটিমাত্র বক্তৃতাংশের উল্লেখ এখানে করব ঃ

Do you feel that millions and millions of the descendents of gods and of sages have become next-door neighbours to brutes ? Do you feel that millions are starving to-day, and millions have been starving for ages ? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud ? Does it make you restless ? Does it make you sleepless ? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats ? Has it made you almost mad ? Are you seized with that one idea of the misery, of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children, your property, even your own bodies ? Have you done that ? That is the first step to become a patriot—the very first step.

শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি ও রচনাসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা-সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ও অভিমত তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান-ও চিন্তাপ্রসূত। 'Education is the manifestation of perfection already in man'—তাঁর এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে শিক্ষার মূলতত্ত্ব নিহিত। অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বলতে কী

বোঝায়, তার যথার্থ বিকাশ কিভাবে সম্ভব, সে-কথা তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই পরিশীলিত করে না ; হৃদয়ের প্রসার, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও মানবিকতা-বোধ যথার্থ শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। প্রকৃত শিক্ষা আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগায়, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মানুষকে শক্তিশালী করে। আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কারণ—আমরা শিক্ষার মূলতত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন। শিক্ষাদর্শ, শিক্ষক, ধর্ম-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি বিভাগীয় শিক্ষার প্রয়োজন, জনশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধশতাব্দী-কালেরও পূর্বে বিবেকানন্দ যে মত ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান কালের ছাত্র-অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শিক্ষকের আদর্শচ্যুতি প্রভৃতি মৌল সমস্যায় তার থেকে সুস্পষ্ট সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব।

উল্লিখিত দুটি বৃহৎ পরিচয় ছাড়াও আমরা বিবেকানন্দকে জানি সমাজ-সংস্কারক, নবযুগের প্রবর্তক, শক্তিধর বাগ্মী, প্রেরণাময় লেখক ও সংঘসংগঠকরূপে। বর্ণাশ্রম-ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার—যাকে তিনি 'ছুঁৎমার্গ' বলে অভিহিত করেছেন—দূরীকরণে তাঁর বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর যে বক্তা-রূপ প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, বিদেশে প্রায় প্রত্যহ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পর্যটনের কালে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সেই রূপের পরিচয় আমরা পাই। বিবেকানন্দকে কখনও সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় না, সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বা বৃত্তিও ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের বক্তব্যের বাহন তাঁর গদ্য-ভাষা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি বিশিষ্ট অননুকরণীয় সংযোজন বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করি না। তাঁর কাব্যরচনা কাব্যোৎকর্ষের বিচারে হয় তো উচ্চস্থান লাভ করে না, কিন্তু গভীর হৃদয়াবেগের সরল, বিশুদ্ধ ও চাতুর্যহীন অভিব্যক্তির জন্য তাঁর কয়েকটি কবিতাকে প্রভাতের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দের দান স্বদেশের সমগ্র অস্তিত্বে অঙ্গীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিংশশতকীয় নবজাগরণে বিবেকানন্দের প্রভাব ব্যাপক। শুধু বাংলাদেশের নয়, ইতিহাস-বেত্তার মতে বিবেকানন্দ বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রূপকার। সংগঠক বিবেকানন্দের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন। তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই পটভূমিকায় মূল প্রশ্ন বিবেচনার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের বিভিন্ন রূপের যে পরিচয় আমরা পেলাম, তাদের সমন্বয়-সাধক মূল যোগসূত্রটি কি ? অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁকে এত ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করতে হয়েছে, এত বিরাট কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে হয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বহু কথায় অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাঁর অনেক উক্তি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়। এই কারণে ইদানীং বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর উদ্ধৃতির যথেচ্ছ

ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সংস্কৃতিপত্রে বলা হয়েছেঃ 'স্বামীজী দার্শনিক সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—তিনি ছিলেন একজন মহান্ দেশপ্রেমিক…।' এই কথার সমর্থনে তাঁরই একাধিক উক্তি উপস্থিত করা খুব কঠিন নয়। স্বদেশের দুর্দশায় বিগলিত-প্রাণ বিবেকানন্দ বার বার নিজের মুক্তিকে তুচ্ছ বলে ঘোষণা করেছেন। এমন কি ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও আমরা তাঁর উক্তির সমর্থন পেতে পারি—'বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে চায়। ধর্ম হইল কেবল অধিকতর পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার আছে যে, উহা অধিকতর পবিত্র।' বাংলাদেশের কোন এক সাহিত্য-পত্রে বলা হয়েছেঃ প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও ঈশ্বরকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে সর্বপ্রথমে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষ—তার পরে ভগবান্।

এই জাতীয় উক্তিকে ভ্রমাত্মক বলা চলে না; কিন্তু এর থেকে অনুভব করা যায় যে, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিবেকানন্দ যে পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁকেও আমরা সেই পথের পথিক বলে ভাবতে আরম্ভ করেছি; চিকিৎসক ও রোগীকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছি; তাঁর উক্তির উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে, তাঁর সত্তার সামগ্রিকতা-নিরূপণে আমাদের দৃষ্টি অসমর্থ।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্র ভাষায় জাতির সহস্র সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনকালে যা কিছু ব'লে গিয়েছেন, তার থেকে যদি আমরা ধরে নিই যে, তাঁর দেশ-প্রেম, দরিদ্রপ্রীতি, সমাজচেতনা, শিক্ষাচিন্তা ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ, তা হলে আমাদের বিবেকানন্দ-পরিচয় যথার্থ হবে বলে মনে হয় না। বর্তমান দশকের ধর্ম-চেতনা-শূন্যতা বা আমাদের ব্যক্তিগত মতবাদ অনুযায়ী বিবেকানন্দকে আমরা গড়তে পারি না। যে ভাবেই হোক না কেন, সার্বিক সংস্কারমুক্ত হৃদয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের আন্তরিক অনুধ্যান করলে দেখা যাবে, আধ্যাত্মিকতা বিবেকানন্দ-সত্তার মূল উপাদান। মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাঁর সমগ্র বাণী অধ্যাত্মচেতনা-প্রসূত, তাঁর সমস্ত কর্মের মূলে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক, শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ, সমাজসংস্কারক—এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তাঁর যে পরিচয় ভিন্ন তাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেই পরিচয় হল—তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ভারতবর্ষের অদ্বৈত বেদান্তবাদের সর্বাধুনিক প্রবক্তা। বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয় তিনি দার্শনিক, কর্মযোগী, ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক; সমাজসংস্কারক ইত্যাদি তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়। আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেই তিনি—পরাধীন, মূর্খ, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে উন্নত করতে চেয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে একাধিক বক্তৃতায় তিনি বলেছেনঃ 'সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি…কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।'

অন্যত্র বলেছেন: 'ধর্মই ভারতের পক্ষে স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।'

'সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।'

মনে রাখতে হবে—'ধর্ম'-শব্দে তিনি ধর্মের শক্তিদায়ক কল্যাণকর মূল ভাবকেই বুঝিয়েছেন, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারকে তিনি কখনও ধর্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করেননি। কলম্বোয় এক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন: ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ··লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম'-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশকেই তিনি ধর্ম-সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম।' তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞা থেকেও লক্ষ্য করা যায়, তাঁর শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার সুস্পষ্ট যোগ রয়েছে। শিক্ষা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্যকে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভ্রমাত্মক বলে মনে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ যদি তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক মননরূপ বিভাজকের দ্বারা নিজেকে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন এবং শুধুমাত্র তাঁর মতানুরাগীর জনসমষ্টির অধ্যাত্মচেতনার বিকাশে নিয়োজিত থাকতেন, তা হলেও বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দের পরিচয় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হত না। প্রকৃতপক্ষে জীবনে আদর্শের রূপায়ণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই আদর্শ-সঞ্চারে সহায়তা করা সৎব্যক্তির পক্ষে তার সামগ্রিক কর্তব্যপালন বলে জগতে বিবেচিত হয়। বিবেকানন্দ তদ্ভিন্ন অন্য কিছু যে করেছেন, তার কারণ তিনি পলাতক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন না, তৎকালে স্বদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি আত্মসুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং মূলতঃ ধর্মের নবীন ভাষ্যকাররূপে ধর্মকে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রধান শক্তি বলে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন: 'আমাদিগকে দেখিতে হইবে—কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে···গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করা যায়। কারণ, যদি ধর্ম মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদ মাত্র।'

বিবেকানন্দ শেখালেন, জীবনের সর্বস্তরে আধ্যাত্মিকতাকে অনুস্যূত করা যায়,

কারণ সেটি কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নয় ; শেখালেন, মানুষের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় ধর্ম অবিরুদ্ধ-ভাবে যুক্ত হতে পারে, দেশকাল-নির্বিশেষে যে-কোন মানুষ তার কর্মকে যোগে রূপান্তরিত করতে পারে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে জানালেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কী, কিভাবে জীবনে তার অনুশীলন সম্ভব : Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control, or philosophy by one or more, or all of these—and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতা, শিক্ষাচিন্তা, সমাজ-সংস্কার, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি তাঁর যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করবে, যদি সেই সমগ্র পরিচয় তাঁর ধর্মচেতনার মূল সূত্র থেকে বিচ্যুত না হয়।

# বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ

নীহার মজুমদার

যুগ পুরুষ ভারতাত্মা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব সঠিক সন্ধিক্ষণে। একদিকে স্বদেশে কুসংস্কারের বেড়াজাল আর অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-সমূহ সভ্যতার দায়-দায়িত্ব নিতে গিয়ে নরবলিতে ব্যস্ত। যদি ঈশ্বর বিশ্বাস করি তাহলে বলব ঐ সময় স্বামীজীর আবির্ভাব স্থিরই ছিল, আর যদি রাজনীতিজ্ঞের কলম ধরি তাহলে বলতে হয়, ঐতিহাসিক চক্রাবর্তে এই মহান সমাজসংস্কারক, কর্মযোগী, মানবপ্রেমী ও বিশ্বমৈত্রীর পুরোধার আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে তাৎক্ষণিক উপস্থিতি অমোঘ ছিল।

প্রখ্যাত বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী নলিনীকান্ত কর এই বৈদান্তিক প্রবক্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'বিবেকানন্দের মতো মানুষ পৃথিবীতে কাঁড়ি কাঁড়ি জন্মান না। দু-এক হাজার বছরে দু-একজনই জন্মান।··· বিবেকানন্দ একাই একশ শুধু নন, একাই একশ হাজার কোটি। যুগন্ধর এই মহাবীর্যবান সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ ও তার ধর্মকে এক মহা সংকট থেকে রক্ষা করেছেন, দিয়েছেন আরও অন্ততঃ হাজার বছরের জন্য পর্যাপ্তের চেয়েও বেশী পাথেয়।' এই বিবেক-বাণীই আজ নিখিল বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রেরণা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূল স্তম্ভ বিশেষ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, কর্মে বিনয়ে শ্রদ্ধা এবং সদাচারের সমর্থনে এত ত্যাগ সাধনা কোন মহাজীবন স্বীকার করেছেন কিনা ভবিষ্যৎ প্রবক্তারাই বলবেন।

স্বামীজীর জীবন সাধনা কোন আবেগতাড়িত চমক নয়, কোন ধর্মীয় 'ইজম'-এর সমর্থনে নয়। তাঁর স্বপ্ন মানবমুক্তির—যেখানে শ্রেণী ধর্ম জাতপাতের ঊর্ধ্বে প্রতিটি বিশ্ব নাগরিকের সার্থকতা লাভ করবে বস্তুবাদী ও বিবেক শাসিত স্বাধীন চেতনার পূর্ণ প্রকাশে। তেজস্বী ভঙ্গিতে তিনি প্রচার রাখলেন: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। 'জীবসেবাই শিবসেবা'—এই তাঁর নবজাগরণের গান। মৃতপ্রায়, বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্ত বিশ্ববাসীর রক্তে নতুন উদ্যমের ধারা বইয়ে দিয়ে হুঙ্কার তুললেন, 'গেট আপ, ও লায়নস এ্যান্ড শেক অফ্ দি ডিলিউশন দ্যাট ইউ আর শিপ।'

মানুষের প্রাণে নতুন চেতনার বীজ পুঁতে দিলেন। তিনি দেখালেন মানব-মুক্তির সেই ঈপ্সিত সোনালী পথের নিশানা। তিনি জানালেন এই সমস্যাস্তীর্ণ বিশ্বে অপার শান্তি সম্ভব—সে তো আমাদেরই দখলে, খুঁজে নিতে হবে। সেজন্য মূলতঃ প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের আত্মমর্যাদা ও বিবেকশাসিত জীবন যাত্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা।

এখানে আত্মকলহ, ধর্মীয় হানাহানি জাতপাতের বিচার বা বিভেদের স্থান নেই। আত্মসমীক্ষা করে তাঁর স্বগতোক্তি, 'আহা দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে।...আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস ?' বিবেক-বাণী যেন রেনেসাঁর শুভ সূচনা। পরাধীনতা এবং বিবাদবৈষম্যহীন সমাজ সংগঠনে বিশ্বের দরবারে স্বামীজী দেখালেন এক নতুন আশার আলো—অনন্ত প্রশান্তির পেলবপরশ। যুব সম্প্রদায়ের কাছে বয়ে আনলেন নতুন বার্তা : বিবেকের পূর্ণ বিকাশ। শোনালেন চেতনার মুক্তধারার কথা। আপামর জনগণের মনের গভীরে আঘাত হানলেন, 'দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না ; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সরল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।' বিশ্ব সৌভ্রাত্রের মূর্তপ্রতীক ও সাম্যবাদের পূজারী মানব দর্শন বলতে বুঝিয়েছেন সর্বজনীন ধর্মের বিকাশ। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম প্রীতি ও আত্মীয়তাবন্ধনকে স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম—বিশ্বজনীন মানবধর্ম। দেবতার অধিষ্ঠান তো এই মনুতেই, মনমন্দিরে।

প্রসঙ্গান্তরে বিবেকানন্দের উধৃতি : 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই মানব দেহই হচ্ছে সব-সেরা অবয়ব এবং মানবসত্তা হচ্ছে মহত্তম সত্তা। সমস্ত প্রাণী সমস্ত দেবদূতের চেয়ে মানুষ হচ্ছে উন্নততর। মানুষের চেয়ে মহত্তম কেউ নেই।...আত্মোন্নতির জন্য আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কর্তব্য করা এবং এমনিভাবে শক্তি অর্জন করে চলা যাতে আমরা সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছুতে পারি।' এই তরুণ সন্ন্যাসীর বাণীগুচ্ছ চিরবন্দিত ও অভিনন্দিত বিশ্বব্যাপী।

ব্যষ্টি জীবনের সর্তগুলি পালনকে স্বামীজী ধর্ম করায় এবং ব্রত পালনের সামিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি প্রচার রেখেছেন সংশোধনবাদের—নিজ আত্মার, অপরের নয় ; পরামর্শ দিয়েছেন বিবেকের পরিপূর্ণতায় অগ্রণী হতে। এজন্য দরকার সদাচার, সদ্ব্যবহার এবং সদ্‌বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাঁর কথায়, 'সদাসর্বদাই মঙ্গলকর কাজ করব, কেননা একাজ আমাদের কাছে সৌভাগ্য-স্বরূপ। এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণতালাভ করতে পারি।...এই জগৎ সব সময় ভাল ও মন্দ মিশিয়ে এবং চিরকাল এমনিভাবেই চলবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলকে করুণা করা এবং এমনকি অন্যায়কারীদেরও ভালবাসা।'

শুন্বন্তু বিশ্বের প্রবক্তা স্বামীজীর কথা বর্তমান ধর্মীয় জিগির এবং বিশ্বব্যাপী আত্মহননের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি বলছেন ; আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। জাতীয় নবজাগরণে তিনি বলেছেন 'লিডার গড়ো'। কিন্তু কে হবেন সে লিডার ? তাও তিনি বলে দিয়েছেন :

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা জন্মায়। লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না—তবে লিডার। প্রথম জন্মগত, দ্বিতীয় নিঃস্বার্থ; তবে লিডার।···প্রীতিঃ পরমসাধনম্। ·শিরদার তো সরদার—মাথা দিতে পার তো নেতা হবে।' আজকের নেতৃত্বহীন বলগাহীন শাসনব্যবস্থায় একথাগুলি বড় বেশী করে স্মরণে আসে।

স্বাধিকারের অপর নাম ত্যাগ—এ মর্মটাই আমরা হয় বুঝতে পারি না, নতুবা না বোঝার ভান করি। এখানেই দ্বন্দ্ব কলহ বিবাদের সূত্রপাত। তিনি কথায় কথায় জানালেন, কিছু আকাঙ্ক্ষা কোরো না, দানের প্রতিদানে কিছু চেয়ো না। যা কিছু দিতে পার দিয়ে যাও। একদিন সবকিছু তোমার কাছে ফিরে আসবে, প্রতিদান হয়ে ফিরে আসবে, কিন্তু সে বিষয়ে মননিবেশ করার প্রয়োজন নেই।···দান করার জন্যই এ জীবনের সৃষ্টি, প্রকৃতিই তোমাকে দান করতে বাধ্য করবে; সুতরাং নিজে থেকেই দান কর।···স্বদেশহিতৈষী হও—যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এতবড় কাজ করিয়াছে সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস।'

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা এবং চিকাগোয় বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান এক অলৌকিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। বিভিন্ন ধর্মের বিচিত্র শ্রোতধারার মিলনী বিশ্বভ্রাতৃত্ব—এই নব মূল্যায়ন এবং ধর্ম-সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল। সূচনা হল নব ধর্মের অভ্যুত্থান যার নাম, মানবাধিকার। তিনি তাঁর যুক্তিজাল দিয়ে ভারতের বৈদান্তিক চেতনার মূল্যায়ন উপস্থাপনার মাধ্যমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বললেন—উপস্থিত মনীষী-মণ্ডলী এই যুক্তিকে স্বাগত জানালেন।

এই ধর্মীয় ঐক্যের মহাসম্মেলন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে (১৮৯৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর) "শিকাগো সানডে হেরাল্ড" লিখছে—'এই ধর্মমহাসভার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য।' ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, 'খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে। যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই: ইহা প্রমাণ করিয়াছে—সাধু চরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী প্রসব করিয়াছে।'

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ তো ঐ তরুণ সন্ন্যাসীই। কেন এই প্রতিষ্ঠান, একথা বলতে গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দ বলছেন, 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যদি বিশেষ কোন আদর্শ নিয়ম ও অবদান থাকে তাহলে, স্বীয় মুক্তি এবং সেই সঙ্গে জগদ্‌বাসীর কল্যাণ।' স্বামীজীর সেই কল্প-বৃক্ষ আজ পরিপূর্ণতার গরিমায় প্রোজ্জ্বল, বিশ্বব্যাপী এর শাখা প্রশাখা। সমাজের কোন ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি নেই। স্বামীজী

সঙ্ঘ-সংগঠন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করেছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, সেবিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার ক'রে তাদের বুঝিয়ে দেবে।' সেই ঈপ্সিত মঠ ও মিশন আজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিলনক্ষেত্র। স্বামীজীর কল্পনা আজ বাস্তবায়িত।

বিশ্বপথিক তরুণ ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পায়ু লীলাখেলায় যে পাহাড়প্রমাণ মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার টানে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপামর জনসাধারণ বারে বারে ছুটে আসে তাঁর সৃষ্ট আশ্রমপ্রাঙ্গণে—শান্তির জন্য, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এই বিশ্ব সঙ্ঘ স্থাপনে স্বামীজী চেয়েছিলেন: মেয়েমদ্দ দুই চাই, আর তাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নেই।...হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।'

বিবেকবাণী আজ সার্থক।

"বিবাদ নয় সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।...'অর্গানাইজেশন' (সঙ্ঘ) চাই—কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।"

—নরেন্দ্র

(পত্রসংখ্যা নং ১৫৫/১৮৯৫)

## ভারতবর্ষ, ভারতীয় ঐতিহ্য-চেতনা ও উত্তরাধিকার

**স্বামী বিবেকানন্দ**

"ভারতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে প্লাবিত করার আগে, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করো। …প্রথমে আমাদিগকে এই কার্যে মন দিতে হইবে যে আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি এই সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ সমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারত-ভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন ঐ সকল শাস্ত্র-নিহিত সত্য আগুনের মতো উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটিতে থাকে। …ভারতে ধর্ম অনেকদিন ধরিয়া নিশ্চল হইয়া আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে।"

# স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-ধর্ম

যোগেশচন্দ্র বাগল

## এক

তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের নূতন সহকারী প্রধান শিক্ষক আসিয়াছেন। লম্বা দোহারা চেহারা, মুখমণ্ডল তেজোদীপ্ত, মস্তকে উষ্ণীষ। দেড় কী দুই মাইল দূর হইতে আসিতেন, কিন্তু দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র দেখিয়াছি। মনে প্রশ্ন জাগিত, ইনি তাঁহার মত উষ্ণীষ পরেন কেন? এই শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল একত্র বাস করি, তখন বুঝিতে পারি, ইনি স্বামীজীর দ্বারা কত অনুপ্রাণিত। স্কুল-লাইব্রেরীতে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইখানি ছিল। তিনি লাইব্রেরীতে বিবেকানন্দের লেখা বাংলা বই আরও কিছু আনাইলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ', 'জ্ঞান যোগ', 'বীরবাণী', এই রকম আরও কিছু কিছু নতুন বই। শিক্ষক মহাশয় এই সকল হইতে অনেক অংশ আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন সাধারণতঃ অপরাহ্লেই তাঁহার নিকট আমরা গিয়া বসিতাম।

দুই বৎসরের মধ্যেই অসহযোগের বান আসিল। আমরা এই বানে গা ভাসাইলাম। তখন আমাদের মনে কত আত্মপ্রত্যয়। আত্মশক্তির কি অভূতপূর্ব বিকাশ। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সম্মুখে। কিন্তু এই পরিণতির জন্য প্রস্তুতি তো চাই! আর ইহা সময়সাপেক্ষও বটে। আমরা তখন পরিণতি দেখিয়াই মুগ্ধ হই। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবিয়া দেখি নাই ইহার মূলে পূর্ববর্তী বহু বৎসর যাবৎ কি কি শক্তি কার্য করিয়াছে, আর ইহার মূলাধার কে বা কাহারা! আট নয় বৎসর পরের কথা। মনে হইতেছে ১৯২৭ সন। বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় গিয়াছি। প্রধান বক্তা দুইজনের কথা মনে আছে, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং মনীষী প্রধান বিপিনচন্দ্র পাল। দুইজনেই স্বামীজীর সমসাময়িক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা অনেক কথা বলিলেন। বিপিনচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় স্বামীজীর মার্কিন বিজয়ের কথা ব্যক্ত করেন। তখন এ বিষয়টি শুনিতে ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা আদৌ হৃদ্গত হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়টি পড়িয়া ইহা কতকটা বুঝিতে পারি। তিনি শতাব্দীর শেষে চারি মাস কাল আমেরিকায় কাটান। সেখানকার ধর্মপিপাসু ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনে বিবেকানন্দের প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং পরাধীন ভারতবাসী সম্বন্ধে ওদেশবাসীরা যে নূতন করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি বলেন শেষোক্ত বিষয়টির মধ্যেও ছিল বিবেকানন্দের মঙ্গল হস্ত।

আর একজন সমসাময়িকের কথাও এখানে একটু বলি। তখন ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমি লিখিব, স্থির করিয়াছি। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি হইতে তথ্য আহরণে প্রবৃত্ত হইলাম। নিবেদিতার The Master as I saw him ("স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি"), যত দূর মনে হইতেছে, ইতিপূর্বেই পড়িয়া ফেলি। স্বামীজীর জীবনদর্শনের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ দ্বিতীয়টি দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। আমার উদ্দেশ্য নিবেদিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা। একদিন লেডী অবলা বসুর সঙ্গে দেখা করিলাম। জানিতাম নিবেদিতা শেষজীবনে বসু-দম্পতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন এবং মারাও যান তাঁহাদেরই দার্জিলিংস্থ বাসভবনে। নিবেদিতা, সারদামণি দেবী (শ্রীশ্রীমা) এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ওইদিন এবং পরেও লেডী বসু আমাকে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে যে কটি কথা বলেন, তাহার মর্ম এই ঃ—"১৯০০ সালে প্যারিসে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। যেমন নানাদেশ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র আমদানী হয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারীরাও বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছেন। আচার্য বসুর সঙ্গে আমিও সেখানে যাই, দেখি বিবেকানন্দ দলবল সমেত সেখানে উপস্থিত। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। একদিন আমরা স্বামী-জীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। দুচার কথা হবার পরই তিনি আমাকে বললেন তাঁকে গান গেয়ে শোনাতে হবে। তাঁর কথা কি অমান্য করতে পারি? আমি সসঙ্কোচে তাঁকে গান গেয়ে শোনাই। পরে যখন শুনি তিনি নিজেও একজন সুগায়ক, তখন আমি লজ্জায় মরে গেলাম। আচার্য বসুকে তিনি Indian Scientist বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন।"

এইরূপে যাঁহারা স্বামীজীর সাক্ষাৎসংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং যাঁহারা মঠমিশনের বাহিরে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, এমন কয়েকজনের কথা শুনিয়া এবং সঙ্গলাভ করিয়া আমিও নিজেকে ধন্য মনে করি।

আট নয় বৎসর পূর্বে চুঁচুড়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলন হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদেশ পর্যটন করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয়দের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দেখিয়া তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। তিনি বলেন—মেক্সিকো পর্যটন কালে মেক্সিকান ভাষায় গীতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন বইয়ের অনুবাদ দেখিয়াছেন। সুইডেনেও এই ধরনের অনুবাদ-পুস্তক তাঁহার নজরে আসিয়াছে। এই সকল অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রচাররত ব্যক্তিবিশেষ বা মণ্ডলীবিশেষ দ্বারা করা হয় নাই। ওই ওই দেশের বিদগ্ধ জনেরা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দেশ-বাসীদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারকল্পে ইহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীয় ও বিধর্মীয়দের দীর্ঘকাল পোষিত প্রতিকূল মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন সম্ভব হইল কিরূপে? উত্তরে বক্তা যাহা বলেন তাহার মর্ম এই ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও মার্কিন মুলুককে হিন্দুধর্মের যে বিজয় বৈজয়ন্তী

উড়াইয়াছেন, তাহার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়। এখন আর হিন্দুর ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টানেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ভরসা পান না। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া হিন্দুদের কতকগুলি রীতিপদ্ধতি—যেমন সংকীর্তন, গেরুয়া পরিধান প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র এবং ডঃ সুনীতিকুমারের মুখে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে প্রায় একই কথা শুনি। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অজানা অচেনা লোকেদের প্রাণে বিবেকানন্দ যে সাড়া জাগাইয়াছেন তাহা ক্রমে নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিরূপে এমনটি সম্ভব হইল তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি! আজকাল ধর্ম সমন্বয়ের কথা আকছার শুনি। জনৈক বন্ধু বলিলেন, সেদিন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এক অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী নেতাদের লইয়া ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক বসিয়াছিল। বিবেকানন্দ-জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু স্বামীজী কর্তৃক অনুশীলিত ও প্রচারিত ভারতধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলে ধর্মসমন্বয়ের সাড়ম্বর আলোচনার হয়তো আবশ্যকতাই থাকিত না। বিদেশে তিনি যে ভারতধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং যাহা শুনিয়া বিদেশীরা বিমোহিত হন সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয়টি জানিতে পারিলে বিবেকানন্দের সুকৃতি কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব।

## দুই

এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে গেলে ঐতিহাসিক পারম্পর্যের কথাও আমাদের জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রায় সমকালেই তিনি হিন্দুধর্ম আলোচনা শুরু করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম তৎসম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থনিচয়। উপনিষদ আগেও ছিল, কিন্তু ইহার যুক্তিনিষ্ঠ টিকাটিপ্পনী সমেত সাধারণগ্রাহ্য করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করার প্রথম কৃতিত্ব রামমোহনের। এই উপনিষদ আবিষ্কার তাঁহার একটি অপূর্ব কীর্তি। হিন্দু-ধর্মের সার ইহাতে বিধৃত। গত শতব্দীতে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার মূলে রহিয়াছে রামমোহনের এই আবিষ্কার। তিনি উপনিষদ তথা বেদান্তের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদের আলোচনা 'আত্মীয় সভা'র মাধ্যমে আরম্ভ করেন। এই সভায় পরিণতি ঘটে তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে (১৮২৮)। দুই বৎসর পরে ইহার জন্য যে মন্দির স্থাপিত হয় তাহার ন্যাসপত্রে রামমোহন এই মর্মে লেখেন যে, এই মন্দিরের দ্বার সকল লোকের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন।

রামমোহনের সমসময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং দেশবিদেশে ইহা প্রচার করিতে থাকেন। রামমোহন কিন্তু আদৌ ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ

একেশ্বরবাদের গুণকীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে সা-কার অর্থাৎ দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন আছে। তিনি অতঃপর আরও লেখেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা পরাধীন ভারতবাসীর ধর্মের বিরুদ্ধে উক্তি করিয়া রেহাই পাইতেছেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব নাই। তাঁহারা একবার স্বাধীন পারস্যে বা তুরস্কে গিয়া ধর্মপ্রচার করুন না, তাহাতে তাঁহারা যে কত বীরপুরুষ তাহা প্রমাণিত হইবার সুযোগ মিলিবে। ওই ওই দেশে বসিয়া ধর্মের গ্লানিকর উক্তি করিলে কি ফল হয় তাহাও বুঝিতে পারিবেন! রামমোহনের প্রতিবাদের পর তাঁহার স্বদেশবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে খ্রীষ্টানী প্রচারের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। সংস্কৃতি শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি প্রকাশে ও অনুবাদে কেহ কেহ তৎপর হইয়া উঠিলেন।

পরবর্তী চতুর্থ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি) রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনে মন দিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃত্বাধীনে। সুষ্ঠুরূপে বেদ-বেদান্ত অনুশীলনের নিমিত্ত চারিজন ব্রাহ্মণ যুবককে কাশীধামে পাঠানো হইল। সভার মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় শাস্ত্র-গ্রন্থাদির 'চুর্ণক' বাহির হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে দিয়া উপনিষদের অনুবাদ করান ও ইহা ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ঋক্‌বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু এত করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ মনে স্বস্তি পাইলেন না। তিনি ব্রাহ্মধর্মের বীজ অন্যত্র খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারই ভাষায়—"তন্ত্র, পুরাণ বেদান্ত উপনিষদ, কোথায় ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম, বলিলাম, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।' তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটি পেন্সিল দিয়া সম্মুখে কাগজ খণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটি বাক্সে ফেলিয়া দিলাম, ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক; আমার বয়স ৩১ বৎসর।" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৩১, চতুর্থ সংস্করণ)।

দেবেন্দ্রনাথ দুই খণ্ডে "ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ" প্রচার করিলেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মদিগের অনুসরণীয় একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। রামমোহনের উপনিষদ-ভিত্তিক একেশ্বরবাদ হইতে দেবেন্দ্রনাথ সমাজকে একটি স্বতন্ত্রপথে চালনা করিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে আলাদা নূতন মণ্ডলী গঠিত হইল। তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আচারনিষ্ঠ হিন্দুরা ও একেশ্বরবাদ তথা পরব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে এই মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিতেন। সাধারণের নিকট ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের অঙ্গ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। দেবেন্দ্রনাথের বহু জনহিতকর প্রচেষ্টা, যেমন খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলন, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় রক্ষণশীল হিন্দু

নেতার নিকট হইতেও আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করে।

পঞ্চম দশকের শেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্র যুবক, যুবজনোচিত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। তিনি ক্রমে কেশবচন্দ্রের উপর বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিলেন। ষষ্ঠ দশকে বহু কৃতবিদ্য যুবক দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সংস্রবে আসেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ নূতন বল পাইল। এই সকল যুবকের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), অঘোরনাথ গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং কিছু পরে আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ ভট্টাচার্যের (শাস্ত্রী) নাম উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুখী মনোভাব ও কার্যকলাপে দেবেন্দ্রনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই দশকের মধ্যভাগেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল।

উৎসাহী যুবক অনুবর্তীদের লইয়া কেশবচন্দ্র ১৮৬৬, ১১ই নভেম্বর নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, আর ইহার নাম দিলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। পূর্ব সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অতঃপর পরিচিত হইল। এই সনে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় "ব্রাহ্মধর্ম প্রতিবাদক শ্লোক সংগ্রহ" সংকলিত ও প্রচারিত হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, অগ্নি-উপাসক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থাদি হইতে সার শ্লোকনিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে শ্লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে'র পরিবর্তে এই শ্লোক সংগ্রহের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের ধর্মাদর্শ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন সমাজের সভ্যেরা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য হইতে গৃহীত সার তথ্যের উপর নির্ভর মাত্র না করিয়া বিভিন্ন ধর্মের ভিতর হইতেই আদর্শ খুঁজিতে তৎপর হইলেন।

কেশবপন্থীরা বিবিধ উপায়ে সমাজের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ সনের তিন আইনের (বিবাহ আইন) মধ্যে তাঁহাদের সংস্কার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে হিন্দুত্ব বর্জন পুরাপুরি সংসাধিত হইল। নূতন সমাজের ব্রাহ্মেরা বিরাট হিন্দুসমাজের হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেকেরই অশেষ নির্যাতন, ক্লেশ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, হিন্দু হইতে তাঁহারা যে আলাদা এ কথাও তাঁহারা কথায় এবং কার্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিক দিয়া পরবর্তী দশকে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা ও কেশবপন্থীদেরই অনুবর্তী ও অনুকারী। ১৮৯১ সনের সেন্সাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, অপরেরা কিন্তু ব্রাহ্ম লিখাইতেই লাগিয়া যান। ইহা অবশ্য পরের কথা। কেশবচন্দ্র বিলাতে একবার ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপে ও আমেরিকায় কয়েকবার নূতন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ

প্রচারকল্পে গমন করেন। তাঁহাদের মুখে বিদেশীরা উপনিষদে বিধৃত শাশ্বত হিন্দুধর্মের কথা শুনিতে পাইলেন না। হিন্দুদের সা-কাব উপাসনা অর্থাৎ বহু দেবদেবী পূজার গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা যে নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, এই ধরনের কথাই তাঁহারা স্পষ্টতঃ প্রচার করিলেন। তবে বিলাতে প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের স্বদেশহিতকারক ধর্মাতিরিক্ত বক্তৃতাদিও এখানে স্মরণীয়।

একদিকে যেমন উৎসাহী কর্মকুশল ব্রাহ্মদের মুখে নিছক হিন্দুধর্মের কথা শোনা যায় না, অন্যদিকে বিপরীত কথাই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাষাবিদ্ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি উপনিষদ-বেদান্ত, ষড়দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটি সকলকেই ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার মতে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদিতে প্রকটিত উচ্চ ভাবধারার পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত বাইবেলের মধ্যে। বেদ-চর্চার নিমিত্ত ম্যাক্সমুলারকে তখন আমরা কত আপন করিয়া ভাবিয়াছি। তাঁহার আত্মজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার একটি উক্তিতে বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। হিন্দুগণকে তিনি 'হীদেন্' ও 'প্যাগান' বলিয়া উল্লেখ করেন। উপরন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন—বাইবেলই সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত নহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সার্ উইলিয়ম জোন্সও ইহার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে হিন্দু দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

এই সময় তৃতীয় বিপদ দেখা দিল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পশ্চিমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশীয়দের নিকট হইতে। তখন কোন কোন নেতার মুখে এমন কথাও শুনি, ইংরেজী ভাষা এবং য়ুরোপীয় আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ না করিলে জাতির মুক্তি নাই। নব্য শিক্ষিতেরা ইংরেজী ভাষায় গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থাদিও লিখিতে অভ্যস্ত হন। বাংলা ভাষা সাহিত্য তাঁহাদের নিকট যেন অস্পৃশ্য। মহামতি সি. এফ. এণ্ড্রুজ বলিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনের দাসত্ব অপেক্ষা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিজয় তথা প্রাধান্যলাভ ভারতীয় সমাজের পক্ষে ঘোরতর মারাত্মক হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার একটি উক্তির মধ্যেও ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলেন—"হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িরা মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি!" (সীতারাম) সত্য বটে, রাজনারায়ণ বসু উদ্ভাবিত এবং নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত হিন্দুমেলার ন্যায় স্বাজাতিক প্রতিষ্ঠান এই সময়কার বিজাতীয় মনোবৃত্তির স্রোত রোধ করিতে খুবই তৎপর হইয়াছিল। স্বদেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও সংস্কার সাধনে এই মেলার বিশেষ প্রযত্ন লক্ষ্য করি। কিন্তু দিশাহারা বিভ্রান্ত জাতির পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হিন্দুমেলারই অঙ্গ জাতীয় সভার একটি অধিবেশনে (১৮৭২) রাজনারায়ণ বসু

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তিনি একেশ্বরবাদী হিন্দু, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, কাজেই বক্তৃতায় সা-কার বা বহু দেবদেবীর পূজার যে তিনি প্রশংসিত করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ চিন্তা যে উপনিষদে বিবৃত তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া 'বহুনিন্দিত' হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রতিপালন করিতে প্রয়াসী হন। হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন তথা সর্বজনীন মঙ্গলময় রূপটি ইহাতে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু তখন এই বক্তৃতায় কত আপত্তি। কেশবপন্থী ব্রাহ্মগণ এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীরা প্রতিবাদ সভা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে নামিলেন। প্রথমোক্তদের একটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং এবং বক্তৃতা দেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৭০ সনের শেষে বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয়দের সেবা, সংস্কার ও উন্নতিসাধন-কল্পে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারত-সংস্কার সভা গঠন করেন। হিন্দুমেলার মত ইহা দ্বারাও সমাজের কল্যাণ খানিকটা সাধিত হয়, কিন্তু মূলে যে হা-ভাত! হীনমন্যতা আত্মপ্রত্যয় আনে না; আত্ম-চেতনাই আত্মপ্রত্যয়ের দ্যোতক, এই চেতনা কিরূপে আসিবে? সন্তরণ শিক্ষার্থী ঠাঁই হারাইয়া জলে যেমন হাবুডুবু খায়, আমরাও তেমনি ধর্মীয়-ভিত্তির অভাবে কেমন যেন বিভ্রান্তির মধ্যে গা ভাসাই। বিভ্রান্তি দূরকরতঃ আত্মচেতনা দান করিবে কে?

## তিন

এইসময়ে আবির্ভূত হইলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার অবস্থিতি, মন্দিরের পূজারী ছিলেন তিনি। ধর্মবিষয়ে তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখে কিরূপ তত্ত্বকথা! ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে প্রথমে সাধারণের গোচরে আনেন। পরমহংসদেবের উক্তিসমূহ লইয়া একখানি চটি বইও তিনি প্রচারিত করেন। এই 'পূজারী' ব্রাহ্মণের (অবশ্য তিনি প্রচলিত অর্থে তখন আর 'পূজারী' নন) নিকট বিভিন্ন স্তরের ও ধর্মাশ্রয়ী লোকের আনাগোনা শুরু হইল। ব্রাহ্মেরা শুধু নন, খ্রীস্টান, মুসলমান এবং উচ্চশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে যাইতেন এবং শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। এক জন পূজারী ব্রাহ্মণ, অপরিচ্ছন্ন, কোনরকমে নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন মাত্র; তিনি এমন উন্নতমনা সাধক হইলেন কিরূপে—নিজ নিজস্ব সুনেত্রে সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীরাও যে তাঁহার মুখে তাঁহাদেরই কথা শুনিতে পাইতেছেন।

পরমহংসদেব উচ্চকোটির সাধক, তাঁহার ঈশ্বর যাঁহাকে তিনি "মা" বলিতেন, মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ নয়; কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও নয়, তাঁহার অস্তিত্ব সর্বজীবে, সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বরের সাধনভজন করিয়াছেন। খ্রীস্টানরূপে, মুসলমানরূপে, অন্যান্য ধর্মীয় শাখা বা সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর ভজনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটিরমধ্যেই জগন্মাতার

সন্ধান পাইয়াছেন। হিন্দু হইয়াও খ্রীষ্টান বা মুসলমানরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করা যে সম্ভব তাহা তিনি দীর্ঘকাল আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ভাষায় বলিতে পারি দক্ষিণেশ্বরকে তিনি পরিণত করেন একটি ধর্মের লেবরেটরি বা পরীক্ষণাগারে। তিনি এইখানে এক একটি ধর্মকে ও ধর্মীয় শাখাকে পরখ করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশ্বর সকল দেশ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে এক কথায় সর্বত্র বিদ্যমান। হিন্দু ছাড়া আর কেহ কি এমন ভাবে ভাবিতে সক্ষম? খ্রীষ্টানরা মনে করেন যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাদের ত্রাণকর্তা, তাঁহাকে না মানিলে জীবের আদর্শে মুক্তি ও কল্যাণ নাই। মুসলমানদের ধারণা মহম্মদীয় ধর্ম অনুসরণ না করিলে জীবের অনন্ত নরক। এই রকম ইহুদীই বলুন, ইরাণীই বলুন প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুক্তিপথ আলাদা। খ্রীষ্টান কি কখনও হিন্দুভাবে দেবতার ভজনা করিতে পারেন? মুসলমানও কি কখনও এরূপ কল্পনা মনে স্থান দেন! অন্যদের সম্বন্ধে কিছু নাই বলিলাম। পরমহংসদেব দেখাইলেন হিন্দু হইয়াও খ্রীষ্টান বা মুসলমানরূপে জগন্মাতার আরাধনা করা যায়। তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ বা তন্ত্রের ধার ধারেন না। কিন্তু তিনি অবিরাম সাধন ভজন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা যে সত্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা উক্ত উন্নতশাস্ত্র গ্রন্থাদির নির্যাস। 'যত্র জীব তত্র শিব' এই তাঁহার বাণী। মানুষের ধর্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নয়। মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষের ধর্ম পরস্পরের কল্যাণসাধন। পরমহংসদেবের মুখে সরল সহজ ভাষায় ধর্মের এই মূল কথাগুলি শুনিয়া সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বিষয় জানাজানি হইবার অল্পকালের মধ্যেই আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, নিরাকার ও সাকার উপাসক—যুবক বৃদ্ধ সকলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ভিড় করিতে আরম্ভ করেন।

বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুগায়ক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত খুবই সংশয়পূর্ণ। এরূপ একজন যুবক কিরূপে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন সে সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর কাহিনী রহিয়াছে, পুনরুক্তি এখানে অনাবশ্যক। তাঁহার মত শিক্ষাভিমানী সন্দিগ্ধচিত্ত যুবক পরমহংসদেবের সহজ সরল তত্ত্বকথা শুনিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া পড়েন। পরমহংসদেব যে ধর্মের কথা বলেন, তাহা দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্ম সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্বলোকের। এই ধর্মই তো উপনিষদব্যাখ্যাত ধর্ম। ইহা একটি জাতির মুখে উচ্চারিত এবং একটি দেশের মধ্যে ইহা সঞ্জাত; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা শুধুমাত্র একটি জাতির বা একটি দেশের ধর্ম নয়। ইহার মূল মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র, ইহার বাণী বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন অর্থাৎ এক কথায় ইহা মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম। নরেন্দ্রনাথ তদীয় আচার্য পরমহংসদেবের মধ্যে উপনিষদে ব্যাখ্যাত বিশ্বজনীন ধর্মের

অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় বিকাশ দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি আচার্যের জীবন দর্শন আলোচনা ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই এই কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ বিশ্বজনীন রূপ প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহা জাতি ও দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল জাতির সকল দেশের মানুষেরই ধর্ম—এই সারসত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। পরমহংসদেবের জীবনে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে; তিনি এই তত্ত্বকে কার্যে রূপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করেন। সর্বত্র স্বদেশবাসীর সংজাত ধর্মবোধ দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপ্লুত হন। উপনিষদ ও বেদান্ত চর্চায় তিনি অভিনিবিষ্ট হইলেন। ইহার সর্বজনীন রূপ তাঁহার হৃদ্গত হইল। সকল মানুষের কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই যে ইহার সার্থকতা তাহাও তিনি উপলব্ধি করেন। এই দিক হইতে বিবেকানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের সত্যকার উত্তরসাধক। উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, অগ্রসর-অনগ্রসর কেহই এই ধর্মের আওতা হইতে বাদ যান না। ইহার কল্যাণমন্ত্রে সকলেই উদ্বোধিত হইতে পারেন।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে "ভ্রাতা ও ভগিনীগণ" বলিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করেন। ইহাতে কি করতালি ও হর্ষধ্বনি! অপরের নিকট এইরূপ সম্বোধন বাস্তবিকই বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল। কারণ বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিরা পরস্পরকে তো আর ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া মনে করেন না। নিজ নিজ ধর্মের তথা জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্তই তো তাঁহারা সেখানে উপস্থিত; পরস্পরকে আপন বলিয়া গণ্য করিবেন কি রূপে? ভারতবাসীর পক্ষে মনুষ্য-মাত্রকেই ভ্রাতা-ভগিনী মনে করা নিতান্তই স্বাভাবিক। হিন্দুরা মনে করেন সকল মানুষের মধ্যেই 'নারায়ণ' বিদ্যমান, এবং নরনারীমাত্রেই এক জগদীশ্বরের সন্তান, কাজেই ভ্রাতা ও ভগিনী। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সম্বোধন আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই সকলের চিত্তে বেশ একটা স্থান করিয়া লইলেন।

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হিন্দু তথা ভারত-ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পরখ করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিলেন—এই ধর্ম উদার ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানবজাতির অর্থাৎ বিশ্ববাসীর মুক্তি ও কল্যাণ চাহে, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মাশ্রয়ী সম্প্রদায়ের নহে। ভারতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" আখ্যাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদেরও মিলনক্ষেত্র এই দেশ। হিন্দুধর্মের উচ্চাদর্শে সঞ্জীবিত হইয়াই ভারতবাসীরা স্বদেশকে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ এই ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের সর্বজনীন মঙ্গলময় প্রকৃতির ব্যাখ্যান শুনিয়া বিশ্ববাসী বিমোহিত হইলেন।

ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর প্রতিনিধিবর্গ এবং বাহিরের অগণিত জনসমষ্টি হিন্দুধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই। ইতিপূর্বে যাঁহারা য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমা করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুধর্মের এই সর্বজনীন রূপের কথা না বলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট মণ্ডলী বা মতবাদের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম তাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত ও সর্বোচ্চ রূপের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাদের পূর্বমত ও ধারণা পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন। পশ্চিমের, বিশেষ করিয়া মার্কিনবাসীদের নিকট ভারতবাসীরা অতঃপর হিন্দুনামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। হিন্দু শুধু ভৌগোলিক নামই নহে, উপনিষদ বর্ণিত, বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত সর্বজনীন কল্যাণধর্মে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাই হিন্দু—এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে। মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শি, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম—তাঁহাদের নিকট ভারতের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু। বিদেশে ভারতধর্মের কুৎসা প্রচার বন্ধ হইল, স্বদেশে হীনমন্যতা দূর হইয়া ভারতবাসীদের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয় দেখা দিল। ইহার ফলেই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিককার "নিউ স্পিরিট" বা নব ভাবনার অভ্যুদয় আমাদের জাতীয়তার পাকাপোক্ত ভিত্তি রচনাও ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।

## 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'

**স্বামী লোকেশ্বরানন্দ**

স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্তব্যটি করেছিলেন। কি এর তাৎপর্য? যত দূর বুঝেছি তিনি বলতে চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভারত নেতৃত্ব দেবে। সুখস্বপ্ন বটে, কিন্তু বাস্তবে কি এটা সম্ভব? এইটি বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্বামীজী যখন এই মন্তব্য করেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ব্রিটেনের পদানত। বৃহৎ দেশ, কোটি কোটি মানুষ, কিন্তু মানুষগুলো অজ্ঞ, দরিদ্র, অসহায়। সকলের কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র। সেই দেশ স্বাধীন হবে? স্বপ্নেও তা কেউ ভাবেনি। অনেকে তা চায়ও নি। কিন্তু স্বামীজী বলে বসলেন—'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশ অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীন হবে।' এও এক সুখস্বপ্ন। কিন্তু সেই সুখস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো। কাকতালীয়? হবেও বা। তাহলে 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' কথাটাও কি কাকতালীয়ভাবে ঘটে যাবে? ঘটবে, কি ঘটবে না, তা বড় কথা নয়। ঘটা সম্ভব কিনা সেইটিই বিচার্য। দেশ স্বাধীন হলো কি করে, তা আমরা জানি। বিশ্বের জনমত, দেশময় বিক্ষোভ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পার্লামেন্টের নির্বাচনে চার্চিলের পরাজয়, আর আই এন এ—এই সব মিলে দেশের স্বাধীনতা। অভাবনীয় বলা যেতে পারে, কিন্তু এরকম ঘটনার সমাবেশ কি বারবার ঘটবে?

স্বামীজীর 'অভাবনীয়' শব্দটি অর্থবহ। অর্থাৎ যে সময়টায় এই উক্তি করেছিলেন, তখন যেসব ঘটনার ফলশ্রুতি ভারতের স্বাধীনতা, তা সত্যিই অভাবনীয়। তাহলে কি বলব দৈব? তা নয়। ইতিহাসের চাকা এইভাবেই ঘুরে যায়। আজ যা অভাবনীয় মনে হয়, কাল তা সম্ভব, অনিবার্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় ঘটনাস্রোতের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া। অন্ততঃ স্বামীজী তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন দেশ আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব অর্জন করুক যোগ্যতার জোরে। এই যোগ্যতা সামরিক শক্তির বা কূটনৈতিক চালের মাধ্যমে ভারত অর্জন করবে, এটা তাঁর অভিপ্রায় নয়। এটা ভারত অর্জন করবে নৈতিক গুণে। তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেব। আধিপত্য নয়—সম্পর্কের ভিত্তি সৌম্য। ভারত শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শে বিশ্বাসী। সকলের কল্যাণকামী। ভারত অতীতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে প্রভাব নৈতিক প্রভাব, প্রেমের প্রভাব। সে প্রভাব তার মনোজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মমত—জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর সাক্ষ্য আজ বিদ্যমান। কোনটাই চাপিয়ে দেওয়া নয়; স্বেচ্ছায়, সানন্দে গ্রহণ। ভারতের শান্তিপ্রিয়তা এ সব দেশের মধ্যেও প্রকট। এই

সব দেশের মানুষও কত শান্ত। স্বামীজী যে নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা এই নেতৃত্ব।

কিন্তু যে-ভারত নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত, সে আবার কি নেতৃত্ব দেবে? ভারত প্রেম ও মৈত্রীর কথা বলতে পারে, কিন্তু সে কি নিজে ঐ সব নীতিকথা আচরণ করে? তাহলে ভারতে এত অসন্তোষ, সংঘর্ষ ও রক্তপাত কেন? সব চেয়ে বড় কথা— ভারতে এত দৈন্য ও অজ্ঞতা কেন? কেন সাধারণ মানুষ এখনও অনাহারে দিন কাটায়? কেন একদল মানুষকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়? অথচ এই ভারতবর্ষই না বলে—'সর্বভূতে ঈশ্বর'? কেন ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে এত বাগ্‌বিতণ্ডা, হানাহানি? অথচ এই দেশই না উঁচুগলায় বলে—'যত মত তত পথ'।

বাস্তবিক লজ্জায় মাথা হেঁট করা ছাড়া এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু এসব সমস্যা নূতন নয়। স্বামীজীর সময়েও ছিল। তবু তাঁর আশা, এ সব সমস্যার সমাধান হবে। সমাধানের পথও তিনি বলে দিয়ে গেছেন। এখন দরকার সকলের সমবেত ইচ্ছা ও চেষ্টা।

স্বামীজী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের জন্যে নয়, সর্বসাধারণের জন্যে। শিক্ষা মানে শুধু বই-এর বিদ্যা নয়, কারিগরী বিদ্যাও। নিজের পায়ে দাঁড়ানো। আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান। শরীর ও মনের বিকাশ। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার সাহস। চরিত্রবান মানুষ হওয়া। উচ্চতম চিন্তার সাথে সামিল হওয়া। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে গড়া। সবই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু না।

স্বামীজী এই শিক্ষাকেই শিক্ষা বলতেন। এই শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মুষ্টিমেয় লোক শিক্ষা লাভ করবে, আর অধিকাংশ লোক বঞ্চিত থাকবে—এ ব্যবস্থা দুঃখজনক। দেশের শক্তি জনসাধারণের মধ্যে। গণশক্তির উপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। এই শক্তিকে জাগানো সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা শুধু অবৈতনিক হলে যথেষ্ট হলো না, সহজলভ্য করতে হবে। প্রত্যেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আবার বলতেন: একজন পণ্ডিত ঘরের শিশুর জন্য যদি একজন শিক্ষক হলে চলে, তাহলে মূর্খের ঘরের শিশুর জন্যে দশজন শিক্ষকের প্রয়োজন।

শূদ্র-শক্তির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী, স্বামীজী বলতেন। শূদ্রশক্তি অর্থাৎ মেহনতি মানুষ। পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটবে। প্রথম ঘটবে হয় রাশিয়ায়, না হয় চীনে। ভারতেও শূদ্রশক্তির জাগরণ ঘটবে। দেশের শাসনভার তাদের হাতে আসবে। কিন্তু বিপ্লবের পথে আসুক, এ স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল না। বিপ্লব মানেই রক্তক্ষয়। অনেক সময় অর্থহীন রক্তক্ষয়। উচ্চ শ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াতে বলেছিলেন। নচেৎ বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হবে। সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হবে। বেদান্তের সাম্য। বিশেষ সুবিধা কারোর জন্যে নয়। শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ। ব্রাহ্মণকে শূদ্রে পরিণত করা নয়। বরং শূদ্রকে ব্রাহ্মণে পরিণত করা। শিক্ষা ও অবাধ

সুযোগের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ মানে উচ্চমনের মানুষ।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলো স্বামীজী। ধর্ম মানে অলৌকিকত্ব নয়, ধর্ম মানে নিজেকে গড়া, নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করা। সত্যিকারের 'মানুষ' হওয়া—সৎ, বুদ্ধিমান, কর্তব্যনিষ্ঠ, 'বহুজনহিতায়' স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত এমন মানুষ। এমন মানুষ যদি না হয়, তা হলে বিপ্লব ঘটুক, সমাজব্যবস্থা পাল্টাক আর যাই হোক, সব বৃথা। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে ঐশ্বর্য দেখেছেন, কিন্তু প্রকৃত মানুষ কম দেখেছেন। ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষ সৎ হয়, একথা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারত একদিন দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি মানবিক গুণের উন্নতি না ঘটে, তাহলে সুখী সমাজ সম্ভব হবে না। ঐহিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক গুণেরও প্রয়োজন। আজ মানুষ বাইরের প্রকৃতিকে জয় করেছে। কিন্তু অন্তরের প্রকৃতিকে জয় করতে পারে নি। তাই পৃথিবীতে এত বিরোধ, এত হিংসা। যেমন আলোর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়, তেমনই অহিংসার দ্বারা হিংসা, প্রেমের দ্বারা ঘৃণা দূর হয়। বেদান্তের মূল বক্তব্য—ঐক্য। সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত মানব এক।

আজ সমস্ত পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ে আতঙ্কিত। বিজ্ঞান আজ 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' হতে চলেছে। পৃথিবী কি করে রক্ষা পাবে? এইখানেই ভারতের ভূমিকা। ভারত বৈচিত্র্যময়। তবু ভারত ঐক্যে বিশ্বাসী। দ্বন্দ্ব একেবারে এড়িয়ে চলতে পারে না, তবে চেষ্টা করে। স্বামীজীর আশা ছিল—ভারত এক নূতন সমাজ গড়বে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হবে—সবার সমান মর্যাদা। এটা সম্ভব হবে যদি ঐহিক সম্পদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পদের মিলন ঘটে। বড় শহর, বড় অট্টালিকা, বড় রাস্তা, তার সঙ্গে বড় মাপের মানুষ। এই বড় মাপের মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ। এই দুই সম্পদের মিলনই স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে, ভারতকে আন্তর্জাতিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করবে।

## স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত

স্বামী আত্মস্থানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের আর্য-সংস্কৃতি এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। ইংরেজ-শাসনে বিদেশী সভ্যতার শিক্ষা-প্রভাবে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর নিজ সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। নিজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ভুলতে আরম্ভ করল, অপবাদ দিতে লাগল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ—তারই চাকচিক্যের মোহে নিজেরা জড়িয়ে পড়ল। এই সময় ভারতীয় সভ্যতাকে এই পাশ্চাত্য মোহ থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান ধর্ম আন্দোলনের ঢেউ একটার পর একটা আসতে লাগল। কিন্তু পুরোপুরিভাবে কেউ সফলকাম হলেন না। আর ঠিক এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠভূমি কলিকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে মা ভবতারিণীর কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্মের সর্বসাধনায় সিদ্ধ হয়ে যে-ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, প্রতিহত হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত। স্বামী বিবেকানন্দও এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়ে গেছেন। বর্তমান ভারতের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

বিবেকানন্দ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ভারতের অতীত গৌরবকে ভোলেননি। বরং ভারতবাসীরা এই মহিমময় সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে বলেই তাদের এত অধঃপতন, হীনম্মন্যতা। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল—"সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ভারতীয়তার ভিত্তি ভারতবর্ষের সব প্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।" তাই ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য-ভূমিতে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটানোর পরও স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল পবিত্র। বৈদিক ঋষিদের অনুভূত সত্য, মহাপুরুষদের বাণী, সাধু-সন্তদের উপদেশ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী বলেছেন, ধর্মই হল ভারতের মেরুদণ্ড। সেই আবহমানকাল হতে ভারত ধর্মকে আশ্রয় করে বড় হয়েছে। বলেছেন তিনি, "এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়?—ধর্মে।

সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।" "ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয়জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয়জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। ..এই জগতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়, প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে।" "এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।" "জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্‌ধক্‌ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তকে অন্নদান—এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।" রাজনীতিও করতে হবে ধর্মের মাধ্যমে। রাজনীতি মানুষের জীবনে সর্বস্ব হতে পারে না, অঙ্গমাত্র। ধর্মই মানুষের যথার্থতা আনতে পারে। ধার্মিক মানুষ যদি রাজনীতি করে, তবেই সেটি হবে সুষ্ঠু রাজনীতি। তখন রাজনীতি পঙ্কিল আবর্তে ডুবে যাবে না। তাই স্বামীজী বলেছেন, "তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয়-জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"

ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা সেইটি দূর করেছেন স্বামীজী। ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করা প্রকৃত-পক্ষে ধর্মধ্বংসী, আত্মঘাতী ও মানবিকতার বিপরীত পশুভাব। মানুষের মধ্যে দেবত্ব রয়েছে তার উন্মোচনকে ধর্ম বলছেন স্বামীজী। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সে মানুষের দ্বারা কোনমতেই মারামারি, হানাহানি, দ্বেষাদ্বেষি, পরস্পরের বিরোধিতা সম্ভব নয়। তখনই একতা আসবে। বিভেদ কখনই আসবে না। দেবত্ব উন্নীত মানুষ যদি রাজনীতি করে, তাহলে সে দেশকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে। সেই হবে প্রকৃত নাগরিক। রাজনীতি মানুষকে কোনমতেই যথার্থতার পথে নিয়ে যাবে না।

স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিকে নানান উন্নতি হয়েছে। গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে, শহর রূপান্তরিত হয়েছে নগরে, স্থাপিত হয়েছে বিরাট বিরাট কল-কারখানা, শিল্পালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, যন্ত্রালয়, প্রভূত চরম উৎকষতা লাভ করেছে বিজ্ঞানের, চিকিৎসার, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের বড় বড় পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরি করার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি, একেবারে নজর দেওয়া

হয়নি, কোন চিন্তা-ভাবনাও করা হয়নি। তাই ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হলেও মানুষের নৈতিকতা, মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানুষের সদ্‌গুণ—এগুলির অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে আজকে চতুর্দিকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, হানাহানি করছে পরস্পরের মধ্যে, অপরকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করতে একটু চিন্তা করে না, ট্রামে-ট্রেনে-বাসে টিকিট কাটে না, ঘুষ ছাড়া কাজ চলে না ইত্যাদি। তাই আমাদের নজর দিতে হবে মানুষ গড়ার দিকে।

বহু আগে স্বামীজী বারবার বলেছেন মানুষ গড়ার কথা। তাঁর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে আমরা এই মানুষ গড়ার কথা পাই। তাই স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" "এস, মানুষ হও।…নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাত কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না। সামনে এগিয়ে যাও।"

প্রকৃত মানুষ কখনও অপর মানুষকে খুন করতে পারে না। সে যদি দেখে যাকে খুন করছি, সে তার নিজেরই প্রতিরূপ, তাহলে সে কাকে খুন করবে? "প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো।" "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।"—বলেছেন স্বামীজী। তাই দেখি, স্বামীজীর সাধনা, তপস্যা, প্রব্রজ্যা—সবকিছুই মানুষকে নিয়েই রয়েছে।

মানুষ গড়তে হলে যথার্থ শিক্ষা চাই। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ তৈরি করা সম্ভব। "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহা-দিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।" "আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।…তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ

দরকার"—স্বামীজী বহু আগে আমাদের এ-কথা বলেছেন।

সেইসঙ্গে স্বামীজী নারী জাতির উন্নতি চেয়েছেন। নারী জাতির উন্নতি ছাড়া দেশ এগুতে পারবে না। বলেছেন তিনি, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।" "অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"

স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বামীজী আমাদের বারবার দেখিয়ে গেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নেই। এদুটি পরস্পরের পরিপূরক। দুটির মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে। স্বামীজী আলোচনা করে দেখিয়েছেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অন্তরের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস —এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে স্বামীজী কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। আধ্যাত্মিক মানুষের প্রকাশ হয় ব্যবহারিকে। যে মানুষ আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে তার দ্বারা কোন অকল্যাণকর কাজ হতে পারে না। সে সমাজে শুধুমাত্র কল্যাণকর কাজেই ব্যাপৃত হয়। সমাজের মধ্যে যত বেশি আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা হবে, ততই সমাজের মঙ্গল।

স্বামীজী অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সর্বপ্রযত্নে অনুকরণ করতে বলেছেন। সাবধান করে তিনি বলেছেন, "আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।··· অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।"

স্বামীজী শুধুমাত্র ভারতের ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির। তিনি যেমন ভারতের কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন বিশ্বের কথা! তিনি কোন গোষ্ঠীতে, দেশের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাই তাঁর মুখেই শুনতে পাই—"আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র।" One World (এক বিশ্ব)।

সর্বশেষে বলি, ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভব।

ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের বিরোধ মিটবে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের সমাপ্তি ঘটবে। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশি শক্তিমান নিশ্চয় নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সংহতির পটভূমি, পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই।...মানুষের মধ্যে প্রেরণা জাগাবার জন্য সবচেয়ে বেশি বেগসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না।" তবেই আমরা বলতে পারব—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

# বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ধর্ম সমাজ, রাষ্ট্র—মননের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ প্রভাব প্রায়শঃই একতরফা নয়, অনেকটা অন্যান্য সম্পর্কের মতো। বিশেষতঃ একটা জাতি যখন নানাবিধ পরস্পরবিরোধী পূর্বহেতুর মধ্য দিয়ে যায় তখন তার মানস-সংস্থানের ভূচিত্রাবলী যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? একচক্ষু রণজিৎ সিংহ নাকি ভাবী ভারতের মানচিত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন, "সব লাল হো যায়েগা।" ভূগোলের প্রতি একথা প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু কালের সঙ্গে যে মনের যোগ, তা কখনও একরঙা থাকতে পারে না। বহু বর্ণের বিচিত্র বিলাস মানুষের মনের যেমন ধর্ম, তেমনি একটা জাতিরও মনের কথা। ধর্মতন্ত্রই হোক, আর কর্মতন্ত্রই হোক—বায়ুমণ্ডলের চাপ এড়িয়ে কোন তন্ত্রসাধনই চলতে পারে না। তা নইলে বেদান্তকেশরী বৈরাগ্যব্রতী স্বামী বিবেকানন্দ নিরন্ন ভারতবাসীর মধ্যে নারায়ণকে খুঁজবেন কেন, কেনই-বা প্রাণায়াম-নিদিধ্যাসন ছেড়ে মানবহিতে আত্মদানের জন্য ব্যাকুল হবেন?

ভারতবর্ষে সনাতন কাল থেকে ধর্মোপাসনা, সাধকজীবন এবং কর্মোদ্যোগ—ইহজীবনের সঙ্গে সবসময়ে এর ঐক্য ধরা যায় নি, বা সাধকেরা ধর্ম ও কর্মকে একসূত্রে গাঁথতে চান নি। প্রতিদিনের অপরাবিদ্যালব্ধ শিশ্নোদরপরায়ণতা ও পরাবিদ্যালব্ধ মোক্ষের মধ্যে যোগ ঘটাতে গেল, সমানুপাত রক্ষা করতে হলে রাজর্ষি জনকের মতো হতে হবে; সংসার, ইহজীবন, প্রত্যক্ষকে পরিত্যাগ না করে, তাকে অবলম্বন করেই মায়া-তিমির অতিক্রম করতে হবে। এটাই আর্যধর্মের যথার্থ আদর্শ। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, এই দুইয়ের মধ্যে যাঁরা যথার্থ ভারসাম্য রাখতে পারেন, তাঁরা সংখ্যায় 'কোটিকে গোটিক'। তার ওপর আবার জীবনপলাতক বৌদ্ধধর্মের সর্ববৈনাশিক নাস্তিক্যবাদ—এর ফলে উত্তরকালে ভারতবর্ষে জীবন-বিমুখ অনীহবাদ সাধকদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হয়। যিনি পরাবিদ্যার অনুশীলন করবেন তাঁকে অপরাবিদ্যা বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে; মোক্ষসাধনার জন্য গৃহকোটর ত্যাগ করে গিরিকন্দর অবলম্বন করতে হবে, এবং যৌবনেই বান-প্রস্থের পথে প্রস্থান করতে হবে,—এক কথায় বস্তু-তন্মাত্রজাত জগৎ-প্রপঞ্চ এবং অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ, এ সম্পর্কে এদেশের সনাতন-পন্থীদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বোধ হয় এ যুগে সর্বপ্রথম রামমোহন ভোগায়তন ও দেবায়তনের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন; তিনি বেদান্তনুমোদিত ব্রহ্মবাদকে একেশ্বরবাদ বলে প্রচার করেছেন, সেই আদর্শ নিজে গ্রহণ করে অপরকে পৌরাণিক

আদর্শ ও দেববাদ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন, নিজেও ঘোরতর পুরাণ-বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মোক্ষের জগৎ ও কর্মের জগৎকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করেন নি। ধর্ম ও তদাত্মক আচরণবাদ তাঁর অনুশীলনের বস্তু হলেও পার্থিব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি প্রখর। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শান্ত-সোম্পদ ভক্তির মধ্যে ডুবে ছিলেন বটে, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে বিষয়ী না হলেও উদাসীন ছিলেন না। পিতার পর্বতপ্রমাণ ঋণ-শোধেই তাঁর বাস্তববুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। আর বিদ্যাসাগরের কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি কোন বাক্‌পথাতীত পারমার্থিক সত্তায় বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ। পুরোপুরি স্টোয়িক, এপিকিউরিয়ান বা পজিটিভবাদী বিদ্যাসাগর ইহজীবন নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, পরকালের কথা ভাবার অবকাশ পান নি।

উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সামাজিক আচার-আচরণ-আন্দোলন মৃত্তিকা স্পর্শ করতে শুরু করেছে। জর্জ টমসনের শিষ্যের দল প্রথমে রাজনীতিকে ভেবেছিলেন আদর্শলোকের সুবর্ণগোলক। যে বিশ্বাস শিথিল হল সিপাহি বিদ্রোহ ও ইংরেজের পশুবৎ নির্মম ব্যবহারের ফলে। ব্রাহ্মসমাজের ঘরভেদী গণ্ডগোলের ফলে ধর্মনীতিগত নির্বিকল্প চিন্তাপ্রণালী বাধ্য হয়েই কঠোর বাস্তবের কলকোলাহলের মধ্যে নেমে এল, এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে সামাজিক আন্দোলনও ক্রমে ক্রমে ছায়াময় ধূম্রজ্যোতিসলিল পূর্ণ কলেবর ত্যাগ করে জীবনসমস্যা-সংক্ষুব্ধ কঠিন কায়া গ্রহণ করল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে তার পরবর্তী কালে বাঙালীর ভাবরসমুগ্ধ মন বায়বীয় চিন্তাপ্রণালী ত্যাগ করে কঠোর জীবনবাদের সম্মুখীন হয়েছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনার ক্ষেত্র, বিশেষতঃ ধর্মালোচনা ও সমাজতত্ত্বে সহনশীল বাস্তববুদ্ধির দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত অনুশীলনধর্ম বাস্তব মানবধর্মেরই নামান্তরমাত্র। এই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যটির জীবন, ধ্যানধর্ম ও কর্ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনিও বর্তমান বিশ্বের বাস্তববোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই কাষায়বস্ত্র ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করেছিলেন, দুর্বল মানুষকে বাস্তব দৃষ্টিকোণের দিক থেকেই বিচার করেছেন, পরাবিদ্যাকে অপরাবিদ্যার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

## ২

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের কর্ম, ধ্যান ও সাধনাকে আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং ব্যবহারিতাকে পরিহার না করে উপযোগকে যোগক্ষেমের সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন। তাই বর্তমান ভারতের জীবনধর্মে তাঁর প্রভাব সুদৃঢ় প্রত্যয়রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। জীবন ও পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর এমন একটা বাস্তবনিষ্ঠ সংযক্তি ছিল যে, ঋষিকেশের গুহাগহ্বরে ধ্যান-সাধনায় আত্মমগ্ন না হয়ে, তিনি দুঃখক্ষুব্ধ জনসংঘের মধ্যে নেমে এসেছিলেন, সর্বহিতের জন্য ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রশ্ন করা, সংশয়

প্রকাশ করা, অটল সত্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা—সর্বোপরি সাড়ে তিনহাত উচ্চ মানবকে সৃষ্টিচক্রের চক্রধারী বলে স্বীকার করা, এ হল উনিশ শতকী আধুনিকতার ধারা। স্বামীজী গেরুয়া ধারণ করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব বিশ্বে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, উনিশ শতকের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই ধর্মাচার, কর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি—সব বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ, আশাময়, ক্রিয়াবান মত ব্যক্ত করেছেন; সেই মতানুযায়ী তিনি নিজে কর্মযোগের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন, সকলকে জীবনের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন, এবং বহুমুখীনতাকে পরিহার না করে তাকে জীবনের সঙ্গে মেলাবার উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক ভারতে তিনি দেবকুমার সৃষ্টি করতে চান নি, বলিষ্ঠ বীরাচারী মানুষই তাঁর আদর্শ। আধুনিক ভারতে এই তাঁর সর্বোত্তম দান।

বিবেকানন্দ বেদান্তকে ধ্যান ও ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, যে-বেদান্ত মূলতঃ অনীহ, বেদান্তরস্পর্শশূন্য, নিষ্ফল চেতনামাত্র। শংকরাচার্য-ব্যাখ্যাত বেদান্তসূত্রের প্রভাবে এদেশে ইহবিমুখী বৈরাগ্যসাধনা মানুষের পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সমগ্র সত্তার মূলকথা যদি ব্রহ্মতত্ত্ব হয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব হচ্ছে আপোষরফাহীন অন্বয়বাদ, এবং যে অন্বয়বাদ জীবের পৃথকসত্তাকে লোপ করে দেয়, ইন্দ্রিয়ময় জগৎপ্রত্যয়কে অধ্যাস ব্যতীত আর কিছু ভাবতে পারে না—তার দ্বারা আর যাই হোক, জীবসেবা চলে না। কারণ কুম্ভের মৃদাবরণ ভগ্ন হলে অপরিমেয় সমুদ্রজল ও কুম্ভগর্ভলীন গণ্ডুষ-পরিমেয় জল—কে কার পরিমাণ করবে? কিন্তু স্বামীজী যুগযুগব্যাপী ধর্মসাধনাকে এক অভূতপূর্ব উপযোগবাদের সোপানের ওপরে স্থাপন করেছেন। বেদান্ত তাঁকে বাস্তবজীবনে উদাসীন করে নি, দেহপিঞ্জরের মধ্যে বন্দী মানুষকে নিষ্কামভাবে জগৎহিতে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবকে শিব বলে microcosm ও macrocosm এর ভেদ ভুলিয়ে, ঘরের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে এবং ভীরুহৃদয়ে প্রচণ্ড পৌরুষ জাগিয়ে স্বামীজী বর্তমানকালের সঙ্গে বেদান্তকে সমন্বিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বেদান্ত ভারতীয় ধর্মজীবনকে অতি অবশ্যই ধারণ করে থাকবে।" (অনুবাদ)। এই বেদান্তের অর্থ—'Dynamic religion'। সেই প্রচণ্ড প্রাণবান ধর্ম, যা আধুনিক ভারতে তামসিকতা ও জাড্য দূর করে প্রাণসঞ্জীব মন্ত্র দান করবে সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্মরণীয়:

> শুধু বেদান্ত পড়ে কি হবে? আমাদের বাস্তবজীবনে বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বকে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতদিন ধরে অদ্বৈতবাদ বনেজঙ্গলে আর গিরিকন্দরে বন্দী হয়ে ছিল। আমি একে নির্জনতা থেকে বার করে নিয়ে আসব, আর প্রতিদিনের কর্মে ও বাস্তবজীবনে এর মহৎবাণীকে ছড়িয়ে দেব। অদ্বৈত-দুন্দুভি প্রতি গৃহকোণে ধ্বনিত হোক, পথেপ্রান্তরে, পাহাড়েপর্বতে অদ্বৈতবাণী বিচ্ছুরিত হোক। এস ভাই, আমাকে সাহায্য কর, কেবল কাজ করে যাও।
>
> (অনূদিত)

শিষ্য বললেন, "কিন্তু মশায়, ধ্যানসাধনার মধ্যে দিয়েই যে আমার মন অদ্বৈতানুভূতি

উপলব্ধি করতে চায়, কাজ-টাজ বড় একটা করতে মন চায় না !" তার উত্তরে স্বামীজী সিংহগর্জনে বলে উঠলেন :

কি ? জড়সমাধিতে হতজ্ঞান হয়ে থাকার কি দরকার ?…ধরে নিলাম, ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তোর মুক্তি হল। কিন্তু তাতে জগতের কি ? সারা দুনিয়ার লোককে মুক্তি এনে দিতে হবে। আমরা মায়ার জগতে দাবানল জ্বালিয়ে দেব। তবেই তুই অনন্ত সত্যসন্ধ হবি। সে সুখের নিবিড় উপলব্ধি, সে আকাশের মতো অসীম অনন্তবোধ—কে তার মাপ করতে পারে ? সে রকম মনের ভাব এলে তোর বাক্য হরে যাবে, নিজের নিজত্ব কোথায় ডুবে যাবে, তখন তুই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নিজেকে দেখবি, প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাবি। এই অনুভূতি এলে, জগতের সবাইকেই ভালবাসতে হবে, সকলের প্রতি অপরূপ প্রেম ও করুণার উদয় হবে। এর নাম যথার্থ বেদান্ত। (অনূদিত)

এই কথাটাই তিনি আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন :

কি জানি, এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ, তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না ! ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্যই তোদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর।

('স্বামিশিষ্যসংবাদ')

যথার্থ জ্ঞানলাভ হলে তখন মানুষের সমস্ত কর্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়ে দাঁড়ায় "আত্মজ্ঞানীর চলনবলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে।" এদিক থেকে তিনি বেদান্তকে 'জগদ্ধিতায়' অর্থে প্রয়োগ করে উনিশ শতকের হিউম্যানিজমকেই একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তা নইলে এরকম বলবেন কেন—"ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মবিতাবের পূজো চাই ; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।…ধর্মকথা শুনতে হলে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা লেকচার-টেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।" ('স্বামিশিষ্যসংবাদ')।

আধুনিক ভারতে অন্নদেবতার উজ্জীবন প্রয়োজন, প্রয়োজন মহাশূদ্রসঙ্ঘের, "যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে।" বেদান্তকে তিনি তাই আধুনিক ভারতের মানুষগড়ার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ইহকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনা একপ্রকার তামসিক স্বার্থপরতা ; কূটস্থ অবস্থা ও মূর্ছার মধ্যে তফাৎ কোথায়, যদি বিশ্বসংসারের হিতে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিতে না পারে ? তাই তিনি বলেছেন, "অন্নাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস ? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস। কর্ম-তৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথার কেউ কান দেবে না।"

('স্বামিশিষ্যসংবাদ')

('স্বামিশিষ্যসংবাদ')। এই হচ্ছে আধুনিকতার বাণী, বর্তমান ভারতের জীবনাদর্শ।

আধুনিকতার যে প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার মন্ত্রঘোষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানময় বিশ্বকে সত্য বলে চিনে নেওয়া, এবং ধর্মকর্ম—সমস্ত কিছুকে মানুষের বাস্তব জীবনের কল্যাণে প্রয়োগ করা—এক কথায় উপযোগবাদকে উপদ্রব বলে না মেনে তাকে বাস্তব জীবন ও মনের জীবনের সঙ্গে এক করে দেখার নব-সমন্বয়বাদই বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ। আধুনিক তামসিক ভারতে এ এক নতুন সত্ত্ববাদ, যার মূলে হচ্ছে প্রচণ্ড রাজসিকতা।

শুধু মানুষের শীলসদাচার নয়, ধর্মকর্ম নয়, আধুনিক ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাদেশিকতা—সমস্ত কিছুকে স্বামীজী আস্তিক্যধর্ম 'পজিটিভ' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জনতাকে এতটা ভালবাসা, নিরন্নের মুখে অন্ন দিয়ে তার দেহটাকে বাঁচানো, শিক্ষা সম্প্রসারিত করে জড় মনকে চেতন করে তোলা, ব্যষ্টির হাত থেকে সমষ্টির উদ্ধার—এই হল বিবেকানন্দের ঐহিক সাধনা। বেদান্তবাদী সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী উনিশ শতকের শেষাংশে যে পরিমাণ মানবপ্রেম প্রচার করেছেন, অনুশীলন করেছেন, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিদিনের জীবন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং বার বার যেভাবে তামসিক বৈরাগ্য ত্যাগ করে রাজসিক জীবনভোগের কথা বলেছেন, তাতে যেকোন এপিকিউরিয়ান চমকে উঠবেন। স্বামিজীর সেই উক্তি—"এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যেসব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক-আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা।" ('স্বামিশিষ সংবাদ')। এই রজোগুণের অর্থ—বাস্তব মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। মিলের হিতবাদ, কোঁতের ধ্রুববাদ, রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁসের মানবতাবাদ, আধুনিক ঐতিহাসিক বিকাশ-বিবর্তনবাদ—সবকিছুর সদুত্তর মিলবে এই রজোগুণের প্রাধান্যে। তাই তিনি জাত-পাতের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে চেয়েছেন, ব্রাহ্মণ্য-অধ্যুষিত হিন্দুসমাজে মহাশূদ্রতন্ত্রের অধিরোহণ কামনা করেছেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিকতার শুধু প্রচারক নন, বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আধুনিকতাকেই সমগ্র জাতির পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্বাদেশিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক অসংখ্য উক্তির মধ্যে এই আধুনিক মনোভাব যে-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে ভাবী ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে গণ্য করতে হয়। শ্রেণীসংস্কার, সমাজসংস্কার, জাতীয় ভাবের উদ্দীপন, মানুষগড়ার শিক্ষাপ্রচার,—সর্বোপরি নিষ্কাম, নির্মোহ, স্বার্থলেশহীন উদার মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা—আধুনিক যুগে ও জীবনে তাঁর এই দান একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্য। বিশ শতকের গোড়া থেকে পরবর্তীকালে যাঁরা রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চা করেছেন, সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁরা কোন-না-কোন দিক দিয়ে এই বীর সন্ন্যাসীর উক্তি, আদর্শ ও আচরণের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর বাণীর দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তাঁরা স্বামীজীর পত্রাবলী, 'স্বামিশিষ্যসংবাদ' এবং 'কলম্বো-আলমোড়া' বক্তৃতাবলী পাঠ করে দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হতেন।[১] সে যুগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা বিপ্লবীদের বাড়ী খানাতল্লাসী করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের গ্রন্থ আবিষ্কার করতেন। সেইজন্য স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর সরকারী 'কৃপাদৃষ্টি' পড়েছিল—সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেবেন কিনা তাও ভাবছিলেন।[২] বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন সভ্যতা, নতুন মানবজীবনবাদ পাশ্চাত্যদেশ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে গোটা পৃথিবীকেই প্লাবিত করবে। আগামী দিনের মানবমুক্তির কথা তিনি প্রত্যক্ষকরেছিলেন। তিনি বলেছেন ;

> জনসাধারণ-অর্জিত নতুন প্রভাত ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যজগতে আসতে আরম্ভ করেছে, সোস্যালিজ্‌ম্‌, এ্যানার্কিজ্‌ম্‌, নিহিলিজ্‌ম্‌—এরকম আরও কত দল এসেছে, এরা নতুন সমাজবিপ্লবের ধ্বজা ধরে আসছে।
>
> ( অনূদিত )

তিনি এই জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমাদের অন্তরে সংগ্রামী স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।" এই মূক, বেদনাহত জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বলেছেন ঃ

> তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাখো লাখো নিরন্ন মানুষ, যারা প্রাচীন যুগের দেবঋষিদের বংশধর, তারা আজ কোথায় নেমে গেছে ? তোমরা কি অনুভব কর, কোটী কোটী মানুষ আজও উপোস করে মরে, যুগ যুগ ধরে তারা উপোস করেই আসছে। ভেবে দেখেছ কি, গোটা দেশের ওপরেই অজ্ঞতা-কুশিক্ষার কালো মেঘ নেমে এসেছে ? এতে কি তোমাদের প্রাণমন অশান্ত হয়ে উঠে না ? এতেও কি তোমরা নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে থাকতে পার ? মানুষের এই অধঃপতন তোমাদের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে স্পন্দিত হয় না ? এতে তোমরা পাগল হয়ে যাও না ? তোমরা এমনই অধঃপতনের বশীভূত হয়েছ যে, নামধাম, স্ত্রীপুত্র-সংসার—এমন কি নিজের দেহটাকে পর্যন্ত ভুলে বসে আছ।
>
> ( অনূদিত )

মনুষ্যত্বের এই অপমানই যে সর্ববিধ অকল্যাণের কারণ, সে সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন ঃ

> তাদের ছুঁলে পাপ হয়, তাদের সঙ্গে বসলে অপবিত্র হতে হয়, নৈরাশ্যের

১. B. N. Datta—Swami Vivekananda—Patriot and Prophet, P 218

২. ঐ, পৃঃ ২১৪

মধ্যে তাদের জন্ম—সারা জীবন তারা সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই থাকবে। ফলে তারা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে—যতদূর মানুষ নামতে পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ কোথায় আছে, যেখানে মানুষ গোরু-ছাগলের সঙ্গে থাকে, ঘুমোয় ?…এর জন্য কে দায়ী ? আমরাই। উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নাও। অপর পক্ষের দিকে কাদা ছোঁড়ার দরকার নেই। তোমরা নিজের দোষেই কষ্ট পাও। তোমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ—তোমরা নিজেরাই। (অনূদিত)

জনসাধারণকে তমোগুণের জড়ত্ব থেকে কি ভাবে রক্ষা করতে হবে ? এ সম্বন্ধেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

তাদের ধর্মের ওপরে হাত না দিয়ে তাদের তুলে ধরতে হবে।…সাধারণ মানুষই ভারতের একমাত্র আশাভরসা স্থল। ওপরের সমাজের লোকেরা দেহ ও মনের দিক থেকে জাহান্নামে গেছে।… জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছি, সমস্ত দোষত্রুটির এই হচ্ছে একমাত্র কারণ। সেই স্বাতন্ত্র্য আবার দেশবাসীকে ফিরিয়ে দিতে হবে, সাধারণ লোককে তুলে ধরতে হবে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান—সকলেই এই সাধারণ মানুষগুলোকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে। তোমরা দেশের ছোট জাতকে ঘৃণা করে এসেছ, ফলে সারা দুনিয়ার থেকে তোমরা নিজেরাই ঘৃণার পাত্র হয়েছ। (অনূদিত)

আধুনিক ভারতের মনুষ্যত্বহীন দরিদ্রসমাজের কথা এতটা প্রেম, আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোন্ দেশনেতা বলেছেন, অনুভব করেছেন জানি না। মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবজীবনের ওপর যথাযথ মূল্য আরোপ করে, রাষ্ট্র ও সমাজে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবতাবাদ, জনকল্যাণবাদ প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরের শতকের সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতারা সেই পথ ধরেই চলেছেন, কিন্তু নিষ্কামভাবে জনসেবা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বলে তাঁরা দরিদ্র মানুষের মনে প্রচণ্ড আত্মশক্তি জাগাতে পারেননি। তাই একচক্ষু হরিণের মতো আমাদের সমাজসংস্কার বা রাষ্ট্রান্দোলন একপেশে হয়ে গেছে ; স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভোটপত্রের সাহায্যে যেখানে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা অধিকার করাই একমাত্র রাজনীতি, এবং সে ভোটভিক্ষু রাজনীতির জন্যই যেখানে সমাজ-আন্দোলনের ক্রিয়াকৌশল অবলম্বিত হয়, সেখানে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূরপরাহত।

তাঁর সবচেয়ে বড় কথা—জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে, তবেই শূদ্রাধর্মেরা নব দ্বিজ-সংস্কার লাভ করবে। অন্ন আর শিক্ষা—একটা দেহকে বাঁচায়, আর-একটা মনকে ক্রিয়াশীল করে, এই দুয়ের অভাবের নাম তামসিকতা। এই ঘোর তামসিকতা থেকে ভারতকে বাঁচাতে হলে একদল নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রয়োজন ; স্বামীজী সেইজন্যই সারা ভারতে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গড়তে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, আধুনিক ভারতকে মনুষ্যত্ব দিতে হলে, পার্থিব

জীবন ও ইহমুখী সভ্যতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে ; য়ুরোপের কাছ থেকে সেই ধরণের শিক্ষাদীক্ষা নিতে হবে, যাতে তমোগুণকে সত্ত্বগুণ বলে ভুল না হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ

> আমি কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি বিশেষ মন দিইনি বটে। আমার কাজ অন্যত্র। কিন্তু আমিও এই আন্দোলনকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি, এর আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। নানা জাতের সংমিশ্রণে ভারতে এক-জাতীয়তা গড়ে উঠছে ··। এর দ্বারা ভারতের ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। যাকে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবধারা বলি, এর উদ্দেশ্য তাই। এখন শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, এর পর বাধ্যতামূলক শিক্ষা সকলের মধ্যে প্রসারিত হবে। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, তাকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে ; ভারতের অন্তরে প্রচুর শক্তি নিহিত আছে, আর তাকেই জাগাতে হবে। (অনূদিত)

এখানে লক্ষণীয়, রাজনীতি, শিক্ষা, গণতন্ত্র—এসবের মূল লক্ষ্য যে, ভারতের ঐক্য-সাধন, জনসাধারণের কল্যাণ, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়। ভারতকে কি আবার সেই বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে ফিরে যেতে হবে ? না সেকালের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে জন্মগত জাতির বেড়া তৈরি করতে হবে ? তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের অবনত শিরে স্বীকার্য ঃ

> এখন তা হলে কি বরণীয় ? আমাদের যা নেই, পূর্বপুরুষদেরও যা ছিল না, যবনদের যা প্রচুর পরিমাণে আছে, তাই আমাদের চাই। তা হচ্ছে স্পন্দমান জীবনপ্রবাহ, যা য়ুরোপের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ঘন ঘন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা জগৎকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলছে। আমরা সেই শক্তি চাই, স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ চাই, আত্মবিশ্বাস চাই, চাই অটল সাহস, চাই কর্মে নিপুণতা, চাই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ঐক্যবোধ, আর চাই নব নব উন্নতির জন্য আকণ্ঠ পিপাসা—অতীতের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে নির্ভর করে থাকার ইচ্ছেকে মাঝে মাঝে পরখ করে বাজিয়ে দেখতে হবে। আমরা চাই সেই বিশাল আত্মদৃষ্টি, যা আমাদের সামনের দিকে অগ্রবর্তী করবে অপরিমেয়ভাবে। আমরা চাই কর্মোদ্যোগী রজোগুণের তীব্রতা, এই রজোগুণ যেন আমাদের শিরায় শিরায় আপদমস্তক সঞ্চরণ করে। (অনূদিত)

এই হচ্ছে নব ভারতের প্রবুদ্ধ বাণী। উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজসংস্কারক, রাজনীতিক, দেশসেবক—সকলেই এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত যুগ-চিন্তা, আধুনিক ভারতের 'চরৈবেতি' বাণী, বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় স্বামীজীর ধ্যান ও কর্মে অধিকতর প্রচণ্ডবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজ-আন্দোলন শ্রেণীভেদের প্রতি বৈমুখ্য, সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি বিদ্রূপ, দরিদ্র মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, মানুষগড়া শিক্ষারীতির প্রচলন, আর জীবকে

শিববোধে বিশ্বহিতে আত্মসমর্থন—স্বামীজীর জীবনের এই হল ধ্রুব আদর্শ ; ভাবী ভারতের পথ-নির্দেশ। আধুনিক ভারতের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর মতামত ও বক্তব্যকে এইভাবে কয়েকটি সূত্রে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে ঃ

১। বেদান্ত অনুশীলনের দ্বারা ক্ষুদ্রত্ব বর্জন, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা, নিষ্কামভাবে বিশ্বহিতে প্রাণ সমর্পণ।

২। য়ুরোপীয় জীবনবাদী আদর্শকে বর্জন না করে ঐতিহাসিক স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনমার্গ বলে গ্রহণ—শূন্য জঠরে তত্ত্বচিন্তার চেয়ে পূর্ণ জঠরে জীবনভোগ অনেক বেশি কার্যকর।

৩। ব্রাহ্মণশাসিত ও অভিজ্ঞাত-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার স্থানে সর্বমানবের, ...ষতঃ শূদ্র-পারিয়া-হেক্টরের কল্যাণ সাধন ও প্রাধান্য বিস্তার।

৪। তমোগুণের বদলে রজোগুণের দ্বারা কর্মোদ্যম সৃষ্টি।

৫। শিক্ষাদীক্ষা সমাজসংস্কারকে ভারতের সমষ্টির কল্যাণে নিয়োগ।

৬। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির মূল কথা—মানবতা। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মনুষ্যত্ব সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আজকের দিনে স্বামীজীর আদর্শ ভারতবর্ষের যথার্থ জীবনাদর্শ বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, পাশ্চাত্য জাতির বলিষ্ঠ জীবনবাদকে গ্রহণ করা অপরাধ নয়। তা বলে তিনি 'হেডোনিস্ট্' ছিলেন না ; ঐহিক সুখসাধনাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য তা তিনি বলেন নি। পরহিতে আত্মদান তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ঐহিকতা বর্জন করে কোন জাতি কখনও বেঁচে থাকতে পারে না, এই হচ্ছে তাঁর উক্তির তাৎপর্য। ঐহিকতার অর্থ—মানবতা, ঐহিক সুখের অর্থ বার্হস্পত্য বীজমন্ত্র নয়। স্বামীজীর জীবন ও সাধনা মানবিক কল্যাণময় ঐহিকতার অনুকূল—এবং উনিশ শতকের ভারতবর্ষ সে আদর্শ কথঞ্চিৎ স্বীকার করেছিল। অধুনাতন ভারতভূমি কোন্ মন্ত্র জপ করছে জানি না ; কিন্তু তা যদি স্বামীজী-নির্দিষ্ট জীবনসাধনা না হয়, তা হলে এ জাতিকে বিনষ্টির হাত থেকে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও বাঁচাতে পারবেন না। ইদানীংকালের দেশনেতাদের বোল পাল্টালেও ভোল পাল্টায় নি। পাশ্চাত্য জীবনের পরিদূষণ, আর প্রাচ্যদেশের বৈরাগ্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা-অহিংসার জয়োচ্চারণ, ধ্বজদণ্ডে 'সত্যমেব জয়তে' লিখে নিষ্কামভাবে অনৃতাচার করা—আজকের ভারতের কর্মকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না, নিকৃষ্ট কর্মেরও সুরাহা হয় না। এই স্বার্থপর, নির্বীর্য, পরস্পর-বিবদমান, সংশয়াকুল, ভীরু ভারতবাসীর স্থলে স্বামীজী যে ভারতকে জাগাতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে যথার্থ বীর ভারত, বাস্তব ভারত, সুস্থ, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ভারত। তাঁর ভারতবর্ষ শূন্য বৈরাগ্যের ঝুলি খুঁজে চিন্তামণি আবিষ্কারের চেষ্টা করে না। দেহকে স্বীকার করে, বস্তুপ্রত্যয়কে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে, প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে জীবসেবার ব্রত নিয়ে নেমে এসে বর্তমান ভারতের যে আদর্শ স্বামীজী দেখিয়েছেন—আসন্ন মহামারীর মধ্যে সেই

পথই একমাত্র জীবনের পথ, শ্রেয়োপথ। সেই শক্তি, ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগ্য ও হিতবাদী মনুষ্যত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা ক্লীবতা আশ্রয় করেছি, বিনাশের সাধনা করে চলেছি, তাই আজ বায়ুকোণে প্রলয়ের দেবতা জেগে উঠেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায়ঃ

রে মৃত ভারত,<br>
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

# স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারতবর্ষ

প্রেমবল্লভ সেন

ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি। মিশর, ব্যাবিলন, সুমের, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলির সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের সভ্যতা। কালক্রমে এই সকল সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারা আধুনিক যুগেও জীবন্তভাবে প্রবহমান। অর্থাৎ ভারতের সভ্যতার সুপ্রাচীনতার সহিত যুক্ত হইয়াছিল ইহার তুলনাহীন ধারাবাহিকতা। আধুনিক ভারতের সভ্যতা বহিরঙ্গে ও অন্তর্লোকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা হইতে বহুলাংশে পৃথক হইলেও আধুনিক ভারতের জীবনের মূল ভিত্তি সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ভারতের উদ্ভবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে উহার সহিত প্রাচীন ভারতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি ফুটিয়া ওঠে।

বর্তমান ভারতে আধুনিক জীবনধারার উৎপত্তি অবশ্যই ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকালে। কারণ সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রের ব্যবহারে ইওরোপে যে নূতন জীবন যাত্রার প্রবর্তন হইয়াছিল, ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে তাহা ভারতবর্ষেও প্রবেশ করে। রেল, টেলিগ্রাফ ও ইওরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ভারতবর্ষের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বিপুলভাবে পরিবর্তিত করে। ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে একদিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও অপরদিকে বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, ভারতের জীবনধারাকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল শাসক ইংরেজের নিজস্ব ধর্ম — খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-অভিযান। ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও খ্রীষ্টধর্ম বিস্তারের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগে ভারতীয় জীবনে একটি সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আধুনিক ভারতবর্ষের প্রধান সঙ্কট একটি সমস্যার রূপ ধরিয়া প্রকট হয়— আধুনিক ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতীয় ধারাবাহিকতার সহিত যোগ রক্ষা করিবে কিংবা আধুনিক ভারতবর্ষ সমাজে, রাষ্ট্রে, সংস্কৃতির জগতে, শিল্পে, সাহিত্যে ও ধর্মজীবনে প্রাচীন ভারতকে বর্জন করিয়া ইওরোপকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে? ভারত-বাসীর মনোজগতে এই জিজ্ঞাসা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই আলোড়নের ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারা এবং তাহার ধারক ও বাহক ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠতা অবশ্যস্বীকার্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই মনোভাব হইতে এক দিকে হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের যাত্রারম্ভ। অপরদিকে কেরী ও ডাফ প্রমুখ খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের খ্রীষ্টধর্ম বিস্তারের উৎসাহ-উদ্দীপনার সূত্রপাত। এই দুই ধারার মধ্যবর্তী রামমোহনের

ব্রাহ্ম আন্দোলন। সেই আন্দোলন প্রাচীন ভারত হইতে কেবলমাত্র উপনিষদ শাস্ত্রকে দ্বিধাগ্রস্ত স্বীকৃতি দিয়া যাত্রা শুরু করিলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে। ভারতে ইংরেজ উপনিবেশের পত্তনও ভারতবাসীর সর্ববিধ উন্নতির অপরিহার্য উপায়রূপে গণ্য হয়। বাস্তবক্ষেত্রে ইওরোপের অনুগমনকে রামমোহন কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষ সৃজনের ক্ষেত্রে ভারতের চিরন্তন চিন্তাধারা ও জীবন সাধনার যথার্থ অনুবর্তন তিনি করেন নাই।

প্রাচীন সমাজের অনুবর্তী ভারতীয়গণ অবশ্য প্রচলিত আচার-আচরণকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রাচীনপন্থী সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ রামমোহনবিরোধী মনোভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন করিয়া দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আধুনিক যুগের জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, রামমোহনবিরোধী হইয়াও এ কথা তাঁহারা বুঝিতেন।

আধুনিক ভারতবর্ষের জন্মলগ্নের প্রাক্কালে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এইরূপে একটি বিপরীত আদর্শ সংঘাতময় বিরুদ্ধ পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' ও খ্রীষ্টীয় প্রচারকের দল আধুনিক ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন ভারতকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজ ইওরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা ও খ্রীষ্টধর্মের আপেক্ষিক উৎকর্ষকে সম্পূর্ণ শিরোধার্য করেন এবং প্রাচীন ভারত হইতে সামান্য কিছু ভাবকে (উপনিষদের ব্রহ্মবাদ) গ্রহণপূর্বক আধুনিক ভারত গঠনে সচেষ্ট হন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতে আধুনিক জীবনের পক্ষে ইংরেজ শাসন অপরিহার্য ছিল। ভারতবর্ষ যে একদা স্বাধীন ছিল এবং দীর্ঘকাল ভারতবাসী যে বিশেষ গৌরব ও দক্ষতার সহিত রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিচালনা করিয়াছিল—এ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল না। অতএব ইংরেজ প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়া ইংরেজের নিকট আবেদন-নিবেদনের নীতিকেই তাঁহারা জাতীয় জীবনের মূলনীতি বলিয়া গণ্য করিতেন। এই মনোভাবই রামমোহনের ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের দাবীর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সামাজিক জীবনে রক্ষণশীলতাকে অনুসরণ করিলেও ভারতবাসী যে স্বদেশ শাসনে সক্ষম, এ বিষয়ে আস্থাশীল ছিলেন না। আর কেশবচন্দ্র তো ভারত শাসনে ইংরেজের অধিকারকে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসের অত্যাবশ্যক অঙ্গে (article of creed) পরিণত করিয়াছিলেন!

ইংরেজ আনুগত্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার গৌরব—এই দুইটির অনুসরণে আধুনিক ভারতের জীবন-গঠন প্রয়াসের প্রতি প্রথম একটি প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। ভারতবর্ষ যথার্থ জাতীয়তাবাদের পথেই আধুনিক ভারতকে গঠন করিবে, এই আদর্শই ভারতে নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, "বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নব জাগরণের পুরোহিত। ১৮৭৩-৭৪

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ছিল এই জাগরণের মুখপত্র।"[১]

'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিম সঙ্গতভাবে আক্ষেপ করিয়াছেন যে আধুনিক ভারতবাসী গীতা ছাড়িয়া Mill পড়ে, কালিদাসের পরিবর্তে Swinburn পাঠ করে এবং উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পকে উপেক্ষা করিয়া সাহেব বাড়ির চীনা পুতুল হাঁ করিয়া দেখে। বঙ্কিম স্বয়ং সে যুগে Mill এর শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং ইওরোপীয় সভ্যতা ও ইংরেজী সাহিত্যের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক আদর্শের মহিমাকে তিনি অভ্রান্তভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও জীবন ধারার উৎকর্ষের সহিত ইওরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তার সম্মিলনে আধুনিক ভারত গড়িয়া উঠিবে এই ধারণা তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্কিম চিন্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা। কিন্তু গীতার মাত্র প্রথম চার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াই বঙ্কিমকে ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইতে হয়। ফলে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়ের পূর্ণ চিত্রটি দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমের ভাবপ্রচারক্ষেত্র বাংলা সাহিত্যের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর সে যুগে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা অবশ্যই বিরাট ছিল না।

সেজন্য সমগ্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা করিয়াছিল এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের যথার্থ মূল্যায়ন ও সার্থক সমন্বয়ের অবিসংবাদিত প্রবক্তার জন্য। সেই যুগস্রষ্টা অদ্বিতীয় প্রবক্তার আবির্ভাব হইল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। সেই Orator by Divine Right স্বদেশী ও বিদেশী উভয় সমাজকেই ভারতবর্ষের চিরন্তন মহিমা ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ধ্রুব চেতনা দান করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বদেশীর ভ্রান্তি ও বিদেশীর ঘৃণা উভয়ই দূর হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘাতের যুগে যখন ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনকে কোন্ পথে পরিচালিত করিবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন স্বামী দয়ানন্দের নেতৃত্বে আর্য সমাজেরও উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগে ভারতীয় পথেই চলিতে হইবে, ইওরোপের পথে নহে—এই ভাবধারার বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ। বিপিনচন্দ্র নির্ভুলভাবে ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন—আর্যসমাজ বিশ্বাস করিত যে সমাজ সংস্কার অথবা ধর্ম আন্দোলন—কোন বিষয়েই ভারতবর্ষের ব্রাহ্ম দৃষ্টির অনুসরণে ইওরোপের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। বৈদিক ভারতই সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার উভয় ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক হইতে পারে। কিন্তু আর্য সমাজের জাতীয় মনোভাবে একটি মাত্রাতিরিক্ত পাশ্চাত্য বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছিল। বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে ভারতের পক্ষে ইওরোপের নিকট শিক্ষণীয় অনেক কিছুই ছিল —এ কথা বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ বুঝিতেন এবং বলিতেও দ্বিধা করিতেন না।

১. *Memories of my Life and Times,* Bipin Chandra Pal, p. 183

আধুনিক ভারতীয় জীবনযাত্রায় ইওরোপের নিকট পাঠগ্রহণ অপরিহার্য ছিল। পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য বিরোধিতা নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপনই সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় সেই লক্ষ্যই আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় মন্ত্রের প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা যে বিবেকানন্দ তাহার প্রমাণ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য জগতে পদার্পণ। তাঁহার পূর্বে রামমোহন ও কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথমে রামমোহন ও তৎপরে কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ সম্মানলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিপিনচন্দ্রের উক্তি তাঁহাদের সহিত বিবেকানন্দের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে—'This ( Vivekananda's Mission ) was practically our first foreign mission··· Keshub's message was really the message of a reformed unitarian Christianity. So also was the message which Protap Chandra Mazumdar delivered to his British and American audiences. Neither Keshub nor Protap Chandra were in intimate touch with the ancient thought and realizations of their own people Hinduism as they knew it, had no claims to either superior ethics or deep spirituality. It was all practically idolatry and polytheism and caste. This was in those days the universal judgment of Europe and America on the religion of the Hindus. Vivekananda first offered a challenge to this universal British and American estimate of his national religion.—'[২] স্বামী) বিবেকানন্দের প্রচারকার্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সর্বপ্রথম বৈদেশিক প্রচার। কেশবচন্দ্রের প্রচারকে একপ্রকার সুসংস্কৃত ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টমতমাত্র বলাচলে। বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রোতাদের সম্মুখে প্রদত্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ভাষণও অনুরূপ। কেশব অথবা প্রতাপ তাহাদের স্বদেশবাসীর সুপ্রাচীন ভাবধারা এবং উপলব্ধিগুলির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নাই। হিন্দুধর্ম বলিতে তাহার উচ্চাঙ্গের নৈতিকতা অথবা গভীর আধ্যাত্মিকতা কোনটাই বুঝিতেন না। বাস্তবিক উহা ছিল পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরবাদ ও জাতিপ্রথামাত্র। তদানীন্তন যুগে ইওরোপ ও আমেরিকার হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা ছিল ঐরূপ। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এই ধারণার প্রথম প্রতিবাদ স্বামী বিবেকানন্দই করিয়াছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রচারকরূপে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—'From the days of Raja Ram Mohun Roy the Brahmo Samaj had received the paternal

---

২ *Memories of my Life and Times*, p. 586-87

sympathy of British and American unitarians,'[৩]

—রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্ম সমাজ বৃটিশ ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদের পিতৃসুলভ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। বিপিনচন্দ্র কেশবচন্দ্রের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকে রামমোহনের ইংল্যাণ্ড গমনের পরিবর্তে 'The first professedly Indian mission to England' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে '…the Raja's English visit had little or no influence… upon the consciousness of the Indian people themselves,'[৪]—রাজার ইংল্যাণ্ডগমন ভারতীয় জনমানসে কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। এ প্রসঙ্গে আলোচনাস্থলে বিপিনচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে কেশবের ইংল্যাণ্ডে গমন প্রথম ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে আত্মগৌরব জাগ্রত করিয়াছিল। কিন্তু কেশবের যে বাগ্মিতা ইংরেজ জনসাধারণ ও ইংরেজ পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহার বিষয়বস্তু কি ছিল? 'Jesus Christ : Europe and Asia'তেই তাহার বিবরণ রহিয়াছে। এইভাবে যে বিখ্যাত ভারতীয়গণ বিবেকানন্দের পূর্বে বহির্ভারতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বিদেশে ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি প্রচারে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। কারণ সভ্যজগৎকে যে ভারতের দিবার মতো কিছু আছে তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। যিনি পরবর্তী জীবনে ভারতীয় ভাবধারা প্রচারে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের পূর্বে ইংল্যাণ্ড গমন করিলেও তাঁহার সেই যাত্রা তাঁহার ব্যক্তিগত ইংল্যাণ্ডভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্য লাভ করে নাই। ১৮৭৮ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ইওরোপযাত্রী রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগৎ ও জীবনকে দেখিলেও পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। অর্থাৎ মানব-সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে বাণীবিতরণের অধিকার লাভ করিতে তখনও তাঁহার বিলম্ব আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য জগতে প্রথম পদার্পণ যে বিরাট আলোড়ন ও ভারত মহিমার অভূতপূর্ব স্বীকৃতির ইতিহাস রচনা করিয়াছিল তাহা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনই অবিস্মরণীয়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোর ধর্মমহাসভায় অপরিচিত ও সহায়-সম্বলহীন এক ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসীরূপে বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিবেকানন্দের অভাবনীয় আবির্ভাব। সেই বিপুল জনসমাগমে বিশ্বের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশে প্রথম বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ একটি অলৌকিক কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 'New York Herald', 'New York Tribune' প্রমুখ বিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, হিরাম্ ম্যাক্সিম্, হ্যারিয়েট্ মনরো, অ্যানি বেশান্ত, ধর্মপাল প্রভৃতি সভাকক্ষে উপস্থিত মনীষিমণ্ডল সেই Cyclonic

৩. idid ,. p. 547
৪. idid ,. p 392

Hindu এবং Orator by Divine Right নামে বন্দিত বিবেকানন্দকে বিস্মিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারত সংস্কৃতির শ্রদ্ধাপ্লুত অনুশীলন ও আলোচনার অবিসংবাদিত অধিকার-স্বীকৃতি সেই দিন হইতেই লাভ হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে একদা যে ভারতবর্ষ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জ্ঞানসাধকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, শত শত শতাব্দীর ব্যবধানে এই প্রথম সেই ভারতবর্ষ পুনরায় পাশ্চাত্যজগতে দর্শন ও সংস্কৃতির মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইল। চিকাগো ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান, মারউইন মেরী স্নেল স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'Indian Mirror' পত্রিকায় পত্র লিখিয়াছিলেন—'Never before has so authoritative a representative of genuine Hinduism—as opposed to the emasculated and Anglicised versions of it so common in these days—been accessible to American inquirers.'[৫]—এই প্রথম প্রচলিত ভাবানুসারী দুর্বল ব্যাখ্যার পরিবর্তে হিন্দুধর্মের একজন বিশ্বস্ত প্রবক্তা আমেরিকান জিজ্ঞাসু মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের আত্মচেতনার এই গৌরব ও বিশ্বাস ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাণপ্রদ উপাদান।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'The Indian Mirror' পত্রিকায় আমেরিকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত স্বামীজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে মানবজাতির ঐক্যসংস্থাপনে স্বামীজীর বাণী আমেরিকায় যে অপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য আছে। যথা: 'We believe such expositions as have been given by yourself and your collaborator the Swami Saradananda, have more than a mere speculative interest and utility—that they are of great ethical value in cementing the ties of friendship and brotherhood between distant peoples, and in helping us to realize that solidarity of human relationships ...'[৬]—আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের ব্যাখ্যা যাহা আপনি এবং আপনার সহকর্মী স্বামী সারদানন্দ করিয়াছেন, সেইগুলি কেবল চিন্তা ও উপযোগিতার খোরাকমাত্র নহে, তাহার একটি গভীর নৈতিক মূল্য আছে। কারণ তাহা দূর দূরান্তরের মানুষগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং সর্বধর্মের অনুমোদিত মানবিক সম্পর্কের ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

এই পত্রের স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন আমেরিকার প্রধান চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ। যেমন উইলিয়াম জেম্‌স্‌, সি. সি. এভারেট্‌, ডব্লু. এম্‌. জেম্‌স্‌, জন্‌ এইচ্‌. রাইট্‌,

৫ Vivekananda in Indian Newspapers, ed. S. P. Bose & S. B. Ghosh, p. 14

৬ *Vivekananda in Indian Newspaper*, p. 176

জোসায়া রয়েস্, জে. ই. লাফ্, এ. ও. লভ্জয়, রেচেল, কেণ্ট্ টেলর, সারা সি. বুল ও জন্ পি. ফক্স।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে শিক্ষার্থীর পরিবর্তে শিক্ষাগুরুর আসনে স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যজগতে বিবেকানন্দ যে ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার কেবল প্রথম নহে, প্রধান প্রচারক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে প্রকাশিত 'Brahmavadin' পত্রিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলরের এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায়—'I know of no philosophy that has a better right to be heard and to be studied by our own philosophers than the ancient philosophy of India, and more particularly the Vedanta philosophy ...'[৭]—ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন অপেক্ষা যোগ্যতর অন্য কোন দর্শনশাস্ত্র আছে বলিয়া আমার জানা নাই, যে শাস্ত্র আমাদের দার্শনিকদেরও শ্রবণযোগ্য ও পঠনীয়।

বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়াই ম্যাক্সমুলর ভারতাত্মার মূর্ত-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবনী ও উক্তি' পুস্তকটি রচনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী মানব-ঐক্যের উদ্বোধন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীরূপ উৎস হইতে সূচিত হইবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বিদেশীর ঘৃণাকে দূর করিয়া বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ভারত সম্বন্ধে স্বদেশীর ভ্রান্তি ও উপেক্ষাকেও তিনি অপসারিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁহার বিজয়ী বীরের অভিযান প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রা। তিনি ভারতের প্রতি প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে সেই ভারতীয় ভাবধারাকে দেশবাসী আপনাদের জীবনে কিরূপে প্রতিফলিত করিবে তাহারও নির্দেশ দেন। দক্ষিণ ভারতে দাঁড়াইয়া তিনি ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়াছেন যে এই সেই অমর আচার্যগণের পুণ্যভূমি। উত্তর পশ্চিম ভারতে গিয়া জাতীয় আত্মরক্ষা সংগ্রামের লীলাভূমি বলিয়া তাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন। আবার পূর্বভারতে তিনি দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন যে ইহা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মহাতীর্থ। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত যাত্রাপথে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী আধুনিক ভারতের নব বেদ। সেই বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভারতবাসী আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপকে চিনিতে পারিয়াছে ও আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। এই গৌরবময়

৭. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭

ভারতবর্ষকে রামমোহন উপেক্ষা করিয়াছেন, কেশব ইহার যথার্থ পরিচয় পান নাই এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ইহাকে ধিক্কার দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল না, আর বিদ্যাসাগর এই বিরাট জাতীয়তার কল্পনা করিতে পারেন নাই। আধুনিক ভারতবর্ষ, ভারতের চিরন্তন সত্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকাকে বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই চিনিতে পারিয়াছে।

## স্বামীজী—উপনিষদ ও ভারতসভ্যতা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি আলোকিত সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। কারণ বিশ্বমানবতার একজন পুণ্যত্রাতারূপে এ পথেই একমাত্র বিশ্বের ক্রমমুক্তি সম্ভব—একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। স্বামীজীর মতে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করাই হল মানুষ হয়ে ওঠার উপায়। তাই যুগপৎ চাই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মচিন্তা। "এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।...এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্য হইবে বর্তমান কালের মীমাংসা।"[১] অর্থাৎ সমগ্র মানবসভ্যতার দুইটি দিক—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী সভ্যতার যুগপৎ কর্ষণা ছাড়া বিশ্বের সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধন বিমোচনের আর কোনও দ্বিতীয় পন্থা নেই বলেই তিনি মনে করতেন। বস্তুতঃ "আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"[২] ইওরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কেও ঐ একই সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করলেন স্বামীজী: "জড়শক্তির লীলাভূমি ইওরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্মই ইওরোপকে রক্ষা করিবে।"[৩] যে সব কর্মপ্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাদের প্রত্যহের জীবনচর্যাকে সচ্ছল সমৃদ্ধ করে তোলে, অন্নময়, প্রাণময় এবং কিছুটা মনোময় কোষেরও পরিচর্যায় জীবন ও জীবিকার নানা উপাদান সংগ্রহ করে, যে সভ্যতা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে এইসব কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, রেডিও-টেলিভিশন, ওষুধ-পত্তর, নানা গৃহসামগ্রী, অন্ন-পান-প্রসাধন প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুসম্ভার এবং আরও সব আবিষ্কার—তাকে আমরা বলি কাত্যায়নী সভ্যতা এবং যা মানুষকে শুধুমাত্র শাশ্বত শান্তি ও অমৃতের অধিকার অর্জনে সহায়তা করে, যেসব কর্মপ্রয়াস, চিন্তাভাবনা, তপস্যা ও নিদিধ্যাসন সকল মানুষের জন্য সুধার সন্ধানে তৎপর, যা জীবনকে প্রসারিত করে দেয় বৃহতের অভিমুখে, যুক্ত করে আমাদের ব্যক্তি-চিত্তকে মহাজীবনের সঙ্গে, বিশাল বিশ্বের চিরন্তনী ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে—তার নাম মৈত্রেয়ী সভ্যতা। কিছুটা মনোময় এবং বাকীটা বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অপাবৃতি ঘটায় যেসব কর্মপ্রয়াস ও প্রচেষ্টা—তাই মৈত্রেয়ী সভ্যতা। এই মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী সভ্যতায়, স্বামীজীর ভাষায়—সকল মানুষের দেহ-মন-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল একদিন এই ভারতবর্ষে। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক কারণে, কিংবা বলা

যায়—জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই, কাত্যায়নী সভ্যতাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে, জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে—আত্মভ্রষ্ট হয়েছিলাম আমরা বৌদ্ধযুগের শেষে। তারপর বহুযুগ আমরা গভীরতম অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছিলাম। অথচ আমাদের দেশেরই এক মহীয়সী নারী উচ্চারণ করেছিলেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—যাতে আমি অমৃত পাব না—তা নিয়ে কী হবে আমার? আর একটি আশ্চর্য বালকের কণ্ঠেও আমরা শুনেছিলাম এই মৈত্রেয়ী সভ্যতার মহত্তম মর্মবাণী—'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—স্তূপীকৃত বিত্তের সঞ্চয়ে পরিতৃপ্তি নেই মানুষের,—সুখ নেই অতৃপ্ত আত্মার। এসব কথা সত্য সন্দেহ নেই, তবু বুঝি শেষ সত্য নয়—অন্ততঃ একালের দরিদ্র, ক্ষুধিত ভারতবর্ষের পক্ষে—খেটে-খাওয়া দুঃস্থ নিরন্ন আর্ত সাধারণ মানুষের প্রত্যহ জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষায়। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যুগগুরুর কণ্ঠের সেই অব্যর্থ অমোঘ জীবন-বাণী: "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" মনে পড়ে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই খালি পেটের সমস্যার কথা স্বামীজী তুলে ধরেছিলেন বিশ্বজনের কাছে, "প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব—ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।...আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম।"[৪] বস্তুতঃ এই খালি পেটের সমস্যার সমাধান ঘটে নি আজও। অথচ Development of ·H ; Head, Hand and Heart—অর্থাৎ মস্তিষ্ক, বাহু ও হৃদয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ঘটানো, উপনিষদোক্ত সেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সমাহার ও সমন্বয়ই যে সামগ্রিকভাবে মানবজীবনের একক অন্বিষ্ট ও পরম কাম্য—এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই জাগতিক জীবনের সমস্যার সমাধানে স্বামীজী ঘোষণা করলেন—"আমরা নির্বোধের মত জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? হাত বাড়াইয়া না পাইলে 'আঙুর টক' বলিব না তো কি!...বাহ্যসভ্যতা (material) আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকেদের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।"[৫] "আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"[৬] "আর আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার—যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের (Western Science) সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস হবে যার মূলমন্ত্র।"[৭]

পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীতে পঞ্চভূতের এই দেহকে অস্বীকার করে, কী ব্যক্তিগত, কী সমষ্টিগত ভাবে কোনদিক থেকেই মানুষের পক্ষে, মানবসমাজের পক্ষে, বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ঊর্ধ্বায়িত পুষ্পিত প্রত্যয়ে সমগ্র জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে তোলাই (life becoming) মানুষের জীবনসাধনা। তাই মানুষকে একই সঙ্গে জয় করতে হবে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে। বস্তুতঃ মানবসভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাসই বিধৃত হয়ে আছে এই দ্বৈত-প্রকৃতি বিজয়ের মধ্যে। "যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে। এই প্রকৃতির দুইটি রূপ—অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি।"[৮] কিন্তু আমরা সর্বশক্তিতে শুধুমাত্র অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার নামে দীর্ঘকাল উপাসনা করে এসেছি জাড্য ও তমোগুণের অন্তহীন তমসাকে, আশ্রয় গ্রহণ করেছি কাপুরুষতার ও ক্লৈব্যের। অথচ দুর্বলতাই পাপ। কাপুরুষের কোনোদিন মুক্তি নেই। স্বামীজীর নিজের ভাষায়—"আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?···এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে···তবে মানুষ।"[৯] এই জন্যেই উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রকে স্বামীজী বারবার তুলে ধরেছেন আমাদের কাছে—"উপনিষদ বলিতেছেন. হে মানব তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ বলিতেছেন—হে মানব, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও। বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোনো শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও।"[১০] দোহাই পার্থ ক্লীব হয়ো না! "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী নতুন ভারতবর্ষকে। সমগ্র জাতিকে রক্ষা করতে গিয়ে এসেছিলেন সর্বনাশা তমোগুণের প্রচ্ছন্ন গোপন ভয়াবহ আক্রমণ থেকে। সমবেত করতে চেয়েছিলেন জাতিকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বিজয়ী প্রাঙ্গণে। পাশ্চাত্য সভ্যতার রজোগুণকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন স্তিমিতশক্তি মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের শিরায় উপশিরায়। স্বামীজীর নিজের ভাষায়: "যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইওরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[১১] আবার বললেন, "শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে

রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা, আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ।"[১২] তা হলে পথ কি?—তাও বলে দিয়ে গেলেন—"তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো।"[১৩] পুনশ্চ "আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তি সঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এইসকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কিছু মহৎ তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে' তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লোহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে।… এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ—সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্রগুলি আবার অবলম্বন কর…জগতের মহত্তম সত্য সকল অতি সহজ। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্য সমূহ রহিয়াছে। ওই সত্য-সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।"[১৪]

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে স্বামীজী দেখেছেন কী দুঃখ, কী দৈন্য, কী যন্ত্রণা, কী নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছে সমগ্র দেশ, দেশের কোটী কোটী মানুষ! 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি' বহন করে করে আজ তারা হারাতে বসেছে তাদের মনুষ্যত্ববোধ। 'কোটী কোটী দেব ও ঋষির বংশধরগণ' আজ অশিক্ষায়, অনাহারে নির্যাতন-নিপীড়নে, শোষণে ও শাসনের জ্বালায় পশুতে পরিণত। ভারতবর্ষের এই ভয়ানক অধঃপতন, এই ভীষণ আক্ষয়ী রূপ প্রত্যক্ষ করে—বেদনাবিদ্ধ স্বামীজী উন্মাদের মতো ঘুরে মরেছেন সারা ভারতবর্ষ। একেবারে শূন্য পেটের চেয়ে এক টুকরো রুটিও ভাল—নির্মম এই প্রাণসত্য উপলব্ধি করে নিজেকে তিনি একজন সমাজতন্ত্রী বলেও ঘোষণা করেছিলেন। বুঝেছিলেন ঐহিক জীবনের সযত্ন পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি ছাড়া, প্রাত্যহিক দিনযাপনের মান উন্নত না করে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া জাতির মুক্তি নেই। তাই স্পষ্ট প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন—"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য-রূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।[১৫]

"আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম—এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির!⋯ ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচারে-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না"[১৬] "প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মত-মতান্তরে তো আর পেট ভবে না।"[৭]—সকল মানুষের সর্বাত্মিক বন্ধন মোচনের মহান্ রূপকারের কাছে তাই এই ভূখণ্ডের মানুষের ক্ষুধার ও দারিদ্র্যের বন্ধন, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বন্ধন, পরাধীনতার বন্ধন মোচনের প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই দুঃখ থেকে—এই দৈন্য-হাহাকার থেকে—দুঃসহ ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে—অবিরাম অসহায় এই অপমৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে হবে মানুষকে সব চেয়ে আগে। তাই ঐহিক জীবনের প্রগতি ও সমুন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের কিছুটা গ্রহণ না করে আমাদের উপায় নেই। বিশেষ করে পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করতে হবে আমাদের বুভুক্ষু বিপন্ন জনগণের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানে। জাতির নিদারুণ সংকটে—রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নেই স্বামীজী তাই 'মনুষ্যের দৈহিক মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে⋯তাহাদের সাহায্য করা', এবং 'শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ বর্ধনের' কাজকে মিশনের অবশ্য কৃত্যের অন্তর্গত করে নিলেন। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।' অতএব সমাজের সকল মানুষের শরীর রক্ষার প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখা এবং 'নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ'—মিশনের প্রথম কাজ বলে গণ্য করা হল এবং যেহেতু অন্নের ব্যবস্থা না করতে পারলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম হওয়া অসম্ভব, তাই ইতর জনসাধারণের জন্য অন্নাগমের নতুন উপায় উদ্ভাবন ও প্রদর্শন করা মিশনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম অবশ্য কর্তব্য বলে বিঘোষিত হল। তাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও বেলুড় মঠের পরিধির মধ্যে বেদান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার মহাবিদ্যালয় স্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্বামীজী।

যদিও জাতির প্রত্যহের বাস্তব জীবনের সম্যক্ সমুন্নতির জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কর্ষণা অবশ্যম্ভাবী এবং একান্ত প্রয়োজন মনে করেছিলেন স্বামীজী, তথাপি এই পাশ্চাত্য বিদ্যাগ্রহণের অন্য ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও সমান সচেতন ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিরঙ্গ জৌলুস ও তার চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্যের সর্বনাশা ও সর্বগ্রাসী প্রলোভনের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আকর্ষণ জাতিকে স্বধর্মচ্যুতির অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে পারে—এ আশংকা তাঁর ছিল।

অথচ তিনি একথাও জানতেন—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া

রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"[১৮] জানতেন ঐহিক কল্যাণের জন্য গুরুর ভাষায় জাতির 'খালি পেটের'—সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের অপরা বিদ্যা আয়ত্ত না করলেও চলছে না এবং পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু ভালো আছে যা আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আহরণ করা আবশ্যিক। কিন্তু পশ্চিমী বিদ্যার ঐ ভালোটুকু শিখতে গিয়ে আমাদের যে কি সর্বনাশ সংঘটিত হতে চলেছে—তা স্বামীজী তাঁর জীবদ্দশায় দেখে গিয়েছিলেন—"কি পাশের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি ?—না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভালো। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি ? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরি শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে ; চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।"[১৯] তাই পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে তখনই স্বামীজী তাঁর উদ্বেগ আর শঙ্কা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশও রেখে গেলেন—"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায় ; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায় ; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আ-সাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর ; তাহার নাশ কে করে ?"[২০]

এখানে 'ঘরের সম্পত্তি' এবং 'পিতৃধন' বলতে স্বামীজী ভারতের কাব্যসাহিত্য, শিল্প-সঙ্গীত, ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ও তার ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, ভাবনা চিন্তা, নীতি-নিয়ম প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন এবং স্বর্ণদীপ্ত অতীত ভারতবর্ষের গৌরবময় কীর্তিকাহিনী ও যশোগাথা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে বলে গেছেন। স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মবিশ্বাসহীন পরানুবাদ ও পরানুকরণপ্রিয় সমকালের পরাধীন ভারতবাসীদের কাছে স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে ও রচনায় সুপ্রাচীন মহান্ এই ভারতসংস্কৃতির উজ্জ্বলতম দিকগুলি বারবার তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি চেয়েছিলেন সামগ্রিক-ভাবে ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তম ভালবাসা সম্পাদিত হোক ভারতবাসীর। নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে, নিজের ঐতিহ্যকে আমরা যেন চিনতে শিখি, জানতে পারি আমাদের উজ্জ্বলতম অতীত ইতিহাসের সমগ্র পথরেখা। তা হলেই ভারতবর্ষ আবার ফিরে পাবে আপন বিলুপ্ত আত্মবিশ্বাস এবং মাথা তুলে আবার

স্বভূমিতে স্বাধিকারে দাঁড়াতে পারব আমরা। নিজের দেশের—স্বীয় মাতৃভূমির মহান উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই আর স্বধর্মভ্রষ্ট হবার ভয় থাকবে না। তখন আর বাইরে কোনও আকর্ষণেই প্রলুব্ধ হবার সম্ভাবনা বা আত্মবিক্রয় করার আশংকা থাকবে না। তখনই আবার আমরা স্বদেশ প্রতিমার অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে দেশ-দেশান্তর থেকে যথেচ্ছ আহরণ করে নিয়ে আসতে পারব দুমূল্য আভরণ-অলংকার-প্রসাধন প্রভৃতি। তাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্যদীপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিজেই এগিয়ে এলেন স্বামীজী। ইওরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে ভারতসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে ঘোষণা করলেন—"তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিন শত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অংকশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবস্বরূপ মিশ্রগণিত — হাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যা-দশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক ( Decimal ) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি।· সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রামসহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইউরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার ভিত্তি।·· সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য।···শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলংকার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত 'শর্করা' হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে।"[২১] আবার অন্যত্র বলেছেন—"গণিতের আরম্ভ এখানে। আজ পর্যন্ত তোমরা সংস্কৃত গণনানুযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে। আর নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানিত।"[২২]

ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ভাবসম্পদের সন্ধান, আবিষ্কার ও প্রচার করে

পুনর্বার বললেন: "দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই-সব কিছুরই পুণ্য-ভূমি।...আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তবরূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোনো শক্তির সাধ্য নাই —এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।"[২৩]

স্বীয় স্বদেশবাসীকে তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করে তুলতে কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় আবার স্বামীজী বললেন—"...in the first place we must try to keep our historically acquired character as a people"[২৪] ভারতবর্ষের এই ইতিহাস-ধৃত এবং ইতিহাসের ধারাপথে প্রবাহিত, বহুকালের ঐতিহ্যলালিত আমাদের এই জাতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে অগ্রগতির শিবিরে শিবিরে আমাদের সেই মহান ভূমিকা প্রতিষ্ঠাপিত করে এগিয়ে গেলেই মৃত্যুঞ্জয় ভারতবাসীর প্রাণশক্তি আবার পূর্ণতার ঐশ্বর্যে বিকশিত হয়ে উঠবে। আমাদের জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাসের মহত্তম বাণী শোনালেন স্বামীজী ভারতবাসীকে, "ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে কাজ রণবাদ্য বা সৈন্য-বাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।"[২৫]

বস্তুতঃ জাতিকে আত্মস্থ, স্থিতধী করবার প্রয়োজনেই 'পিতৃধন' বা 'ঘরের সম্পত্তি' সর্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে রাখার পথ-নির্দেশ। পিতার প্রভূত ধনসম্পদ ও সম্পত্তি থাকলে এবং সেই মহৎ ঐশ্বর্যের সন্ধান জানা থাকলে—ভাইয়েরা আর লোভে, হীন সংশয়ে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পরস্পর হানাহানি, মারামারি করে

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না, যেতে পারে না। অকারণ অর্থহীন আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয়ে বিনষ্টির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। ভারতবাসীরা যদি সত্যি তাদের 'ঘরের সম্পত্তি' ও 'পিতৃধনের' কথা জানত, পরিচয় থাকত তাদের ঐশ্বর্যদীপ্ত উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে, তা হলে সমগ্র দেশব্যাপী আজ এমন ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভেদবুদ্ধি আমাদের গ্রাস করতে পারত না। জাতীয় সংহতি এমন করে ধূল্যবলুণ্ঠিত হতে পারত না। 'ঘরের সম্পত্তি', 'পিতৃধনের' সম্যক্ পরিচিতির মধ্যেই নিহিত আছে জাতি হিসেবে, ভারতবাসী হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র মহামূল্য অভিজ্ঞান এবং এ কথাও এখানে স্মরণীয় যে আমাদের 'পিতৃধন' এবং 'ঘরের সম্পত্তি'র কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এমন দুর্মূল্য, দুর্লভ রত্ন-ভাণ্ডার, এমন বিশাল ঐশ্বর্য, এত বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত সম্পত্তি, এমন অশেষ পিতৃধনের উজ্জ্বল মহান্ উত্তরাধিকার পৃথিবীর মাটিতে খুব কম সন্তানের ভাগ্যেই জোটে। 'কিন্তু তা সবে, ( অবোধ আমরা ) অবহেলা করি, পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে'—নয় শুধু, স্বদেশেও 'ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।' ভারতবর্ষের বিগতপ্রায় সাড়ে সাতশ বছরের ইতিবৃত্ত এই অবরেণ্যকে বরণ করার, মৃগেন্দ্রকেশরী হয়েও শৃগালকে মিত্রভাবে সম্ভাষণের কলঙ্ক-কালিমায় অবলিপ্ত। কে আমরা? কোন মহাকুলে আমাদের জন্ম—তা ভুলে গেছি; নিজেদের সোনা ফেলে দিয়ে অপরের পরিত্যক্ত রাঙকেই সোনা ভেবে আঁচলে বাঁধার অক্ষম অন্ধ পরানুকরণপ্রিয়তা তাই অবক্ষয়ের অন্ধকার অতল আবর্তে নিক্ষেপ করেছে জাতিকে।

'ঘরের সম্পত্তি' ও 'পিতৃধন' বলতে স্বামীজী যদিও সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথাই বলে গেছেন, তথাপি উপনিষদকেই তিনি সব-সেরা সম্পত্তি, সবচেয়ে দুর্মূল্য পিতৃধন এবং বহুকালার্জিত রত্নরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে চিহ্নিত রে গেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে এবং অন্যান্য রচনাবলীতে বেদান্ত বা উপনিষদ সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য রেখে গেছেন স্বামীজী, তা অনুধ্যান করলে বোঝা যাবে যে উপনিষদকে স্বামীজী আমাদের জাতীয় জীবনের পরম দুর্লভ, অনন্য এক মহাসম্পদ এবং শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার বলে মনে করতেন এবং ভারতবাসী মাত্রেরই তার এই মহান্ উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় একান্ত জরুরী এবং অপরিহার্য বলে স্বামীজী বার বার ঘোষণা করে গেছেন। কারণ একই সঙ্গে ইহ-পরত্রের সম্যক্ সমুন্নতির পূর্ণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে উপনিষদের মধ্যে। 'খালি পেটে'র সমস্যার সমাধান এবং পঞ্চকোষাত্মক পরিপূর্ণ মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমোচনেরও পথ-নির্দেশ রয়েছে এখানে। জাতীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্য বিধানমাত্র নয়, পরন্তু জনজাগরণ, নারীমুক্তি, আমাদের জীবনের সর্বাত্মক বিকাশ ও সার্বিক পুনর্গঠনও একমাত্র এই উপনিষদের মহৎ জীবনদর্শন গ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। স্বধর্মভ্রষ্ট পরানুকরণকারী আমাদের অবক্ষয়ী, মুমূর্ষু জাতীয় জীবনের একক মৃত-সঞ্জীবনী এই উপনিষদ। আর শুধু জাতীয় জীবনেরই মাত্র নয়,

ঔপনিষদিক জীবনাদর্শ বা কর্মপরিণত বেদান্তবাদের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে বিশ্বৈক্য ও বিশ্বশান্তি রচনার একমাত্র চাবিকাঠি। আজকের স্বার্থমগ্ন, পরস্পর বিবদমান, হিংসায় ও হননে উন্মত্ত, নানা সংঘাত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আসন্ন তৃতীয় ও শেষ আণবিক মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিতে সমাসীন এই বিপন্ন, বিধ্বস্ত পৃথিবীরও একমাত্র মুক্তিদাতা ঐ ঔপনিষদিক বিশ্বৈক্যবোধ ও সর্বাস্তিত্ববাদের মহত্তম দর্শন। 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'ই শুধু নয়, 'বিপন্ন বসুধা বেঁধে দেব আমি'—একমাত্র বেদান্ত বা উপনিষদের 'কবির্মনীষী' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠই আজও এ কথা সমান প্রত্যয়ে উচ্চারণ করতে পারে, এবং আজকের পৃথিবীর আর্ত বিপন্ন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারে শান্তির প্রতিশ্রুতি ও পরম সান্ত্বনার বাণী। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রবক্তা স্বামীজীই নন, ম্যাক্সমুলার, শোপেনহাওয়ার থেকে শুরু করে এ কালে রোমাঁ রোলাঁ, ঈশারউড, উইল ডুর্যান্ড, আরনল্ড টয়েনবি পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, প্রজ্ঞাবান মনীষীবৃন্দ সকলেই ভারতের এই বেদান্তদর্শন বা উপনিষদের লোককল্যাণব্রতী মঙ্গল-সুসমাচারকে বিশ্বমানবতার একমাত্র এবং সমগ্র মানব সমাজের সমস্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর একমাত্র পরিত্রাণ বলে ঘোষণা করে গেছেন। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উপনিষদ প্রসঙ্গে বলেছেন; "উপনিষদ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।"[২৬] "গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।"[২৭] আর বিশ্রুত আরনল্ড টয়েনবি বলেছেন: ইতোমধ্যেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিশ্বসভ্যতায় যে অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল একদা পশ্চিমের আনুগত্যে ও আশীর্বাদে, সমূহ ধ্বংস ও আত্মবিনাশের হাত থেকে আজ মানবজাতিকে যদি রক্ষা পেতে হয় তা হলে সে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করতে হবে ভারতীয় আদর্শ ও জীবন-প্রত্যয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ্বজগৎ সংযুক্ত ও সম্মিলিত হতে পেরেছে, মানুষ পরস্পরের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য দক্ষতা, অসাধারণ এই নিপুণ প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র স্থান ও কালগত দূরত্বের অপসারণই ঘটায়নি, পরন্তু বিশ্বপৃথিবীর নর-নারীকে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে একই সঙ্গে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রেও সজ্জিত করেছে। এবং পরস্পরকে সামান্যতম ভাল না বেসে, পরস্পরকে বিন্দুমাত্র না জেনে জানার চেষ্টা না করে, সব মানুষ সেই ভয়াল, ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের দিকে উঁচিয়ে ধরে একেবারে একান্ত সান্নিধ্যে এসে গেছে। মানব-ইতিহাসের চূড়ান্ত এই সর্বনাশের মুহূর্তে, প্রত্যাসন্ন সমূহ বিনষ্টির অশুভ লগ্নে, সমগ্র মানবজাতির একমাত্র মুক্তির পথ—একমাত্র পরিত্রাণ ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগামী হওয়া—ভারত-পন্থার অনুসরণ করা। বলা বাহুল্য, এ মুক্তি-পথ মানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

প্রবর্তিত নব বেদান্তের সর্বত্র সার্বিক প্রযোজনা।

আর ভারততত্ত্ব বিশারদ ম্যাক্সমূলের বলছেন : আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—কোন্ আকাশের নীচে মানব-মনের নির্বাচিত গুণরাশি অপার উৎকর্ষের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কারা জীবনের কঠিনতম সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা করেছে এবং কোন কোন জীবন সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে—যা কাণ্ট, প্লেটো-পড়া ইওরোপীয় শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে—পুনর্বার আমি ভারতবর্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করব এবং আমি নিজেই যদি এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হই—কোন্ সাহিত্য থেকে সর্বাধিক প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ পেতে পারি—তা হলেও পুনর্বার আমি ভারতীয় সাহিত্যের নামই উচ্চারণ করব। আমাদের অন্তর জীবনকে অধিকতর নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে যে পথ-নির্দেশের আজ একান্ত প্রয়োজন, যে মহৎ সাহিত্যের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ আমাদের জীবনকে করবে আরও প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত, সর্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী, যার অমল সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আমাদের অন্তর্জীবন সত্যিকার মানবিক মর্যাদায় সমুত্তীর্ণ হতে পারবে…আমি কিন্তু একবাক্যে ঐ ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলব।

অতঃপর উপনিষদ সম্পর্কে স্বামীজীর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি অসাধারণ উক্তি এখানে উৎকলিত হচ্ছে ; "বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।" [৮]

"উপনিষদসমূহের লক্ষ্য একটি : কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতী'তি। আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় হইল চরম একত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আর বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[২৯]

"ভগবান ও মানুষে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?…অজ্ঞানেই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ অতিকষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রহ্ম রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান।

কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?—শক্তির জোরে ; এই বল-বীর্যই ধার্মিকতা. দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা **বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে**

পারে, তবে তাহা—'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসে। এখন প্রশ্ন—এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে? আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার তুমি উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতমতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই দ্বন্দ্ব করিতেছি।

'আত্মার সকল শক্তি নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে এবং পূর্বে তুমি নরনারী ও প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন তাহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না; তখন আর মনে হইবে না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্বলের উপর বলবানের জয়লাভের জন্য এ পৃথিবীতে নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে, এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান শিশুর মতো এখানে খেলিতেছেন, আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কাজের সহায়ক।"[৩০]

"উপনিষদসমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র…ইহার ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতা ভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"[৩১] "সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত উপনিষদ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও ইহাদের সবগুলিই উপনিষদ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা অন্য কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুমি যে নামেই নিজেকে অভিহিত কর না কেন, তোমার শাস্ত্র উপনিষদই প্রমাণস্বরূপ তোমার পিছনে রহিয়াছে।"[৩২] "ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ থেকে পাওয়া যায়…খাঁটি উপনিষদের তত্ত্ব ও নীতিই আমাদের ধর্ম, তাতে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদির কোন স্থান নাই।"[৩৩] "গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খ্রীষ্টান জগতে 'নিউ টেস্টামেন্টে'র মতো ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা এক শতেরও অধিক।"[৩৪] "প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫,০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেকার…উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত…সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন

সুসম্বন্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।"[৩৫]

"চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখও নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।"[৩৬]

"উপনিষদ বলেন—ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টি পাথর। সব কিছু ত্যাগ কর। সৃজনী শক্তি হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন স্বস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।"[৩৭]

"অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে।···উহাই ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকুই পাইতে পারে,···কিন্তু কর্ম পরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism) যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টি লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে···কখনও যদি কোনো ধর্মাবলম্বীগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণই আসিয়াছে; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার এবং ইসলামপন্থীগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নয়। এইজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্ম-পরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে।"[৩৮]

এইসব উধৃতি এবং উপনিষদ-বেদান্ত প্রসঙ্গে অন্যত্র স্বামীজীর অজস্র নানা বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আদর্শের সার্বিক সম্প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সমগ্র মানবজাতির সর্বার্থসাধক সমুন্নতি এবং সবরকম বিশেষ অধিকার-বিমুক্ত, যথার্থ সাম্যের শান্তিতে স্থিত 'এক বিশ্ব—এক রাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠাপনা সম্ভব—স্বামীজী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বিশেষ করে আধুনিক ভারতের সর্বাত্মক নব-নির্মাণ এবং বিশ্ব জুড়ে এক শান্তির সাম্রাজ্য স্থাপনার অনন্য কর্মযোজনায় উপনিষদ যেন আশ্চর্য একক এক ব্লু-প্রিন্ট। উপনিষদকে স্বামীজী এত মর্যাদা দিয়ে গেছেন এবং এজন্যই স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাবলী, চিঠিপত্র ও

রচনাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে এই উপনিষদ বা বেদান্তের ভাবাদর্শকে দেশে বিদেশে সমগ্র মানব সমাজে প্রচারের জন্য চিরকাল চেষ্টা করে গেছেন কারণ উপনিষদ বা বেদান্ত সকল মানবের—সমগ্র মানব সমাজের সকল সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান।

### আকর গ্রন্থ নির্দেশ


১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪
২ তদেব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭
৩ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১
৪ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯
৫ তদেব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯—১০
৬ তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩
৭ তদেব, পৃঃ ৪২৬
৮ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬
৯ তদেব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮০
১০ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯
১১ তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২
১২ তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪
১৩ তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২
১৪ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪—১৫
১৫ তদেব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০
১৬ তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩
১৭ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০
১৮ তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩
১৯ তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২
২০ তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩—৩৪
২১ তদেব, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯—১০
২২ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১২
২৩ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪—৭৫
২৪ Complete Works of Swami Vivekananda.
Ghed Vol. III. P. 195
২৫ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬

২৬ তদেব, পৃঃ ৮
২৭ তদেব, পৃঃ ৮
২৮ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮
২৯ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১
৩০ তদেব, পৃঃ ৫২-৫৩
৩১ তদেব, পৃঃ ২২৬
৩২ তদেব, পৃঃ ২১৯
৩৩ তদেব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১
৩৪ তদেব, পৃঃ ৪১৭ ৩৫ তদেব
৩৬ তদেব, পৃঃ ৪২৩
৩৭ তদেব, পৃঃ ৪২৪-২৫
৩৮ তদেব, পৃঃ ৩৮-৩৯

# স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের ভারতবর্ষ

হোসেনুর রহমান

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙল। পিছনের দিকে ফিরে দেখার মন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হল। স্মৃতি ও সত্তা নিয়ে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের দিকে তাকাল। এই পটপরিবর্তনে বাংলাদেশ এক বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালীর চেতনায় আর মনীষায়, প্রেমে আর প্রত্যয়ে 'মানুষ' নামক এক দুর্মর প্রাণ বহু পুরাতন কাল থেকে দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। বাঙালী স্বভাবতই যা সবাই করে, যা সবাই বলে তা প্রাণে ধারণ করে বেশি দিন চলতে পারে না। তার একটা নিজস্ব ধরন আছে। জীবনে সে বার বার ভেঙেছে প্রচলিত মত, গড়েছে নতুন পথ। কারণ যা কিছু আচার-সর্বস্ব, যা কিছু প্রাণহীন ঐতিহ্য তা যে বাঙালীর বুদ্ধিকে বার বার করেছে ক্ষত-বিক্ষত। শ্রীচৈতন্যদেব এই মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চৈতন্যদেব বাঙালীর মানস-প্রতিম। তিনি সংস্কর্তা, তিনি প্রফেট। তাঁর কণ্ঠে গান নবজাগরণের স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল রচনা করেছে। তাঁর হাতে ভাষা মানুষের প্রেমের ভাষায় পরিণতি নিয়েছে। চৈতন্যদেব আমাদের বোঝালেন ঃ ধর্ম মানুষের প্রাণের একান্ত বস্তু হতে পারে। ধর্ম মানুষকে মেলাতে পারে। ইতিপূর্বে কোন ধর্মপ্রাণ ধর্মপ্রচারক কি এমনভাবে ধর্মকে জীবনে আচরণ করে মূর্ত করে, এমন সহজ করে তুলতে পেরেছেন ? তাঁর ভাষার দুর্বল অনুকরণ ঃ ভজন সাধন বুঝিনে। বুঝিনে পরকাল, একাল, বুঝিনে স্বর্গ-নরক। কেবল বুঝি এই জীবনের নৈবেদ্য, বুঝি এই জীবনের জিজ্ঞাসা।

এই উপলব্ধি থেকে আমরা নিত্য নতুন পথ চলাকে জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে জেনেছি। এই ধর্মই বলেছে পথ চলাতেই আনন্দ ! আর আনন্দ যত পথের পাঁচালি রচনায়। তারপর ? সোনারতরী সাজিয়ে বিনত হয়ে বলতে পারা ঃ আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর এই পৃথিবী। এই বাঙালী ঘর-বাহির, অস্থি-মজ্জা, বুদ্ধি-বুদ্ধিহীনতা—সব কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। কারণ সে পরম আনন্দে জীবনের স্বরূপ সন্ধান করতে জীবনের সব বিসর্জন দিতে পেরেছে।

এই ঐতিহ্যহীন ঐতিহ্যের জীবনে এসে একদিন দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। হতে পারতেন তিনি বিপ্লবী, হতে পারতেন কবি কিংবা শিল্পী। হলেন সন্ন্যাসী। অথচ প্রতি মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করলেন পুরাকালের তথাকথিত ধর্মচর্চার ধারাকে। সর্বক্ষণ জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় চারিদিকের প্রাণহীন যুক্তিহীন সব ধর্ম-প্রস্তাবকে, সামাজিক নিবেদনকে আঘাত করে চললেন। চিকাগো শহর যখন মার্কিন মুল্লুকে খবর ছড়িয়ে দিলে—এখানে ধর্মমহাসভায় এসেছেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী, যিনি মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর ভাষণে নব নব তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যাঁর প্রতিটি বাক্য

উচ্চারণে জীবনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। যিনি মার্কিন মুল্লুককে চমকে দিয়ে জানালেন ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম কোন একটি পুস্তকে, কোন একটি ধর্মীয় আচরণে বাঁধা পড়েনি। ধর্মই আমাদের জীবনের উৎস। কিন্তু সে ধর্ম ইউরোপ আমেরিকা ধর্ম বলতে যা বোঝে তা থেকে বহু দূরে। সে ধর্ম হচ্ছেঃ কর্ম, প্রেম, মনীষা, মননশীলতা। লোভ, হিংসা প্রভৃতি মানুষের থাকবেই। কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিদিন বেঁচে থাকতে পারার এক অভিনব আধুনিক সার্বিক প্রস্তাব। কোন কিছুই যে যাবে না ফেলা। বিবেকানন্দ বাংলা দেশকে এক বাস্তব ধর্মাচরণের শিক্ষা দিলেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রাণোচ্ছল চলমান এক জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। আশ্চর্য, তিনি যখন ধর্ম আচরণ করেন তখন নিজের হাতে সব প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস নামক আচার-সর্বস্বতাকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন না। আঘাত করেন সেইসব রামকৃষ্ণ-ভক্তদের যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনেছেন, কিন্তু চোখ কান বন্ধ করে। বুদ্ধি ও মন নিয়ে, পরিবেশ ও প্রয়োজনের বিচার করে যাঁরা এই বিস্ময়কর আবির্ভাবকে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। তাদের তিনি অম্লানবদনে এই ভাষায় বলেছেনঃ "You think you understand Sri Ramakrishna better than myself! You think Jnana is dry knowledge to be attained by a desert path, killing out the tenderest faculties of the heart. Your Bhakti is sentimental nonsense which makes one impotent. You want to preach Ramakrishna as you have understood him, which is mighty little. Hands off! Who cares for your Ramakrishna? Who cares for your Bhakti and Mukti? Who cares what the Scriptures say? I will go to hell cheerfully a thousand times, if I can rouse my countrymen, immersed in Tamas (inertia), and make them stand on their own feet and be Men, inspired with the spirit of Karma-Yoga···"[১] (তোরা মনে করেছিস তোরা আমার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশি বুঝেছিস? তোরা মনে করিস জ্ঞানটা একটা শুকনো নীরস জিনিস; তার চর্চা করতে গেলে হৃদয়ের কোমল ভাবগুলিকে একেবারে গলা টিপে মারতে হবে। তোরা যাকে ভক্তি বলিস তা তো আসলে প্যানপ্যানানি আর আহাম্মকি যা মানুষকে ক্লীবে পরিণত করে। তোরা যেমন বুঝেছিস তেমনি রামকৃষ্ণকে প্রচার করতে চাস; কিন্তু তোদের বোঝার দৌড় আমার জানা আছে। সাবধান! কে তোদের রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোদের ভক্তি-মুক্তি চায়? কে শুনতে চায় তোদের শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের মানুষকে যারা ঘোর তমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাদের জাগাতে পারি, যদি তাদের নিজের পায়ে দাঁড়

করিয়ে দিয়ে তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি, যদি কর্মযোগের আদর্শে তাদের উদ্দীপ্ত করতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্রবার নরকে যেতে প্রস্তুত। )

অর্থাৎ বিবেকানন্দ তাঁর আচার্যের মানবতা, মানবসর্বস্ব বাণী জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষ যে ভক্তি, সাধনা, ঈশ্বর-উপলব্ধির কর্মক্রিয়ার চেয়ে অনেক বড় সেই কথাটি বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাঁর এমন অনেক স্পষ্ট ঘোষণা প্রমাণ করে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে কত ব্যস্ত ছিলেন। ঐসঙ্গে তিনি আধুনিক জগতেরও নাগরিক। এই এক আশ্চর্য প্রতিভা! রামমোহন ও বিবেকানন্দ সেই অন্ধকার ইতিহাসের রাত্রিতে পরাধীনতার মধ্যে সেই কেবল ভারতবর্ষের কথা ভাবলেন না। ভাবলেন এই গোটা পৃথিবীর কথা। 'এক পৃথিবীর' কথা। এই তো হল সবচেয়ে বড় আধুনিকতা। বিবেকানন্দের বেদান্ত, তাঁর কর্মযোগ সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে। কেবল ভারতবাসীর জন্যে নয়।

বলা বাহুল্য, ভারতবাসীর জন্য, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য, শূদ্র, চণ্ডাল ভারতবাসীর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা পর্বতপ্রমাণ। তাঁর যুক্তিতে আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ—সবাই ভারতবাসী। তাই এইসব মানুষকে গড়ে তুলতে হবে, স্বাধীনতার ধারণা এদের জীবনে এনে দিতে হবে। এদের ভাসিয়ে দিতে হবে এক মহান কর্মযজ্ঞের মধ্যে। এই ছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণী।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। তাঁর কণ্ঠে সেই ভাষা, তাঁর হৃদয়ে সেই ভাব, তাঁর আচরণে সেই উদারতা। তিনি দরিদ্রতম মানুষের প্রথমে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তা স্পষ্ট করে বলতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। আগে সেইসব মানুষের পেট ভরাও। তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর এবং সর্বোপরি তাদের শিক্ষায় উজ্জ্বল করে তোল। এই তিন অধ্যায়ের মহাভারত প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনে একমাত্র ধর্ম হোক—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সারা দেশে প্রচার করলেন অক্লেশে।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন আলাসিঙ্গাকে প্যারিস থেকে : "I am surprised you take so seriously the missionaries' nonsense···If the people in India want me to keep strictly to my Hindu diet, please tell them to send me a cook and money enough to keep him···" (তোমরা মিশনারিদের বাজে কথাগুলোর উপর এতটা গুরুত্ব দিচ্ছ দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।··· যদি ভারতের লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছুই ছোঁব না, তাহলে তাদের বলো তারা যেন আমাকে একজন রাঁধুনী এবং তাকে পুষবার প্রয়োজনীয় খরচও পাঠিয়ে দেয়।··· ) সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরের উক্তি আরও প্রণিধানযোগ্য। "I belong as much to India as to the world, no humbug about that, I have helped you all I could. You must now help yourselves. What country has any special claim on me? Am I any

nation's slave ?"[২] (আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। এ-সম্পর্কে বাজে যা-তা বকলে চলবে না। তোমাদের যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি—এখন তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি কোন জাতের ক্রীতদাস নাকি?) এবার মনে রাখা দরকার, দু-দুটো মহাযুদ্ধ তাঁকে তৈরি করেনি। মহাযুদ্ধের কথা এল কেন? বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের ধর্মযাজকদের পাল্টে দিয়েছে বহুল পরিমাণে। তাঁদের জীবনে আজ ধর্ম বলতে এক নতুন সমাজ-জিজ্ঞাসা বড় হয়ে উঠেছে। তাঁরা বলছেন: আর চার্চ বেল নয়। এখন সোশ্যাল অ্যাকশন। আরম্ভ হল আপসহীন লড়াই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, 'এক পৃথিবীর' পক্ষে। আর এসবই বিবেকানন্দ স্বচ্ছন্দে করে গেলেন বিগত শতাব্দীতে। এবং তাঁর করার ভাষা ভারতবর্ষের ভাষা, তাঁর চিন্তা ভারতবর্ষের মুনি-ঋষির চিন্তা। কেবল তিনি কালের যাত্রার ধ্বনিকে প্রকাশ করেছেন সেই ভাষায়। তিনি কালান্তরের পথিকৃৎ। আজ আমরা ১৯৯৯-তে বসে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। তাও কি সত্যি সত্যি সেই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করছি? যেমন করলেন বিবেকানন্দ? বিবেকানন্দ দ্বিধাহীন ভাষায় লিখলেন তাঁর গুরুভাইকে: "You must admit Mohammedan boys too, but you never tamper with their religion. The only thing you will have to do is to···teach them so that they may be moral, manly and devoted to doing good to others. This indeed is religion. Shelve your intricate philosophical speculations for the present."[৩] (মুসলমান ছেলেদেরও নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু কখনও তাদের ধর্ম নষ্ট করবে না।···তাদের শুধু একটা জিনিসই শেখাবে যাতে তারা নীতিপরায়ণ হয়, পৌরুষসম্পন্ন হয় এবং পরহিতব্রতে অনুরাগী হয়। এরই নাম ধর্ম। তোমাদের জটিল দর্শনের চচ্চড়ি এখন শিকেয় তুলে রাখ।)

আধুনিক মানুষ বিবেকানন্দ অনেক বেশি ব্যস্ত 'মানুষ' তৈরি নিয়ে। তিনি মানবতাবাদী সামাজিক মানুষ চান। হিন্দু চান না। মুসলমান চান না। সুস্থ, সবল, মুক্ত শিক্ষিত মানুষ চান। এবং এসব ভয়ানক চাওয়া তিনি চেয়েছেন যখন আধুনিক পৃথিবী আনুষ্ঠানিক ধর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা। আজ আমরা কি এইসব ভয়ানক চাওয়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি? পারিনি বলেই এসেছি বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবন ও কর্মকে স্মরণ করতে। কারণ আজই তাঁকে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। সবে আমাদের ঘুম আবার নাকি ভাঙছে। বরফ গলছে। এবার বোধ করি বিবেকানন্দ-চেতনা সার্বিক হতে বাধ্য। আগামীকালের ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষ বিবেকানন্দকে চাইবে সবচেয়ে বেশি করে—একথা আজ জোর করে বলা চলে।

## স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মানুষ। জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, যে কলকাতা একদিন ছিল গ্রাম, পরবর্তী যুগে এক বিরাট শিল্পনগরী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর তিনখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে যে ভবিষ্যতে নগরীর সূচনা হয়েছিল বিবেকানন্দের জন্মের সময়েই সেই নগরী ধীরে ধীরে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজে। একজন নগর সচেতন মানুষ প্রকৃত অর্থে নাগরিক মিসেস ওলিবুলকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি শিল্প সৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছেন। চিঠিতে লিখেছেন: "আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায় আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম বাংলো।"

তিনি আরও বললেন: "প্রাচীনকালে কোনো ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম। তবে এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।" সুতরাং এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মানুষ, যাঁর অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও দর্শন, তাঁর মধ্যে এই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি, গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, সামগ্রিকভাবে দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এত আকর্ষণ ও অনুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর এ-পথেরও দিশারী। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ-স্বরূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাণীগুলিকে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও বিচিত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাই স্বাভাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লোকসংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

দেশের যুবকদের প্রতি স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠের সেই আহ্বান: "ভারতমাতা

অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়…যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম, স্বদেশানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষা দ্বারা সর্বসাধারণের উন্নতির প্রচেষ্টা এ সমস্ত কিছুর মূলে আছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরই লোকায়ত শিক্ষারীতির প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানবসুহৃদ্ করে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি অন্ধকারে ভরা ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।

'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-প্রসূত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের লোকায়ত ঐতিহ্যটি সামগ্রিকভাবে স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষ কি ব্যাপক বিশাল বিচিত্র ও গভীর স্বামীজীর কথায় ঃ

"সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোনো স্থানে খুঁড়িলে মিলিবে। হ্রদবাসী বা নদীতীরবাসীরা নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্র-সজ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবিদের এখনো নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইহুদী, হূন, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি, মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যাহারা এখনো একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই সকল বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, নিম্নে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, আবার শান্ত হইতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২)

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মূলে যে অরণ্যচারী মৃগয়াজীবি কোল ভীল সাঁওতাল ইত্যাদি অষ্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমস্ত ভারত পর্যটন করে ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন বলেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ছিল। ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেন ঃ

"আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন স্বামীজীকে India শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা। কোন বিরাট গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তখন ভারতের সবকিছু তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছু জীবন্ত।" ( রেমিনিসেনস্, পৃঃ ১৫৭—৫৮ )

ভগিনী নিবেদিতাও একটি প্রবন্ধে স্বামীজীর চারিত্রিক বিশেষত্ব বুঝতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"দু-পয়সার ডাকটিকিট, সস্তার রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল ঐক্য থাকলেই তবে ঐ জিনিসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে—তার ফলে যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক।" ( The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work—হিন্দু পত্রিকা; ২৭ জুলাই ১৯০২ )

স্বামী বিবেকানন্দের এই লোকপ্রীতি ও লোক সাধারণ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতালাভ—এ সমস্ত কিছুই যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভগিনী নিবেদিতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সার্থক-ভাবে ধরা পড়েছে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার রূপটি স্বামীজী ভারত পর্যটনকালে কিভাবে অবলোকন করেছিলেন তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার অন্য একটি রচনার মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কৃষক, কৃষকের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে যুক্ত তা স্বামীজী কী গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও নিবেদিতার ভাষায় সার্থক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম ও সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময়ে তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরণের প্রবল প্রগাঢ় তদ্গত ভালবাসার রূপ

দেখেছি, এমনটি আর কখনও দেখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে ভাগে জমি চাষ হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, খুঁটিনাটি পর্যন্ত বাদ যেত না—যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য সারারাত উনুনে খিচুরি ফুটত, ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, তাঁর ি জের পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিই এই সব বর্ণনাকালে তাঁর নয়নকে উজ্জ্বল এবং কণ্ঠকে ভাবাবেগে কম্পিত করে তুলত। আমি সাধুদের কাছে শুনেছি, দরিদ্র কৃষকের কুটীরে যেমন অতিথিসেবা হয়, এমনটি আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে, কৃষকপত্নীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে দেবার জন্য অন্য কোন শয্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কুটীরের বাইরের দিকে মাটির চালার আশ্রয়ই তিনি মাথা গোঁজার জন্য দিতে পারতেন—সেই নারীই আবার বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি দাঁতন ও এক বাটি দুধ এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান এবং তৃপ্তিভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে পারেন।" (ঐ, পৃঃ ৩১—৯২)

নিবেদিতার চোখে স্বামীজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির ভারতবর্ষ নয়, একেবারে পায়ে হেঁটে গ্রাম-ভারতের জমির আলের ওপর দিয়ে কৃষকের কুটীরের পাশ দিয়ে, কখনও বা চাষবাসের কাজ দেখতে দেখতে, কখনও কৃষক রমণীর কুটীরে গৃহস্থালীর কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষ। একমাত্র স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনেই লোকায়ত ভারতবর্ষের গ্রাম-জীবনকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি সেখানকার মানুষকে ভালবেসেছিলেন। প্রকৃত দরিদ্র ভারতবর্ষ কি, চণ্ডাল ভারতবর্ষ কি, মূর্খ ভারতবর্ষ কি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অভিশাপ কোথায় লুকিয়ে আছে—দারিদ্র্যে অস্পৃশ্যতায় অজ্ঞান অন্ধকারে তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন চিঠিতে লিখছেন অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে; তাদের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারতবাসীর সংস্কার, কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যভিচার সমস্ত কিছু স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে বলছেন "মহা দঁক সামনেঃ সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্।" (পত্রাবলী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩)।

পদব্রজে ভারত পর্যটনের ফলস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধি আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও স্বামীজী যে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তার মূলে আত্মাটিকে, তার স্বরূপটিকে বাস্তবরূপে দেখবার

চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বোপরি আত্মসমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, এটা আজ সমস্ত ভারতবাসীর অনুধাবন করা দরকার।

ভারতবর্ষের অধোগতির যে কারণ স্বামীজী বিশ্লেষণ করেছেন একান্তভাবেই তা বাস্তব গবেষণা-প্রসূত। আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য বিবেকানন্দ সোচ্চারে বলেছেন যে, যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষের অপমান-অবজ্ঞা-লাঞ্ছনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, শোষণ আর অত্যাচার, ধর্মীয় আচারের ছলে নষ্টামি ও ব্যভিচার, ক্ষমতাশীলদের সুচতুর শোষণ—নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান ইত্যাদি—ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। তাই সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালীন সমাজের যে চিত্রখানি এঁকেছিলেন তা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী। রোষ-দৃপ্ত কিন্তু বেদনামথিত ভাষায় যখন তিনি বলেন ঃ

"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক ! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য !" ( ঐ, পৃঃ ১৫৫ ) তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃপতিত ও অন্তসারশূন্য রূপটি আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার ; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত ; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।" ( ঐ, পৃঃ ৩৭৪ )

তাঁর এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে অবলম্বন করেই এই ভারত আবার জাগ্রত হবে—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। তাই স্বামীজীর আহ্বান বাণী ঃ "যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India ( বর্তমান ভারত )—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" ( ঐ, পৃঃ ৩৭২ )

কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তৈরি হবে, কিভাবে দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা দূর হবে, অস্পৃশ্যতা অন্ধতা দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী তাঁর ভারত-উন্নয়নের স্বপ্নকে কিভাবে সার্থক করা যায়, বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে লিখছেন ঃ "দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্দি ঠাওরালুম—Cape Comorin ( কুমারিকা অন্তরীপে ) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics ( দর্শন ) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না ? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ; পাজী বেটারা

চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।" (ঐ, পৃঃ ১৫৬)

এর প্রতিকারকল্পে সন্ন্যাসী হিসাবে কি করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যে যে নেমে পড়া উচিৎ এবং তার দ্বারা কিভাবে লোকায়ত ভারতবর্ষের কিছুটা মঙ্গলসাধন হতে পারে সে-সম্পর্কেও স্বামীজী বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন ঃ

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে ?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।" (ঐ, পৃঃ ১৫৬)

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তাতে তিনি মনে করতেন যে, চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষাব যত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, চণ্ডালের ক্ষেত্রে দশজনের আবশ্যক হবে। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের লোকায়ত মানুষ ও জীবন পর্যালোচনা করে তিনি এই মহৎ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন ঃ "The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God." (ঐ, পৃঃ ৩৭৩)

লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্বামীজীর অনন্য মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আগামী দিনের দারিদ্র্যনিপীড়িত অজ্ঞ মানুষেরাই হবে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য আরাধ্য—মানুষের সেবাই হবে ভগবানের আরাধনা।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ধর্ম-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

"ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন—তত্ত্ব মাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশি কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তাঁর পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে। এরূপে এখনো যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্বানুভব বা প্রেমই এর সাধন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

## বিবেকানন্দের ধর্মমত

ভবানীগোপাল সান্যাল

পৃথিবীতে যত প্রাচীন ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তারা মানুষের যুক্তিবাদ থেকে সৃষ্ট নয়। বরং যা অতিপ্রাকৃত তা থেকে তাদের সৃষ্টি।

ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মতবাদ আছে। প্রথমটি হলো পূজা আর দ্বিতীয়টি হলে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা। মিশর, ব্যাবিলন ও চীনে পূর্বপুরুষদের পূজার প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি অতিরিক্ত আত্মা বাস করে। মানুষের দেহের যখন মৃত্যু ঘটে তখন এই অতিরিক্ত আত্মা মুক্তিলাভ করে। তার মৃত্যু ঘটে না। এইজন্য সে দেশের নিয়ম পিরামিডের মধ্যে মৃতদেহকে রক্ষা করা। ব্যাবিলনবাসীদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে এই অতিরিক্ত আত্মার জন্য খাদ্য-পানীয় দিতে হয়। চীন দেশেও অনুরূপ রীতি ছিল এবং নিঃসন্দেহে তা পূর্বপুরুষদের পূজার প্রমাণ দেয়।

ভারতবর্ষে এই জাতীয় বিশ্বাস মোঙ্গল বা কিরাত জাতির মধ্যে একদা প্রচলিত ছিল। বোড়ো-কাছারীদের মধ্যে কবর দেওয়া ও মৃতদেহ ভস্মীভূত করবার রীতি ছিল। সাধারণতঃ নদীর তীরে কবর দেওয়া হতো। নদীর ওপারে স্থান নির্বাচন করলে একটি দড়ি বা সুতো জলের উপর দিয়ে বা নীচ ফিরে টেনে যাওয়া হতো। এর উদ্দেশ্য যাতে জিওয়া বা আত্মা তার বাড়ী-ঘরে আসতে পারে। কবর দেবার পরে একটি ফাঁপা নলখাগড়া বা ঘাসের একটি শীষ মাটির উপর থেকে মৃতের নাক পর্যন্ত দেওয়া হতো যাতে মৃতের আত্মা নিঃশ্বাস নিতে পারে। কবরের চারপাশে চারিটি খুঁটি পোঁতা হতো, যাতে অন্য কোন মৃতের আত্মা সেখানে না আসতে পারে। কবরের উপরে একটি খোড়ো ঘর তোলা হতো, যাতে শীত-বৃষ্টিতে আত্মার কোন কষ্ট না হয়। গারোরা এই ঘরের নাম দেয় দোলাঙ্। তারা ঐ চার খুঁটির সঙ্গে ধানের শীষ বেঁধে রাখে। একটি খুঁটি থেকে একটি ঝুড়ির মধ্যে চাল, জউ ( মদ ), কাপড়-চোপড় ও ফল রেখে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আত্মার আনন্দ ও মুক্তির জন্য চাল, তরকারি, মদ একমাস পর্যন্ত দেওয়া হয়। গারোদের মধ্যে একটি বড় উৎসব হচ্ছে ওয়াংগালা। গারোদের গ্রাম নূতন সাজে সজ্জিত হয় ও এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন তখন লক্ষ্য করা হয়। এই উৎসবের সময়ে পূর্বোক্ত সকল দোলাঙ্ পুড়িয়ে ফেলা হয়। ডাফ্‌লা জাতির মধ্যেও অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত। মৃতের মাথার সামনে একটি লাউয়ের খোলের মধ্যে জউ ও মাটির পাত্রে চাল, লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়।

মৃতের জন্য যেমন শোক করা হয় তেমনি বলা হয় সে যেন ফিরে এসে জীবিতদের

দুঃখ না দেয়, ভীত না করে। কবরের উপরে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চালা তৈরী করা হয়। কোথাও কোথাও বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বেষ্টনী রচনা করা হয়। মানুষের জীবিত আত্মার নাম ইয়ালো ও মৃত্যুর পরে তাকে বলে ওরাম। ডাঃ ফুরার-হাইমেনডরফ্ ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষের যে সত্তা মৃত্যুলোকে যায় তার নাম ইয়ালো আর ওরাম জীবিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু অন্য এক লেখক লিখেছেন যে ইয়ালো আত্মার সারভূত রূপ।

আর্য-সভ্যতায় আছে প্রকৃতি-পূজা, যার পরিচয় আমরা গ্রীকদের মধ্যে দেখতে পাই। এই ধারা আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেব-দেবী অর্থাৎ ধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে শস্য উৎপাদনের গভীর সম্পর্ক আছে। এর প্রভাবে পশ্চিম এশিয়া, গ্রীক ও রোমে এডোনিস, ফিরজিয়াতে এটিস ও মিশরে ওসিরিস অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষেও অস্ট্রিক ও কিরাত জাতির মধ্যেও এই জাতীয় শস্য-কেন্দ্রিক ধর্মবোধের পরিচয় উদ্ভূত হয়েছিল। কিরাতদের মধ্যে আছে শস্যের উৎপাদনের জন্য বৃষ্টি বা হুকুম দেও পূজা, সমৃদ্ধি ও যৌবনের প্রতীক বদনকামের পূজা ও শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী আইনাওর পূজা।

স্বামীজীর মতে ধর্মের প্রকৃত পরিচয় মানুষের পার্থিব সীমা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে অতিক্রম করবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত। পূর্বপুরুষদের পূজা অথবা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সীমা উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ ধর্মের প্রথম পরিচয় পেলো।[১] নিদ্রায় দেহ অসাড় হয়ে পড়ে কিন্তু মানুষের মন ক্রিয়াশীল থাকে। অবশ্য স্বপ্নকে মনস্তাত্ত্বিকরা পার্থিব জীবনের প্রতিফলিত অবস্থারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই স্বপ্নাবস্থাতে মানুষ উপলব্ধি করলো আত্মাব অবিনশ্বরত্বের পরিচয়। এই অবস্থায় মানসিক প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। তখন বোধির সাহায্যে জীবন ও জগতের তাৎপর্য, দেহ ও আত্মার নিগূঢ় সম্পর্ক সহজে অনুভূত হলো। সকল ধর্মে দেখা যায় যে মহাপুরুষ ও প্রবর্তকরা বোধির দৃষ্টিতে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় এই ধরনের সত্যানুভূতি সম্ভব হতো না। ইহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এই বোধির অবস্থাকে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন: 'Screne and blessed mood.' এই পর্যাযে আমরা:

By the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things.

1. To me, it seems very natural that first glimpse of religion should come through dreams. The first idea of immortality man may well get through dreams : The Necessity of Religion.

বৌদ্ধরা ঈশ্বর স্বীকার করেননি বটে কিন্তু তাঁরাও নৈতিক ধর্ম বা নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে একদা মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনিও বিচার-বুদ্ধি অথবা বিশ্লেষণের সাহায্যে অগ্রসর হননি। মানুষের জীবনে এমন একটি পর্যায় আসে যখন সে মনের আলোকে, হৃদয়ের দৃষ্টিতে সত্যকে জানতে পারে। এই জানার মধ্য দিয়ে সে মর্ত্যসীমাকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

এই যে সত্য তা নির্বস্তুক, বিজ্ঞানের উপলব্ধির মত প্রমাণসাপেক্ষ ও বস্তুনির্ভর নয়। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে যে তিনি গুণাতীত ও জ্ঞানাতীত অথবা নৈতিক ধর্মের সারভূত রূপ। ঈশ্বরের পরিচয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি সারাৎসার, জীবনের আদর্শ প্রকাশ। এই আদর্শে পৌঁছুবার জন্য মানুষের মধ্যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যিনি অসীম তাঁকে সীমার সাহায্যে অর্থাৎ নিছক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে পাওয়া যায় না।

নীতিশাস্ত্র বলে যে আত্মাকে বিসর্জন না দিতে পারলে শ্রেয়কে লাভ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিসত্তার জীবন যদি বিবৃত থাকে তবে পরমতত্ত্বকে পাওয়া যায় না। ব্যক্তি-জীবনে আছে অহংকার, ভোগাকাঙ্ক্ষা ও বাসনার প্রতি সংস্কার। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, এই ত্যাগের আদর্শ জীবনে গ্রহণযোগ্য। এইজন্য টি. এস. এলিয়টের একটি কবিতায় তীর্থযাত্রীরা তীর্থপরিক্রমা শেষে বললেন, I should be glad of another death. এর তাৎপর্য হলো যে ভোগ-মলিন জীবনের অবসানে মহত্তম পরিণাম নিহিত।

অসীমের প্রতি এই যে আকুতি কবিরা সৌন্দর্য-সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁরা সাধক তাঁরা প্রকাশ করেন আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। হিতবাদের সমর্থকরা সমাজের কল্যাণের কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এই যে কল্যাণ তা গৌণ অর্থাৎ উপায় মাত্র। একে অবলম্বন করে মানুষ উদ্বর্তনের পথে এগিয়ে চলে। তা ছাড়া এই যে, সমাজ, তাও চিরস্থায়ী নয়। এরও পরিবর্তন ঘটবে। সমাজ অর্থ ব্যক্তির সমষ্টি। ব্যক্তির কল্যাণে সমাজের উন্নতি। সুতরাং ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নয়ন সাধন করা। মানুষের পূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটে তখন যখন মানুষ অন্তরের ও বাহিরের সকল বাধা জয় করবার চেষ্টা করে। জ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বাধা জয় করা মানুষের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও বড় গৌরব যদি সে তার ভোগাকাঙ্ক্ষা, অসংযম ও প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করতে পারে ও মানসিক প্রশান্তির অধিকারী হয়। এই যে প্রচেষ্টা তা ধর্মের বিষয়।

ধর্মবোধ যখন একটি সমাজকে আশ্রয় করে তখন তার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপের যে অসাধারণ উন্নতি তার মূলে কেবল বস্তুবাদ নয়, আছে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মতে নিছক ভোগবাদের পরিচয় য়ুরোপে থাকলে সে-দেশ কদাপি উন্নতি করতে পারত না। সুতরাং স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতি

আধ্যাত্মিক পথ গ্রহণ করে প্রকৃত উন্নতি লাভ করে থাকে।

সাধারণ মানুষ, যারা প্রাণী-পর্যায়ের স্তর অতিক্রম করেনি, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, পার্থিব জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরিতৃপ্ত। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছাড়া ইন্দ্রিয়ের পারবশ্যতা অতিক্রম করে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। ধর্মবোধের মাধ্যমে মানুষ সার্থক জীবন-যাপনের প্রেরণা লাভ করে থাকে।

Earth changes, but thy soul and God stand sure ;
What entered into thee,
That was, is, and shall be :
Time's wheel runs back or stops ; potter and clay endure.

বিশুদ্ধ ধর্মই মানুষকে প্রেরণা দিয়ে থাকে। সুতরাং ধর্মের সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও রীতিগত সংস্কার বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। সুতরাং ভবিষ্যতে ধর্ম হবে মানুষের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের ধারক। মানুষ অদ্বৈতবাদী হোক বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হোক কিংবা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নীতিধর্মে বিশ্বাসী হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। মানুষের সকল প্র ার প্রগাঢ় বিশ্বাসকে ধর্ম নামে অভিহিত করা যাবে।

ধর্ম হবে সর্বজনীন। এর অর্থ এ-নয় যে একটিমাত্র ধর্ম পৃথিবীতে থাকবে। ধর্মবিশ্বাসের যত বৈচিত্র্য থাকবে ততই তাদের মধ্যে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা অপরিহার্য। অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে গেলে কিছুটা হয়ত আপনার মতের ও মনের সংকীর্ণতা পরিহার অপরিহার্য হবে। এতে বিভিন্ন জাতির মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে।

অথচ এই ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটেছে তার তুলনা পাওয়া বিরল। উগ্র জাতীয়তাবাদের চাইতেও ধর্ম মানুষকে যেন আরও হিংস্র ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে।

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে, স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনটি অংশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে তত্ত্ব। এর সাহায্যে ধর্মের মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধিলাভের উপায় ব্যাখ্যা করা হয়। দ্বিতীয় অংশকে বলা যায় পুরাণ। এর মধ্যে থাকে নানা কাহিনী বা উপকথা। তত্ত্বকে সার্থকরূপে বোঝাবার জন্য এদের অবতারণা। তৃতীয় অংশ হচ্ছে রীতি। এখানে বাহ্যিক কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। যদি এই অনুষ্ঠানগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করে তবে এদের অতিক্রম করে যাওয়াতে মনের সার্থকতা। এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সকল ধর্মের এইগুলির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। প্রত্যেক ধর্ম মনে করে যে তার তত্ত্ব, পুরাণ ও অনুষ্ঠান একমাত্র সত্য। সুতরাং ধর্মকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণতা ও অনুদার মনোভাব সৃষ্ট হয়।

তত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্নতা আছে। পৌরাণিক বিশ্বাসেও আছে।

খৃষ্টীয় মতে ঈশ্বর ঘুঘুপাখীর রূপে ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। হিন্দুরা অশ্বত্থ বৃক্ষ বা গাভীকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে মনে করে। ইহুদিরা মনে করে যে একটি বাক্সাকৃতি বস্তুর দুধারে দেবদূতের মূর্তি থাকলে তাকে ভগবানের রূপ বলে গ্রহণ করা যাবে। স্বভাবতঃ দেখা যাচ্ছে যে পৌরাণিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। অপর দিকে অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই জাতীয় ভিন্নতাকে দেখা যায়। হিন্দুরা লিঙ্গপূজা করে। খৃষ্টানরা সাক্রামেণ্টে বিশ্বাসী। লিঙ্গপূজাকে অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপত্তিকর বলে মনে করবে অন্যদিকে খৃষ্টীয় অনুষ্ঠানকে বর্বরতার প্রতীক রূপে উপহাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করেন তাঁরা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে করে থাকেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সমতার কথা বলে থাকি। কিন্তু এই আদর্শের মধ্যে সর্বজনীন মনোভাব নেই। এ-ভ্রাতৃত্ব নিজেদের ধর্মাবলম্বীদের জন্য, বিধর্মীদের জন্য নয়। আসলে আমাদের সমতার আদর্শ কথার কথা মাত্র। আর সমতা (equality) মঙ্গল আনয়ন করবে না, বৈচিত্র্য বিশ্বের প্রাণ। যেমনি জাতিগত বিভিন্নতা আছে তেমনি আছে মানুষের মধ্যেও ভিন্নতা। তবে মানুষের মধ্যে একতার পরিচয় এই ক্ষেত্রে যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট। সুতরাং সমতার চিন্তা ক্ষতিকর; সে সমতা আদর্শের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক। তাই স্বামীজীর বক্তব্য হলো যে এই সমতা পৃথিবী ধ্বংস না হলে আসবে না।

স্বামীজী বলেছেন যে আদর্শ সর্বজনীন ধর্মের অর্থ এ-নয় যে ধর্মে, এক তত্ত্ব, এক পৌরাণিক কাহিনী ও এক জাতীয় অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে। বৈচিত্র্য যে সৃষ্টির ধর্ম এ-কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। যাকে বলি এক তাকে পৃথক স্থান ও পরিবেশের মধ্যে দেখলে বিভিন্ন বলে মনে হবে। বর্তমানে শুক্রগ্রহে যাবার চেষ্টা চলছে। এই গ্রহের বিভিন্ন অবস্থা থেকে চিত্র তোলা হলে দেখা যাবে যে আমরা যেন বিভিন্ন গ্রহের ছবি দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে জল বিভিন্ন আধার অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। ধর্মও তাই। আমাদের মনও আধার; সেই অনুযায়ী ধর্ম ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করবার কোন উপায় নেই। যদি বিভিন্ন ধর্মের মূলে বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে একটি ধর্ম গড়ে তোলবার প্রয়াস করা হয় তাতে আর একটি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হবে মাত্র।

ধর্মের যাঁরা গুরু তাঁরা সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারবেন, সে-চেষ্টা অলীক প্রয়াস। স্বামীজী এই ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কথা বলেছেন, There is no other to you than your own soul. Recognise this. মননশীল বলে মানুষের গৌরব। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আপন সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে। গুরু মাত্র পথ প্রদর্শক হতে পারেন। সকল মানুষের প্রবণতা ও আদর্শ এক হতে পারে না। কর্মী আছেন যাঁরা কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করছেন। আছেন ভক্ত যাঁর পথ ভক্তিসাধনায়। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বা খৃষ্টের লোকোত্তর জীবন ও আদর্শ বরণীয়। যাঁরা মরমী সাধক

তাঁরা আপন মনের ভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করেন। এঁদের জন্য ধর্ম অখণ্ড না হয়ে বিচিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

স্বামীজী এই ক্ষেত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছেন।

কর্মযোগের মধ্যে কর্মের সার্থকতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কর্মের আদর্শ বড়, তা গ্রহণযোগ্য। তবে সেক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন যে কর্ম যেন আমাদের প্রভু না হয়ে বসে। কর্মযোগী অনাসক্ত চিত্তে কাজ করে যান। বৈরাগ্যের নির্মল দীপ্তি তাঁর কর্মকে সার্থক করে যেন তোলে। জ্ঞানযোগী সাধারণ জ্ঞান আহরণে সন্তুষ্ট নন। পার্থিব জগতের জ্ঞান তাঁর অন্তরকে তৃপ্ত করে না। তিনি চান সত্যের পরিচয় লাভ করতে। এই সত্যোপলব্ধি ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করলে ঘটে। ঈশ্বর ছাড়া সত্যের পৃথক অস্তিত্ব নেই। গাছের ডালে দুটি পাখী বসে আছে। উঁচু ডালের পাখীটি শান্ত, স্তব্ধ ও সংযত। নীচের ডালের পাখীটি যখন স্বাদু ফল খায় তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যখন তাকে তিক্ত ফল খেতে হচ্ছে তখন সে দুঃখিত হয়ে উপরের পাখীটির দিকে তাকায়। তার শান্ত, সংযত রূপ তাকে মুগ্ধ করে। সে অনুশোচনা ভোগ করে। সংসার-সমুদ্রে ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ এমনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সত্যলাভের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবানের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করে। ভগবান পরমানন্দ মাধব। প্রীতির মধ্য দিয়ে ভক্ত ভগবানের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করে থাকে।

স্বামীজীর মতে মানুষের পক্ষে প্রত্যেক ধর্মের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা কর্তব্য। এই স্বীকৃতির মধ্যে গৌরব আছে।[১] ঈশ্বরের সৃষ্টি ধারা আজও অব্যাহত আছে। এই পৃথিবী ঈশ্বরের মহাগ্রন্থ। সুতরাং এর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, তাঁর সৃষ্টির গৌরব ও তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য।

---

1. I accept all religions that were in the past, and worship with them all ; I worship God with everyone of them in whatever form they worship him.

—Realisation of a Universal Religion

## গনদের ধর্ম : উৎস ও স্বরূপ

সুধীন মিত্র

নাস্তিক্য সম্বন্ধে যে ভাবটি আমাদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবটিকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে আস্তিক হয়েছিলেন—এমন একটা অস্পষ্ট আর ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সাধারণ মহলে প্রচলিত আছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা হল এই, তিনি কোনদিনই নাস্তিক ছিলেন না বা চট্ করে কোনদিন আস্তিক হননি। তাঁর চরিত্রের যে ভাবটিকে আমরা এতদিন নাস্তিকতা বলে জেনে এসেছি. সেটা তাঁর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি।

বিজ্ঞান বলে, সব কিছু বুঝে নাও, যাচাই কর। প্রমাণ না পেলে কোনও জিনিস বিশ্বাস করো না। যতক্ষণ না বিশ্বাস কর, মনটাকে মোহমুক্ত রাখ। চুলচেরা বিশ্লেষণ করো সবকিছু। যখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। এই যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, এই মোহমুক্ত নিরাসক্তি বিবেকানন্দ আমৃত্যু হৃদয়ে পোষণ করে এসেছিলেন। একে নিছক নাস্তিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। বিবেকানন্দ তখন দিশেহারা। মনে তাঁর পিপাসা জেগেছে—অধ্যাত্মপিপাসা। কিন্তু তাঁর মনের এই পিপাসা কেউই পারছে না যুক্তি দিয়ে নিবৃত্ত করতে! এমন সময় এক দুর্লভ মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কত সহজে, সরল উপমা আর প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুর তাঁর এতদিনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। বিবেকানন্দের যুক্তিবাদী মন শান্ত হল। ভগবান আছেন কি নেই—এ নিয়ে যে প্রবল ঝড় উঠেছিল তাঁর মনে, শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় তাকে থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তিনি যে শুধু ভগবানকে দেখেন তাই-ই নয়, তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন। একথার তাৎপর্য হল, তাঁর চেতনার চারপাশে আছেন মঙ্গলময় ঈশ্বর। তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে, তাঁর কর্মের সঙ্গে, তাঁর সকল মনোময় মহাজগতের সঙ্গে যুক্ত সেই নিত্যগত শক্তি। কি সহজ অবস্থায়, কি ধ্যানে, তিনি সেই নিত্যানন্দময়ী কল্যাণশক্তিকে মাতৃরূপে দেখতে পান।

এতক্ষণে একটা প্রশ্নের অবকাশ এল। নাস্তিকের দল বলবেন এ কেমন কথা? মাটির একটা পুতুলের সঙ্গে রামকৃষ্ণ কথা বলতেন? একি সম্ভব, না এ সত্য? কথাটাকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

উচ্চতম ও নিম্নতমভেদে সত্যের প্রকার ভেদ। একটি সাধারণ মানুষের সত্য অপরটি অসাধারণের। দুটোই নিত্য সত্য। সূর্য উঠেছে, চন্দ্র উঠেছে—এটা সাধারণ সত্য, অসাধারণ সত্য হল কোনও শক্তি সূর্য আর চন্দ্রকে ওঠাচ্ছে। সাধারণ সত্য

আমরা সাধারণ মানুষ যাচাই করতে পারি, চোখে দেখতে পারি। কিন্তু কে ওদের ঠিক সময়টিতে ওঠাচ্ছে সেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না। বিশেষ বিশেষ অসাধারণ মানুষের চোখের উপর এই অসাধারণ সত্য মূর্তি লাভ করে। কে একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে? শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা ছিল এই ধরনের। এ স্থূল চোখে দেখা নয়, সূক্ষ্ম চোখে দেখা। শক্তিকে মাতৃরূপে দেখা। এ দেখা তাঁর সহজ অনুভবের চারপাশে এমন প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে, একে তিনি না দেখে পারেন নি। সমস্ত মূর্তির মধ্যে শক্তিরূপিণী মাকে এবং সমস্ত মাতৃজাতির মধ্যে জগন্মাতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে—মানুষ আর ভগবানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

বিবেকানন্দ সেই ভাবটি ধারণা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তুই বটগাছ হয়ে শত শত পথিককে ছায়া বিলাবি। বিবেকানন্দ বুঝলেন, কর্মই তাঁকে করতে হবে। অলসতা তাঁর জন্যে নয়, দেশের ধর্ম যেখানে অবহেলিত, দেশের মা-বোনেরা যেখানে নিতান্তই অসহায়, পুরুষেরা যেখানে বীর্যহীন সেখানে তিনি নির্বিকার থাকবেন কি করে? নাস্তিকের দল যেখানে ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করছে, আস্তিকের দল বিজ্ঞানসম্মত ধর্মের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছে, সেখানে এই সুন্দর শাশ্বত ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই হল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। উপনিষদের মূলকথাটি তিনি বুঝলেন। স্বীকার করলেন তিনি মানুষের ধর্মকে। শুধু তাই নয়, সমস্ত ধর্মের পিছনে যে সত্য আত্মগোপন করে আছে এবং তা মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, একথাও তিনি জানলেন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তাঁর শুভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রঞ্জনরশ্মির মতো ধর্মের চিরন্তন আত্মাকে তাঁর মনের পটভূমিকায় উদ্ভাসিত করল। তিনি বুঝলেন, ধর্ম মানবিকতাকে অবলম্বন করেই গঠিত হয়। মানুষের চরিত্রের সঙ্গে ধর্ম একাত্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে ধর্মের কোনও স্বতন্ত্র চেহারা নেই। এদিকে আবার কর্মকে বাদ দিয়েও ধর্মের নিজস্ব কোনও মূল্য নেই।

বস্তুতঃ কর্ম মানুষের কাছে মুক্তির সোপান। মানুষ কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে কর্মকেই যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে সে কর্ম একটা মধুর অনুভবের দ্বারা মানুষকে তার সঙ্গে একাত্ম করে নেয়। কর্ম যেন আমাদের শক্তির উৎস হয়, শক্তিহীনতার নয়।

কর্ম যেখানে বিশ্ব কর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বার্থপর অহংবোধের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, প্রভুত্ববোধের দ্বারা স্ফীত, সেখানে সে শক্তিহীন, দুর্বলতা দিয়ে মানুষকে বন্ধ করে। অপর দিকে আনন্দ থেকেই যেখানে কর্মের উৎপত্তি, কামনাহীন পবিত্রতা নিয়ে আনন্দলোকেই যেখানে কর্মের লয়, কর্ম সেখানে শক্তির আধার।

বাস্তবিক, কর্ম হয় আমাদের উপকার করে, নয় করে অপকার। হয় সে শক্তি দান করে, নয় করে শক্তিহরণ। হয় সে আমাদের বন্ধ করবে, নয় আমাদের দ্বারা বন্ধ হবে। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ'—যজ্ঞার্থে যে সব কর্ম করা হয়ে

থাকে, সে সব কর্ম ছাড়া অন্য সব কর্মই হল বন্ধন-স্বরূপ। যজ্ঞ হল সেই সব কর্ম যার দ্বারা নিজেকে সংযত করে, কামনা শূন্য করে নিজের অহংবোধকে নিশ্চিহ্ন করে বিশ্ব আমির সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। নিষ্কামভাবে কিছু করাই যজ্ঞার্থ কর্ম। প্রকৃত অর্থে নিষ্কাম কর্ম আমাদের অহংকারকে মুছে ফেলে দেবে। এর মধ্যে থাকবে একটা ধ্যানগম্ভীর পবিত্রতা, থাকবে শান্ত নিরাসক্তির স্পন্দন। এরই দ্বারা মানুষ এক মুহূর্তেই আপনার সমস্ত সংকীর্ণতাকে বিসর্জন দিতে পারে। কর্মের মধ্যে কর্মও থাকবে, সংযমও থাকবে। সংযত-ইন্দ্রিয় হ'য় পরার্থে যে কর্ম করা যায় সে কর্মই মানুষকে দেখায় মুক্তির পথ।

মুক্তির জন্য যে কর্ম সে কর্মও তো আমাদের ছাড়তে হবে। বিবেকানন্দের মতে নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও স্বার্থপরতা। নিষ্কাম কর্মের অর্থ আসক্তিহীন কর্ম। নিরাসক্ত থাকার সহজ উপায় দাসভাব। আমরা তাঁর ভৃত্য, তাঁর কর্মচারী। তাঁর সম্পত্তি সামলাচ্ছি আর টাকার তহবিল আগলাচ্ছি। সম্পত্তির আর টাকার এক কানাকড়ি অংশ মালিকানাও আমাদের নেই। আমাদের তিনি কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। জীবনের আদিম প্রভাত থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সেই কাজ করে যেতে হবে। কোম্পানির ক্যাসিয়ার লক্ষ লক্ষ টাকা লেন-দেন করে, কিন্তু এক পয়সাও সে মালিক নয়। কাজেই ভাল ক্যাসিয়ার কখনও টাকার দ্বারা আসক্ত হয় না। জ্ঞানী মানুষও কখনও কর্মের দ্বারা আসক্ত হন না।

বিবেকানন্দের কর্মের পিছনে কোন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। এই নিষ্কাম কর্ম বিবেকানন্দের চরিত্রের মধ্যে এক অসীম বীর্য দান করেছে, তাঁর হৃদয়ে একটা সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছে।

বীরত্বের প্রতি বিবেকানন্দ চিরদিনই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। শক্তির আহ্বানে তিনি বার বার সাড়া দিয়েছেন। বীরত্ব বলতে আমরা সাধারণ লোকেরা ভুল করে ভাবি দৈহিক কসরৎ। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। কঙ্কালের মতো দেহধারী কোন লোকও বীর হতে পারেন, যদি তিনি মনের দিক থেকে বীর হন। যদি তাঁর কর্ম কামনাশূন্য হয়, চিন্তাধারা বলিষ্ঠ হয়; ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর চরিত্রের চারপাশে সুকঠোর মাধুর্যের পরিমণ্ডল রচনা করে।

বিবেকানন্দ যখন বলেন : "I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads, it is only that one idea strength," (The complete works of Swami Vivekananda, lst. ed vol. viii. p 269) আমি কখনও উপনিষদ ছাড়া অন্য কিছু আবৃত্তি করি না। আবার উপনিষদের যে-সব বাক্যে শক্তির কথা আছে, সেগুলিই বলি—তখন এটা কিছুতেই মনে হবে না যে তিনি গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

বীরত্বের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা অসীম আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মবিশ্বাসকে তিনি সকলের বড় বলে মনে করতেন। আগে নিজেকে বিশ্বাস করা, তারপরে ভগবানের কথা। অনুভব করো তোমার সঙ্গে পরমাত্মার লীলা চলছে।

ঈশ্বরের অংশে তুমি গঠিত, তাঁর দানে তুমি পুষ্ট। তুমি ছোট কিসে? তোমার মনে যে পাতা রয়েছে তাঁর আসন! যেখানে তিনি স্বয়ং বর্তমান সেখানে কেউ তোমাকে বিন্দুমাত্র ছোট করবে এত সাধ্য কার?

ভাবতে গেলে ছোট হওয়ার কোনও কারণ নেই। মানুষ যখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কেবলই 'আমি আমি' করে 'তিনি' থেকে 'আমি' বিচ্ছিন্ন হয়। তখনই আসে সংকীর্ণতা, মনে জাগে শংকা, দৃষ্টিতে আসে দিশাহারার ভাব; বুদ্ধি আপন কক্ষচ্যুত হয়ে ভুলপথে ভ্রমণ করে।

আত্মবিশ্বাস মানে আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা, আত্মার থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়। 'সোহহম্' এই কথাটির অর্থ যখনই উপলব্ধি করতে পারব, তখনই আসবে যথার্থ আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দের তাই ছিল।

বিবেকানন্দের জীবন আত্মপ্রত্যয়প্রদীপ্ত এই বীরত্বের জীবন। সেই বীরত্ব আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত, কামনাবিহীন কর্মের দ্বারা নিবোধিত, জ্ঞান ও বুদ্ধির শিখায় আলোকিত, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সংযত। এই যে বীরত্ব—এই ছিল তাঁর ধর্মের আর কর্মের অঙ্গ। এরই জোরে বিবেকানন্দ ভাবীকালের কাছে করবেন একটি সম্পূর্ণ যুগের প্রতিনিধিত্ব।

## ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা : বিবেকানন্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তাঁর মানসিক ও আত্মিক সম্প্রসারণে। সে সম্প্রসারিত আত্মিক শক্তির সাহায্যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তিনি যেমন অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেন তেমনি গড়ে তোলেন প্রচুর সম্ভাবনাময় একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংঘাতময় ধর্মভাবনার ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ স্থান নির্ণয় করতে হলে আমাদের উক্ত সত্যটি মনে রাখা দরকার। মনে রাখা দরকার শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের ধর্মচেতনায় যে উদার মানবিকতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল বহু আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে সুরই একটি সুসমঞ্জস সুন্দর পরিণতি লাভ করে বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার সে বিবর্তন ও সমন্বয়ের ইতিহাস বড়ই জটিল। বর্তমান আলোচনার সীমাবদ্ধ পরিসরে সে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব। শুধু একটা রূপরেখা অঙ্কনই ঐ প্রয়াসের মুখ্য লক্ষ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার ইতিহাস সংস্কার ও সমন্বয়ের ইতিহাস। পূর্ব শতাব্দীর সর্বপ্রকার সংস্কারান্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন প্রথমে মনীষী রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের নব-উপলব্ধ ধর্মচেতনাকে নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাসমত একটি সংস্কার-আন্দোলনে রূপ দেবার চেষ্টা করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার দেবেন্দ্রনাথের ধর্মান্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেন। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র প্রথমে রামমোহনের অনুগামী হলেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ এবং স্বাধীন কর্মপন্থা গ্রহণ করায় ভাবগুরু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে। বস্তুত ধর্মোপলব্ধির জগতে কেশবচন্দ্রের নবতর আদর্শ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সমন্বয়ী ভাবধারার সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্রে যে সমন্বয়ী নতুন চিন্তার সূত্রপাত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে তার বিকাশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শতাব্দীর শুরু হল রামমোহনের বিদ্রোহী ধর্মভাবনায় বহু দিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, তা অবশেষে স্থিতিলাভ করল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায়। এ আবর্তসঙ্কুল ধর্মভাবনার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট স্থান কি এখন তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

রামমোহনের যে নবীন ধর্মচিন্তার আঘাতে সে যুগের বাঙালী অকস্মাৎ চকিত হয়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণ রূপ কী, একথা আজ নিশ্চিত করে বলা শক্ত। এর কারণ, যে-সমস্ত ধর্মালোচনামূলক পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থে রামমোহন তাঁর নব-

উপলব্ধ ধর্মমতকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার অধিকাংশ আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে পর্যন্ত রামমোহনের ধর্মজীবনে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বলা চলে অনুসন্ধানের যুগ। এ সত্যানুসন্ধান সর্বপ্রথমে তাঁকে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। চেতনা যেখানে বিদ্রোহী আঘাত করবার ইচ্ছা সেখানে স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধকে আঘাত করবার ইচ্ছা জাগল রামমোহনের মনে সে শতাব্দীরই শেষভাগে যখন তিনি ষোল বৎসরের যুবক মাত্র। ঐশ্লামিক শিক্ষা-সংস্কারের আবহাওয়ায় বর্ধিত রামমোহন সে সময় হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্মকে আঘাত ও ইসলামের একেশ্বরবাদকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে একখানি পুস্তিকা রচনা করলেন। ইসলামের প্রভাবে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি এ সময় এত ব্যগ্র হয়ে পড়েন যে ১৮০৩ বা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফার্সী ভাষাতেই একখানি গ্রন্থ রচনা করে বসেন। এ সমস্ত গ্রন্থে রামমোহনের পরবর্তীকালের দার্শনিক ভাবনা নেই। আছে বহুকাল প্রচলিত হিন্দুর ধর্মসংস্কারের প্রতি একটি সংশয়ী মনোভাব। আছে বহুকাল প্রচলিত হিন্দুর ধর্মসংস্কারের প্রতি একটি সংশয়ী মনোভাব। সংশয় শূন্যোতাধর্মী সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সংশয়ের মধ্য দিয়েই মানুষ উপনীত হয় পরিপূর্ণ সত্যোপলব্ধির রাজ্যে।

যে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস বহুকাল যাবৎ হিন্দুর ধর্মবোধের প্রধান অঙ্গ ছিল তার বিরুদ্ধে রামমোহনের এ বিদ্রোহ কেন? রামমোহন মনে করতেন বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্য দিয়ে হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের এ বিভিন্নতা হিন্দু জাতির মধ্যে এনে দিয়েছে চরম অনৈক্য যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভারতবাসীর সমকালীন দুরবস্থা। রামমোহন সেজন্য অনুভব করলেন অন্ততঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য হলেও ভারতবর্ষে সার্বভৌম একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠার দরকার। কর্মজীবনে মিঃ ডিগবীর সাহচর্যে এসে ইংরেজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হবার পর রামমোহন যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন তখন লোকশ্রেয়ের আদর্শকেই ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে মনে হল তাঁর।

এ তো গেল ধর্মের প্রকৃত রূপসন্ধানে রামমোহনের পরাশ্রয়-প্রয়াস। তারপর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পর শুরু হল তাঁর ব্যাপকতর ধর্মানুসন্ধান। শাঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত ধর্মদর্শকে। "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম"ই হল তখন থেকে তাঁর উপাস্য বস্তু। ব্রহ্ম সম্পর্কীয় ও সত্যধর্মের আলোচনা গবেষণার জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন তিনি 'আত্মীয় সভা'। এরপর রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল খৃষ্ট ধর্মের সহজ আবেদনের দিকে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের উক্তি সংকলন করে প্রকাশ করলেন তিনি—"The Precepts of Jesus." ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় আদর্শে উপাসনার জন্য স্থাপন করলেন তিনি ইউনিটারিয়ান সোসাইটি। এ

সোসাইটিতে উপাসনা জনপ্রিয় না হওয়ায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন তিনি 'ব্রহ্মসভা'। রামমোহনের এ 'ব্রহ্মসভা'র দ্বার উন্মুক্ত ছিল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী লোকের জন্য।

তাহলে দেখা গেল রামমোহনের ধর্মচেতনা বিকাশের পথ খুঁজছিল জগতের মুখ্য ধর্মসমূহের সারসংকলনের মধ্য দিয়ে। প্রখর যুক্তি ও মনীষার সাহায্যে সমকালীন কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে ধর্মকে তিনি একটি সার্বজনীন ও যুগোপযোগী রূপ দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মসংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লোকহিত। এ লোক-শ্রেয়ের প্রেরণায় 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শঙ্করের মায়াবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত পরস্পর-বিবদমান দেশবাসীর মনকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে সকলের সামনে তুলে ধরলেন তিনি নির্গুণ পরব্রহ্মের ধারণা। সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ প্রভাবিত শিক্ষিত মন এ সূক্ষ্ম ঈশ্বরধারণার মধ্যে তার সংশয়বাদী ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেল। 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'কে লোকপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে যুক্তির জাল বিস্তার করে তিনি আরো বললেন : উপাস্য ব্রহ্ম যদি সত্য হন তাহলে তাঁর সৃষ্ট মানুষ বা জগৎ কখনও মিথ্যা হতে পারে না। উপাসক মানুষ যদি মিথ্যা হয় তাহলে ধর্মজগতে কে কার উপাসনা করবে? সুতরাং সত্য ব্রহ্মের মত তাঁর সৃষ্ট মানুষও সমানভাবে সত্য।

শতাব্দী-শেষে বিবেকানন্দের ধর্ম-উপলব্ধিও রামমোহনের অনুরূপ।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী ধর্মের নামে যখন গুপ্ত উপাসনা ও মানবতাবিরোধী নানা হৃদয়হীন কর্মে লিপ্ত ছিল সে সময় মানবতার এত উচ্চ আদর্শের কথা রামমোহন ব্যতীত কোন বাঙালী উচ্চারণ করেননি। এর ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন-প্রভাবিত সংশয়াচ্ছন্ন বাঙালী রামমোহনের ধর্মদর্শনের ভেতর খুঁজে পেলেন বিশ্বাসের একটি বড় অবলম্বন। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সংশয়াচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত বিদেশী ধর্মযাজক এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের স্রোতও বাধা পেল রামমোহনের ধর্মালোচনার নিকট।

রামমোহন যে যুক্তিবাদী ধর্মাদর্শের প্রবক্তা তার যুগোপযোগিতা সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। সত্যের সার্বভৌম রূপসন্ধানই যে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার প্রধান লক্ষ্য ছিল—এ বিষয়েও সকলে হয়তো একমত হবেন। তথাপি রামমোহনের উচ্চাদর্শের তার স্ব-যুগে কিংবা তার পরবর্তীকালে সর্বস্তরব্যাপী না হয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল কেন একথা স্বভাবতই মনে আসে। কোন কোন সমালোচক তো ব্রাহ্মধর্মকে সে যুগের সংস্কার-বিলাসী অ্যারিস্টোক্রেট হিন্দুর ধর্ম বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেননি। অথচ শতাব্দীর শেষে অদ্বৈত বেদান্তকে আশ্রয় করে স্বামী বিবেকানন্দ যে নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করেন তার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সমাজের প্রায় সর্বস্তরে। এর কারণ কী?

এর কারণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিকে এক সার্বভৌম অদ্বৈত বেদান্ত ধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়ে রামমোহন হিন্দুর চিরশ্রদ্ধেয় পুরাণ ভাগবত প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রকে শুধু উপেক্ষাই করেননি—আঘাতও করেন। যুক্তিতর্কের সাহায্যে একদিকে তিনি পুরাণের অবতারবাদকে নিরসন করার চেষ্টা করেন আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবীয় ধারণাকে ধিক্কৃত করেন। তিনি বললেন হিন্দুর পুরাণে বা ভাগবতে প্রতীকতার মধ্য দিয়ে যে ভগবৎধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা বেদান্ত ধর্মের সূক্ষ্ম মর্মগ্রহণে অক্ষম নিম্নাধিকারীর জন্য। পুরাণাদিতে বর্ণিত যে আদর্শ দেবোপম চরিত্রগুলি যুগে যুগে জাতিকে আদর্শচেতনায় সঞ্জীবিত করেছে কিংবা ভাগবৎ বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের ভিতর বৈষ্ণব মহাজনেরা ভগবৎ-অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন—সে মহৎ অধ্যাত্মবোধের ওপর এরূপ প্রচণ্ড আঘাত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ খুব সুস্থভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তান্ত্রিক গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী অবধূতের শিষ্য হয়েও তন্ত্রোক্ত মূর্তিপূজাকে রামমোহন কখনও সমর্থন করেন নি। এ ছাড়া প্রচণ্ড বেদান্তবাদী হয়েও রামমোহন পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদীদের মত ভোগাকাঙ্ক্ষাকে স্ব-জীবনে চরম মর্যাদা দিতেন। এ সমস্ত কারণে রামমোহন-প্রচারিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম-ত্যাগাদর্শে বিশ্বাসী জাতির চিত্তে কোন গভীর প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেনি। ধর্মোপলব্ধির জগতে রামমোহন বৈদান্তিক জীবন-দর্শনের জন্য প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের জীবনদর্শন তাঁর চিন্তা ও কর্মকে ঐহিক সুখ ও ভোগের পথে আকর্ষণ করেছিল। শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের এ স্বতোবিরোধী ধর্মভাবনা শতাব্দীশেষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-সাধনায় কিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল রূপ পেয়েছিল—তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের সংমিশ্রণে রচিত রামমোহনের এ অভিনব ধর্মদর্শন রক্ষণশীল জাতির চিত্তে যে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি তার প্রমাণ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিদেশ গমনের পর তাঁর নবপ্রচারিত ধর্মের দুরবস্থা। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারবৎসর পর্যন্ত রামমোহনের ভাবশিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোনমতে একটি সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে এ নবধর্মকে বাঁচিয়ে রাখেন। তারপর দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন থেকে রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন নতুন শক্তি অর্জন করল। ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের প্রায়-বিপরীত। তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, জীবনব্যাপী সৌন্দর্যের উপাসক, ভোগবিমুখ এবং সাধনার সাহায্যে হৃদয় ও মনের বিশুদ্ধ অনুশীলনে তৎপর। ইতিমধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা যুক্তিবাদী ডিরোজিওর শিক্ষায় একদল নব্যশিক্ষিত যুবক ধর্মভাবনায় সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে শুধু যে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিল তা নয়—খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্ররোচনায় কেউ কেউ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। একটি ধর্মসংগঠনের সাহায্যে

এ বিজাতীয় ধর্মস্রোতকে বাধা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং এ উদ্দেশ্যে প্রগতিবাদী কয়েকজন হিন্দুকে নিয়ে বিদ্যাবাগীশের কাছে বেদান্তধর্মে দীক্ষা নিয়ে গঠন করলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহনের বেদান্ত প্রতিপাদ্য সার্বভৌম সত্যধর্ম এভাবে পরিণতি লাভ করল একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ধর্মে। এ ধর্মের রূপদানে দেবেন্দ্রনাথ মুখ্যত আশ্রয় গ্রহণ করলেন উপনিষদকে। "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়"ই হল সে উপনিষদোক্ত ব্রহ্মোপলব্ধির ভিত্তিভূমি। রামমোহন যেখানে তাঁর সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন শাস্ত্র ও প্রবল যুক্তির ওপর, দেবেন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশুদ্ধ হৃদয়কে। কোন কোন সংস্কৃতি-সমালোচক মনে করেন ব্রাহ্মধর্মের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে এ আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ ফরাসী কার্টেসিয়ান দর্শনের ওপর স্থাপিত। এ দার্শনিক ভিত্তির ওপরের চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ সগুণ ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষদ-বাক্যগুলো আহরণ করে ব্রাহ্মধর্মের স্থাপনা করেন। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর-অদ্বৈতকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন তাঁর 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থে। শুধু দেবেন্দ্রনাথ নন, সংস্কার যুগের অন্যতম নায়ক দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা'য় ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর জোর দিয়েছেন বেশী।

এভাবে রামমোহন-পরবর্তী সংস্কার যুগের ব্রাহ্মধর্ম তার আদি বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শন-ঘেঁষা একটি ধর্মমতবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মধর্মের রূপদানে মহর্ষির অন্যতম সহকর্মী ছিলেন মনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত। ধর্মসংস্কারে অক্ষয়কুমার মহর্ষির সহকর্মী হলেও তার মন ছিল বিজ্ঞানীর। সেজন্য রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মত কোন দর্শনকে ধর্মের ভিত্তি না করে বিজ্ঞানকে ধর্মের ভিত্তি করবার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন। 'আত্মীয় সভা'য় ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতেন তিনি ভোটের সাহায্যে। ঈশ্বরের সর্বশক্তি মত্তায় তিনি বিশ্বাসী না হলেও প্রত্যক্ষবাদীর মত বিচিত্র শক্তিকে তিনি বিশ্বাস করতেন। সমীকরণের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতেন যে ঈশ্বরস্বরূপ উপলব্ধি করবার উপায় হিসাবে প্রার্থনায় কোন শক্তি নেই। যথার্থ বিজ্ঞানীর মত জগৎ-ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিয়মকেই তিনি স্থান দিতেন সবার উপরে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" দ্বিতীয়ভাগের উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন : 'মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।" বেদের অপৌরুষেয়ত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্মজিজ্ঞাসায় সব চাইতে বড় স্থান দিয়েছেন তিনি লোকহিতকে। তাঁর এ মনোভাবের ওপর অষ্টাদশ শতাব্দীর হিতবাদী ও মানবতাবাদী দার্শনিকদের প্রভাব অতি-প্রত্যক্ষ। তাঁর নিশ্ছিদ্র যুক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথও ঈশ্বরতত্ত্ব ও শাস্ত্রবিচারের কোন কোন বিষয়ে মতপরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তবে মূর্তিপূজা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো একই মত পোষণ করতেন। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও মনে

করতেন ঈশ্বর যখন "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারেন না। অতএব কোন মূর্তির মধ্যে তাঁর প্রকাশ ঘটতে পারে না।

দেবেন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় ভগবৎ ধারণা এভাবে অক্ষয়কুমার দত্তে এসে পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদী ও প্রতক্ষ্যবাদী দর্শনে স্থিতিলাভ করল।

সংস্কার-যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকর্মীদের হাতে রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' এভাবে নবতর রূপ পেল। নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রামমোহন হিন্দুর অতি-পুরাতন শক্তি ও বৈষ্ণব ধর্মের যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যায় তা একেবারে অনুপস্থিত। দেবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করলেন না, সে জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি আত্মপ্রত্যয়কে। এছাড়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করতে গিয়ে রামমোহনের মতোই তিনি মূর্তিপূজা স্বীকার করলেন না।

তাহলে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে মূর্তিপূজা বর্জিত হয়েছে, বেদের অপৌরুষেয়তা হয়েছে অস্বীকৃত, স্মৃতি-নির্দেশিত ক্রিয়াকাণ্ডের কথাও নেই, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের কোন আলোচনা নেই—এ সমস্ত পূর্বসংস্কার বর্জন করে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন শুধু উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মবাদ ও সে ব্রহ্মের উপাসনা। এভাবে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মসমাজ দেশের বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি মননপ্রধান স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসমাজের একমাত্র সমাজ-চেতনা দেখা যায় ব্যক্তিগত চরিত্রকে বিদেশী সভ্যতার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ ফ্রন্ট গঠনে।

সংস্কার-যুগের তৃতীয় পর্যায়ের সব চাইতে বড় নায়ক হলেন কেশবচন্দ্র সেন। কোন কোন সংস্কৃত-সমালোচকের মতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁরও মতবাদের ভিত্তি স্কটল্যাণ্ডের 'সহজ জ্ঞানবাদ'। কেশবচন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন তারও ভিত্তি নাকি জার্মানীর হেগেল দর্শনের ইংলণ্ডীয় সংস্করণ। সুতরাং দেখা যায় সংস্কার-যুগের ব্রাহ্ম-নায়কগণ বৃহত্তর জাতীয় ঐতিহ্য থেকে অনেকাংশে সংযোগ হারিয়ে বিদেশী ভাবপ্রেরণায় ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা কেন, কেশবচন্দ্রের সমন্বয়মূলক ধর্ম-সংস্কারের যে মহত্তম পরিণতি সে 'নব-বিধান'ও ছিল বিভিন্ন ধর্মের সার-সঙ্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমন্বয়ের অস্ত্র হিসেবে 'নব-বিধানে'র উপযোগিতা অবশ্য-স্বীকৃত হলেও কোন গভীর দার্শনিক ভিত্তির অভাবে এ উদার ধর্মবোধও বাঙলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। এ সমস্ত কারণেই এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-আন্দোলন ক্রমশ শক্তি হারিয়ে একটি কালচার-বিলাসী ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

সংস্কার-আন্দোলনের দুর্বলতার কারণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক ধর্মান্দোলন বেগ ও বলিষ্ঠতা লাভ করে একমাত্র তখনই

যখন আন্দোলনকারী জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদকে একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেন। অথচ ব্রাহ্মনেতাদের মতবাদ ও জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় মতোবিরোধ দেখা গেছে। প্রচণ্ড বেদান্তবাদী হয়েও রামমোহন হিন্দু প্রথানুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। মেরী কার্পেনটার জানিয়েছেন মৃত্যুকালেও তিনি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেননি। ব্রাহ্মজ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্যার চরম জেনেও তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৈদান্তিক রামমোহনের শৈব বিবাহে আপত্তি ছিল না। ধর্মজিজ্ঞাসায় বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন হয়েও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের পাষাণমূর্তি নির্মাণ করবার আবেদন জানিয়ে পৌত্তলিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সমর্থনের মধ্য দিয়ে রাজনারায়ণেরও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পিতার শ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুপূজিত শালগ্রাম শিলা আনতে নিষেধ করলেও হিন্দুমতে পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলেন। এক কথায় ব্রাহ্মসমাজের নেতারা যুগপ্রয়োজনে বুদ্ধির সাহায্যে হিন্দুর পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও জীবনের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি।

হতে যে পারেননি তার সর্বশেষ পরিচয় সংস্কার-যুগের শেষ নেতা কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনের বিবর্তনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য হিসেবে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অধ্যাত্মজীবন শুরু করেন। তারপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে তাঁর ধর্মমতের বিবর্তন ঘটে। ('ফেয়ারওয়েল টু বেদান্ত')। অতঃপর আবার তিনি ফিরে এলেন বেদান্তধর্মে— তবে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ('আওয়ার রিটার্ন টু বেদান্ত')। এখানেও কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের বিবর্তন শেষ হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তাঁর ধর্মানুভূতির আবার বিবর্তন ঘটে। আত্যন্তিক আগ্রহের সঙ্গে তিনি হিন্দুর দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা শুরু করেন। খ্রীষ্ট বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন ('গ্রেট মন') আলোচনা-প্রসঙ্গেও তিনি অবতারবাদ বিশ্বাসেরও পরিচয় দেন। কেশবচন্দ্র স্ব-জীবনে সগুণ ব্রহ্মবাদ, অবতারবাদ, আদেশবাদ প্রভৃতি মতবাদকে যেভাবে সক্রিয় সাধনার মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাতে দেখা যায় সংস্কার যুগের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ক্রমশঃ রূপময় ভগবৎ-উপাসনার পথে অগ্রসর হচ্ছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ভাষ্যকার রমাঁ রলাঁ মনে করেন ঈশ্বরকে পিতৃভাবে ধারণার থেকে মাতৃভাবে সাধনার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রবণতা আসে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে। ব্রহ্মজ্ঞানী কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবে তন্ময়তা ও অবতারবাদে বিশ্বাসের মধ্যে সংস্কার-যুগের অবসান ও সমন্বয়-যুগের সূচনা দেখা দিয়েছে।

জগতের মুখ্য ধর্মাদর্শের আশ্রয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্য দিয়ে সে সুসমঞ্জস ধর্ম-সমন্বয় যুগের শুরু। সংশয়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্তের সে উদার ধর্মগ্রহণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের মধ্য দিয়ে সে সার্বভৌম ধর্মের বিকাশ। প্রায় সমস্ত সংস্কৃতি-সমালোচকই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এ সামঞ্জস্যময় ধর্মভাবনার যুগকে বলেছেন সমন্বয় যুগ। কিন্তু কোন কোন চিন্তাশীল লেখক

এ যুগের ধর্মভাবনায় পৌত্তলিকতার পুনরুজ্জীবনপ্রয়াস দেখে এ যুগকে অভিহিত করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল সমন্বয়-যুগ বলে। শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্ঞানযোগী রামমোহনের সংস্কারকামী ধর্মচিন্তায় বাঙালীর যে মজ্জাগত পৌত্তলিকতা-প্রীতি বিসর্জিত হয়েছিল, শতাব্দী-শেষে কৃচ্ছ্রতপা তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনায় জড় পাষাণপ্রতিমার ভিতর অনন্ত-চৈতন্যের সজীব প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার শুধু সংশয়বাদী যুবক নরেন্দ্রনাথের সকল জিজ্ঞাসাকে নিরুত্তর করল তা নয়—সে সংস্কার-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্রের বিস্মিত শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করল। বস্তুত পক্ষে এ মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পরম উপলব্ধির কথা সংস্কারকামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত করেন ভাবপ্রবণ ব্রহ্মবাদী নেতা কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ভাষ্যকার রম্যাঁ রলাঁ কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় সর্বসংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র এ মূর্তিপূজকের প্রায় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ এ মূর্তিপূজকের প্রকাশ্য শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মূর্তিপূজার সমর্থনে পরবর্তীকালে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তো দ্বিধাই করেন নি: "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম।" পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বক্তৃতায় ও উপদেশে মূর্তিপূজার সমর্থনে অনেক কথা বলেছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মসমূহের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ করে তিনি এটাও প্রমাণ করেছেন যে মূর্তি বা প্রতীকের উপাসনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ধর্মই বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মূর্তিপূজাকে যুগমানব রামমোহনের মতো শুধু নিম্নাধিকারীর ধর্ম বলে তিনি উপেক্ষাই করেন নি, বরং মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিকাশ ঘটতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শতাব্দীর প্রারম্ভে চিন্তানায়ক রামমোহন যেখানে মূর্তি-পূজাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের নিদর্শন এবং জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন, শতাব্দীর শেষে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সে মূর্তিপূজাকে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার পরম পরিণতি বলে স্বীকার করেছেন। একেই মনে হয় সংস্কার-যুগের ধর্মভাবনার বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগের প্রতিক্রিয়া। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগকে সেজন্য সর্বসংস্কারমুক্ত (?) কোন কোন লেখক রি-অ্যাকশনারী অর্থাৎ প্রগতি-বিরোধী যুগ বলতেও দ্বিধা করেননি। যে বিবেকানন্দ এ হতভাগ্য দেশের সমষ্টি-মুক্তির সাধনায় তাঁর ত্যাগব্রতী জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। সত্যই কী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ধর্মানুভূতি প্রগতিবিরোধী এবং বিবেকানন্দ কী প্রতিক্রিয়াশীল?—এ প্রশ্নের আজ মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

বিবেকানন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করবার প্রধান কারণ হল এই যে—যে মূর্তিপূজাকে রামমোহন কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থূল ধর্ম বলে মনে করেছেন এবং সংস্কার-যুগের ধর্মনেতারা যে সংস্কারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়েছিলেন,

বিবেকানন্দ সে ধর্মপ্রণালীকে স্ব-জীবনে শুধু অনুসরণ করেন নি, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাও দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিবেকানন্দ কি শুধু মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্তি-পূজকদের মত প্রাণহীন পাষাণ-পূজাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন? বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকেরা জানেন যতদিন পর্যন্ত তিনি পাষাণময়ী কালীপ্রতিমার মধ্যে ইচ্ছাময়ী ভগবৎশক্তির অনন্ত বিভূতি উপলব্ধি করতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত তিনি নিরক্ষর মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণকে গুরু বলেই স্বীকার করেন নি। এ পরম উপলব্ধির পর বিবেকানন্দ মূর্তিকে ভগবৎশক্তির প্রতীক হিসেবেই উপাসনা করবার নির্দেশ দিয়েছেন—ইট, কাঠ, পাথর হিসেবে পূজা করতে বলেন নি। মূর্তিপূজা সম্পর্কে রামমোহনের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্মসাধনার বড় পার্থক্য হল এই : রামমোহনের মতো যুক্তি প্রয়োগে তিনি মূর্তিপূজাকে শুধুমাত্র 'নিম্নাধিকারীর ধর্ম' বলে উপেক্ষা না করে সাধনার সাহায্যে হিন্দুর ঐতিহ্যাশ্রিত এ ধর্মপ্রণালীর গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের মতো ভিন্নতর ধর্মাদর্শের প্রভাব স্বীকার না করে হিন্দু-ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন। এজন্য বিবেকানন্দের ধর্ম-সংস্কারের প্রভাব জাতীয় জীবনে যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, আমাদের ধর্মান্দোলনের পাঠকমাত্রই তা জানেন।

কিন্তু একথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে মূর্তিপূজায় বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মানুভূতির প্রথম স্তর মাত্র। আসলে বিবেকানন্দের ধর্মসাধনার চরম বিকাশ ঘটেছিল অদ্বৈতব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে। এখানে রামমোহন ও বিবেকানন্দের ধর্ম-উপলব্ধি প্রায় এক। তবে জীবের মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিকে বিবেকানন্দ শুধুমাত্র সূক্ষ্ম ধর্মালোচনার সীমায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। আচার্য শঙ্করের পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে আচার্য রামানুজ এবং মানবপ্রেম-বিগলিত মহামানব শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ধর্মের সংমিশ্রণে তিনি অদ্বৈতব্রহ্মবাদকে এমন একটি সার্ব-ভৌম রূপ দিতে পেরেছিলেন—যা একটি সজীব ও সক্রিয় সমাজধর্মরূপে জাতীয় চিত্তে বল ও বীর্যের সঞ্চার করেছে। সাধারণতঃ স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী-মহলে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে জীবমাত্রকেই ব্রহ্মবোধে সেবাকে বিবেকানন্দের ধর্ম উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলে মনে করা হয়। বর্তমান মানব-মাহাত্ম্য উপলব্ধির যুগে এরূপ একটি সাম্যবাদী চেতনা বুদ্ধিজীবী মানুষের মনকে সহজে আকর্ষণ করে বলে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মকেই তাঁরা বড় করে দেখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মভাবনার মহত্তম পরিণতি হল মানুষের মধ্যে ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য, শক্তি ও বীর্যের অনুভব—যে অনুভবের সাহায্যে মানুষ জীবনে দুঃসাধ্য কর্মকেও সহজ করে তুলতে পারে। স্বামীজীর আত্ম-প্রত্যয়ান্বিত এ মহৎ জীবনবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা ও সমাজচিন্তার জগতেই শুধুমাত্র একটি সজীব প্রেরণারূপেই দেখা দেয়নি—বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের জটিল সংকটের দিনেও জাতীয় সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তির নির্দেশক একটি উজ্জ্বল আলোকরেখার মত পথ দেখাচ্ছে।

প্রমাণ-পঞ্জী ঃ

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, কলিকাতা, ১৩৬১

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ, কলিকাতা, ১৯৫৯

কাজী আবদুল ওদুদ ঃ বাংলার নবজাগরণ, কলিকাতা

Romain Rolland : The life of Ramkrishna : Advaita Asram, Almora.

## মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্বনাথ বসু

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোনোরূপ সংশয় না থাকিলেও তিনি ছিলেন জগতের উদারতম ধর্মপ্রচারক। প্রত্যেক ধর্মকে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দিক দিয়া বিচার করিতেন। মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মমতগুলির কি অবদান ছিল সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এখানে আমরা কেবলমাত্র মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিব।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান স্বামীজী ভালভাবেই পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান বিভেদ অতীতের ঘটনা হইয়া গিয়াছে। 'বিবেকানন্দ ছিলেন সর্ববিধ বন্ধনের অপনোদক।' অনাথ আশ্রম স্থাপনের ব্যাপারে এক চিঠিতে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন—'মুসলমান বালকও লইতে হইবে বইকি, এবং তাহাদের ধর্মনষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্‌ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতব্রত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। জীবন্ত ভগবানের পূজা করিতে হইবে। বিভেদই বন্ধন, অভেদই মুক্তি। সকল ধর্মের ছেলেদের উহাতে যোগ দিতে বলিবে—হিন্দু, ক্রীশ্চান, মুসলমান।' নিবেদিতার এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন—'কি জান, আমি আমাদের মুসলমানদের ভালবাসি।' তাঁহার এই ভালবাসা মৌখিক ছিল না।

### স্বামীজীর জীবনে মুসলমান সংস্পর্শ

অতি শৈশবকাল হইতেই স্বামীজী মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের অনেক অভিজাত মুসলমান মক্কেল ছিল। এবং লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তিনি তৎকালীন বহু অভিজাত মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। ফলে আহারে বিহারে তিনি মুসলমানী আদব কায়দা অনুসরণ করিতেন।

উত্তরকালে যাঁহার পাদমূলে বসিয়া স্বামীজী জীবন গঠন করিয়াছিলেন সেই সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষার ফলস্বরূপ তিনি ধর্ম সম্বন্ধে উদারতম ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব, উদার ধর্মবোধ ও অপরের প্রতি সহানুভূতির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমানকে যে তিনি সমভাবে ভালবাসিতেন এবং তাঁহারাও যে তাঁহাকে ভালবাসিত আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। পরিব্রাজক

জীবনে আলমোড়ায় ক্ষুধায় অবসন্ন ও মূর্ছিতপ্রায় হইয়া তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকীর স্বামীজীর ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে একখানি শশা খাইতে দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামীজী এই মুসলমান ফকীরের উপকারের কথা ভুলিয়া যান নাই। পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজীকে যে সভায় আলমোড়ার অধিবাসিগণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছিল সেই সভায় স্বামীজী তাঁহাকে দেখিতে পান। অবশ্য ফকীর তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি জনতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া সাদরে নিজের কাছে আনিয়া সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহার পরিচয় দেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। এই পরিব্রাজক জীবনেই আলোয়ারে স্বামীজী জনৈক মৌলভী সাহেবকে প্রধান ভক্ত ও বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। মৌলভী সাহেব স্বামীজীকে একজন শ্রেষ্ঠ ফকীররূপে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার অকপট বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীজী জাতিভেদের ঊর্ধ্বে। তিনি স্বামীজীকে নিজ বাড়িতে আনিয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী মৌলভী সাহেবকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'কোরানের এইটিই বিশেষত্ব যে, আজ পর্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই। ১১০০ বৎসর পূর্বেও ইহা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে রহিয়াছে; কোথাও একটি নূতন কথা বসে নাই। প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।'

মহীশূরে আবদুল রহমান সাহেব নামে মহীশূররাজের একজন মুসলমান সভাসদ্ কোরানের কয়েকস্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে সন্দেহ ছিল তাহা মিটাইয়া লন। তিনি হিন্দু-ফকীরের মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী বহুপূর্বেই কোরানের অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভাব নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বামীজী আমেরিকায় ভারতের মুসলমান শাসন ও খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সকল ধর্মের লোকের ভিতরই—মুসলমানগণের ভিতরও—স্বামীজীর শিষ্য ছিল। অমরনাথ যাত্রার প্রাক্কালে 'একজন মুসলমান পর্যন্ত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতে পারে' তাঁহার এইরূপ মত অনেককেই বিস্মিত করিয়াছিল। কাশ্মীরে মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমারূপে তিনি পূজা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে একবার স্বামীজী জনৈক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি ধর্মাবলম্বী। সগৌরবে জয়োল্লাসিতকণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, 'খোদাকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী'। স্বামীজী এই স্ত্রীলোকটির স্বধর্মে আস্থা ও গৌরববোধ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

## বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলাম

বিরাট মনীষী এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয়, আত্মবিস্তার এবং মানবসভ্যতায় ঐ সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ

সেই সকল বক্তব্যের কিছু সঙ্কলন দেওয়া যাক।

স্বামীজীর মতে মহম্মদ ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সাম্যভাবের বার্তাবাহক এবং যাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব বজায় থাকে তজ্জন্য তিনি স্বীয় জীবনে ইহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদের সবচেয়ে বড় শিক্ষার কথা ভুলিতে পারিতেন না।

তাঁহার উপদেশ সাধারণ মানুষদের জন্য ছিল। অনেক বিষয়ে স্বামীজী মহম্মদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই, তথাপি "it cannot be denied that Mohammad was a world figure, and that the force which he set free has shaken this world and has not yet expended itself." স্বামীজী মহম্মদকে ঐশী-ক্ষমতাসম্পন্ন লোক বলিয়া মনে করিতেন—"he became one of the Illumined Ones, destined to rank for all time with the very elect of God"

আরবজাতির উত্থানের কাহিনী স্বামীজী বিশেষ দীর্ঘ সময় ধরিয়া বর্ণনা করিতেন। আরবের উত্থানকে স্বামীজী শক্তি ও বিশ্বাসের প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে আরবের কি পরিবর্তন আসিল এবং কি করিয়া এই নগণ্য পশুপ্রায় আরবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাহা আমরা স্বামীজীর নিজের ভাষায় দেখিব—"বন্য পশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত করলে।" মহাবেগে যে আরবতরঙ্গ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল ছয়শতবর্ষ ধরিয়া তাহাদের গতিরোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে আরবদের সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই—"বদ্দু আরব দেখেচ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনো দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্ছে—সেই আরব। আরবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হয়।"

মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস স্বামীজীর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। আরবদের স্পেনবিজয় কাহিনী বলিতে বলিতে তিনি আত্মমগ্ন হইয়া পড়িতেন। তাহাদের 'দীন, দীন', (বিশ্বাস, বিশ্বাস) ধ্বনি তিনি যেন প্রত্যক্ষ শুনিতেন।

জগৎসভ্যতায় মুসলমানধর্মের শ্রেষ্ঠদান কি, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিতেছেন—"Islam makes its followers equal···What Mohammadanism comes to preach to the world is this practical brotherhood of all belonging to their faith. That is the essential part of the Mohammadan religion." তুরস্কের সুলতান পর্যন্ত তাঁহার স্বধর্মাবলম্বীর সহিত, সে যত দরিদ্র হউক না কেন, একত্রে আহারে কোনোরূপ সংকোচবোধ করেন না।

ইতালীর 'রেনেসাঁ' প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের পারস্যজয়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। যখন আরবরা পারস্য জয় করিল তখন আরবি ধর্ম ও পারসিক সভ্যতা

সম্মিলিত হইল। আরবের তলোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পারসিক সভ্যতা, যাহা গ্রীস ও ভারত হইতে গৃহীত হইয়াছিল, ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়া ইতালীর মৃত শরীরে প্রাণস্পন্দন করিল—ইতালীয় নবজাগরণের সূত্রপাত হইল।

মুসলমান ধর্মের গুণগুলি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিলেও তাহার দোষগুলি স্বামীজীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি মুসলমানধর্মের ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতার সমালোচনা না করিয়া পারেন নাই। তাহাদের ভ্রাতৃত্ববাদ প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ামির ফলে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ তাহারা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসের অমোঘ বিধান এই যে, যে জাতি যত আত্মকেন্দ্রিক হইবে সে জাতি তত স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহা এই গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতারই ফল।

পৃথিবীর প্রধানতম ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, ক্রীশ্চানধর্ম ও ইসলামধর্মের সার্বজনীন ধর্ম হইবার প্রচেষ্টা খুবই প্রবল। কিন্তু কোনো ধর্মই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক জাতির কয়েকটি বৈশিষ্ট আছে এবং জাতীয় ধর্মের মধ্যে উহার চরমতম অভিব্যক্তি দেখা যায়। স্বামীজীর মতে উপরোক্ত কোনো ধর্মসম্প্রদায়ই সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম হইতে পারে না। সার্বজনীন ধর্ম হইতে গেলে উহারা অপর জাতির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিবে। স্বামীজী বলিতেছেন—I do not condemn the institution of other races ; they are good for them, but not for us. What is meant for them may be poison for us.

মহম্মদ মূর্তিপূজা ও আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে, ইহা করিলে ইসলাম আচারগত ধর্মে পরিণত হইবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে সেন্টপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং তাহারা সাধুদের কবর একরূপ প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিতেন! প্রকৃত কথা এই যে, আমরা ব্যক্তি বিশেষকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপ করা আমাদের পক্ষে হিতকর।

সর্বোপরি, মুসলমান ও ক্রীশ্চান ধর্মের একটি বৃহৎ ত্রুটির দিকে তিনি অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছিলেন। ইসলাম ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যখনি সেই ব্যক্তির চরিত্রে কোনো দোষ আবিষ্কৃত হয় তখনি সেই ধর্মের মহিমা অনেকাংশে কমিয়া যায়। বেদান্ত যেহেতু কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় সেই হেতু ইহার সার্বজনীন আবেদন আছে।

## ভারতে মুসলমান-শাসন

বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলামের স্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভারতের মুসলমান শাসন সম্বন্ধে তাঁহার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমানেরা আর বহিরাগত আগন্তুক নহে, তাহারা এদেশেরই সন্তান।

অথচ হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারে নাই। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কি চিন্তা করিয়াছেন তাহা গভীরভাবে বিবেচনার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি।

স্বামীজী প্রত্যেক জাতিকে তাহার শ্রেষ্ঠগুণগুলির দিক দিয়া বিচার করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অপর সম্প্রদায়ের গুণগুলির প্রতি উদারতা না দেখানোর ফলেই জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধের সৃষ্টি হয়। অপর সম্প্রদায়ের গুণগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানানোর মত মানসিক উদারতা তাঁহার ছিল। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে স্বামীজী যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে তাহার বর্ণনা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মোগল বাদশাহগণের কীর্তি কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। মোগলগণের গরিমা তিনি শতমুখে বর্ণনা করিতেন। সিস্টার ক্রিশ্চিন বলিয়াছেন—

'The Moguls seemed to have cast a spell over Swami Vivekananda. He depicted this period of Indian history with such dramatic intensity, that the idea often came to us that he was perhaps telling the story of his own past. We often wondered whether we saw before us the re-incarnation of the mighty Akbar.

স্বামীজীর মতে বাবর বিদেশী ও আক্রমণকারী হওয়া সত্ত্বেও সম্রাটরূপে তিনি নিজেকে ভারতবাসীর সহিত একীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও টান প্রবল ছিল। তিনি এমন এক মহত্তম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যাহা মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

আকবরকে স্বামীজী জাতীয়গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ সর্বগুণান্বিত সম্রাট খুব কমই জন্মিয়াছেন। তিনি সাহসী, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীল, খেলাধুলো ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং স্বভাবে সংযমী ছিলেন। মাংসে বীতস্পৃহ, সর্বধর্মের প্রতি সহনশীল, এমন কি ব্রাহ্মণদের কাছে হিন্দুযোগের গূঢ় তথ্যানুসন্ধানে উৎসুক এইরূপ নৃপতি সত্যই বিরল। পরবর্তীকালে হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, পারসিক প্রভৃতি ধর্মসমন্বয়ে তিনি এক নূতন ধর্ম স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানকে আকবর সমান চক্ষে দেখিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর নির্ভরশীল। আকবর বিবেকানন্দের চক্ষে এক আদর্শ-মানুষ ছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার The Master As I Saw Him গ্রন্থে স্বামীজীর আকবরপ্রীতির কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—'আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত বাতাতপমুক্ত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীর কণ্ঠ যেন অশ্রু গদ গদ হইয়া আসিত, এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত বেদনা কাহারও আর বুঝিতে বাকি থাকিত না।' তানসেন রচিত আকবরের

সিংহাসনাধিরোহণ বিষয়ক গানটি তানসেনেরই সুরে গাহিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, এইকালে মোগল রাজসভা বিলাসিতা ও আড়ম্বরের শিখরে উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের মহিষী জগতের-আলো নূরজাহানই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শাসক ছিলেন। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং নূরজাহানের বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতার জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, ঐশ্বর্য ও বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল।

ললিতকলা ও উদ্যান বিন্যাস-শিল্পে নূরজাহান সত্যই বিশেষ গুণবতী ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে মোগল স্থাপত্যশিল্পে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। মধ্য এশিয়ার পার্বত্য শিল্পরীতির পরিবর্তে পারসিক সূক্ষ্ম কারুকার্য ও কমনীয়তা এই যুগেই প্রবর্তিত হয়। অধিকাংশ অট্টালিকা মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত হইতে থাকে। ইতিমদ্দৌলার সমাধি এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে নূরজাহানের অভিভাবকত্বে নির্মিত হইয়াছিল।

সাজাহানের প্রশংসা স্বামীজী অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে করিতেন। একবার সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী উৎসাহভরে বলিয়া ওঠেন, "আহা, তিনিই মোগল-কুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। এমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্য-বোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন। আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলাসম্পদের অঙ্গ বিশেষ। কি প্রতিভা!" অবিবেচনাপূর্বক লিখিত একটি শব্দ-প্রসঙ্গে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "সাজাহান নিজেকে 'বিদেশী' নামে অভিহিত শুনলে কবরের মধ্য থেকেও ফিরে দেখতেন, কে তাঁকে ঐরকম বলছে।"

মোগল-কুলের শিল্প ও স্থাপত্য স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়বস্তু ছিল। দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনা তাঁহার বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিত। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ যেখানে ভাঙা মদের বোতল ভারতবর্ষের দানস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, সেখানে আমরা মুসলমানদের কাছে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসজিদ লাভ করিয়াছি। 'আগ্রার মোগল যুগের কীর্তির সমারোহ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

কিন্তু এই যুগের শিল্পপ্রতিভা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বিশ্ববিশ্রুত স্মৃতি-সৌধ তাজমহলে। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য এই অনিন্দ্য-সুন্দর মর্মরপ্রস্তরের সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। কারুকার্যের সুষমায় ও সৌন্দর্যের মাধুর্যে এই অনুপম শিল্পকীর্তি জগতের কয়েকটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একবার স্বামীজী তাজমহলকে "একটি ক্ষীণালোক স্থান, তৎপরে আর একটি ক্ষীণালোক স্থান, আবার সেখানে একটি সমাধি"—এইরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"It is interesting to compare this first imperfect attempt with the perfection attained in the Taj

Mahal where 44 stones of different shades of red are used to reproduce the delicate shades of one rose petal."

মোগল শাসনের স্থায়িত্ব এবং পরবর্তী পতনের কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে বলিয়াছেন—"হিন্দুরা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার চেয়ে পারমার্থিক স্বাধীনতা—মুক্তির উপর বেশি জোর দেয়। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। ঐখানটায় হাত দিলেই সর্বনাশ।······মোগলরাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি—জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো এদের সকলের মা যে হিন্দু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগলরাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল।"

ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানদের এত সংখ্যাধিক্য কেন এবং ভারতে মুসলমানবিজয় এত সহজসাধ্য কেন হইয়াছিল তাহা স্বামীজী শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে নভেম্বর, ১৮৯৪ খৃঃ লিখিত পত্রে অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন—"একথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।···বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল! আর সেইজন্যই বাংলাদেশে, যেখানে জমিদাররা বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষক "সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।" মাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি পুনরায় বলিলেন—নিজের দোষে ভারতবর্ষে এত লোক মুসলমান হইয়াছে। সাধারণ মানুষকে অবহেলা করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। গরীবেরা যখন পদদলিত তখন ভারতবর্ষের উপর ভগবানের অভিশাপ নামিয়া আসিল, ভারতে মুসলমানবিজয় সম্ভব হইল। স্বামীজী "The Future of India" প্রবন্ধে পুনরায় বলিলেন—"It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire."

ভারতবর্ষে মুসলমান বিজয়ের ফলে 'একচেটিয়া অধিকারের, একচেটিয়া দাবির দিন চলিয়া গিয়াছে'। মুসলমানধর্ম পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে। এই পুরোহিত প্রাধান্যের ফলেই ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজী মনে করিতেন একমাত্র মুসলমানধর্মই বাস্তবক্ষেত্রে 'সাধারণ লোকদিগকে সর্ববিধ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে এবং উচ্চপদস্থ লোকদিগকে সর্বসাধারণের সহিত সমান পর্যায়ে রাখিয়া দেয়।' নিবেদিতা বলিয়াছেন —নীচবংশোদ্ভবগণকে উচ্চ উচ্চ সামাজিক অধিকার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া তাহারা যে এই অতি শান্তস্বভাব জাতিটির মধ্যে দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার্থে উদ্যম ও বাধাপ্রদানরূপ আদর্শদ্বয়কে সংরক্ষণ ও পোষণ করিয়াছে—তাহাদিগের কৃত এই উপকারও স্বামীজীর নিকট উপেক্ষণীয় বস্তু ছিল না।

মুসলমানগণ কিন্তু চিন্তার জগতে ভারতবাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহামতি আকবর আচার ও আচরণে একজন হিন্দু ছিলেন। হিন্দু চিন্তা সুফীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। মুসলমানেরা এদেশে অনধিকার প্রবেশ করিলেও, তাঁহারা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্য শাসনপদ্ধতি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্বামীজী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় উদারতা মুসলমানদের অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

## ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবী রূপ

আজ ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান বিবাদ এবং এই বিবাদের ফলেই ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা আজ বিপদের মুখে। এই সমস্যার সমাধান কি হইতে পারে এবং কি পন্থা গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে ভারতে এক আদর্শ-রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব তাহার সুন্দর ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন হিন্দু ও মুসলমান এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ আসিতে পারে। আজীবন বেদান্তধর্মকে সকল ধর্মের উপরে স্থান দিয়াও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণই কেবলমাত্র দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে বেদান্তপ্রচারিত সাম্যের সমীপবর্তী হইয়াছেন। হিন্দুগণ যদিও অদ্বৈতবাদ ধর্মের তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু কর্মে-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism) তাহাদের মধ্যে কখনও সার্বজনীনভাবে পুষ্টিলাভ করে নাই। তিনি চাহিতেন ভারত "ইসলামের মত দেহ এবং বেদান্তের মত হৃদয়ের" অধিকারী হউক। মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল—মাতা যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হৃদয়'-রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিগ্রহ-স্বরূপ হন। আমরা তাঁহার এই একই কথার পূর্ণতম অভিব্যক্তি দেখি তাঁহার ১০ই জুন, ১৮৯৮ খৃঃ মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত বিখ্যাত চিঠিতে—

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।"

হিন্দুধর্মে-বিশ্বাসী স্বামীজীর ভবিষ্যৎ ভারতের মঙ্গলময় পথের ইঙ্গিত শুধু আমাদের বিস্ময়াবিষ্টই করে না, পরন্তু সমস্যাজর্জরিত ভারতের সমাধান তাঁহার চক্ষে এত সত্যরূপে প্রতিভাত হইতে দেখিয়া আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিভূত না হইয়া পারি না।

জগতে যিনি উচ্চ আদর্শ প্রচারে ব্রতী, পৃথিবীর সমক্ষে সর্বধর্মসমন্বয়ের যিনি আদর্শ চরিত্র এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শান্তির পথের যিনি দিশারী তিনি যে সকল ধর্মসম্প্রদায়কে বিভেদ ও হিংসা ভুলিয়া একে অপরকে সহ্য ও ভালবাসিতে উপদেশ দিবেন তাহা যদি তিনি নিজের চরিত্র ও ব্যবহার দিয়া দেখাইয়া না দিতেন তবে তাহার কি কোনো মূল্য থাকিত? তিনি মুসলমানদের এত আপন করিতে

পারিয়াছিলেন বলিয়াই তো নৈনিতালে আমরা একজন মুসলমান ভদ্রলোককে বলিতে শুনি—"স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান "হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী।" সিস্টার ক্রিশ্চিন বলিয়াছেন—

"In a man like Vivekananda, with "a genius for seeing only what was great in an individual or a race, such understanding of the Mussalman was nothing strange. To him India was not the land of the Hindu only, it included all. "My brother the Mohammadan" was a phrase he often used. For the culture, religious devotion, and virility of these Mohammadan brothers, he had an understanding, an admiration, a feeling of oneness which few Moslems could excel."

## স্বামীজীর জীবনে ও চিন্তাধারায় সুফী প্রভাব

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্র 'ধ্যানসিদ্ধ' ও নারায়ণের অংশরূপে অবতীর্ণ প্রাচীন 'নর' ঋষি ; তিনি যে কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—এ-কথা বলা কোনরূপেই সমীচীন নয়। সমকালীন সকল ভাবই এই সকল যুগমানবের অন্তর থেকে আপনা হতেই উত্থিত হয়। তাহলেও মানুষ-জীবনে তাঁর যেমন গুরুদেব ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি ছিল তাঁর মাতাপিতা ও বংশ-গৌরব। আবার যেমন তিনি শিক্ষা করেছেন হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য, তেমনি তাঁর ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য বিদেশী ধর্ম ও সাহিত্য, তথা প্রাচীন ইরানীয় ধর্ম ও কৃষ্টি, খৃষ্টান ধর্ম ও ইওরোপীয় সাহিত্য এবং ইসলাম ধর্ম ও এর সুফী চিন্তাধারা।

কলিকাতারই অধিবাসী রামমোহন দত্তের পুত্র (নরেন্দ্রনাথের পিতামহ) দুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন সংস্কৃত ও ফারসী—এই উভয় ভাষাতেই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া তিনি আইনেও ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তবু মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে পুত্র বিশ্বনাথের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজ্ঞ এটর্নী। তাছাড়া তাঁর ফারসী ভাষায় ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। কথিত আছে, তিনি অনেক সময় তাঁর পরিবারবর্গকে ফারসী কবিতা বিশেষ করে কবি হাফিজের গজল বা প্রেমগীতিকা শুনিয়ে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করতেন। যেমন ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি সঙ্গীতে ছিল বিশেষ অনুরাগ। এবং তাঁরই আগ্রহে নরেন্দ্রনাথ হলেন সঙ্গীতানুরাগী ও তাঁর কলেজ-জীবনে সুকণ্ঠ আহমদ খানের কাছে হিন্দী উর্দু ও ফারসী গান শিক্ষা করেন।

এই উন্নত-কৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বনাথ স্বভাবতই উদারচেতা ও অতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই সহজ, সরল ও উদার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক সময়ই বিরূপ মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষ অনেক সময় বাহ্য আচার-ব্যবহারকেই বড় করে দেখে। যাঁর ভিতরে ফল্গুনদী প্রবাহিত, তিনি কি কখনও নির্দয় হতে পারেন ? আমরা যেরূপেই গ্রহণ করি না কেন, গিরিশচন্দ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহাস্পদ ও স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ জগাই-মাধাই লোকচক্ষে মাতাল ও যবন-ভাবাপন্ন হলেও তাঁরা ছিলেন পরম ভক্ত ও প্রসিদ্ধ সুফী কবি জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী-কাব্যের বিশেষ রসগ্রাহী। কিন্তু এই মসনবী-কাব্যের রসগ্রাহী বলেই এই পরমভক্ত দুজনকে মধ্যযুগের 'চৈতন্যমঙ্গল'-কার জয়ানন্দ বিশেষ নিন্দা করেছেন।

এ নিন্দায় কি আসে যায় ?—জহুরীই বস্তুতঃ জহর চেনে।

কথিত আছে, মাতালকে সাহায্য করায় বিরূপ মন্তব্য করলে বিশ্বনাথ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মানবজীবনের দুঃখ-ব্যথার মর্ম তুমি কি বুঝবে ? মাদক-দ্রব্যের সহায়ে এই হতভাগারা কেবল ক্ষণিকের জন্যই তাদের এ দুঃখ ভুলে থাকতে চেষ্টা করে; তা যখন বুঝতে পারবে, তখন আপনা হতেই তাদের প্রতি তুমি সহানুভূতিশীল হবে।' দুঃখের বিষয় তাঁর পিতা দেখে যেতে না পারলেও এই পরোক্ষ আশীর্বাদ নরেন্দ্রনাথের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল।

তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন পরম বুদ্ধিমতী ও কষ্টসহিষ্ণু। নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন উদার মন, বিশ্বজনের প্রতি দরদ, দার্শনিকসুলভ স্বভাব ও সৌন্দর্যপ্রীতি, তেমনি তাঁর মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন পরম নিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা।

কঠোর সংযম-নিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে প্রথম জীবনে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে না পারলেও, এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গানকে সব সময়ই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও পরবর্তী জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি ছিলেন তিনি অসীম শ্রদ্ধাবান্। বস্তুতঃ সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে কি করে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র প্রেমের উপলব্ধি হতে পারে ? স্বামীজীর শ্রীকৃষ্ণলীলা-গানের প্রতি বক্রোক্তি অনেকটা যুবক-সমাজকে সংযমনিষ্ঠ করার কৌশলমাত্র। এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত প্রেমের আদর্শের সঙ্গে ফারসী সূফী আদর্শ তুলনীয়।

স্বামীজী যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের স্তুতি করেছেন, তেমনি ফারসী গজল তথা হাফিজের কবিতার প্রতিও তাঁর ছিল পরম প্রীতি। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র নবম খণ্ডে পাই, তাঁর হিমালয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে ১৮৯৭ খৃঃ মার্চ মাসে বেলুড় গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়িতে একটি বিশেষ জনসমাগমে পারসিক কবিতার বিস্তৃত আলোচনা হয়। কয়েকজন ইওরোপীয় সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্বামীজী সেখানে ফারসী প্রেমগীতিকার হাফিজের প্রসিদ্ধ সেই কবিতাটি আলোচনা করেছিলেন, যার অর্থ—'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে পারি।'

—এই পদটি আবৃত্তি করতে করতে সহসা তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে পারে না, তার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।'

প্রেম-সঙ্গীতে আকৃষ্ট সৌন্দর্য-পিয়াসী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মাত্র প্রথম পদটির ফারসীরূপ ও পূর্ণ গজলটির বাংলায় তরজমা দিচ্ছি।

অগর্ আঁ তুর্কে-শীরাজী বদস্ৎ আরদ্ দিলে-মারা ;
বখালে-হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ্ ও বুখারা রা।

—যদি শিরাজের সেই তুর্কি সুন্দরী আমার হৃদয় গ্রহণ করে, তবে তার কালো তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা বিলিয়ে দিতে রাজী আছি।

'হে সাকী, এই চিরস্থায়ী সুরা। আমাদের পান করতে দাও, কারণ বেহেস্তে এই স্রোতস্বিনী রুক্‌নাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া যাবে না। হায়, তুর্কীগণ যেমন লুণ্ঠিত দ্রব্য হরণ করে নিয়ে যায়, সুপটু ও শহরময় চাঞ্চল্য-উৎপাদনকারী প্রেয়সীগণ তেমনি আমাদের হৃদয় হতে ধৈর্য কেড়ে নিয়েছে। বন্ধুর সৌন্দর্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন তোয়াক্কা করে না। সুন্দর মুখে আবার (বাইরের) আভা, বর্ণ, তিল বা গালের টোলের কি দরকার? আমি ইউসুফের সেই ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য হতে জেনে নিয়েছিলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলেখাকে সতীত্বের আবরণ হতে বাইরে টেনে নিয়ে আসবে। তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ—আমি এতেই সন্তুষ্ট,—ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করুন; তুমি আমাকে ভালোর জন্যই বলেছ, চিনি-মিশ্রিত অধরের পক্ষে তিক্ত উত্তরই শোভা পায়। হে প্রাণপ্রিয়, আমার কথা শোন, কারণ ভাগ্যবান্ যুবকেরা এই জ্ঞানী বৃদ্ধের উপদেশ প্রাণাপেক্ষাও পছন্দ করেন। চারণকবি আর সুরার কাহিনীর কথা বলো ও পৃথিবীর গূঢ় রহস্য অল্পই জানতে চেষ্টা কর; কারণ জ্ঞানদ্বারা কেউই এ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি এবং (ভবিষ্যতেও) পারবে না। হে হাফিজ, তুমি এ প্রেম-গীতিকা গেয়ে মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছ। এস, সুললিত কণ্ঠে (আবার) এ গান কর; কারণ স্বর্গ থেকে তোমার গানের উপর পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে।'[১]

অপূর্ব এর তত্ত্বকথা। আমাদের রাধাকৃষ্ণের সহিত ইউসুফ-জুলেখা চরিত্রের সাদৃশ্য তুলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্র বৈষ্ণবভক্তদের পরম আদরের জিনিস। তাঁরা একে দ্বৈতবাদ মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়বস্তু মনে করে থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব এই পরম পবিত্র গ্রন্থের সূচনাতেই বলে দিয়েছেন যে, ইহা বেদ তথা উপনিষদের ব্যাখ্যান মাত্র। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর পরম রূপটি রূপকভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে ইউসুফ-জুলেখাকে অবলম্বন করে ফারসী সুফী কবিদের অনেক প্রেম-গাথা বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রেমের স্বাদ যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের লক্ষ্য করেই স্বামীজী বলেছেন, 'তার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।'

মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী, তথা 'মসনবীয়ে মনবী' (বা আধ্যাত্মিক কাব্য) এরূপ একটি পবিত্র গ্রন্থ। এ-কে ফারসী কবিতায় কোরানের ব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে। এখানে কবি কোরানের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেনঃ আমি কোরানের মগজ বা আসল অর্থটি বেছে নিয়েছি, এর হাড়গুলি বা বাহ্য সাধারণ অর্থটি কুকুরদের জন্য। অর্থাৎ যারা বাহ্যরূপে মুগ্ধ তাদের ছুঁড়ে দিয়েছি।

১. লেখকের 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে' এই কবিতাটির ফারসী অক্ষরান্তরী-করণসহ সংক্ষেপে হাফিজের জীবনী ও কাব্য-কথা বর্ণিত হয়েছে।

'মন্ জে কোরান্ মগ্‌জ্ রা বর্ দাশ্‌তম ;
উস্তুখ্‌বান্ পেশে-সগান্ অন্দাখ্‌তম্ ।'

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফারসী সূফী কবি প্রিয়ার সুন্দর মুখের 'তিল' ( খাল্ )-এর ব্যাখ্যা কী সুন্দরভাবে করেছেন! ধ্যানে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা অসম্ভব ; এই উভয় পৃথিবী তাঁর তিলের প্রতিবিম্ব মাত্র। যখন তাঁর তিলের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই, তখন এরূপ ভাষার প্রয়োজন যা শরীরকে ( অর্থাৎ দেহভাবকে ) ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। সামান্য পিঁপড়ের ন্যায় এই সম্পদেই আমি সন্তুষ্ট, কারণ আমার তুলনায় ভারী বোঝাকে আমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।[২]

পিতার ন্যায় নরেন্দ্র যেমন ছিলেন হাফিজের গজলের প্রতি আকৃষ্ট, তেমনি মৌলানা রূমীর মস্‌নবী ও দেওয়ানে-শম্‌সে-তব্রীজের প্রতি ছিল তাঁর পরম শ্রদ্ধা। একাধিক স্থানে তিনি রূমীর কাব্য-কথা উল্লেখ করেছেন। আর ফারসী সূফী কবিদের ভাবধারার সহিত তাঁর চিন্তাধারার ঐক্য কেবল আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল মহৎ ব্যক্তিই একই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ।

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে উপনিষদের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর অপূর্ব রূপটি যে প্রেমের দ্বারাও সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, স্বামীজী কী সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন! তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। সেই অপূর্ব রূপ বাক্য বা মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। যখন জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে বাক্য-মনের ঊর্ধ্বে ওঠে, তখনই তাঁর হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব—আমি ও সমগ্র জগৎ এক ; আমি ও ব্রহ্ম এক—এ ভাবের উদয় হয়। আর এ ভাব যে কেবল শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্ধ হতে পারে, তা নয়, প্রেমবলেও এর কতকটা আভাস পেতে পারি।' তার পরই শ্রীমদ্ভাগবত ও মসনবীর দুটি ছবি পাশাপাশি স্থাপন করে স্বামীজী প্রেম-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যান করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, গোপীগণের মধ্য হতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে তাঁর বিরহে বিলাপ করতে করতে তাদের মনে তাঁর ভাবনা এরূপ প্রবল হয় যে, গোপীগণের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হয়ে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে তাঁরই মতো বেশভূষা করে তাঁরই লীলা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত হল। প্রেমের সাহায্যে যে সেই 'এক'-এর অনুভূতি হতে পারে, তা আমরা ফারসী সূফী কাব্যেও পাই। স্বামীজীও বলেছেন, প্রাচীন পারস্যদেশীয় সূফী কবিতায়ও এরূপ একটি ভাবের কথা আছে : প্রেমাস্পদের নিকট গিয়ে দেখলাম গৃহদ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত করায় ভিতর হতে প্রশ্ন হল, 'কে?' উত্তর দিলাম, 'আমি'। দ্বার খুলল না। দ্বিতীয়বার এসে দ্বারে আঘাত করলাম। আবার সেই প্রশ্ন, 'কে?' —'আমি অমুক'। দ্বার খুলল না। তৃতীয়বার আসায় আবার সেই প্রশ্ন 'কে?' —'হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি'। তখন

২ নিকল্‌সন্ সঙ্কলিত মস্‌নবী, ২য় খণ্ড, পঙ্‌ক্তি ১৯১-৩।

দ্বার খুলল।’

মৌলানা রুমী মূল আখ্যানটি কাব্যময় ও আরও গূঢ় ইঙ্গিত সহকারে আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন ঃ

সেই একজন তার বন্ধুর দ্বারে এসে আঘাত করে ;
তার বন্ধু বলে, ‘হে বিশ্বস্ত বন্ধু, তুই কে রে ?’
উত্তর দেয়, ‘আমি’। বন্ধু বলে, ‘যা, হয়নি এখনো
—আমার এরূপ পরিবেষণ-আসর অপক্কের স্থান নয়।’
( বস্তুতঃ ) অপক্ক-ব্যক্তি বিরহ ও বিভেদের আগুন ছাড়া—
কেমনে হয় পক্ক—যদি না হয় কপটতা-হারা ?
সেই হতভাগা যায় চলে—ও বৎসর খানেক ঘুরি ফিরি—
বন্ধুর বিরহের অগ্নি শিখায় তাকে পুড়িয়ে দগ্ধ করি,
বিদগ্ধ হয়ে পক্ক—এইভাবে আবার সে ফিরে আসে ;
আবার সেই গৃহের পরিবেশে অংশ নেয় যে সে।
শত ভয় ও ভদ্রতার সঙ্গে সে দ্বারের কড়া নাড়ে ;
যেন কোন অভদ্র কথা তার মুখ হতে না বেরিয়ে পড়ে।
তার বন্ধু বলে ওঠে, ‘কে আবার আমার দ্বারে ?’
উত্তর দেয়, দ্বারে তুমিই, আমার মনোহারিণি ; আরে !’
সে বলে, ‘যখন তুমিই আমি, হে আমি, এসো ঘরে !
( কারণ ) স্থান হয় না দুই ‘আমি’-র এই একই ঘরে’।

মসনবী একটি বর্ণনামূলক আখ্যায়িকা কাব্য। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় নানা আখ্যানের মাধ্যমে সেই অপরূপ প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর তাঁরই দেওয়ানে-শমসে-তব্রীজে জয়দেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দ অথবা আমাদের চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির ন্যায় নানা গীতময় মধুর ছন্দে রুমী গজল বা প্রেম-কাব্য রচনা করেছেন। কী সুন্দরভাবে একই ভাবধারা তাঁর গজল-কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে !

এমনি চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হয়েই স্বামীজী তাঁর ‘Inspired Talks’ বা ‘দেববাণী’তে বলেছেন, ‘সব জ্ঞানই প্রতিবিম্বিত জ্ঞান মাত্র, যেমন আয়নায় আমরা আমাদের মুখ দেখতে পাই। কেউ কখনও নিজের স্বরূপ বা ভগবানকে জানতে পারে না। বস্তুতঃ আমরাই সেই আত্মা বা ভগবান।’ ভগবান যে আমাদের প্রতিবিম্বিত রূপ মাত্র তা আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তারের ‘মুনতিবুৎ-ত্বয়ের’ ( বা পাখিদের আলোচনা ) নামক কাব্য-গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

স্বামীজী তাঁর ‘দেববাণী’র আর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই কী সুন্দরভাবে প্রেমের

৩ লেখকের ‘পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস’, পৃঃ ৬৪-৬৮।

স্বরূপটি ব্যাখ্যা করেছেন। 'ভগবানকে ভালবাসতে গিয়ে আমরা নিজেদের দুভাগ করে ফেলি—আমার স্বরূপের প্রতি প্রেমাকর্ষণ। ভগবান যেমন আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমিও সেরূপ তাঁকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ভগবানকে আমাদের অনুরূপ করে সৃষ্টি করি। আমরাই তাঁকে আমাদের প্রভুরূপে সৃষ্টি করেছি—ভগবান আমাদের তাঁর দাসরূপে সৃষ্টি করেননি। যখন বুঝতে পারি যে আমরাও ভগবানের সহিত এক হয়ে আছি, তিনি এবং আমি (পরস্পর) বন্ধু—তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা আসে ও আমরা মুক্তিলাভ করি। যতদিন তুমি নিজেকে সেই অশেষ ও অসীম হতে একচুল তফাৎ মনে করবে, ততদিন ভয় কখনো দূর হতে পারে না।' এখানে আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী যেন চিনি খেতে চাচ্ছেন না, বরং চিনিতে রূপান্তর লাভ করাকেই অধিকতর পছন্দ করছেন।

স্বামীজী আরও বলেছেন ঃ (ভগবানকে ভালবেসে) জগতের কি কল্যাণ হবে—বোকার মতো এ প্রশ্ন কখনো করো না। সমস্ত জগৎ নষ্ট হয়ে যাক—ভালবাসো এবং আর কিছুর প্রত্যাশা করো না। চাই কেবল প্রেম—সকল বাদ-বিতণ্ডার নিপাত হোক। প্রেমপাত্র পান করে পাগল হয়ে যাও। (কেবল) বলো, 'হে প্রভু, হে পরম প্রিয়, আমি চিরকাল তোমারই।' আর সব কিছু ভুলে তাঁর প্রেমগভীরে ডুব দাও। ভগবানই যে প্রেমস্বরূপ! আর এজন্যই দেখতে পাই, ফারসী প্রসিদ্ধ কবি উমর খইয়াম বা হাফিজ কেবল সাকী, পানপাত্র ও সুরারই জয়গান তাঁদের রুবায়ী বা গজলে গেয়ে গিয়েছেন। খইয়াম নিজেই তাঁর একটি চতুষ্পদীতে এগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যান করেছেন ঃ মানুষ পানপাত্র, আর আত্মা অন্তঃস্থিত সুরা ; শরীরটি বেণুমাত্র, আর তার প্রাণ দেহস্থিত শব্দঝঙ্কার। হে খইয়াম, তুমি কি জানো, সেই মাটির মানুষটি কি ?—ভাবের ফানুস মাত্র, আর মধ্যে রয়েছে আলোকবর্তিকা।

সুফী কবিদের ন্যায় স্বামীজীও জীবনকে একটি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর রুমীর প্রসিদ্ধ মসনবী কাব্যের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই প্রাণকে বাঁশীর সহিত তুলনা করে বলা হয়েছে ঃ

'শোন, বাঁশী কি তার কাহিনী বর্ণনা করে ;
সে যে তার বিরহ-ব্যথাতেই রোদন করে।'
আর যখন তাঁদের মধুর মিলন সংঘটিত হয়,
তখনকার অবস্থা এরই শেষে বলা হয়েছে ঃ
'ভগবানই সব কিছু, প্রেমিক তো তাঁর ছায়ামাত্র,
প্রেমিকাই জীবন্ত, প্রেমিক তো মৃত কায়ামাত্র।
জুমলেহ মাশুকস্‌ৎ ও আশিক্ পরদ-ঈ ;
জিন্দহ মাশুকস্‌ৎ ও আশিক্ মুরদ-ঈ।'

লণ্ডনে প্রদত্ত 'সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন'[8] বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন, 'এই সমগ্র

8 God in Everything, C. W. Vol. II

ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রমাত্র। যখন সকল কামনা বাসনা দূর হয়, তখনই মানুষ ঠিকমত জগৎকে উপভোগ করতে পারে। তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব—ভ্রমাত্মক অধিকার বোধ থাকে না। ঋণদাতা নেই, ক্রেতা নেই, বিক্রেতা নেই—তখনই জগৎ একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ভগবান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো এমন সুন্দর ভাবধারা আর কোথাও পাইনি ঃ তিনিই কেবলমাত্র অতি-মহৎ প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎই তাঁর কাব্য—অনন্ত প্রশান্তিতে পূর্ণ, নানা শ্লোকে, নানা ছন্দ ও তালে লিখিত। সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করেই কেবল আমরা এ বিশ্ব-কবিতা-পাঠে আনন্দ পেতে পারি। তখন সব কিছুই ভগবৎ-রূপ ধারণ করে। সমস্ত আনাচে-কানাচে, সকল অলিগলি, যা পূর্বে অন্ধকার ও অপবিত্র মনে করেছিলাম, সবই তখন ব্রহ্মভাব ধারণ করে। তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন আমরা নিজেরাই আমাদের পূর্বের আচরণ মনে করে হেসে উঠি। তখন আমরা মায়ের মতো ঐ খেলার পাশে দাঁড়িয়ে কেবল দেখেছি মাত্র।'

আর মৌলানা রুমী ভগবানকে চিত্রকরের সঙ্গে তুলনা করে কি সুন্দরভাবে বিশ্বরূপটি প্রকাশ করেছেন! এই সুফী কবি সুন্দরের স্রষ্টা চিত্রকর-আখ্যায়িকার মাধ্যমে প্রেমময় ভগবান যে সকল সুখ-দুঃখের উৎস হয়েও এতদুভয়ের ঊর্ধ্বে এবং সকল দুঃখ-ব্যথা সৃষ্টি করেও তিনি যে পরম মঙ্গলময় তাই প্রমাণ করেছেন ঃ

এই দুঃখ দানও তাঁর পরিপূর্ণতারই পরিচয় ;
এ বিষয়ে একটি আখ্যান বলি, হে মহাশয়।
এক চিত্রকর দুপ্রকারের চিত্র করেন সৃষ্ট ;
পবিত্র চিত্র, আর চিত্র অপকৃষ্ট।
ইউসুফের চিত্র, আর সু-স্বভাব পরী-চিত্র ;
কদাকার শয়তান, আর দেও-দানবের চিত্র।
এই চিত্র উভয়প্রকার তাঁর প্রভুত্বেরই প্রমাণ ,
এ তাঁর অপূর্ণতার নয়, মহত্ত্বেরই প্রমাণ।
কদাকারকে যেমন দিয়েছেন তিনি পূর্ণ রূপ ;
তেমনি কদাকৃতি এঁকেছেন তথায় প্রচুর।
যাতে প্রমাণ হয় তার জ্ঞানের পূর্ণতা ;
আর তাঁর প্রভুত্ব অস্বীকারকারীর অজ্ঞতা।
হন যে অপূর্ণ না জানলে প্রকাশ কদাকারের ;
সে জন্যই তিনি স্রষ্টা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর।
এ কারণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস তাঁরই সাক্ষ্য ;
প্রণতিকালে তাঁর প্রভুত্বই যে তাদের লক্ষ্য।
কিন্তু জেনো, স্বেচ্ছায় জানায় প্রণতি বিশ্বাসী ;
কারণ, তাঁরই অনুগ্রহ আর ভগবৎ-ইচ্ছার প্রয়াসী।
অবিশ্বাসীও তাঁকেই জানায় প্রণতি, তবে অনিচ্ছায় ;

তার ইচ্ছায় যে রয়েছে নানা প্রকার অভিপ্রায়।
রাজ-দুর্গ সে-ও বটে করছে সুগঠিত;
কিন্তু তার দাবি যে করিতে নিজ অধিকৃত।
নিজ অধিকারের দাবিতে হয়েছে সে বিদ্রোহী;
অবশেষে কিন্তু সেই রাজাই হবে অধিকারী।
বিশ্বাসী রাজার জন্যই রয়েছে কেবল দুর্গ;
তার প্রকাশে নাই নিজ শক্তি ও গর্ব।
কদাকার যে বলে, হে অসৎ-সৃষ্টিকারী রাজা;
তুমি শক্তিধর করিতে সৃষ্ট সদসৎ প্রজা।
সুন্দর যে বলে, হে মহৎ ও মঙ্গলের রাজা;
মুক্ত করেছ মোরে সকল দুঃখ-দুর্দশা হতে।[৫]

ভালোমন্দের উপরে উঠে ঋষিদের ন্যায় কেবল সাক্ষিরূপে পৃথিবীটাকে ছবির মতো দেখবার উপদেশ দিতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর 'দেববাণী'র অন্য একস্থানে বলেছেন, 'ভালমন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব হল, যে অবস্থায় আছে, তেমনি পড়ে থাকা। আর মানুষের স্বভাব হল মন্দ ত্যাগ করে ভালো হবার চেষ্টা করা। কিন্তু দেবতার স্বভাব হবে কোনটারই প্রত্যাশা না করে সর্বাবস্থায় আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করা। আমাদেরও দেবতা হতে হবে। দিলকে দরিয়ায় রূপান্তর কর—পৃথিবীর সকল তুচ্ছতার উপরে উঠে যাও; এমনকি দুঃখেও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠ। জগৎটাকে একটা ছবির মতো দেখ। কোন কিছুই তোমাকে বিচলিত করতে পারে না—এটাই সঠিক জেনে এই জগৎ-ছবির সৌন্দর্য উপভোগ কর।'

স্বামীজী সুফীদের উল্লেখ করে 'দেববাণী'তে (পৃঃ ৯৯-১০০) বলেছেন, 'তাঁরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন মনে করেন।' তাঁরা বলেন, 'আন্-অল্-হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ। সুফীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-বাণীর সার্থক উপলব্ধি করেছিলেন প্রসিদ্ধ সুফী সাধক মনসুর অল্-হল্লাজ। তাঁর এ-বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জলালুদ্দীন রুমী তাঁর তত্ত্বালোচনামূলক ফারসী গদ্যগ্রন্থ 'ফীহি মা ফীহি'-তে বলেছেন, 'একটি মক্ষিকা মধুর মধ্যে পড়ে গেলে তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় রূপান্তর লাভ করে এবং কোন অংশই আর নড়তে পারে না। তেমনি 'ইস্তিমূরাক্' বা সমাধির অবস্থা তখনই বলা যেতে পারে, যখন নিজের অস্তিত্বের কোন খেয়ালই মানুষের থাকে না। কোন কাজই তখন আর তার নিজের বলে মনে করতে পারে না। যদি সে তখনও সেই জীবন-সমুদ্রে সংগ্রামই করতে থাকে এবং ক্রন্দন করে বলে, 'আমি জলমগ্ন হচ্ছি', তাহলে সে আর 'ইস্তিমূরাক্' অবস্থায় নয়। ইহাই 'অন্-অল্-হক্'-এর প্রকৃত অর্থ। সাধারণে এরূপ দাবিকে অহঙ্কারের চিহ্ন বলে মনে

৫ মসনবী, ২য় খণ্ড; ২৫৩৬-৫০

করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে 'অন্-অল্-অব্দ্' ( অর্থাৎ আমি তাঁর দাস ) বলে দাবি করে, সেই প্রকৃত অহঙ্কারী। 'অন্-অল্-হক্' অতি বিনয়ের একটি প্রকৃষ্ট প্রকাশ। যে 'আমি তাঁর বান্দা'—এই বলে দাবি করে, সে দুটি অস্তিত্বের স্বীকার করছে, তার নিজের ও ভগবানের। কিন্তু যে 'আমিই আল্লা' বলে দাবি করছে, সে এক ভগবানের অস্তিত্বেই কেবল স্থির বিশ্বাস করছে এবং তার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে বিলোপ করে দিয়েছে—'আমার কোন অস্তিত্বই নেই, কেবল এক তিনিই আছেন, আর তা ছাড়া কিছুই নেই।'—এ বিনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। দ্বৈতবাদীদের চিনি বা মধু আস্বাদের মধ্যে একটি মাধুর্য থাকতে পারে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী ও সুফী সাধক এর মধ্যেও অহঙ্কারের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন।

উপনিষদের পরম পূজারী ও অদ্বৈতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকানন্দও 'সোঽহং' ( আমিই সেই সত্যস্বরূপ )-এর বাণী প্রচারে কখনও বিরত হননি। তাঁর 'দেববাণী'-তে তিনি বলেছেন : মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও। গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখো, এবং তেমনি তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হবে, এটি বিশ্বাস কর। যাই ঘটুক, কেবল বলো, 'সোঽহং, সোঽহং'। খেতে, বেড়াতে এবং নানা কষ্টের মধ্যেও এই কথা বলো। মনকে এটি মনে করিয়ে দাও যে, এই জগৎ-প্রপঞ্চ যা দেখছি, তার কোন অস্তিত্বই ছিল না, কেবল সেই ( সত্যস্বরূপ ) 'আমি' মাত্র আছি। দেখবে, দপ্ করে একদিন সত্যের প্রকাশে মিথ্যা-স্বপ্ন ভেঙে যাবে। দিনরাত কেবল ভাবো জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ভগবানই আছেন।

এই পরম-সত্যের উপলব্ধি করতে হলে চাই আদর্শের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস। এই ভাবোন্মাদ ও তৎসঙ্গে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কার্যকারিতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রুমী তাঁর 'মসনবী'তে বলেছেন, 'ভাব-সমৃদ্ধি দ্বারা মানুষ স্বস্থতা লাভ করে, যদি সে ভাব সেই সুন্দরতমের প্রীতি হয়। আর যদি এই ভাবসমূহ কোন অস্বস্তি নিয়ে আসে, তবে আগুনে গলিত মোমের ন্যায় সে দগ্ধ হতে থাকে। সাপ ও বিছার মধ্যেও যদি সৎ-চিন্তাযুক্ত ভাব-সমন্বিত ভগবান্ তোমার আশ্রয় হয়, তবে সাপ-বিছাও তোমার সাহায্যকাংক্ষী হবে। কারণ এই চিন্তাধারা কষ্টিপাথরের ন্যায় তামাকেও সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে। এই সৎ-চিন্তাই মধুর ধৈর্যের সৃষ্টি করে; ইহাই দুঃখ হতে মুক্তির আস্বাদ দেয়। হৃদয়ের একান্ত বিশ্বাস এই মুক্তি স্বাদ বহন করে নিয়ে আসে; তার দুর্বল বিশ্বাস হতাশা ও দুঃখ বহন করে। বিশ্বাস হতে যে ধৈর্য, তা অবশেষে মাথায় ( গৌরব ) মুকুট পরিধান করে; আর যেখানে ধৈর্য নেই, সেখানে বিশ্বাসও নেই।'

Freedom of the will, অর্থাৎ যা বিশ্বাস করবে, তাই হবে। কিন্তু এই বিশ্বাস একনিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। স্বামীজী তাঁর 'আমরা কি বিশ্বাস করব ?'[৬] বক্তৃতায় ইচ্ছা-শক্তির মূল্য নির্দেশ করে আমরা কি কি বিশ্বাস করব, তার একটা

৬ What we believe in ; Complete Works, Vol. IV, p. 302-6

ফিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ব্যক্তিই ভগবৎ-স্বরূপ। প্রত্যেকটি আত্মাই সূর্য—অজ্ঞান-মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে আছে মাত্র। আত্মায় আত্মায় প্রভেদ এই আচ্ছাদনের গভীরতার রকমফের মাত্র।···আত্মার বস্তুতঃ কোন লিঙ্গ নেই, কোন জাতিধর্ম নেই, বা কোন অপূর্ণতা নেই।'

অদ্বৈতবাদী বলেন, সৃষ্টিরহস্য মনের বিকার মাত্র। মনের বিকারই আমাদের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে। নামরূপ তুলে নাও, তাহলে যে সত্যবস্তু থাকবে, তাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্য-স্বরূপ। 'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডধর ভ্রমণ করেছ, আবার জন্মগ্রহণ করে তুমিই নানা রূপ ধারণ করেছ।'[৭] ঠিক তেমনি ভাবে বাণী কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, 'আমি ও আমার ভেদ হতে তুমি মুক্ত; এই আত্মার প্রেম-লীলা চলে পুরুষ ও স্ত্রীর ভাবের মধ্যে। পুরুষ ও স্ত্রী যখন একাত্ম হয়, তখন সে তুমিই; যখন পৃথক পৃথক্ আত্মভাব বিলুপ্ত হয়, যা থাকে তা তুমিই। এই 'আমি ও আমরা' এজন্যই তুমি সৃষ্টি করেছ, যাতে নিজেই নিজের সঙ্গে খেলা করতে পারো। যাতে আমি-তুমি সকলে এক প্রাণ হতে পারে—তাই অবশেষে প্রিয়তমে মন সমর্পণ করে।'

"অয় রহীদয়-জানে-তু অজ্ মা ও মন্;
অয় লত্বীফয়-রূঃহ অন্দর্ মর্দ্ ও জন্।
মর্দ্ ও জন্ চূঁ য়ক্ শুবদ্ আঁ য়ক্ তুয়ি;
চূঁকি য়ক্হা মহ্ শুদ্ আঁকি তুয়ি।
ইন্ মন ও মা বহরে-আঁ বর্ সাখ্তী;
তা তু বাখুদ নর্দে-খিদমৎ বাখ্তী।
তা মন্ ও তুহা হমহ য়ক্ জান্ শুবন্দ্;
আক্কবৎ মস্তিঘ্রক্কে—জানান্ শুবন্দ্।"[৮]

বস্তুতঃ সেই পরমাত্মার কোন লিঙ্গ নেই, ধম বা জাত নেই—তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাই সকল গুণের অতীত, নির্গুণব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ বলে উক্ত হয়েছেন। সেই গূঢ়-রহস্য অপ্রকাশ্য। তিনি কেবল শিব ও শক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারেন। শিব পুরুষ বা পুংলিঙ্গ; তিনি static বা স্থাবর হয়েও অনন্ত শক্তির ধারক। তিনি শান্ত ও সমাহিত—তাই গুণাতীত একক ব্রহ্মের পরিচয় রাখেন। তিনি জ্ঞানী—তাই অদ্বৈতবাদী। কিন্তু তিনি পঙ্গু—তাঁর স্ত্রীরূপিণী শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি পরিচিত বা প্রকাশিত। আর শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ—তাই তিনি সৃজনশীল, বহু গুণের আধার। তিনি dynamic বা গতিশীল, চল-চঞ্চল। কিন্তু কেমন করে চলতে হবে, তা জানেন না বলেই তাঁর একটি অবলম্বন (বা প্রেরণাদানকারী স্বামী) চাই—তাই তিনি ভক্ত। তিনি অন্ধ—তাই দ্বৈতবাদী।

৭ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪/৩

৮ মসনবী, ১ম খণ্ড, ১৭৮৫-৮

শিব ও শক্তি বা জ্ঞান ও ভক্তির একান্ত সংমিশ্রণ হলেই সেই পরমের উপলব্ধি হয় ; এবং এই দুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে শিবের অবতার বলেছেন, তেমনি জ্ঞানাতীত পরাভক্তির প্রতীক শুকদেবের সহিতও তাঁকে তুলনা করেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হযেও তাঁর গুরুদেবের পরাভক্তিতে ভূলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত হয়েছিলেন। গুরুদেবের সহিত নিজের ভাবের তুলনা করতে গিয়ে তাঁর এক শিষ্যকে স্বামীজী এই খাঁটি কথাটাই বলেছিলেন, 'He was all *Bhakti* without, but within he was all *Jnana* ; I am all *Jnana* without but within my heart it is all *Bhakti*.'[১] তাঁরা দুজন যেন একই পরম-বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র।

আমরা কিন্তু আগে 'সোঽহং' বা 'আন্-অল্-হক্'-মন্ত্রের দ্রষ্টা পুরুষ, জ্ঞান-মার্গের একান্ত পথিক সুফী সাধক মনসুর অল্ হল্লাজের উল্লেখ করেছি। এখানে ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা সুফী সাধিকা রাবিয়া অল্ আদবিয়া-র উল্লেখ করছি। ভক্তির সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামীজী আমাদের আর একজন ভক্তিমতী নারী মীরাবাঈ-এর সমতুল্য রাবিয়াব উল্লেখ করে 'দেববাণী'তে বলেছেন : জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈচৈ বাধিয়ে দেয় ; কিন্তু ভক্ত বলে, 'ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন',—তাই সে সব মানে। এবং একজন খাঁটি ভক্তের নিদর্শন-স্বরূপ বলেছেন, :

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান,
নিজ শয্যা 'পরে আছিলা শয়ান।
এহেন কালেতে নিকটে তাঁহাব
আগমন হ'ল দুই মহাত্মাব—
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান।
কহিলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
'পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
যে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।'
পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী,
'প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।'

---

১ The Life of Swami Vivekananda, by E. & W. disciples. p. 115.

রাবিয়া শুনিয়া দুঁহু সাধুরাণী,
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি ;
কহিলা, 'হে ঈশকৃপার ভাজন,
দুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ;
জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে।'

ফারসী সুফী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার অষ্টম শতাব্দীর এই তিনজন ভক্ত সাধক বা সাধিকারই নাম তাঁর প্রসিদ্ধ 'তধ্‌কিরাতুল্‌-আউলিয়া' (বা সাধক-জীবনী) নামক গদ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ও তাঁদের জীবনের বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। এই উপরি-লিখিত সুমধুর কাহিনীর কথাও এতে উক্ত হয়েছে।

হাসান বা হসনে-বস্‌রী (অর্থাৎ বস্‌রার-অধিবাসী হসন), মালিক (মালিকে-দীনার) এবং রাবিয়া অল্‌ আদবিয়া—এই তিন জনই ছিলেন প্রসিদ্ধ বসরা শহরের অধিবাসী। আদী বংশের অন্তর্ভুক্ত বলে তিনি আদবিয়া, আবার পিতার চতুর্থা কন্যা বলে তিনি 'রাবিয়া' নামে পরিচিতা। এই তিনজনেরই অনেক অলৌকিক কাহিনী এই জীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, রাবিয়াকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেম (মহব্বৎ) কি ? তিনি বলেন, 'প্রেম অনাদি হতে এসে অনন্তে মিশে গেছে ; এবং এই আঠার হাজার জগতের কাউকে এর এক পেয়ালা শরবৎ পান করাতে না পেরে, সত্য নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়লেন, তাতেই পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে যে, 'তিনি যেমন তাদের ভালবাসেন, তেমনি তারা তাঁকে ভালবাসে' (ইয়ুহিব্বুহুম্‌ ও ইয়ুহুব্বুনহু, কোরান, ৫ ; ৫৭)। বিশেষ করে তাঁর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উল্লেখযোগ্য : 'হে ভগবান্‌, পার্থিব সম্পদ যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছ, তা শত্রুদের দিয়ে দাও ; এবং পরবর্তী জীবনের যে সকল সম্পদ আমার জন্য রেখেছ, তা বন্ধুদের দাও—কারণ, আমার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।'

ভক্ত বা প্রেমিক পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন সম্পদেরই আকাঙ্ক্ষী নয়। তাঁর নিকট প্রেমময় ভগবান্‌—সেই পরম-স্বামী বা প্রেমিকাই (সুফীদের মাশুক্‌ অর্থাৎ যাঁকে ভালবাসা যায়) শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানমার্গের পথিক সে আশ্রয় হতেও বঞ্চিত। তিনি বলেন, 'কার কাছে ভিক্ষা করব ? আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র—তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' বলো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো।' সত্যকাম শুনতে পেলেন—তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণী তাঁকে বলছে, 'তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই

সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শোন।' (দেববাণী, পৃঃ ১৬৫) ঠিক তেমনি ভাবে সুফী সাধকগণও বলেছেন, আমাদের প্রভু 'উধ্কুরু-আল্লা' (অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা)-র অনুমতি দিয়েছেন ; আমাদের আগুনে পতিত দেখে আলোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যদিও আমি সকল গুণ ও প্রশংসার বাইরে এবং কোন প্রতীক আমার উপযুক্ত নয়, তথাপি এই সকল প্রতীক-ধারণা ও ভাবধারার বশবর্তীগণ কোন উপমার মাধ্যম ছাড়া আমাকে বুঝতে পারে না। বাহ্য-প্রার্থনা নির্বোধের ভাব-সামগ্রী ; কিন্তু ভগবৎ-প্রার্থনা এ সব হতে মুক্ত।'[১০]

১০ মসনবী, ২য় খণ্ড, ১৭১৫-৮

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## স্বামীজীর বেদান্তদর্শন

১। "বেদান্ত জগতে উড়িয়ে দেয় না, একে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয় না, ব্যাখ্যা করে—আমিত্বকে বিনাশ করতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আমিত্ব কি তা বুঝিয়ে দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগত অর্থহীন বা এর অস্তিত্ব নেই, বরং বলে—জগত কি তা বোঝ, যাতে জগত তোমার কোনো অনিষ্ট করতে না পারে।"

**—স্বামী বিবেকানন্দ**

২। "বিবেকানন্দ বেদান্তের মারফতে মানুষকে উদারতার বিশ্বপরিমণ্ডলে স্থাপন করেছেন। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় মানবতাবাদ মোটামুটি পাঞ্চভৌতিক ভৌগোলিক মানুষের জয় ঘোষণা করেছে, ঈশ্বরচেতনা সেখানে বাহুল্যমাত্র, হানিকরও বটে। তাই উনিশ শতকের সাগরপারের মানবতাবাদ—নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ আর বিবেকানন্দের মানবতাবাদ—সেশ্বরবাদী মানবতাবাদ। বেদান্তই তাঁকে সেই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়েছে; তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ একে অপরের পরিপূরক।"

**—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

## বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন

মশারাফ হোসেন

কোন সুদূর অতীতে সরল, শান্ত, শীতল আশ্রমে ধ্যানগম্ভীর আর্য ঋষির অন্তরে যে মহাসত্য জন্ম নিয়েছিল, তাই বেদনামে কথিত। বেদের অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এসেছিলো প্রাচীন ইতিহাস, পুরান, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। উপনিষদকে আশ্রয় করে, ব্রহ্মসূত্রকে আশ্রয় করে, এবং শংকর ও রামানুজের অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছিল বেদান্ত। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন বেদের কর্ম-উপাসনা ও জ্ঞান-কাণ্ডের এবং শংকর ও রামানুজের অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক অপূর্ব সমন্বয়।

(বেদে কথিত ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বজীবে এবং বস্তুতে বর্তমান—এই মহাসত্যকে স্বামীজি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর আত্মারূপে সকল মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন, মানুষ এবং ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নেই, মানুষই ঈশ্বর, বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্ব, পশুপক্ষী, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত জল-হাওয়া, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য সবই বিশ্ব আত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সর্বত্রই একটি মন, একটি চেতনা, একটি জীবন, একটি অস্তিত্ব—বেদের এই মহাসত্য স্বামীজীর বেদান্ত দর্শনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাঁর বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বর, বস্তু-জগৎ, প্রাণী-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, সৌর-জগৎ এবং মনুষ্য-জগৎ একাকার হয়ে গেছে।)

তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টি ছিল সার্বিক। সমগ্র বিশ্ব-সমাজ ছিল তার দৃষ্টির মধ্যে। সারা পৃথিবীতে যখন এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের সংঘর্ষ চলেছে, কার ধর্ম শ্রেষ্ঠ এই প্রমাণ করার জন্য যখন বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, ঠিক সেই সময় তিনি বেদান্তের মহান বাণীকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করলেন। বেদান্তের অমর বাণী—সমস্ত ধর্ম এক, ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে সে শুধু আচারে এবং অনুষ্ঠানে, মূল লক্ষ্যে কোন পার্থক্য নেই। বেদ-উপনিষদ-গীতা যে ঈশ্বরের কথা বলে, কোরাণও সেই ঈশ্বরের কথাই বলে, বাইবেলও সেই ঈশ্বরের কথা বলে। স্বামীজী তাই বার বার বলেছিলেন 'আমি মুসলমানের মসজিদে নামাজ পড়তে পারি, খ্রিশ্চিয়ানদের গীর্জায় প্রার্থনা করতে পারি, এবং হিন্দুদের মন্দিরে উপাসনা করতে পারি। সুতরাং ধর্মে ধর্মে প্রতিযোগিতা করা মিথ্যা, সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সব ধর্মই এক।

তাঁর বেদান্ত দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বেদের মহাসত্যগুলিকে দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞানের স্তর থেকে নামিয়ে এনে মানুষের বাস্তব জীবনে ও তার সমাজ জীবনে পৌঁছে দেওয়া। অনেকে মনে করেন, বেদের আদর্শের শুধু তাত্ত্বিক মূল্য আছে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এ কথা কিন্তু সত্য নয়। আমরা জানি

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, প্রাচীন রাজারা যাঁরা সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতেন, তাঁরাও বেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুতরাং বেদের বাণী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরী হয় সম্রাটের জীবনে কার্যকরী হয়, কেন আমাদের সমাজ জীবনে—যেখানে মানুষ হাটে, মাঠে, গৃহে, অফিসে, আদালতে কাজ করছে—তা কার্যকরী হবে না? বিবেকানন্দ বেদের আদর্শকে মানুষের সমাজ জীবনের, তার কর্ম জীবনের আদর্শ-রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশেই তাঁর বেদান্ত দর্শন রচনা করতে বসেছিলেন।

তাঁর বেদান্ত দর্শনে তিনি মানুষকে বার বার কর্মে আহ্বান জানিয়েছেন। কর্মের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, কর্মের মধ্যেই পাবে মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ। প্রতিটি মানুষ যে যেখানে আছে শান্ত মনে সততার সঙ্গে কাজ করবে। তিনি সকলকে সাধু-সন্ন্যাসী হতে বলেন নি, বাস্তব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবই মানুষ গ্রহণ করবে। মানুষ সমাজে বসবাস করবে, সংসার ধর্ম পালন করবে, কিন্তু কর্ম বিমুখ হলে চলবে না। বীরত্বের সঙ্গে, সততার সঙ্গে তাকে কাজ করতে হবে।

ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি ভারতের জাতীয় চরিত্রকে নির্বীর্য করে দিয়েছে। ভারতবাসী তখন হীনমন্য, ভীরু ও দুর্বল। তিনি এই পঙ্গু, দুর্বল, ভীরু, হীনমন্য, স্বার্থান্বেষী ভারতবাসীকে সবল, দৃঢ়, সজীব, মহান, শক্তিশালী ও বীর ভারতবাসীতে পরিণত করার উদ্দেশে বেদের আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। (তিনি বার বার উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন মানুষ দুর্বল নয়, ভীরু নয়; সে মহান, সে বিরাট, সে অসীম, সে স্বয়ং ঈশ্বর। ভীরুতা তার সাজে না, হীনমন্যতা তার সাজে না, পরাধীনতার শৃঙ্খল তাকে মানায় না। এই আত্ম-বিশ্বাস মানুষকে রাখতেই হবে। যার আত্মবিশ্বাস নেই সে কাপুরুষ। মানুষ দেব শিশু, সে বীর, সে অসীম শক্তিশালী। তাকে ঘুমালে চলবে না, তাকে উঠতেই হবে, জাগতেই হবে।) এই ভাবে তিনি বেদের আদর্শে মৃতপ্রায় ভারত-বাসীকে সোজা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলতে বার বার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আজ আমরা স্বাধীন। কিন্তু কোথায় আমাদের জাতীয় চরিত্র? সমাজ জীবনে চরিত্র নেই, ত্যাগ নেই, পারিবারিক জীবনে শান্তি নেই, সুখ নেই, স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, ভালোবাসা নেই। এহেন দুরবস্থায় বেদান্তের আদর্শকে কার্যকরী করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আজই আমাদের বেদান্তের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে; জাতীয় জীবনের সঙ্গে, সমাজ জীবনের সঙ্গে, পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিতে হবে।

বিবেকানন্দ বেদের আদর্শে মানুষকে শিখিয়েছিলেন মানুষকে ভালবাসতে, তাকে শ্রদ্ধা করতে, তাকে পূজা করতে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়ে কিছুই লাভ হবে না, যদি না আমরা মানুষকে ভালবাসতে পারি। একজনের বিপদে আর একজন ছুটে যাবে, একজনের দুর্ভাগ্যকে সকলের দুর্ভাগ্য বলে মনে করতে হবে। কে অন্ন

পাচ্ছে না, কে বস্ত্র পাচ্ছে না, কে গৃহহীন, কে বাস্তুহারা, কোন রোগী ওষুধ পাচ্ছে না, কে চিকিৎসা পাচ্ছে না আমাদের দেখতে হবে, তাদের আমাদের সাহায্য করতে হবে। এ সাহায্য আমাদের দয়া নয়, এ আমাদের কর্তব্য, এ আমাদের ধর্ম। আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন। আমরা ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, জাতিতে জাতিতে কোন পার্থক্য নেই, সমাজে সমাজে কোন পার্থক্য নেই, দেশে দেশে কোন পার্থক্য নেই। একটা মানুষ জাতি, একটা সমাজ, একটা জীবন, একটা বিশ্ব, একটা অস্তিত্ব, একটা ঈশ্বর, আর কিছু নেই। পার্থক্য অনেক আছে, বিভেদ অনেক আছে, কিন্তু মিলনটাই আসল সত্য। আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, এইটাই বেদের আদর্শ, এইটাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং সমগ্র মানব সমাজকে একটা ঐক্য সূত্রে গাঁথবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করে আসছে। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে বেদের পাতায় পাতায় এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের প্রতিটি লাইনে লাইনে বিশ্ব ঐক্য, বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্ব মানবতার কথা স্পষ্ট করে বলা আছে। আমরা যে কেউ অতি সহজে বেদান্তের এই আদর্শকে জাতিসংঘের সামনে তুলে ধরতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মানব দরদী ও মানব প্রেমিক। মানুষকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন দীন-দুঃখীজনের বন্ধু। মানুষের সেবাই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর সেবা। সর্বজীবে সেবাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন। এর থেকে শ্রেষ্ঠতর জীবন দর্শন তিনি খুঁজে পান নি। এই জীবন দর্শন থেকেই ভবিষ্যতে বেদান্ত দর্শনে তাঁর উত্তরণ সহজ হয়েছিল।

## বিবেকানন্দ-দর্শনচিন্তায় মন্ত্ররহস্য

**স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ**

স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ধর্মবক্তা, সমাজসংস্কারক, প্রচারক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা ও আরো কত-কিছু। সমুদ্রগামী বহুধারা-স্রোতস্বিনীর মতো ছিল তাঁর প্রতিভা বহুমুখী এবং দেদীপ্যমান সহস্র কিরণবাহী অংশুমালীর মতো ছিল তাঁর মনীষার দীপ্তি। তাঁর মধ্যে বিচিত্র শক্তির প্রসুপ্ত রূপ দিব্যনেত্রে দর্শন করেই দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন ঃ 'নরেনের মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ'।

অন্তর্নিহিত অনভিব্যক্ত শক্তির ব্যক্ত রূপের নামই শক্তির বিকাশ ; শুধুই তা জৈবশক্তির প্রতিফলন বা পরিণতি নয়। অন্তলীন বীজশক্তিই অভিব্যক্ত প্রকৃতিরূপে মানুষের জীবনসত্তার বিকাশসাধন করে। সুতরাং একটি অখণ্ড মানবসত্তার সৃষ্টি-কারণ সাধারণভাবে জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বরূপ বলে স্বীকৃত হলেও আসলে শাশ্বত চৈতন্যসত্তার স্ফুরণেই মানুষের প্রাণসত্তার রূপদান করে ও পার্থিব মানবসত্তাকে অপার্থিব ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাই বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি জড়-চৈতন্যসম্পৃক্ত আন্তর-বাহ্য রূপদুটির লীলায়ণরূপে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নির্মায়মান চৈতন্যধর্মী আত্মসত্তাই আদর্শ মানুষের জীবনপ্রবাহকে করে সচল ও আনন্দমুখর এবং তার প্রতিষ্ঠাকে করে সার্থকতা দিয়ে পূর্ণ। ক্রমপ্রস্ফুটিত সহস্রদলকমলের মতো নরেন্দ্রনাথ বাল্য ও কৈশোর কাল অতিক্রম করে যৌবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিয়ে ধীরে ধীরে স্বামী বিবেকানন্দে রূপায়িত হয়েছিলেন এবং সে রূপায়ণ ছিল প্রসুপ্তির নবজাগরণ,—অনভিব্যক্তেরই ব্যক্ত রূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সন্দেহতরঙ্গায়িত নরেন্দ্রনাথ তখন কেন্দ্রায়িত জীবনচিন্তা ও জীবনসাধনা নিয়ে শান্ত সমাহিত সমুদ্রে পরিণত ও প্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং এই অভিনব বিবর্তনের কারণকেন্দ্র ছিলেন ঊনবিংশ শতকের যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম সমাজসমস্যা, শিক্ষা, দেশসেবা এধরনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যেমন স্বামী বিবেকানন্দ সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণের সঞ্চার করে, তেমনি করেছিলেন মন্ত্ররহস্য, প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা, অধ্যাত্মসাধনা প্রভৃতির নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও উপায়সম্বন্ধে আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণী মন নিয়ে। ভক্তিযোগেরই প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিচিত্র প্রশ্নের অবতারণা করেছেন ঃ ঈশ্বরতত্ত্ব কি, অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বরূপ কি, ধর্মাচার্য ও দীক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা কি, অনুভূতিদীপ্ত ধর্মগুরু কারা, প্রভৃতি ; আবার এঁদেরই আলোচনাসূত্রে আলোকপাত করেছেন তিনি ভারতীয় সাধনার প্রাণবস্তু ওঙ্কারতত্ত্বের নিগূঢ়রহস্যের ওপর। তাঁর বিশ্লেষণী নীতির মধ্যে ক্ষুরধার বুদ্ধি-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আস্তিক্য বিশ্বাস ও

নিবিড় প্রেমনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার ও অবতারকল্প পুরুষদের প্রসঙ্গ না হয় এখানে নাই কল্লাম জীবনসিদ্ধিপথের পরম-সহায়করূপে, কিন্তু সাধনক্ষেত্রের দিশারীরূপে জ্ঞানদীপ্ত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আচার্যের উপযোগিতাকে তো কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা তারাই আসলে শক্তির উদ্বোধন করেন সাধনকারীদের হৃদয়ে শাশ্বত পথের সন্ধান দিয়ে। সিদ্ধগুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রের সাধনা ও জাগ্রতচেতনাই নিয়ে যায় একনিষ্ঠ সাধককে তার অভিলষিত লক্ষ্যের পাদপীঠে এবং অপসারিত করে বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ অজ্ঞান-অন্ধকার পরমবোধিসত্তায় তাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করে। স্বামীজী এপ্রসঙ্গেই বলেছেন: "But we are now considering not these *Mahapurushas*, the great Incarnations, but only the *Siddha-Gurus* (teachers who have attained the goal); they, as a rule, have to convey the germs of spiritual wisdom to the disciple by means of words (*Mantras*) to be meditated upon. What are these *Mantras* ?"

স্বামীজী নিজেই প্রশ্ন করেছেন—তাহলে মন্ত্র কাকে বলে? ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণে দেখা যায়, বিশ্বচরাচর নিছক নাম-রূপেরই পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, নাম রূপই দিয়েছে তার বিরাট বিকাশরূপকে সার্থকতা ও করেছে রূপ, রস, গন্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে তাকে পূর্ণ। উপনিষদকার সৃষ্টির এই রহস্যকথার মর্ম উদঘাটন করে বলেছেন: "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনামায়মিদং রূপ ইতি; তদিদমপ্যেতর্হি নাম-রূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনামায়মিদং রূপ ইতি";—অব্যাকৃত অখণ্ড আত্মসত্তাই ছিল প্রতিষ্ঠ বিশ্ববিকাশের পূর্বে এবং পরে নাম-রূপের আবরণে প্রকাশ করলেন তিনি নিজেকে বহুধাবিচ্ছিন্ন করে। এই নাম-রূপই করেছে রস-সৌন্দর্যপূর্ণ ভোগভূমি-বিশ্বের প্রাণসঞ্চার।

আবার মানব-মনের মধ্যে দেখি ঐ একই নাম-রূপের সচঞ্চল বিলাস। বিশাল চিত্তসমুদ্রের বুকে নিত্য-নূতন ওঠে কত তরঙ্গ এবং ঐ তরঙ্গের আলোড়নে মানব-মন সততই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ। বাহ্য ও অন্তরদেশব্যাপী বিশ্বচরাচরের বুকে অহরহঃ ঐ নাম-রূপ-তরঙ্গেরই চলেছে খেলা এবং ঐ লীলাবলোকনই আনে মানুষের মনে বিস্ময় এবং আনে বিবেকের জাগরণ। বৈচিত্র্যাভিমুখী মানুষের মন তখন স্বতঃই কেন্দ্রায়িত হোয়ে অনুসন্ধান করে মিলন কোথা,—ঐক্যকেন্দ্র কোথা! বিদ্যুৎচমকের মতো বুদ্ধি-প্রকাশে তখন মাঝে মাঝে জাগে বোধির আলোকদীপ্তি এবং তখনি সে বোঝে 'যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ',—একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের স্বরূপ-জ্ঞানে যেমন যাবতীয় মৃত্তিকার স্বরূপাবধারণ সম্ভব, তেমনি নাম-রূপের পরিণতি মন বা চিত্তবৃত্তির স্বরূপজ্ঞান হোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর নির্মাণরহস্যের অনুভব করাও সম্ভব। ছান্দোগ্য-উপনিষদে মহর্ষি আরুণি তাঁর ব্রহ্মচারী-পুত্র শ্বেতকেতুকে

ঠিক এতত্ত্বেরই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। যথা সোম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' (১।৬।৩-৪) ;—অর্থাৎ যে তত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করলে অশ্রুত, অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত বিষয় শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হয়, হে সৌম্য, সেই বিষয় হল এক সত্য পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব। সেটি ক্যামন জানো ?—একটিমাত্র মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানলে যেমন বিশ্বের সকল পার্থিব বিষয়ের রহস্যতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ও তখন মনে হয় এক মৃত্তিকাই সত্য, আর সমস্ত বিকাশ শব্দাত্মক ও নাম মাত্র, তেমনি মানবসত্তা বা মানুষের চিত্তকে জানলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যই অবগত হওয়া সম্ভব। বাহ্য আকার বা রূপ অন্তরসত্তারই বহিরাবরণ। মানুষ ও প্রাণীমাত্রের পার্থিব শরীর আবরণ বা রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণ নাম মাত্র এবং বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শব্দপ্রতীক ঐ নাম ও মনের প্রকাশক। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, একটি মানুষের চিত্ত-বিক্ষেপের ফলে যে অজস্র চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেই চিন্তাতরঙ্গমালাই প্রথমে শব্দাকারে ও পরে বাস্তব আকারে স্থূলমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বতরঙ্গ তাই মনঃসমুদ্রেরই বিক্ষুব্ধি বা পরিণতি।

অন্তরদর্শী স্বামীজী মন্ত্র তথা নিত্যশব্দতত্ত্বের বিশ্লেষণ আরো নিবিড়ভাবে উপস্থাপন করেছেন বিশ্বসৃষ্টির মূল-রহস্যকথার অবতারণা কোরে। তিনি বলেছেন, হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা অথবা স্থূলরূপধারী মহৎই বিশ্বসৃষ্টির প্রভাবে 'নাম' বা শব্দাকারে এবং রূপ বা পার্থিব আকারে নিজেকে প্রকাশ করেন ঃ "In the universe, Brahma or Hiranyagarbha or the cosmic Mahat first manifested himself as name, and then as form, i.e. as the universe"। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এক ও অদ্বিতীয় শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্যেরই রূপভেদ হলেও শ্রুতি ও স্মৃতি-কারেরা তাদের উল্লেখ করেছেন মনুষ্যবুদ্ধিতে সুগম ও স্বচ্ছলভাবে ব্রহ্মবোধকে প্রতিভাত করার জন্য। বুদ্ধি ও বোধির সমৃদ্ধিলাভের পথে এই কল্পিত চৈতন্যগুলি স্তররূপে প্রতিভাত,—যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বা জ্ঞানানুভূতির স্তরগুলি কল্পিত ও প্রতিভাত। নাম ও রূপের বিচিত্র বিকাশ ছাড়া ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট চৈতন্যস্তরগুলির আর কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না। নির্বিশেষে ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমানুভূতির এরা সোপান এবং এই সোপানাশ্রয়ী সাধকেরা ধীরে ধীরে পরমসত্য-লাভের পথে অগ্রসর হয়ে কৃতকৃতার্থ হন। সুতরাং ঈশ্বরাদি চৈতন্যসত্তাগুলি সাধকের ক্রমাগ্রগতি বা ক্রমানুভূতির পথে সহায় মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ আরো বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের জগতে যত-কিছু রূপ বা আকার তাদের পিছনে বিকাশমান শব্দব্রহ্মরূপী অনির্বাচ্য স্ফোটের প্রকাশ থাকে। নিত্য ও অবিনাশী স্ফোটই বিশ্বচরাচরের কারণ এবং এই স্ফোটের মাধ্যমেই স্রষ্টা ঈশ্বর স্থূলবিশ্বরূপ সৃষ্টি করেন। অথবা উপনিষদের ভাষায় বলা যায়, ঈশ্বর সৃষ্টিসূচনার পূর্বে স্ফোটরূপ ধারণ করেন ও পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

স্ফোটপ্রকাশক শব্দই 'ওম্' বা ওঙ্কারঃ "All this expressed sensible universe is the form, behind which stands the eternal inexpressible Sphota, the manifester as *Logos* or Word. This eternal Sphota, the essential eternal material of all ideas or names, is the power through which the Lord creates the universe ; nay, the Lord first becomes conditioned as the Sphota, and then evolves Himself out as the yet more concrete sensible universe. This Sphota has one word as its only possible symbol, and this is the 'OM'। এই স্ফোটই সামগ্রিক সৃষ্টিচিন্তার বীজ এবং এর স্থূলরূপ বিশ্ববৈচিত্র্য।

নিত্যশব্দের ধারণা শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সকল দেশেই দেখা যায়। গ্রীকভাষায় এই অবিনাশী নিত্যশব্দকে 'লোগাস' বলে এবং লোগাসের অর্থ নিত্যচিন্তা বা ভাবনাসমষ্টি। কিংবা বলা যায় নিত্যচিন্তার বিষয়ীভূত শাশ্বত বস্তু। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস লোগাসকে বলেছেন বিশ্বানুস্যূত ব্যাপক সত্তা, ষ্টোয়িক বা জ্ঞানবাদীরা বলেছেন 'ওয়ার্ল্ড সোল' বা বিশ্বাত্মা, প্লেটো বলেছেন 'অতীন্দ্রিয় লোগাস' বা চিন্তাকেন্দ্র এবং আলেকজান্দ্রিয় ফাইলো বলেছেন ঈশ্বর ও বিশ্বের মধ্যবর্তী নিত্যবস্তু যা লোগাসেরই পর্যায়ভুক্ত। চতুর্থ গসপেলে এঁদেরই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছেঃ 'In the beginning was the Word and the Word was with God, and Word was God'। এই ওয়ার্ড বা নিত্যশব্দই অবিনাশী শব্দব্রহ্ম। সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও একথা স্বীকার করেন। বেদে ও উপনিষদে নিত্যশব্দকে বলা হয়েছে 'বাক'। বাক্ই বাগ্দেবী সরস্বতীতে রূপায়িত। বাক্ বা নিত্যশব্দ স্ফোট পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে ত্রিমূর্তি বা ট্রিনিটি। বাক্ থেকে কামের সৃষ্টি এবং কামই প্রকাশ পায় সৃসৃক্ষা বা সৃষ্টির দিব্য ইচ্ছা রূপে। কঠোপনিষদে কামকে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছেঃ 'কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্'। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো কামকেই আদি-ইচ্ছারূপ 'এরোস' (Eros) বা প্রেমাকর্ষণ (Love) বলেছেন। অথর্ববেদে কাম বাকের দুহিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বাক্কে অবিনাশী স্ফোট বলেছেন এবং স্ফোটই সমগ্র চিন্তা ও নামের প্রতিষ্ঠা বা আধারবস্তু। একে তন্ত্রকার ও শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সৃজনীশক্তি এবং এই শক্তিসহায়েই হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। উপনিষদের ভাষায় এই সৃষ্টির অর্থ হল ঈশ্বরচৈতন্য ব্যক্ত করেন নিজেকে দেশ-কালপরিচ্ছিন্ন জীবজগতে। সুতরাং স্বামীজীর বাণী ঔপনিষদিক সত্যেরই প্রতিধ্বনি। বাক্-রূপ শব্দের আকার পরিগ্রহ করে পরব্রহ্ম বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছেঃ 'সোঽকাময়ত, ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো-যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত। বাগেবাস্য সা সৃজ্যত'। কঠোপনিষদে আছেঃ 'প্রজাপতির্বৈ ইদম্ আসীৎ'। 'তস্য বাগ দ্বিতীয়া আসীৎ'। 'তম্ মিথুনম্ সমভবৎ'।

'সা গর্ভং আধত্ত'। 'সা অস্মাৎ অপাক্রামৎ, সা ইমা প্রজাঃ প্রাবিশৎ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুনরায় বলা হয়েছেঃ 'সা তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বং অসৃজত যদ্ ইদং কিঞ্চ ঋচো যজাংসি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন,'। বাক্ এখানে শব্দব্রহ্মের বাচক বা দ্যোতক ও নিত্যশব্দ স্ফোটেরই অভিন্নরূপ। ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন, বেদাত্মিকা বাক্ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ বাঙ্ময়। মহাভারতকার বলেছেনঃ 'বাচৈব সম্রাড় ব্রহ্ম জ্ঞায়তে, বাগ্বৈ সম্রাট পরমং ব্রহ্ম'। পূর্বেই বলেছি যে, এই বাক্ই বেদমাতা সরস্বতীঃ 'বেদানাম্ মাতরং পশ্য মৎস্থাম্ দেবীং সরস্বতীম্'। ঋক্ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে সায়ণ স্বীকার করেছেনঃ 'যস্য নিঃশ্বাসিতং বেদা যো বেদোভ্যোঽখিলং জগৎ। নির্মমে তৎ অহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরম্'। তৈত্তিরীয়-সংহিতা ভাষ্যে মাধবাচার্যের স্বীকৃতিও তাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে আছেঃ 'বাগ্ অক্ষরং প্রথমং যা ঋতস্য বেদনাং মাতা অমৃতস্য নাভিঃ'। শতপথব্রাহ্মণের উক্তিও অনুরূপঃ 'বাগ্বৈ অজো বাচো বৈ প্রজাঃ বিশ্বকর্মা জনান'। এভাবে বাক্ বা স্ফোটকে বিশ্বপ্রসবিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

শাস্ত্রকারেরা শব্দকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছেনঃ অতীন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়িক। অতীন্দ্রিয় শব্দই নিত্যশব্দ স্ফোট এবং তার স্পন্দন ও পরিবর্তন নাই। ঐন্দ্রিয়িক শব্দ বিকাশধর্মী,—যদিও সে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। মহাভাষ্যে ঋষি পতঞ্জলি শব্দানুশাসনপ্রসঙ্গে শব্দ কিভাবে পদার্থ, কর্ম, গুণ ও জাতি থেকে ভিন্ন তার বিবরণ দিয়েছেন। শব্দকে তিনি সাধারণভাবে বলেছেন ভাবপ্রকাশক, অর্থাৎ যা ভাবের দ্যোতক তাই শব্দ। সুতরাং ধ্বনিও শব্দ। অনেকে শব্দকে ধ্বনি ও বর্ণ এই দুভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে ধ্বনাত্মক ও বর্ণাত্মক এই দুরকম শব্দ। কোন বাদ্যযন্ত্রে বা কোন ধাতববস্তুতে আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তা ধ্বন্বাত্মক শব্দ, আর অক্ষরাদির উচ্চারণে বর্ণাত্মক শব্দের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আচার্য উপবর্ষ ও তাঁর অনুসারী আচার্য শবর ও শঙ্কর শব্দ অর্থে বলেছেন অক্ষর। শবর বলেছেনঃ 'গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকার-বিসর্জনীয়া ইতি ভগবনুপবর্ষঃ'। ভাষ্যকার শবর বলেছেনঃ 'তস্মাদক্ষারাণ্যেব পদম' এবং শঙ্কর বলেছেনঃ 'বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবনুপবর্ষঃ'। তারপর শব্দের সৃষ্টি কিভাবে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন সকল দার্শনিকই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তো বটেই। ভর্তৃহরি ও পুণ্যরাজ দুজনে বায়ুই শব্দের কারণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। যোগদর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্রের মতে প্রাণবায়ু ও তেজের সংমিশ্রণে শব্দের সৃষ্টি। তন্ত্রশাস্ত্রের মতেও তাই, তবে সামান্য-কিছু পৃথক। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, মূলাধারে যে চিচ্ছক্তিরূপিনী কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তা থেকে মাতৃকাবর্ণের সৃষ্টি। দেবী কালিকার গলায় মুণ্ডমালা মাতৃকাবর্ণেরই প্রতীক। মাতৃকাবর্ণ অক্ষররূপী। রামপ্রসাদ মাতৃকাবর্ণরূপী মুণ্ডমালাকে তাই বলেছেনঃ 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণ'। পঞ্চাশৎ বর্ণই কালিকা তথা শক্তি। অবশ্য ন্যায় অর্থাৎ নব্যন্যায়ের সিদ্ধান্ত অনেকটা ভর্তৃহরি ও পুণ্যরাজের

মতানুযায়ী। শব্দকে তাঁরা বলেছেন নিত্য ও আকাশের গুণ।

মন্ত্রশাস্ত্রের মতে শব্দই ধ্বনি এবং শব্দসমষ্টির সমাহারে বর্ণের সৃষ্টি। তবে ধ্বনি কি বস্তু তার উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১/৩/২৮) বলেছেন ঃ "কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকম্ প্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি, প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি",—অর্থাৎ যা সুদূরস্থিত শ্রোতার বর্ণবিবেক সৃষ্টি করে না, অথচ কর্ণে প্রবেশ করে শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মায় তাই ধ্বনি। ধ্বনি অর্থের প্রকাশক ও বর্ণের স্রষ্টা। মন্ত্র বা বীজমন্ত্রও বর্ণেরই সমষ্টি। বর্ণ শক্তিধারক ও তা অভীষ্ট বস্তুর নির্দেশক। পূর্বেই বলেছি, শক্তিসাধক রামপ্রসাদ যে 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, তুমি বর্ণে বর্ণে নাম ধর' বোলে দেবী কালিকার মহিমা কীর্তন করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, শক্তি ও বর্ণ অভিন্ন—অন্ততঃ শাক্ততন্ত্রমতে। বর্ণ তথা আদিবর্ণ স্ফোটকে স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসহায়ে সৃষ্টিকারী বোলে বর্ণনা করেছেন ঃ "This eternal Sphota, * *, is the *power* through which the Lord creates the universe ; nay, the Lord first becomes conditioned as the Sphota, and then evolves Himself out……"। এখানে আদিবর্ণ শক্তিরূপিনী ও পরমেশ্বর-শিবের সঙ্গিনী, শিব বা ঈশ্বর স্ফোটশক্তির সাহায্যে বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকার পাণিনি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ( ইনি যোগদর্শনকার পতঞ্জলি কিনা এনিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে ) বর্ণে অন্তর ও বাহ্য প্রযত্নের কথা স্বীকার করেছেন। বর্ণোচ্চারণেই প্রযত্নের সার্থকতা। প্রযত্ন ক্রিয়াশক্তি, সুতরাং বর্ণোচ্চারণে শক্তির প্রয়োজন স্বীকার্য। তন্ত্রশাস্ত্রেও বর্ণোচ্চারণরীতির কথা আছে। বর্ণবীজ বা মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই সিদ্ধি বা সার্থকতা লাভ করে,—যদিও সেই উচ্চারণে অভিনিবেশ ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। পাণিনি ও পতঞ্জলি অন্তরপ্রযত্নকে আবার স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিকৃত ও সম্বত এই চারভাগে এবং বাহ্যপ্রযত্নকে বিবর, সম্বাদ, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই এগারটি ভাগে ভাগ করেছেন। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই স্পৃষ্ট এবং য র ল ব বর্ণগুলি ঈষৎস্পৃষ্ট। বর্ণের উচ্চারণে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং সে শব্দ অনাদি একথা ব্যাকরণশাস্ত্র স্বীকার করে।

ভর্তৃহরিও পাণিনি এবং পতঞ্জলিকে অনুসরণ করে শব্দকে নিত্য বলেছেন। তারি জন্য এমন কি শব্দশাস্ত্র-রূপ ব্যাকরণস্মৃতিকে বলেছেন নিত্য ও মুক্তিদায়ী। তিনি বলেছেন ঃ 'তত্ত্বাববোধে শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে' (১/১৩), 'তদ্দ্বারমপবর্গস্য' ও 'তদ্ব্যাকরণমাগম্য পরংব্রহ্মাধিগম্যতে' (১/১৪, ২২)। স্ফোট বা নিত্যশব্দকে অখণ্ডব্রহ্ম-রূপে প্রতিপন্ন করেই আচার্য ভর্তৃহরি একথার উল্লেখ করেছেন, কেননা শব্দব্রহ্মের উপাসনায় জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব ঃ 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি'। নাদকারিকাকারের সিদ্ধান্তও তাই। তিনি বলেছেন ঃ 'বাগ্‌ব্রহ্মণি নিষ্ণাতশ্চিদ্‌ব্রহ্মাপ্নোতি যেন কথয়ন্তি'। সঙ্গীতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ওম্ বা ওঙ্কারকেই অনাদি নিত্যশব্দ 'স্ফোট' বলেছেন : "This Sphota has one word as its only possible symbol, and this is the Om. And as by no possible means of analysis can we separate the word from the idea, this Om and the eternal Sphota are inseparable ; and, therefore, it is out of this holiest of all holy words, the mother of all names and forms, the eternal Om, that the whole universe may be supposed to have been created"। স্বামীজীর বক্তব্য হল, শব্দের সঙ্গে অর্থের তথা চিন্তার বা ধারণার শিব-শক্তির মতো নিত্যসম্বন্ধ। শব্দ অর্থের বোধক, আর তারি জন্য অর্থ থেকে শব্দকে কোনদিন পৃথক করা যাবে না। নিত্যশব্দ স্ফোটের সম্বন্ধেও ঐ এককথা। বিশ্বচরাচর স্ফোটেরই অর্থ তথা স্থূলরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি বা বিকাশ। তন্ত্রশাস্ত্র তাই সগুণব্রহ্ম স্ফোট বা ওঙ্কারকে সর্ববর্ণের আধার ও স্রষ্টা বলে বর্ণনা করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শব্দবীজ স্ফোটের যদিও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তবুও তা এত ব্যাপক, বিশ্লেষণাত্মক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাকে সুষ্ঠুভাবে বোঝা ও বোঝানোর জন্য কিছুটা টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন। তন্ত্রসাহিত্যের আলোকে দেখা যায়, শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় এতিনটির ভিতর এক পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত। পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি শব্দসম্পর্কের মধ্যে বাচ্য-বাচক, ভেদ-ভেদ্য প্রকৃতি-প্রত্যয় বা প্রকৃতি-বিকৃতি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। জাতি-ব্যক্তি বা জেনাস-স্পিসিস-সম্পর্ক নিয়েই অবশ্য এই দ্বন্দ্বতত্ত্বগুলির সার্থকতা। তন্ত্রসাহিত্যে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্কেও শাব্দিক ভেদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু তারা পরস্পরসম্পৃক্ত। শব্দের আলোচনায় চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির প্রসঙ্গ তুলে তন্ত্র বলেছে ঐ শক্তি-দুটির বিকাশে এক ও অভিন্ন শক্তিই বিষয় ও বিষয়ী অথবা কর্তা ও কার্যের আকারে অভিব্যক্ত হয়। পরাসম্বিৎ বা সচ্চিদানন্দ-পরমশিব এদুটি শক্তির উপরে। অবশ্য এই উচ্চ ও নিম্ন ভেদ আসলে স্পন্দন বা স্পন্দনশক্তিকে নিয়ে সার্থক। স্পন্দন থাকা ও না-থাকার জন্য একই চিদ্‌ঘনব্রহ্ম উত্তীর্ণ ও লীন বলে প্রতীত হন। স্পন্দনের আর এক নাম বিমর্শশক্তি। নিস্পন্দ হলে নিষ্ক্রিয় চিৎ, আর সম্পন্দ হলে সক্রিয় চিৎ তথা শক্তি। শিব-শক্তির নিত্যবিলাসেই বিশ্ববৈচিত্র্যের সার্থকতা। শিব ও শক্তিকে শব্দতত্ত্বের দিক থেকে তাই নিঃশব্দ ও সশব্দ ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে একই মহাশক্তি চিতি তথা চৈতন্যরূপে ও শক্তিরূপে প্রকাশিত। শিব ও শক্তি অভিন্ন এবং অখণ্ড একথা অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যকে লক্ষ্য করেই বলা হয়। স্পন্দনপ্রকৃতিই নিষ্কল ব্রহ্মের স্বরূপপরিণাম। এরই নাম নিত্যশব্দ ওঙ্কার এবং সেজন্য ওঙ্কারকে বলা হয়নির্গুণব্রহ্মের বাচক। তন্ত্রে পরিণামবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিবর্তবাদ। পরিণামবাদে বস্তু মূল-উপাদান থেকে পৃথক, কিন্তু বিবর্তবাদে বিবর্তিত উপাদান স্বরূপে অবিকৃতই থাকে, বিকৃতি যা তা ভ্রমমাত্র।

ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দনের নাম কারণশক্তি। তখন শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় 'স্পন্দ' নামে

পরিচিত। স্পন্দ ও স্পন্দন একই কথা। শক্তিরই স্পন্দন হয়, ব্রহ্মের নয়। শক্তির স্পন্দনই আবার সৃষ্টির কম্পন এবং তাকে সৃষ্টির প্রস্তুতিও বলা যায়। শক্তি বা কম্পনের পরিণতিই বিশ্ববৈচিত্র্য। সায়েন্স তথা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই। আলোক, বিদ্যুৎশক্তি, তাপ, শব্দ, বর্ণ ও এমন কি বিশ্বের সকল-কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সমস্তই কম্পনের পরিণতি। কঠোপনিষদে একথাই বলা হয়েছে ঃ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' ( ২।৩।২ )। প্রাণতত্ত্বের কম্পন থেকেই বিশ্বের বিকাশ। ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, জল ও আকাশ এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিকাশে স্থূলপঞ্চভূতের সৃষ্টি। পঞ্চভূতের বিকাশই বিশ্ববৈচিত্র্যকে দিয়েছে নাম ও রূপ, কিন্তু এ বিকাশ বা বিকৃতির মূলে নিত্য স্ফোটই চিরসমাসীন। মীমাংসাশাস্ত্রে জাতি-ব্যক্তিপর্যায়ে জাতিকে বলা হয়েছে সর্বানুস্যূত ও ব্যাপক, সুতরাং নিত্য ও ব্যক্তি বিকৃত ও ব্যষ্টি, সুতরাং অনিত্য। ঘট-ব্যক্তির জাতি ঘটত্ব নিত্য ও সর্বানুস্যূত এবং এই ঘটত্বজাতির মাধ্যমেই ঘট-ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভব, আর এর বিপর্যয়ে হয় মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি ও বিকার। স্ফোট নিত্যজাতির সমপর্যায়ভুক্ত। মন্ত্রতত্ত্বের রহস্যভেদ করতে হলে নিত্য-শব্দ-রূপ সিদ্ধবীজ ওঙ্কারের স্বরূপজ্ঞান প্রয়োজন। বাচ্য ও বাচকের অভেদত্ব-প্রতিপাদনের নামই স্বরূপজ্ঞান।

মন্ত্ররহস্যের সমাধানে 'তত্ত্ব'-বস্তুসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ-কিছু না বললেও অধ্যাত্মজ্ঞানকামীদের তা জানার বিষয়। মন্ত্রশাস্ত্রে ছত্রিশটি শৈবতত্ত্বের সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শক্তি একটি তত্ত্ব। শক্তির বিকাশরূপ নাদ এবং নাদের অপর নাম সডাখ্যতত্ত্ব। শক্তি ও নাদের উপরে বিন্দু এবং বিন্দুর নাম ঈশ্বরতত্ত্ব। তাহলে মোটামুটি বোঝা যায়, শক্তি, নাদ ও বিন্দুর তত্ত্বজ্ঞানে বা সম্যকজ্ঞানে শব্দরহস্য তথা মন্ত্ররহস্যের সমাধান সম্ভব। মন্ত্রশাস্ত্রে শক্তির নাম বিমর্শ সেকথা আগেই বলেছি। অদ্বৈতবেদান্তে বিমর্শশক্তি অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে পরিচিত। তবে বিমর্শ ও অবিদ্যা শক্তি-দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, মন্ত্রশাস্ত্র বা তন্ত্রের বিমর্শশক্তি নিত্য ও মহাশক্তিসঙ্গিনী, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যাশক্তি অনিত্য, সুতরাং মিথ্যা। শক্তির পরিবর্তনশীলতাই তাকে অনিত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। অদ্বৈতবেদান্তমতে একমাত্র বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মই নিত্য ও অবিনাশী, তা ছাড়া আর সকল বস্তু অনিত্য ও বিনাশী।

শিব ও শক্তিকে নিয়েই মন্ত্রশাস্ত্রের পটভূমিকা রচিত এবং চরমসিদ্ধান্তও ঐ নিত্যবস্তু-দুটির অবিনাভাবসম্বন্ধে। তন্ত্রে শিবকে বলা হয়েছে অহংতত্ত্ব ও শক্তি ইদংতত্ত্ব। একটি গ্রাহক ও অপরটি গ্রাহ্য এবং এ দুটি তত্ত্বের মিলনে বা সমন্বয়েই 'হংস' ( হং—শিব+স—শক্তি =হংস )-শব্দ নিষ্পন্ন। তন্ত্রোক্ত হংসের অভিন্ন রূপই অদ্বৈতবেদান্তের 'সোঽহং'। হংস বা সোঽহং-তত্ত্বের নির্ধারণ ও সম্যক্-অবধারণের নামই মন্ত্রশুদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্রচৈতন্য সাধনার বস্তু। নিরঙ্কুশ একনিষ্ঠ সাধনায় এবং ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসেই একমাত্র মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদন সম্ভব।

মন্ত্রতত্ত্ববেত্তা সূক্ষ্মদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ 'ওম্'-শব্দের সর্বব্যাপকত্ব ও নিত্যত্ব-সন্দেহী সাধকের পক্ষে একটি পূর্বপক্ষেরও অবতারণা করে বলেছেন ঃ "But it may be said that although thought and word are inseparable, yet as there may be various word-symbols for the same thought, it is not necessary that this particular word Om should be the word representative of the thought, out of which the universe has become manifested. To this objection we reply that this Om is the only possible sombol which covers the whole ground, and there is none other like it" ; —অর্থাৎ যদি কেউ বলেন শব্দ ও অর্থ শিব-শক্তির মতো নিত্যসম্পৃক্ত ও অভিন্ন, তবুও একথা সত্য যে, একই চিন্তা বা ভাবের পরিবাহক হিসাবে অনেকগুলি শব্দের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, সুতরাং নির্দিষ্ট ওঙ্কার-শব্দই যে বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় চিন্তা বা ভাবের একমাত্র বাচক বা জ্ঞাপক এমন কোন নিয়ম নাই, তাহলে তার উত্তরে বলি, বাচক হিসাবে ওঙ্কার বা প্রণবই একমাত্র সর্বানুস্যূত শব্দ—যা বিশ্বান্তর্গত নিখিল ভাবের জ্ঞাপক এবং এর সমকক্ষ আর কোন ব্যাপক শব্দ নাই একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

ওম্-শব্দটির ভিতর পাই অ উ ম তিনটি অক্ষরের সমাবেশ এবং শব্দতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অ উ ম অক্ষর-তিনটিই বিশ্বের সকল শব্দের উৎস। এই তিনটি অক্ষর-রূপের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্ববর্ণের বিভাজক বর্ণ হিসাবে অ-কারই স্বীকৃত। অ-কারেই সকল উচ্চারিত বর্ণ ও শব্দের প্রথম প্রকাশ ও স্থিতি এবং তাদের সমাপ্তি ঘটে ম-কারে ; কেননা ওষ্ঠদুটির উন্মিলনে শব্দের সূচনা বা আরম্ভ এবং নিমীলনে হয় সমাপ্তি। আর উ-কার অক্ষরটি দেয় শব্দোচ্চারণে প্রেরণা ও শক্তি এবং তা জিহ্বামূলে হয় সৃষ্ট, মুখাভ্যন্তরে পুষ্ট এবং সমাপ্ত হয় ওষ্ঠদ্বয়ের মিলনসাধনে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন ঃ "All articulate sounds are produced in the space within the mouth beginning with the root of the tongue and ending in the lips —the throat sound is A, and M is the last lip sound, and the U exactly represents the rolling toward of the impulse which begins at the root of tongue till it ends in the lips"। অ-কারের সৃষ্টি হয় গলদেশে জিহ্বামূল থেকে, পুষ্ট হয় মুখে উ-কাররূপে ও সমাপ্ত হয় ম-কারের উচ্চারণে। সুতরাং অ-কার ও ম-কার অনন্ত শব্দপ্রবাহের দুটি দিক বা সীমা এবং উ-কার তাদের মধ্যে করে সমতা রক্ষা। তারি জন্য সর্বানুস্যূত শব্দ ওঙ্কার বা স্ফোট শব্দাত্মক ও বর্ণাত্মক সকল বিশ্বরূপের সৃষ্টিকারণ।

স্বামীজী ওম্ বা অ-উ-ম অক্ষর-তিনটির আরো সূক্ষ্মবিশ্লেষণ করেছেন রাজ-যোগের 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭) সূত্রের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন মানব-মনে প্রতিটি ভাব বা চিন্তার পিছনে এক একটি শব্দের থাকে সমাবেশ, কেননা শব্দ তার

অর্থচিন্তাকে ছেড়ে কোনদিনই নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না। কায়ার পাশে যেমন ছায়ার সমাবেশ থাকে, চিন্তার পাশে তেমনি থাকে শব্দ। আসলে চিন্তা বা ভাব সূক্ষ্ম এবং তার স্থূল রূপ শব্দ ঃ একটি আন্তর ও অপরটি বাহ্য। আন্তরবস্তুটিকে আমরা বলি চিন্তা বা ভাব এবং বাহ্যবস্তুকে বলি শব্দ। যত প্রখর বুদ্ধিশক্তিই থাকুক না কেন মানুষের মধ্যে, সে কিন্তু কখনো শব্দের পিছনে চিন্তাকে বা চিন্তার ফলস্বরূপ শব্দকে ত্যাগ করতে পারে না।

এখন শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাহলে সত্যকার সম্পর্ক কি ? রাজযোগের ব্যাখ্যায়ও স্বামীজী পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেছেন পূর্বেকারই মতো এবং ভাষ্য ও টীকার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "Although the relation between thought and word is perfectly natural, yet it does not mean a rigid connection between one sound and one idea"। ব্যাস তাঁর ভাষ্যে প্রায় এ ধরনের বক্তব্যেরই আভাস দিয়ে বলেছেন ঃ স্থিতোঽস্য বাচাস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, * * সর্গান্তরেষপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সংকেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থ-সম্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে'। বাচস্পতি মিশ্র এ সম্বন্ধে আরো একটু পরিচ্ছিন্ন আভাস দিয়ে বলেছেন ঃ 'পরে হি পশ্যন্তি যদি স্বাভাবিকঃ শব্দার্থয়ো সংবন্ধঃ সংকেতেনাস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থঃ প্রত্যেতব্য ইত্যেবমাত্মকেনাভিব্যজ্যেত। ততো যত্র নাস্তি সঃ সংবন্ধস্তত্র সংকেতশতেনাপি ন ব্যজ্যেত'। স্বামী বিবেকানন্দ বাচস্পতি মিশ্রের এ ইঙ্গিতেরই অনেকটা পরিচয় দিয়েছেন।

স্বামীজী ওঙ্কারের অ-উ-ম অক্ষর-তিনটির ব্যাখ্যা মন্ত্রপর্যায়ে ( vide *The Mantra : Om : Word and Wisdom,*—SV's Works [ 1955 ], p 58 ) দিলেও রাজযোগের ভাষণে ( vide SV's Works [ 1955 ], p. 219 ) তা আরো সুপরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ "The first letter A, is the root sound, the key, pronounced without touching any part of the tongue or palate ; M represents the last sound in the series, being produced by the closed lips, and the U rolls from the very root to the end of the sounding board of the mouth. Thus, Om represents the whole phenomena of sound-producing"।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের বিশ্লেষণপ্রণালীও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বামী অভেদানন্দ অক্ষর-তিনটি বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে এবং স্বামী বিবেকানন্দ করেছেন শব্দব্যাপ্তি ও বিজ্ঞানের দিক থেকে, যদিও উভয়ের বিবৃতি একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে আক্ষরিক ব্যাপ্তি ও বিজ্ঞানের উল্লেখ করে তাঁর 'যোগ-সাইকোলজি' ( *Yoga Psychology* ) গ্রন্থে ( পৃষ্ঠা ৩৭৫ ) বলেছেন ঃ And this basic word came to the ancient seers of truth as a revelation, and they discovered this mystic syllable OM. It consists of three sounds, the sounds of A, U

and M. * * When coalesced, they sound like two letters. The first basic sound is represented by the position of the mouth, when it is wide open. * * The gutteral sound A is the first sound. The last sound is, when you close your mouth completely, the M sound. The M sound is produced by the lips, and the A sound by throat. The lyrynx and the palate must be kept all wide open. Then between these two sounds we get the whole gamut of sound. * * Thus A-U-M are the three sounds which include words that can be uttered by the human mouth. And naturally it (OM) includes all thoughts and ideas, which are represented by all such words"। এবং তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক থেকে স্বামী অভেদানন্দ আবার বলেছেন ঃ "These three letters, that I have described, A. U. M not only include all thoughts in the waking state ( *jagrata* ) but include also thoughts that are in the dream state ( *svapna* ) and that are in the causal state or dreamless sleep state ( *susupti* ) The A sound represents everything in the waking state, and U sound represents everything in the dream state. In the dream state, ideas are real. They are the occasions, when all the thoughts become real for the time being. In the dreamless sleep state (*susupti*), there are realisations, which are included in the sound M. As in the individual, so in the cosmic sense. If we can imagine that the waking state of all beings is taken collectively, that would be represented by the sound A. Then all the minds, that are dreaming, taken collectively, would be represented the U sound, and the M sound will represent all that is to be realised in the dreamless sleep state".

অধ্যাত্মতত্ত্বের দিক থেকে ওঙ্কারের অ-উ-ম অক্ষর-তিনটি গভীর অর্থপূর্ণ এবং তারা মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-তিনটির জ্ঞাপক। শুধুই মানুষ কেন, প্রাণীমাত্রেই এতিনটি অবস্থার অধীন এবং এরাই মায়িক সংসারের প্রবৃত্তিজাল সৃষ্টি ও বিস্তার করে। এতিনটি অবস্থার অতীত মায়ানির্মুক্ত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম-চৈতন্য। এই ব্রহ্মচৈতন্যসত্তাকে অনুভব করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আদি-বীজমন্ত্র ওঙ্কার এই অবস্থা-তিনটির জ্ঞাপক এবং এরা চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্য বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মানুভূতিরই মুখ্যত দিকদর্শন করে। তারি জন্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন ঃ "So these three sounds include everything, and the more we think of the meaning, the higher we rise in meditation, and eventually we enter into the state of superconsciousness or Godcons-

ciousness"। স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। তিনিও পতঞ্জলির মতো ওঙ্কার বা আদিবীজমন্ত্র স্ফোট বা প্রণবকে সর্বগুণোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞাপক বা নির্দেশক বলেছেন, কিন্তু চরমলক্ষ্য বলেন নি! অদ্বৈতবেদান্তের পূজারী স্বামীজী জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও প্রজ্ঞা-ঈশ্বরের অতীত চৈতন্য মায়ালেশনির্মুক্ত ব্রহ্মকেই ওঙ্কার ও সর্বমন্ত্রের লক্ষ্য বলেছেন। মাণ্ডুক্য-উপনিষদে ৮ম থেকে ১১শ শ্লোকগুলিতে ওঙ্কারের পাদ ও মন্ত্র সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ওঙ্কারতত্ত্ব-বিশ্লেষণের পটভূমিকায় তন্ত্র তথা শাক্তধারণার কিছুটা আভাস দিয়েছেন। তন্ত্রসাহিত্যের মতে ওম্ বা ওঙ্কার আদিশব্দ অ-উ-ম অক্ষর-তিনটিরই কেবলি সমষ্টি নয়, এতে সম্পৃক্ত আছে চন্দ্রবিন্দু তথা নাদ ও বিন্দু। নাদ ও বিন্দু মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশের দুটি প্রধানতম ধারা এবং এদুটি শক্তিই ওঙ্কারের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় তথা চতুর্থ চৈতন্যাবস্থার জ্ঞাপক বা নির্দেশক। মন্ত্রশাস্ত্রের মতে নাদ সূক্ষ্মতম শব্দ এবং ক্রিয়াশক্তির প্রথম অবস্থা। পরানাদ ও পরাবাক্যের সমষ্টি পরাশক্তি। পরাশক্তি মূলাধারশায়িনী চিতিরূপিণী কুণ্ডলিনী-শক্তি। মূলাধারশক্তি ও সহস্রারশক্তি অনেকের মতে সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু পার্থক্যও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট—অন্ততঃ সাধনা ও ভাবনা-দৃষ্টির দিক থেকে। দুটির মধ্যে পার্থক্য হল ঃ একটিতে শক্তি বা মহাশক্তি সুপ্ত ও অপরটিতে থাকে চিরজাগ্রত তথা চিদ্ঘনরূপে। শারদাতিলকতন্ত্রের টীকাকার রাঘবভট্টের মতে শব্দব্রহ্মই সর্বজীবাশ্রয়ী চৈতন্য এবং প্রকৃতি—যা ব্যাপকশক্তি কুণ্ডলীরূপা কামকলা। সুতরাং নাদই বিন্দুর আকারে রূপায়িত হয়ে সম্পরিষক্ত চৈতন্য ও শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় বিকাশোন্মুখী শক্তি-রূপ, দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা শব্দব্রহ্ম-রূপে এবং তৃতীয় অবস্থায় ত্রিবিন্দু-রূপে তথা বিন্দু, নাদ বীজ-রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এই ত্রিবিন্দুও আসলে কামকলা কুণ্ডলিনী। বাক্যরূপী নাদ বীজ বা মন্ত্রের সাহায্যে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নামই মন্ত্রচৈতন্য। ওম্ বা ওঙ্কার মহাবীজ, সুতরাং তার জাগরণে শব্দব্রহ্মচৈতন্যের জাগরণ কিনা প্রত্যক্ষ-অনুভূতি হয়।

ওঙ্কারের মতো নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ প্রভৃতি। এরা ওঙ্কারের অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ, তবে ওঙ্কার সাধারণভাবে বৈদিক বীজমন্ত্র ও হ্রীঁ, শ্রীঁ প্রভৃতি তান্ত্রিক বীজমন্ত্র রূপে পরিচিত। এরা সাকার কিনা রূপধারী বা আকারবিশিষ্ট কিন্তু নিরাকার নির্গুণব্রহ্মের নির্দেশক ও প্রকাশক। পতঞ্জলি এরই জন্য ওঙ্কারকে বলেছেন বাচক ঃ 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। বীজমন্ত্রের উচ্চারণকে উচ্চারণকলা বলে। উচ্চারণকলা নাম ও রূপধারী, আর তারি জন্য একে বলা হয় 'সমনি'। কিন্তু এই সমনি-রূপ উচ্চারণকলাই স্বরূপে বিশ্বোত্তীর্ণা নিরুচ্চারণকলা তথা 'উন্মনি'-রূপী পরাচৈতন্যের জ্ঞাপক ও প্রকাশক। অবশ্য নির্বিকার চৈতন্যে আসীন হতে অর্থাৎ তার সম্যক-অনুভূতি লাভ করতে গেলে

তত্ত্ববিকৃতির প্রয়োজন। তত্ত্ববিকৃতির অপর নাম শব্দবিকৃতি, যেমন বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত অবস্থা-চারটি ঐ চতুর্বিকৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এ'তত্ত্ব শুধু পাঠ বা উচ্চারণের বস্তু নয়, প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সামগ্রী।

শারদাতিলকতন্ত্রকার লক্ষ্মণ-দেশিকেন্দ্র শব্দব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে কিভাবে অনুলোমরীতিতে নাদবিকাশগুলি রূপায়িত হয় তার উল্লেখ করে বলেছেন ( ১।১০৮-১১১ ),

সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা ॥
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ।
পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূঃ।
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মাঽসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্।
আকারাদি-সকারান্তাং দ্বিচত্বারিংশদাত্মিকাম্ ॥
পঞ্চাশদ্বারগুণিতা পঞ্চাশদ্বর্ণমালিকাম্।
সূতে তদ্বর্ণতোঽভিন্না কলা রুদ্রাদিকান্ ক্রমাৎ ॥

শব্দব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে শক্তি, ধ্বনি, নাদ, নিরোধিকা, অর্ধেন্দু, বিন্দু, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাদের সৃষ্টি। টীকাকার রাঘবভট্ট এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—কুণ্ডলিনীশক্তি জ্যোতির্মাত্রাত্মরূপিণী। তিনি ঊর্ধগামিনী হন সহস্রারপদ্মে আসীন হবার জন্য। পরা মূলে তথা মূলাধারে, পশ্যন্তী স্বাধিষ্ঠানে, মধ্যমা হৃদয়ে ও বৈখরীনাদ মুখে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্যন্তী স্বয়ং-প্রকাশ ও সুষুম্নানাড়ীবাহী এবং ক্রমে হৃদয়পথে প্রকাশিত হয়ে তা মধ্যমানাদ-রূপে রূপায়িত হয়। বৈখরী জিহ্বামূলে ও ওষ্ঠদেশে প্রকাশ পায় এবং তন্ত্রে তাকে শব্দপ্রপঞ্চজননী বলা হয়েছে। অবশ্য এই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী স্তর বা অবস্থাগুলির উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায়ও পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতার ৪।৫৮।৩ মন্ত্রে বলা হয়েছেঃ 'চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা' প্রভৃতি। পুনরায় আছেঃ 'চত্বারি বাক্-পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ'।

হিন্দুতন্ত্রকার বলেছেনঃ 'পঞ্চাশদ্বর্ণমালিকাম্'। পঞ্চাশদ্বর্ণই নাদের বিচিত্র বিকাশ ও এগুলি কামকলা কুণ্ডলিনী তথা শব্দব্রহ্মরূপী স্ফোটেরই রূপায়ণ। স্ফোটকে সেজন্য বর্ণমাতৃকা বলা হয়। বর্ণমাতৃকাই আবার দেবী সরস্বতী যিনি বর্ণাধিষ্ঠাত্রী। এখানেও রামপ্রসাদের 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী' কথাটি আবার স্মরণ করতে বলি। প্রতিটি বীজমন্ত্রের ধ্যান করার সময় তাই ব্রহ্মকে ঋষি বলা হয়, গায়ত্রী ছন্দ ও দেবতা সরস্বতী। মাতৃকা বা মাতাই দেবতা তথা দেবী পদবাচ্যা। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে আচার্য শংকর তাই দেবী সরস্বতীকে বর্ণমাতৃকা তথা 'বর্ণাধিষ্ঠাত্রী' ও 'বোধদীপিকা' বলে সম্বোধন করেছেন। বোধদীপিকার অর্থ বর্ণই ভাব ও রূপের

স্রষ্টা এবং তাদের থেকে বস্তুসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হয়। আবার সিদ্ধবীজমন্ত্রের যথার্থ বোধে বা মন্ত্রচৈতন্যে পরাজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। অক্ষরাধিষ্ঠাত্রী ও অক্ষররূপিণী দেবী সরস্বতীর প্রথম ও চতুর্থ হস্তে তাই জ্ঞানমুদ্রা ও পুস্তক-মুদ্রার কল্পনা করা হয়েছে। তিনি প্রদীপ্ত জ্ঞানের প্রতীক বলেই এই মুদ্রা-দুটি তাঁর হস্তে শোভা পায়।

বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায়ও ওঙ্কার এবং বীজমন্ত্রের উপযোগিতা দেখা যায়। কার্ণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমতে প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্মসাধনায় ঠিক 'ওম্' বা 'হুম্' প্রভৃতি নির্দিষ্ট বর্ণবীজের অন্তর্নিবেশ ছিল না, তখন প্রাচীন মহাসাঙ্ঘিকেরা ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক প্রভৃতি সাধন-নিয়মসূত্রের অনুসরণ করতেন। ধারণীর অর্থ কোন ভাব, চিন্তা বা ধারণায় মনকে কেন্দ্রায়িত করা ও তারি পরিণতিস্বরূপ ধ্যান ও জ্ঞান-দৃষ্টির বিকাশ সম্ভব। তেমনি বিদ্যাধরের অর্থ আধার বা প্রতিষ্ঠা। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে সম্রাট কণিষ্কের ধর্মমহাসভায় হীনযান ও মহাযান-ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা হলে মহাযানীরা ও বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকেরা বোধিসত্ত্বের আদর্শসাধনায় বিশেষ করে 'ওম্' ও হুম্ বর্ণবীজ-দুটির সহায়তা গ্রহণ করেন মন্ত্রসাধনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-সাধনার সিদ্ধিলাভ করার জন্য।

অবশ্য এখানে একটি জিজ্ঞাসারও সৃষ্টি হয় যে, হীনযান ও মহাযান এবং এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে বৈদিকযুগে সাধনমন্ত্রে যখন ওঙ্কারের বিশেষ প্রচলন ছিল তখন পূর্বপ্রবর্তিত বৈদিক বীজমন্ত্র পরবর্তীকালে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ও বিভিন্ন ধর্মসাধনায় কেন গৃহীত হল না। ঐতিহাসিকেরা হয়তো এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে ওঙ্কারতত্ত্বের সাধনা কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করল তার সামান্য নিদর্শন দিতে গেলে শ্রদ্ধেয় লামা আনাগারিক গোবিন্দের ভাষায়ই বলি : "In order to impress this universal attitude of the *Mahayana* upon the devotee or *S..dhaka* with the suggestive power of a concentrative symbol, the sacred syllable OM opens every solemn utterance, every formula of worship, every meditation. * And so it happened that in the moment, in which Buddhism became conscious of its world-mission and entered the arena of world-religions, the sacred symbol OM became again the 'leitmotif' of religious life, the symbol of an all-embracing urge of liberation, in which the experience of oneness and solidarity are not the ultimate aim but the *precondition* of real liberation, which was no more anxiously concerned with one's own salvation and perfect enlightenment",

সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র সাধনায় বৈদিক উপাসনা ও হিন্দুতন্ত্রসাধনার মতো ওঙ্কারের স্থান ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বৌদ্ধধর্মসাধনায় ওঙ্কারকে একেবারে চরমমন্ত্র বা বর্ণবীজ বোলে গ্রহণ করা হয়নি—অন্ততঃ এটাই

বৌদ্ধাচার্যদের অভিমত। তারি জন্য বোধিসত্ত্বভূমি এবং মহাযান ও বজ্রযান-সাধনায় প্রতিটি মন্ত্র, সূত্র, পূজা ও ধ্যানের প্রারম্ভে থাকে 'ওম্' ও সমাপ্তিতে থাকে 'হুম্' বর্ণবীজ-দুটি। বৌদ্ধতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় 'ওম্' ও 'হুম্' বর্ণবীজ-দুটির মধ্যে অর্থের কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন 'ওম্'-এর গতিপথ হল ঊর্ধপ্রসারী বিশ্বজনীনতা বা সার্বভৌমিকতার আদর্শের দিকে, আর 'হুম্'-এর গতিপথ সার্বভৌমিকতার সঞ্চার নিয়ে নিম্নদিকে পার্থিবজগতে মনুষ্য-হৃদয়ের গভীরতম দেশে ঃ একটি উন্মীলনধর্মী ও অপরটি নিমীলনধর্মী হলেও উভয়ে কিন্তু বিনাশ বা নিষ্প্রভতার দিকদর্শন করে না, বরং করে মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও পূর্ণব্যাপ্তি সাধন। আবার 'ওম্'-বর্ণবীজ ব্যতীত 'হুম'-বীজের কোন সার্থকতাই থাকে না। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় এজন্য এদুটির সামঞ্জস্য ও সহাবস্থানকে 'মধ্যমপন্থা' নাম দেওয়া হয়েছে। মধ্যমপন্থার অর্থ নিত্য অবিনশ্বর তত্ত্ব সান্ত অথবা অনন্তের গর্ভে লীন হয় না, কিংবা একটি অপরটির কাছে আত্মনিবেদন করে না বরং করে উভয়ের মধ্যেই সমতা রক্ষা করে এবং তাঁর ফলে হয় সাম্যগুণসম্পন্ন পরমসত্তাবান শূন্যতার প্রতিষ্ঠা।

বৌদ্ধধর্মাচার্যগণ ওঙ্কারকে বলেছেন যেন সূর্য এবং হুংকার হলো সরস মৃত্তিকা—যাতে সূর্যের তাপ ও কিরণচ্ছটা নবজীবনের সঞ্চার করে। তারি জন্য ওঙ্কার-রূপ আদিবর্ণবীজকে চিন্তা করেছেন তাঁরা অনন্ত হুংকারকেও শান্তির মধ্যে প্রতিফলিত করে। সুতরাং হুংকারের প্রাণবন্ত সীমার মাঝে অসীমের বিকাশ ও পূর্ণস্ফূর্তি। আবার তারি জন্য সূক্ষ্মদর্শী বৌদ্ধসাধকেরা ও বিশেষ করে বজ্রযানী মন্ত্রসাধকেরা শূন্যতার মধ্যে দেখেন ব্যাপকসত্তা—যাকে বলে শূন্যতা বা নথিঙ্নেসের মধ্যে সাচনেস বা দ্যাটনেস। শ্রদ্ধেয় লামা অনাগারিক গোবিন্দের ভাষায় বলা যায়ঃ "We, therefore, must have passed through that experience of OM in order to reach and to understand that still deeper experience of HUM. This is why OM stands at the beginning and HUM at the end of *mantras*. In the OM, we open ourselves and in the HUM, we give ourselves. OM, is the door of knowledge, HUM is the door of realization of this knowledge in life. HUM is a sacrificial sound".

কিন্তু উপরিউক্ত ক্রম বা ধারারও আমরা বিপর্যয় লক্ষ্য করি বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মন্ত্রমালায়। যেমন,

(১) তারাদেবীর মন্ত্র—হ্রীঁ+স্ত্রী+হূঁ+ফট্।
(২) উগ্রার ,,—স্ত্রীঁ+হ্রীঁ+হূঁ+ফট্।
(৩) বজ্রার ,,—হূঁ+স্ত্রীঁ+হ্রীঁ+ফট্।
(৪) ভদ্রকালীর ,,—স্ত্রীঁ+হূঁ+হ্রীঁ+ফট্।
(৫) সরস্বতীর ,,—স্ত্রীঁ+হ্রীঁ+ফট্+হূঁ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, হ্রীঁ বা হূ-বর্ণবীজ সকলের ব্যাপ্তিশেষে নাই, বরং প্রথমে, মাঝে এবং শেষে আছে। বৈদিক মন্ত্রের প্রথমে ও শেষে 'ওম্'-বর্ণবীজ পূটিত

করা হয়। বৈদিক 'ওম্'-বর্ণবীজের বিশ্লেষণ যেমন অ+উ+ম, তেমনি হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের 'হুং'-বর্ণবীজের বিশ্লেষণভঙ্গিও হ+উ+ম। তান্ত্রিক বর্ণবীজগুলির বিশ্লেষণভঙ্গি একই রকমের। তবে তিব্বতীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' পরম-মন্ত্রের সজ্জাপ্রণালী অবশ্য পূর্বসিদ্ধান্তের অনুযায়ী, অর্থাৎ ওম্ প্রথমে ও হুম্ মন্ত্রের শেষে থাকে। মোটকথা বৌদ্ধতন্তে আদিবর্ণবীজ ওঙ্কার পরমবীজমন্ত্র-রূপে সাধকের বোধিচেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে ও পরমশান্তি দান করে। বৌদ্ধতন্ত্রের মতো জৈনতন্ত্রসাধনাও আদিবর্ণবীজ ওঙ্কারের সার্থকতা যথেষ্ট।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ আদিবর্ণবীজ ওঙ্কারের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে ভারতীয় মন্ত্রতত্ত্ব বা মন্ত্ররহস্যের আলোকদীপ্ত দ্বার আরো উন্মুক্ত করেছেন। তবে তাঁর অনুশীলনধারার ব্যাখ্যাতা আমরা হয়তো সে সহজ সরল ধারাকে বিচিত্র শাস্ত্রপ্রমাণ ও ব্যাখ্যার অবতারণা করে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানের অবসরে রামায়ণ-রচনারই চেষ্টা করেছি এখাঁনে, কিন্তু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মন্ত্রতত্ত্ববিদ্যা উপনিষদ্বিদ্যার মতোই দুরধিগম্য ও রহস্যময় চিরদিন, এবং তারি জন্য মন্ত্রবিদ্যাকে শাস্ত্রে রহস্যবিদ্যাও বলে। আবার প্রণব-রূপ বাচক, প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যেই সেই নিগূঢ় রহস্যেরও যথার্থ সমাধান করা সম্ভব। রূপের মধ্য দিয়েই আমাদের অরূপের স্পর্শানুভূতি লাভ করতে হবে এবং এই লাভই মনুষ্য-জীবনে পরমপবিত্র ও দুর্লভ।

এবার মন্ত্ররহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বকথার শেষসিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকানন্দেরই নিজের কথায় নিবেদন করে নিবন্ধ শেষ করি। স্বামীজী বলেছেন : "Even as in the case of the least differentiated and the most universal symbol Om, thought and sound-symbol are seen to be inseparably associated with each other, so also this law of their inseparable associated applies to the many differentiated views of God and the universe : each of them, therefore, must have particular word-symbol to express it. These word-symbols, evolved out of the deepest spiritual perception of sages, symbolise and express as nearly as possible, the particular view of God and the universe stand for. And as the Om represents the *Akhanda*, the undifferentiated Brahman, the others represent the *Khanda* or the differentianed views of the same Being ; and they are all helpful to divine meditation and the acquisition of true knowledge" ;—অর্থাৎ শব্দবাচকরূপ বীজমন্ত্রগুলি সিদ্ধসাধকের ধ্যাননেত্রে প্রতিভাত ও প্রতীকরূপে রূপায়িত নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমচৈতন্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপানুভূতি লাভ করার জন্য। লাভ এখানে অর্থবাদ বা প্রশংসামাত্র, কেননা স্বয়ংপ্রকাশ সেই পরমবস্তু ব্রহ্মচৈতন্য, অজ্ঞানতার অপসারণেই হয় তার প্রকাশ। ওম্ বা স্ফোট অখণ্ডব্রহ্মেরই প্রতীক বা প্রকাশক, তাছাড়া অন্য সকল বস্তু খণ্ডব্রহ্মের

দিকদর্শন করে, সুতরাং তারা ধ্যান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্ররহস্য সহজ ও সরলভাবে প্রতিফলিত হলেও পূর্বেই বলেছি তা সাধারণ সাধকের কাছে দুরধিগম্য, কিন্তু অবিশ্রান্ত সনিষ্ঠ সাধনায় সেই দুর্লভ সত্যের দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হয় এবং এই সান্ত্বনা ও আশার দীপ্ত বাণীই শুনিয়েছেন স্বামীজী এযুগে। তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত সমস্ত কল্যাণচিন্তায়। তত্ত্বচিন্তাই শুধু স্থান পেত না তাঁর বোধপ্রদীপ্ত হৃদয়ে, তত্ত্বানুভূতিও তিনি করেছিলেন নিজের জীবনে বিশ্বের ব্যাপক প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে নিজ প্রাণের নিবিড় যোগসূত্র রচনা করে। পৃথিবীর সংঘাতময় জীবনপ্রবাহের মধ্যে সর্বদাই প্রদীপ্ত ছিল তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষু এবং সামগ্রিক ব্রহ্মানুভূতি করেছিল তাঁর অধ্যাত্মজীবন-সার্থকতাকে প্রতিষ্ঠিত। প্রণাম করি আমরা সেই বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দকে, আশীর্বাদ করুন তিনি সকলকে অধ্যাত্মজীবনের দ্বার চির-উন্মুক্ত করে। ভারতের পবিত্র মন্ত্রতত্ত্ব তাঁর পুণ্যপ্রেরণাস্পর্শে আবার নূতনভাবে হোক উজ্জীবিত! অধ্যাত্মসাধনার মঙ্গলদীপমালা প্রজ্জ্বলিত হোক আবার প্রতিটি মানুষের হৃদয়কন্দরে!

# বিবেকানন্দ ও নব বেদান্ত

---

গণেশ বেদজ্ঞ

বেদান্ত শব্দে আমরা বুঝি বেদের অন্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ। বেদের দুইটি ভাগ আছে—ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ ও সংহিতা লইয়া কর্মকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডকেই উপনিষদ বলে। জ্ঞানকাণ্ডেই বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ এবং ইহাই বেদান্ত নামেই পরিচিত। উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—উপ+নি+সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া উপনিষদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "উপ" অর্থাৎ সমীপে। "নি" অর্থ নিশ্চিত বা নিশ্চয়রূপে। "সদ্" অর্থ ছেদন বা প্রাপ্তি। অতএব গুরুর নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার বন্ধন নিশ্চিতরূপে ছেদন করা যায় অথবা যে উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহাই উপনিষদ। বৈদিক কর্মকাণ্ডের বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ শাশ্বত অবস্থায় বিদ্যমান। "কৃতের" দ্বারা "অকৃত"-কে পাওয়া যায় না, তখনই আসিবে নির্বেদ। আর এই নির্বেদ হইতে জাগিবে ব্রহ্ম বিবিদিষা। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ না হইলে "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" উদিত হয় না। আর এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই প্রয়োজন বৈধ কর্মের। অতএব বৈদিক দৃষ্টিতে কর্ম আর জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই। জ্ঞান বলিতে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝি। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "শুধু এক জ্ঞানই জ্ঞান। বাকী সব অজ্ঞান"। তিনি উপমা দিয়া বলিয়াছেন—"পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে আমরা আর একটা কাঁটার সাহায্যে সেটিকে তুলে ফেলি। পরে দুটো কাঁটাই ফেলে দিই।" তাই তিনি বলিয়াছেন "প্রথমে জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলবে। তারপর জ্ঞান কাঁটা অজ্ঞান কাঁটা দুইই ফেলে দেবে।"

সক্রেটিসকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হয়। তিনি বলিতেন, "আমি জানি যে আমি কিছু জানি না, আর বাকী সব লোক জানে না যে তারা কিছু জানে না।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। হে পার্থ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হয়।" "প্রস্থানত্রয়" হল ব্যাপক এবং পূর্ণ অর্থে "বেদান্ত"। উপনিষদ, গীতা ও ব্যাসসূত্র হইতেছে প্রস্থানত্রয়। উপনিষদকে বলা হয় শ্রুতি। যত পুরাণাদি আছে তাহাদেরকে বলা হয় স্মৃতি। শ্রুতি হইতেছে প্রামাণিক। যখন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিবাদ ঘটে তখন শ্রুতিকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

বেদান্তের মধ্যে তিনটি মতবাদ দেখা যায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদই বেদান্তের চরম লক্ষ্য। এই সকল মতবাদের আচার্য ও দার্শনিকগণ উপনিষদকে উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতীয় প্রত্যেক দর্শন ও সম্প্রদায়কে দেখাইতে হয় যে তাঁরা উপনিষদের ভিত্তি প্রস্তর রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া

আছেন। আধুনিক যুগে ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবত "বৈদিক বা বৈদান্তিক" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বেদকে যে মানে সেই বৈদিক। বেদান্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় ধর্ম সমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর বেদান্ত যখন বেদ তখন ইহা সর্ব সম্মতিক্রমে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ।

আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে উপনিষদে ভক্তির আদর্শ নাই। এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই যাহার বীজ সেই সর্বভারতের বীজস্বরূপ উপনিষদে পাওয়া যায় না। আমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন তার সবটুকুই সংহিতাতে আছে—উপাসনা, প্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নাই। উপনিষদের ধর্ম প্রেমের, উপনিষদের ধর্ম জ্ঞানের। ইহার চিন্তারাশি সকলের অধিকাংশ নির্জন অরণ্যের ফল নহে, পরন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজারাই এগুলির প্রণেতা।

আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদবিদ্যমান, তাহা দূর করাই বেদান্তের অন্যতম শিক্ষা। কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু উপদেশ দেন, বেদান্ত বলে এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করা সম্ভব। ইহার সাহায্যে জড় জগতে এবং পারমার্থিক জগতে একই সঙ্গে উন্নতি করা সম্ভব। জনক রাজা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দুই হাতে দুইটি তরবারি ঘুরাইতেন। একটি কর্মের আর একটি জ্ঞানের।

পরবর্তীকালে গীতা বেদান্ত দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়। গীতার মধ্যে আমরা পাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয় সাধন। আধার ভেদে এক একটি পথ মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য "ঈশ্বর" লাভের সহায়ক হয়। বিবেকানন্দ যে প্রতীক ব্যবহার করিয়াছিলেন তাও উক্ত চতুর্থয়েরই সমন্বয়। ঠাকুরের জীবনীও একটি সমন্বয় সাধনের তীর্থক্ষেত্র যাহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি সমস্ত ধর্মের স্থান পরিলক্ষিত হয়।

স্বামীজী বেদান্তের প্রতি কিরূপে আকৃষ্ট হন তা ১৮৮৪ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর উক্ত বৎসরে একদিন শিষ্যদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান গুণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনটি গুণের কথা বলেন। প্রথম নামে রুচি। দ্বিতীয় জীবে দয়া। তৃতীয় বৈষ্ণব পূজন। জীবে দয়া বলিতে গিয়াই তাঁহার ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, "তুই শালা কীটাণুকীট। তুই দয়া করার কে ? বল সেবা করব।" নরেন ব্যতীত অন্যান্য গুরুভাইরা এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নরেন বলিলেন, "বনের বেদান্তকে কি সুন্দরভাবে ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। যদি সুযোগ পাই তবে উহা প্রচার করিব।"

১৮৮৬ সালে যখন ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ছিলেন তখন একদিন নরেনকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে নরেন নির্বিকল্প সমাধি লাভের কথা উল্লেখ করিলেন। ঠাকুর সখেদে বলিলেন, "ছি ছি! তুই কিনা

বটবৃক্ষ হবি। তোর ছায়ায় কতলোক আশ্রয় পাবে।" এই দুইটি ঘটনা নরেনের চিন্তাজগতে এক বিশাল আলোড়ন তুলিয়াছিল। তাই বিবেকানন্দকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে পাই এক বিখ্যাত বৈদান্তিক হিসাবে যেখানে হৃদয়ের স্থান মস্তিষ্ক হইতে অনেক উপরে। অবশ্য তিনটি 'H'-এর সমন্বয় সাধনের কথা বলিয়াছেন—Head, Heart and Hand. স্বামীজী বলিয়াছেন, "When your Brain and Heart come into conflict, you follow your Heart." স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে আবু স্টেশনে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমি আজও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝিতে পারি নাই।" পরে তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে এবং ভাবাবেগে বলিলেন, "আমার হৃদয়ের বিশাল সম্প্রসারণ ঘটেছে, আমি পরের জন্য অনুভব করতে শিখেছি, আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছি।" এই কথাগুলি বলার সময় ভাবে তাঁর স্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, চোখ থেকে অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছিল।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দান—জ্ঞান দান। কাহাকেও খাবার দিলে তার সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু জ্ঞান পাইলে তাহার ইহকালের এবং পরকালের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে। স্বামীজী এই মত পোষণ করিতেন। তাই উপনিষদে পাই "সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম।" উপনিষদ জ্ঞানের আকর, শক্তির আকর। উপনিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। জাতীয় জীবনে প্রত্যেকেরই বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না। একটি অপরটির পরিণতি। একটি যেন গৃহ, অপরটি ছাদ। একটি যেন মূল, অপরটি ফল। স্বামীজীর স্বীকৃতিতে জানতে পারি—"বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, যিনি একদিকে পরম ভক্ত, অপর দিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শুধু অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে শিখিয়াছি। আমি এবিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সকল শাস্ত্র বাক্য পরস্পর বিরোধী নহে। ঐগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপান স্বরূপ।" তাই তিনি উপদেশ দিতেছেন—"তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত তুমি তাহা গ্রহণ কর। তুমি অপর সকলকে তোমার আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে যাও কেন? প্রত্যেককে নিজেরভাবে চলিতে দাও।" ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনিস্বরূপ মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, "যার পেটে যা সয়।"

কেহ মাছ ভাজা খায়, কেহ ঝোল, কেহ ঝাল আর কেহ বা টক। কিন্তু সেই মৎস্য আস্বাদন। নিজের মত লইয়া চলিবার কথা ঠাকুর বলিয়াছেন। অপরের ভাবে হাত দিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। কাশীপুরের শিবরাত্রিতে নরেন যখন কালীকে স্পর্শ করাইয়া ভাবের রূপান্তর সাময়িকভাবে করিয়াছিল তখন অসুস্থ

ঠাকুর পরে নরেনকে তাঁর ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এর বাণী স্বামীজী তাঁর গুরুর কৃপায় উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর শিক্ষা ও সেবার ভিতরকার মূলমন্ত্র ঐটিই। প্রাচ্যের মানবতা হচ্ছে "God based Humanism"। তাই তাঁর কন্ঠে নিনাদিত হইয়াছিল, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' সুতরাং ঈশ্বর লাভের সোপান হইতেছে সেই সেবা।

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তুমধ্যমঃ।
স্তুতিজপোহধমো ভাবো বাহ্য পূজাধমাধমা ॥

ঠাকুর তাই বলিয়াছেন পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান, ধ্যানের চেয়ে ভাব, ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়।

উপনিষদের অমোঘ বাণী "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধিত" অনুবাদ স্বরূপ বলিয়াছেন Arise! Awake! And stop not till goal is reached. Life is ever expanding and contraction is death, সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। প্রেমই হচ্ছে সম্প্রসারণ অর্থাৎ জীবন। স্বার্থপরতাই সংকোচন অর্থাৎ মৃত্যু। প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও সেবা—এই চারটিই রামকৃষ্ণ মিলনের মূলমন্ত্র। আমাদের জীবনের পক্ষেও তাই। মনুষ্য জীবনের কাম্য চারিটি বস্তু—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারিটিই লাভ করা যায় যদি আমরা বেদান্তে বিশ্বাসী হই এবং অনুসরণ করি। শুধুমাত্র মূর্তিপূজা করিয়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। জ্যান্ত মূর্তি পূজা অর্থাৎ মানুষের পূজার মাধ্যমেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ধ্বনিত হয়েছে—

'মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু পূজা খেলা
মুগ্ধভাব ভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজ খেলার পুত্তল।'

শিবজ্ঞানে জীবসেবাই ছিল তাঁর জীবনে ধ্রুবতারা। সেবা করে আমরা ধন্য হবো। যে সেবা গ্রহণ করবে সে নয়। তাই তিনি বলেছেন—পরোপকারে নিজেরই উপকার। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেছেন—Blessed are we that we are given the privilege of working for Him and not of helping Him. Cut out the world help from your mind. You can not help. It is blashphemy. Do it only as worship. I should see Good in the poor. And it is for my salvation that I go and worship them. The poor and the miserable are for our salvation, so that we way serve the Loud coming in the shape of the diseased, the Lunatic, the Leper and the Sinner. অপরের মুক্তির জন্য নরকে যেতে পর্যন্ত বলেছেন। পৃথিবীতে নিজের মুক্তি বলে কোন কথা নেই। Great things can be done by great sacrifices only.

Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment, universality. "যতদিন পর্যন্ত ভারতে একটি কুকুর অভুক্ত থাকিবে ততদিন আমি মুক্তি চাই না"—কি বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পাই এই কথার মাধ্যমে। "জন্ম হইতে তুমি মায়ের বলি প্রদত্ত" এটিও তাঁর কথা।

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির কথাই তিনি বলিয়াছেন। বর্তমানে জগতে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধান যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি সেই পরিমাণে হয় নাই। তাই এত শোষণ, এত মারামারি এত হানাহানি। মানুষকে তিনি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মহান শিল্পী। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—যার জীবন যত সুন্দর সে তত বড় শিল্পী। অরবিন্দ বলিয়াছেন—We are sons of God and must be even as He. His human portion we must grow divine "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সব কিছুই ব্রহ্ম কারণ সমস্ত কিছু তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে। এই ব্রহ্মই জীব জগত ও ঈশ্বররূপে বিরাজমান। ঈশ-উপনিষদে প্রথমেই আমরা পাই—"ঈশো বাস্যামিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই চলমান বিশ্ব সেই সর্বময়ের দ্বারা আবৃত। তাহাকে আমরা কিরূপে ভোগ করিব? তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—ত্যাগের মাধ্যমে। আর বলিয়াছেন অপরের ধনে লোভ করিও না—মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্। এই উক্তির চরম সার্থকতা দেখি অবতারের জীবনে। তিনি বলিয়াছেন—একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে দেখে তাঁর নাম খণ্ড জ্ঞানী—সে মনে করে তাঁর ওদিকে আর তিনি নাই। আর পূর্ণ জ্ঞানী সে সব কিছুর ভিতরেই তাঁকে দর্শন করে। তিনি তাঁর অনুভূতির কথা বলেছেন—"হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোষাকুষি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ জীব জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগলাম।—যা দেখি তাই পূজা করি।...ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যে এক একটা ফুলের তোড়া। গীতাতেও এর সমর্থন পাই—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মবিৎ হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, ঘৃতকে, হোমাগ্নিকে আহুতিদানের কর্তাকে এবং হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। মিশনে অন্নগ্রহণের পূর্বে এই মন্ত্রটি স্মরণ করিতে হয়। ঠাকুরের অদ্বৈতানুভূতির কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ব্যাপারটি আরো সরল হইয়া যাইবে। কেহ ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে ঠাকুরের বুকে যন্ত্রণা হইত। একবার গঙ্গায় দুইটি মাঝির সহিত বচসার পরিণামে একজন আর একজনকে সজোরে চড় মারে। ইহাতে ঠাকুর যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করেন। হৃদয় আসিয়া দেখিল ঠাকুরের পিঠে আঙুলের দাগ। বেলগাছ হইতে পাতা পাড়িবার কালে ঠাকুরের কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিত।

তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিন্তু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো। তিনি বললেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ

করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হলো। তিনি রামকে বোঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ বললেন, "রাম তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বলছো ? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। যদি তুমি বুঝিতে দাও ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তাহলে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ করে রইলেন—কোন উত্তর দিতে পারলেন না।"—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ধ্বনিত হয়েছে—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ।

সুতরাং সর্বত্রই সমদর্শন অর্থাৎ সমদর্শী হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দৃপ্তকণ্ঠে বলছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥

যে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলিয়া অভুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। আবার তিনি অর্জুনকে সাম্যের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মনং ততো যাতি পরাম্ গতিম্ ॥

সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলিয়া নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাই স্বামীজীর কণ্ঠে শুনিতে পাই, মূর্খদেবোভব। দরিদ্রদেবো ভব ! আপামর দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীকে নিজের ভাই বলিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন। তিনি অস্পৃশ্যতাবাদী ও ছুঁত মার্গীদের তীব্র কষাঘাত করেছেন। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ—তিনিই প্রথম শিখিয়েছেন। পরাধীন দেশের অধিবাসীদের শ্রাদ্ধের কোনো অধিকার নেই একথাও শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে। যদিও তিনি ভারতবাসী বলিয়া গর্ববোধ করিতেন তবুও তিনি সারাবিশ্বের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "জগত জুড়িয়া এক জাতি—তার নাম মানুষ জাতি।" আমেরিকা থাকাকালীন ওনার এক ইংরেজ বন্ধু লিখিয়াছিলেন—How long will be there ? Please return to your own mother India ; there is plenty of work for your nation awaiting you.

"Doubtless, I do love India, But everyday my sight grows clearer. What is India or England or America to us ? We are the servants of that God who by the ignorant is called Man. He who pours water at the root does he not water the whole tree ?

There is but one basis of well being : social, political or spiritual to know that I and my brother are one. This is true for all countries

and all people." যদিও তিনি নিবিড়ভাবে ভারতীয় ছিলেন, তিনি কিন্তু সর্বতোভাবে ভারতীয় নন। সুতরাং এই একত্বের সুর যতদিন পর্যন্ত মানুষের অন্তরে সংস্কারে পরিণত হইবে না ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মারামারি হানাহানি বন্ধ হইবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে একজন ইংরাজ বুদ্ধিজীবী "Dr. Jariah Oldfield Wars and Internationalism" সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে ভার্সাইলের সন্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—More wars are caused by bad tempered people seeking to discuss peace measures than by good tempered people seeking to diseuss war measures. UNESCO এই প্রসঙ্গে বলেছেন—Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the Defences of peace must be constructed. বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ভীরুতার কোন্ স্থান নাই। স্থান নেই কোন নেতিবাচক কথার।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলেন রোমা রোঁলা ১৯২০তে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative." স্বামীজী বলিতেন—Weakness is death, অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন। আমরা অমৃতের সন্তান। আমাদের বিনাশ নাই। তার অভিধানে পাপ বলিয়া কোনো শব্দ স্থান পায় নাই। তিনি বলিতেন মানুষ ভুল করে। তার কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—Ye, divinites on earth—Sinners! It is a sin to call a man so: it is a standing libel on human nature. Come up, O, lions, and shake off the delusion that you are sheep. You are sons immortal, spirits free, blessed and eternal; ye are not matter, ye are not bodies, matter is your servant not you the servant of matter. তিনি বিবেকানন্দরূপে খ্যাতিলাভ করিবার পর অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছেন—ঐগুলির একটিও যদি বাদ পড়িত তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি, তাহা হইতাম না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতে পারে না; কারণ মঙ্গল ও পবিত্রতা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর কোন উপায়ে সেই প্রকৃতির অন্যথা হয় না। আত্মানং বিদ্ধি—know thyself, নিজেকে জান—স্বরূপকে জান—এইতো তাঁর উদাত্ত আহ্বান। "জ্ঞানের আলো জ্বালো। এক মুহূর্তে সব অন্ধকার চলিয়া যাইবে। নিজের স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত "আমি কে"—সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি কে' প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই আত্মাকে দর্শন কর। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই এমন অবস্থালাভ করুক যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলে ও তাহার

বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্যামী সৎ স্বরূপকে দেখিতে পারে, আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারে, "হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় ওঠ! হে সদা শুদ্ধ স্বরূপ ওঠ! হে অজ অবিনাশী সর্বশক্তিমান ওঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে সকল ক্ষুদ্রভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজেনা।" অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা—নিজ স্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা অনন্ত সর্বশক্তিমান, সদামঙ্গলময় বলিয়া স্মরণ। এই অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধন তাহাতে নাই।' আমাদের অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। বেদান্ত এই মত পোষণ করে। অতি প্রাকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ করিও না—নিরাশ বা বিষণ্ণ হইয়া পড়িও না, অথবা মনে করিও না, আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। "Self help is the best help" আমরা গুটিপোকার মতো নিজের শরীর হইতে বন্ধনের সূত্র প্রস্তুত করিয়া কালক্রমে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বন্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। গুটির মধ্যে প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া আমরা বাহিরে আসিব, মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি—আমরা যেন বন্ধ।...নিজের চারিদিকে যেজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে, আর তাহা করিবার শক্তি আমাদের রহিয়াছে।

"আমাদের উপনিষদ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ।" সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করিনা কেন, দেখা যায়, ঐ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, যখন পরস্পরকে ঠিকমত জানতে পারি, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, হইবেই তো—কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, চেষ্টা না করিলেও আমাদের একত্বভাব স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধা অর্জন করিতে বলিয়াছেন। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস অথচ নিজের উপর বিশ্বাস যার নাই তাকে নাস্তিক বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নচিকেতার উদাহরণ দিয়েছেন।

রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর সেগুলির সমাধান জাতীয় ভিত্তিতে করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলায়তন হইতেছে, বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র; সকলের ভিতর একত্বভাব বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

শারীরিক দুর্বলতা আমাদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ—ইহা াঁহার মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ঋষির কথা! দুর্বল মস্তিষ্ক

কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু তাজা হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে তখনই তোমরা উপনিষদ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Education is the manifestation of perfection already in man. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life building, man-making, character-building assimilation of ideas. If you have live ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. শিক্ষা প্রসঙ্গে মনীষী প্লেটো বলিয়াছেন—The aim of education is to develop in the body and in the soul all the beauty and all the perfection to which they are capable. শিক্ষার সাহায্যে প্রকৃত মানুষ তৈরী করিতে হইবে। তাই তিনি বলিতেন "Man making is my mission." স্বামীজী ১৮৯৭-র জানুয়ারীতে দেশে ফিরিলে কিছু লোক তাঁকে বললেন স্বামীজী রাজনীতিতে আসুন, দেশটাকে স্বাধীন করে দিন। তিনি বললেন, "১২টা মানুষ দাও, আমি দেশ স্বাধীন করে দেব।" আজও তার আশা পূরণ হয়নি। তিনি চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—Netiher money pays, nor name nor fame, nor learning, it is character that can cleave through the adamantine walls of difficulties. তথাকথিত শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—লেখাপড়া শিখে কি করবি ? হয় ৩০ টাকা মাইনের কেরানী নয় দুষ্টু উকীল হবি। প্রাচীন আশ্রমিক প্রথার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব। ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন Religion is the manifestation of divinity already in man. ধর্মকে আমি শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। ধর্ম পশুকে মানুষের স্তরে উন্নীত করে আর মানুষকে দেবার স্তরে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রগঠন প্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যবাদ—এই সবগুলিই ঠিকঠাক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।

ভারতের মাটিতেই বেদান্তের সৃষ্টি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষেই এর প্রয়োগ

ন্যূনতম। তার কারণ স্বরূপ স্বামীজী সমাজের শীর্ষে যারা বসে আছেন তাদেরকে দোষারোপ করেছেন। তারা তাদের পীড়ন ও শোষণ নামক যন্ত্র সমাজের নিম্নশ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে রেখেছে। East is groaning under the tyranny of the Priests: তিনি রোষের সঙ্গে বলেছেন। তবে এইভাব বেশিদিন চলবে না। হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছেন—তোমরা তোমাদের কবর খুঁড়ছ। কবির কণ্ঠে শুনি সেই কথা—পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমার পশ্চাতে টানিছে। Asia laid the germs of Civilisation, Europe developed man and America is developing the Woman and the masses. It is the Paradise of the Woman and Labourer. The Americans are fast becoming liberal, and this great nation is progressing fast towards that spirituality which is the standard boast of the Hindu.

ভারতবর্ষের দুঃখের কারণ নারী ও সাধারণের প্রতি অবহেলা। নারীকে প্রসব যন্ত্ররূপেই ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের উন্নতি না ঘটিলে কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া যদি মুখেই রক্তের সঞ্চার করা যায়, তবে তাহাকে সুন্দর স্বাস্থ্য বলা যায় না।"

বিবেকানন্দ বেদান্ত সম্বন্ধে নতুন কিছু বলেন নাই। প্রায় তিনহাজার বছর পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্যবহারিক জীবনে যে প্রয়োগ কৌশল দেখাইয়াছেন তাহাতেই বিস্মিত হইতে হয়। তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি গুরু-ভাইদের কেউ কেউ এমন কি শ্রীম পর্যন্ত অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদের মতন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে ইহার তাৎপর্য বোঝা যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই বিরাটের অল্পও পালন করিতে পারিলে মহান ভয় হইতে রক্ষা পাইব। ক্ষুদ্রকীট হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলের ভিতর একই ব্রহ্ম বিরাজমান। তফাৎ শুধু বিকাশের তারতম্যে; ঈশ্বরের মধ্যেই চরম বিকাশ। আমাদের লক্ষ্য বিকাশের সেই চরমে পৌঁছানো। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে আদর্শ সন্ন্যাসী অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া শক্ত। এবং আরও বলিয়াছেন যে যার নিজের ক্ষেত্রে বড়। আপেলের সঙ্গে ওকের তুলনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ভোগসর্বস্ব জীবনকে বরণ করার জন্যই আমাদের যত দুঃখ। প্রাচীন ভারতের এবং বর্তমানের অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে।

আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যে তিনি বলিতেছেন, প্রাচীন ও নবীন যুগের যাহাকিছু ভাল তাহার সমন্বয় ঘটাইতে। এই প্রকারে সার্বিক উন্নতি সম্ভব। স্বামীজী তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি বিদ্যার মিলন ঘটাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে বড় হইতে গেলে তিনটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন—

(1) Conviction of the Powers of goodness.
(2) Absence of Jealosy and Suspicion.
(3) Helping all who are trying to be good and do good.

তিনি রাজনীতিবিদ্‌দের হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছেন—Do not try to lead your brethren, but Serve them . The brutal mania for leading has Sunk many a great Ship in the waters of life. তিনি বলিয়াছেন—উত্তম সেবকই শ্রেষ্ঠ নেতা। সরদার হতে গেলে শিরদার হতে হবে। নজরুলের কণ্ঠেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।

জওহরলাল নেহরু "Discovery of India" তে স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছেন—Rooted in the past and full of ride in India's heritage Vivekananda was yet modern in his approach to life's Problems, and was a kind of bridge between the Past of India and her present. তিনি ছিলেন এক বিরাট কর্মবীর। প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটি আদর্শ থাকে। কর্মের সোপানে ভড করিয়া আমরা আদর্শে আরোহণ করিব। ঐ আদর্শই আমাদের জীবনের গবাক্ষপথে প্রতিফলিত ও প্রত্যাবর্তিত হইয়া সরল বা বক্ররেখায় চলে। যে কোন কাপুরুষ জীবনে কোন এক মুহূর্তে এক দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারে কিন্তু উহা তাহার সামগ্রিক জীবনের পরিচায়ক নহে। প্রতিদিনের কর্মই চরিত্র নামক বস্তুতে পরিণত হয়। তিনি কাজকে এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা ভাবা যায় না। তিনি বলিয়াছেন যে এক ছিলিম তামাক ভালভাবে সাজিতে পারে সে ধ্যানও করিতে পারে। হাজার তাত্ত্বিক অপেক্ষা একজন কর্মীকে উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। রামঠাকুর বলতেন, "বকাউল্লা, শোনাউল্লা দেখলাম ; করিমউল্লা দেখলাম না।"

শ্রেয়কে গ্রহণ করিয়া প্রেয়কে বর্জন করিতে হইবে। তিনি বলিতেন, "মরতে যখন হবে মরচে পড়ে মরবি কেন, খেটে খেটে মর। আমি দেখে শান্তি পাই।" একটা সৎ উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ বরং বরণীয়। তিনি বলেছেন—

"কেন প্রশ্নে নাই কোনো অধিকার,
কাজ কর, করে মর, এই হয় সার।

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি—কল্যাণকারী কখনও বিপদগ্রস্ত হন না। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—জগতের হিত সাধন করিয়া মুক্তিলাভ কর। প্রহ্লাদ বলেছেন—

প্রায়েন দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা ॥

প্রায়ই দেখা যায় মুনিরা নিজের মুক্তির জন্য নির্জন পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়। লোক সংগ্রহার্থে কাজ করেন না। তাই তিনি তুলসীদাসের একটি দোঁহা উল্লেখ করেছেন—

তুলসী যব্ জগমে আয়ো জগ্ হাসে তুম্ রোঁ।
এই সি করনি কর চলো কি তুম হাসে জগরোঁ।

যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিলে সবে।
এমন জীবন হবে করিতে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

এই রকম একটি জীবন কি কাম্য নয়। তিনি বলিয়াছেন, শতকরা ৯০ জন জীবন্মৃত। যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—Eating, drinking, earning and begeting. One following another in mathematical precision. আহার, নিদ্রা আর মৈথুন সর্বস্ব জীবন। তোমাদের ভিতরে Fiery sympathy and Fiery Love বিরাজ করুক। নিষ্কর্মা ও অলসদিগের প্রতি ভীষণ রূঢ় ছিলেন। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ ধর্মসাধনার তিনটি স্তর মাত্র। আর "তত্ত্বমসি" বা অহং ব্রাহ্মাস্মি‌ই হচ্ছে উপলব্ধির শেষ কথা। উপনিষদ কিন্তু বাস্তবকে কখনই অস্বীকার করে নাই। বরং বাস্তবকে স্বীকার করিয়াই সে অসীমের সন্ধানে গিয়াছে। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ"—অন্নই ব্রহ্ম। ক্রমে ভৃগু বুঝিলেন প্রাণ, মন, বিজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তি ও আনন্দ—এরাও ব্রহ্ম। কারণ জীবগণ উহাদের সাহায্যেই জন্মায়। উহাদের প্রভাবে বর্ধিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে উক্ত জিনিসে প্রবেশ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে—উপলব্ধির পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে 'এতৎ আত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যংস আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি। এইখানেই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বামীজীর পার্থক্য। বৈষ্ণবগণ বলেন, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কখনো পরিপূর্ণ অভেদ হতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। হনুমানকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, "হনুমান, তুমি কিরূপে আমায় দেখ?' হনুমান বললেন, যখন দেহবুদ্ধি থাকে তখন দেখি,

তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ! কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমি যা আমিও তা। সুতরাং দেখা যাইতেছে দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান কেবল উপলব্ধির স্তর মাত্র। দ্বৈতাৎ ভয়ম্ অদ্বৈতাৎ অভয়ম্-দুই বোধেই ভয়। তুমি আর আমি যখন এক তখন আর কোন ভয় নাই। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে রাখিয়া সংসার করিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের দুঃখ কষ্টের কারণ আমরা স্ব স্ব রূপকে ভুলিয়া গিয়াছি। "নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী ক্যায়াসে ভরম মিটে পশুকা রে। বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।" হরিণের নাভিতে কস্তুরী রয়েছে কিন্তু বৃথাই তার উৎসের সন্ধান করছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা—যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম—যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ হইবে না তা দিয়া আমার কি হবে? বাইবেলেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়—What profits us if we gain the world but lose our own soul? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, সংসারে যা কিছু আমাদের প্রিয় তা আত্মার জন্যই। আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

স্বামীজী ছিলেন বেদান্তের আকাশে ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদ। তাই কবির লেখনীতে ধ্বনিত বেদান্তের মর্মবাণী—"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির"—কবিতায় কবির উদাত্ত আহ্বানের সামিল হয়ে আমরাও বলি—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের স্থলে বিশ্বের মহামানবের সাগর তীরই হইবে আমাদের আহ্বান। যখন সত্যিই এই বাণী বাস্তবে পরিণত হইবে সেইদিন সার্থক হবে ঋষির প্রশস্তি—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী, মধুনক্তম্ উতোষসো
মধুবৎ পার্থিবং রজঃ মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান অস্তু সূর্য।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

সবই মধুময় হয়ে উঠবে!

# স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ

অমিয়কুমার মজুমদার

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জগৎ মিথ্যা ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানাত্ব নাই। ব্রহ্ম স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদরহিত। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ভেদরহিত, সেইজন্য শুদ্ধ "এক" হইতে "বহু"-র আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। অথচ আমরা চারিদিকে বহুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই। জড়জগৎ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, দেশ, কাল প্রভৃতি বহুত্বের নিদর্শন। যাহা ঘটিতে পারে না তাহা ঘটিয়াছে ইহাই মায়া। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করার তাপর্য হইল ইহা সদসদ্‌বিলক্ষণ ; অর্থাৎ জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে। সৎ বলিতে বুঝি যাহার নিষেধ হয় না, যাহা বাধিত হয় না, যেমন চৈতন্য বা ব্রহ্ম বা আত্মা। অসৎ বা অলীক বলিতে বুঝি যাহার ধারণা করা অসম্ভব, যাহার আবির্ভাব ঘটিতে পারে না—যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি। জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ বস্তু নহে, কারণ জগত দেখিতে পাইতেছি, জগতে আমরা বাস করি, দেশ-কাল-কার্যকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। অথচ বন্ধ্যাপুত্র এবং আকাশকুসুম কেহ কখনও দেখে নাই। আবার ব্রহ্মানুভূতি হইলে জগৎ সম্বন্ধে পৃথক্ কোন জ্ঞান থাকে না ; জগদ্‌-জ্ঞান বাধিত হয়। তখন ব্রহ্মও আছেন, বাড়ীঘর, গাছপালা, পাহাড়পর্বতও আছে এইরূপ বোধ হয় না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সবকিছুই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভূতি হয়। এই কারণেই জগৎকে 'মায়া' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মের ন্যায় জগৎ সৎ বস্তু নহে ; আবার বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় জগৎ অসৎ বা অলীক নহে। এই জনাই জগৎকে মায়া বলা হইয়াছে। 'সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়া মায়া'। মায়া অনির্বাচ্যা। ইহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আসল কথা, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে দেখিলে তাহা হইবে ভ্রান্তদৃষ্টি। ব্রহ্মের অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব ; জগতের পৃথক্ কোন সত্তা নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের মূল-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু মায়া সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা অনুধাবনযোগ্য। স্বামীজীর মতে, মায়া কোন তত্ত্ব নহে, ইহা কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি। সেই ঘটনাগুলি কি ? প্রথমতঃ, মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির অসামান্য শক্তির সামনে মানুষ তাহার অসহায় অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন হয়। মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক ; তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং সে সীমিত ক্ষমতার দ্বারা অনন্ত সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আমরা জানি, তবুও জীবনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ "জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জিনিস

কি ?” তিনি উত্তর করিয়াছিলেনঃ ‘প্রত্যহ কিছু কিছু লোকের মৃত্যু হইতেছে তবুও মানুষ এমনভাবে কার্য করিয়া থাকে যেন তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না’—ইহাই মায়া। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, অপরের কল্যাণ করিতে গেলে অনেক সময়ে অকল্যাণকর বা অসৎকর্মের মাধ্যমে তাহা করিতে হয়। পশুজীবন উদ্ভিদজীবনের উপর নির্ভর করে; মানুষ পশুর উপর নির্ভর করিয়া বাঁচে। আবার মানুষ মানুষের উপর নির্ভর করিয়াও বাঁচে; সবল দুর্বলকে দলন ও শোষণ করিয়া বাঁচে। ইহাকেই বলে মায়া। সতের আবির্ভাব সর্বদা সতের মাধ্যমে হয় না কেন? অসতের মাধ্যমে সৎকে পাইতে হয়—ইহাই মায়ার প্রকাশ। আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া অসৎ ও অমঙ্গল ধীরে ধীরে দূরীভূত হইবে এবং সৎ ও মঙ্গলই পরিশেষে জয়ী হইবে। কিন্তু অমঙ্গল ও অসৎ আদৌ থাকিবে কেন? কেনই-বা অসতের মাধ্যমে সৎ-এর আবির্ভাব হইবে? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। ইহাই মায়া। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল সৎ বা কেবল অসৎ বলিয়া জগতে কিছুই নাই। যে আগুনে আমার প্রতিবেশীর ঘর পুড়িয়া গেল সেই আগুনেই অন্নব্যঞ্জন রান্না করিয়া আমি অতিথিকে খাওয়াইতে পারি। কাজেই আগুন নিজে ভাল বা মন্দ কিছুই নয়। মানুষ যে-ভাবে আগুনের ব্যবহার করিবে, সেইভাবেই সে আগুনকে ভাল বা মন্দ বলিয়া বিচার করিবে।

দেখা যাইতেছে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে মায়া বলিতে কতকগুলি ঘটনাকে বুঝায়, যাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, অথচ যাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ব্যর্থ হই। বিবেকানন্দের মতে, ইহলোককে বর্জন করিয়া কেবল পরলোকেই ঈশ্বরলাভ হইবে ইহা বেদান্তের শিক্ষা নহে। তাঁহার মতে, বেদান্ত জগৎকে অস্বীকার করে নাই; জগৎকে ভাগবত-সত্তায় উন্নীত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের মন্ত্র “ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্”—ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু আচ্ছাদিত দেখিতে হইবে—ইহা স্মরণীয়। সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন বলিতে অমঙ্গল ও মৃত্যুকে বাদ দিয়া ঈশ্বরদর্শন বুঝায় না। “যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ”—অমৃতত্ব ও মৃত্যু একই সত্তার দুই দিক। সেইজন্য জীবনের সুন্দর, শোভন প্রকাশের মধ্যে যেমন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইবে, তেমনই ক্ষয়, ক্ষতি, দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে একই ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে সাধনার পথে বিঘ্ন মনে করিয়া বর্জন করিলে চলিবে না। স্ত্রী ও পুত্রের মধ্যেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। মানুষের অর্থ, সম্পত্তি, বিলাসের সামগ্রী থাকুক ক্ষতি নাই; কেবল এইসকল বস্তুর অধিকারী আমি নই, এই সমুদয় ঈশ্বরের—এইভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের তিনটি গুণ নহে; এই তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা আনন্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আনন্দেই বিধৃত হইয়া আছে; আবার আনন্দেই বিলীন হইয়া যাইবে। মানুষ যখন সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে মুক্ত হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তি কোন প্রাপ্য বস্তু নহে। প্রত্যেক মানুষই স্বভাবতঃই মুক্ত; কাজেই সে নূতন করিয়া মুক্তিলাভ করে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অন্ধকারে মানুষ তাহার মুক্তস্বরূপ সত্তার পরিচয় পায় নাই। অজ্ঞানের আবরণ সরিয়া গেলেই প্রতীতি হয় বে মানুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব।

উপনিষদে নির্গুণ ও সগুণ এই দুপ্রকার ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্যের মতে, নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মায়োপহিত চৈতন্য। কাজেই ঈশ্বর পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে যদি নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য হন, তাহা হইলে মায়ার স্থান কোথায়? মায়ার সাহায্যে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুইটি পদার্থকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায় মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই, মায়াও মিথ্যা বা তুচ্ছা, তাহা হইলে প্রকারান্তরে জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদী এই আপত্তির উত্তরে বলেন, ব্রহ্ম অধিষ্ঠানসত্তা; যুগপৎ জগৎ ও মায়া সেখানে বাধিত হইয়া থাকে। জগৎ ও মায়া ভাব ও অভাবের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী পদার্থ নয়। সেইজন্য জগৎ ও মায়া যুগপৎ ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, নির্গুণ ব্রহ্ম জীবন্ত ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের পার্থক্য এই যে সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে, নিগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ দেবদূত, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলের মধ্যে। অবশ্য নিগুণ ব্রহ্ম নিঃশেষে কোন প্রাণীর মধ্যে প্রকাশিত হন না। নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে, জগতের সকল সত্তার মধ্যে প্রকাশিত অথচ নিগুণ ব্রহ্ম অনন্ত এবং অসীম সত্তা। সেইজন্য ইহা কোন সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইতে পারে না। বিবেকানন্দ ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে দেখিয়াছেন। এই ঈশ্বরকে সর্বপ্রথমে আমার নিজের অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি ঘটিলে পরে আমার সর্বানুভূতির বোধ আসিবে। আমি তখন আমার পরিবারের সকলের মধ্যে, আমার সমাজের মধ্যে, কীট পতঙ্গ, লতাগুল্মের মধ্যে ঈশ্বরকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিব। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যদিও ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তথাপি মানুষের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী।

সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তার অনুভব অদ্বৈতবাদের চরম লক্ষ্য। জগৎ ব্রহ্মময়, সকল প্রাণীতে ব্রহ্ম অনুস্যূত আছেন এই উপলব্ধির কথা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীঃ "তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সেদিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চেতনাময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট-পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।…দশভূজা, ষড়ভূজা, চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা, আরো ছোট করে একখণ্ড নুড়িতে ঈশ্বরকে এনে ফেলেছি—শালগ্রাম শিলা। তার পরে সমস্ত প্রতীকের বাইরে চলে গিয়েছি। সাকার ভূমি থেকে নিরাকারে চলে গেছি। কিন্তু তুমি (কেশব) কি

ভেবেছ নিরাকারেই থেমেছি ? নিরাকার থেকে আবার সাকারে ফিরে এসেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছি। নরাকারে নিরাকার"।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আচার্যদেবের নিকট হইতে সর্বভূতে ভগবৎসত্তার অনুভূতির প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদিগণ জগতের ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকার করিয়াছেন, অথাৎ দৃশ্যমান জগৎ কোনদিন ছিল না, এখনও নাই, কোনদিনই ভবিষ্যতে এইরূপ জগৎ থাকিবে না। তত্ত্বত ব্রহ্মই যখন একমাত্র সত্য, তখন জগতের আবির্ভাবের অবকাশ কোথায় ? স্বামী বিবেকানন্দ শ্রুতির দুইটি মহাবাক্যকে একত্র করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'এ সমস্তই ব্রহ্ম' এই দুইটি বাক্য পরিপূরক। একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরের তাৎপর্ব গ্রহণ করা যায় না।

স্বামিজীর মতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ রূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছেন! শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে মানুষ নিজেই নিজেকে সচ্চিদানন্দময়ের অংশ এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া অনুভব করিতে পাবে। বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, তিনটি বিষয়ে যত্নবান থাকিতে—এই ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন, 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন'। 'জীবে দয়া' অর্থাৎ কৃষ্ণেরই জগৎসংসার এই কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বজীবে দয়া প্রকাশ করিবে। 'সর্বজীবে দয়া' এই কথা উচ্চারণ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন: 'কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'।

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা অনেকেই সেদিন শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সুগভীর তাৎপর্য স্বামী বিবেকানন্দ যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন আর কেহ করেন নাই। স্বামীজী উপলব্ধি করিলেন যে, যে বেদান্তকে এতকাল লোকে শুষ্ক, কঠোর, হৃদয়হীন বলিয়া মনে করিত শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা সরস ও মধুর করিয়া প্রকাশ করিলেন; জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়ের পথ দেখাইলেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন,—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২৯

যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্বভূতস্থ এবং সর্বভূতকে আত্মস্থ দেখেন। আবার,

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬।৩১

যিনি সর্বভূতস্থ আমাকে অভেদজ্ঞানে ভজন করেন, সেই যোগী সর্বভূতের সহিত সংস্রব রাখিলেও আমাতেই থাকেন অর্থাৎ সমস্ত ভূতের সহিত সম্বন্ধকে আমার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান করেন। 'সর্বথা বর্তমানোঽপি' এই বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সর্বপ্রকারে

সর্বভূতের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেও'—সর্বভূতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইতেছে না। বলা হইতেছে, সর্বভূতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াও সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন এই একত্ববুদ্ধি অবলম্বন করিতে হইবে।

এই একত্ববুদ্ধি উপলব্ধির বিষয়। বিচার-বিতর্কের সাহায্যে একত্ববুদ্ধির সম্ভাব্যতা এবং যৌক্তিকতা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকল প্রাণীর সহিত নিজের আত্মার তথা ঈশ্বরের অভিন্নতা অনুভবগম্য। স্বামীজীর অদ্বয়বুদ্ধি গীতার উপরোক্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কত গভীর এবং ব্যাপক ছিল তাহা প্রণিধানযোগ্য। 'হিতবাদী' সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করকে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন ঃ 'মহাশয়, যতদিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু অধর্ম'। দেশবাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছেন ঃ "একমাত্র দেবতা—আমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন তিনি। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতা দেখিতেছি, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না।...এই সব মানুষ, এই সব পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য"।

মানুষ ভগবানের অংশ, এই কথা শ্রুতিতে আমরা উল্লিখিত দেখিয়াছি। বিবেকানন্দ আরও গভীরে প্রবেশ করিলেন, পশুর মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, এই কথা উপলব্ধি করিলেন। স্বামীজী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন ঃ "যারা জাতের মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে!...এরা না উঠলে মা জাগবেন না, আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হইল? দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে, আমি দিব্য চক্ষে দেখছি এদের ও আমার ভিতরে একই ব্রহ্ম একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোনকালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না, ইহা নিশ্চিত জানবি"।

বেদান্তের আদর্শ নিজের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উচ্চ-বর্ণের মানুষেরা যাহাদিগকে 'চলমান শ্মশান' বলিয়া ঘৃণায় দূরে পরিহার করিয়াছে তাহারা 'আমার ভাই', 'আমার রক্ত'। সেবাধর্ম বর্তমান যুগে একমাত্র আদর্শ ধর্ম"।

তত্ত্বের দিক দিয়া প্রশ্ন হইতে পারে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সকল মানুষ, ইতর প্রাণী, লতাগুল্ম, কীটপতঙ্গের সহিত যদি অভিন্ন হন তবে জগতে অমঙ্গল, বৈষম্য, দুঃখ-দারিদ্র্য আদৌ থাকে কেন? যে আর্ত, নিরন্ন, পদদলিত নিম্নবর্ণের মানুষকে স্বামীজী উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ঈশ্বর তাহাদিগকে আদৌ সৃষ্টি করিলেন কেন? শংকরাচার্য এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ "ঈশ্বরঃ পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরকে

মেঘের মত নিরপেক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মেঘ যেমন পাশাপাশি দুইটি ক্ষেতে সমানভাবে জলবর্ষণ করে ঈশ্বরও তেমনি সকল মানুষকে সমান সুযোগ দিয়াছেন। যে চাষী সময় বুঝিয়া বীজ বপন করে, হলকর্ষণ করে সে উপযুক্ত ফসল পায়। আবার যে চাষী উদাসীন, অলস এবং যে সময় মত বীজ বপন করে না তাহার ক্ষেত বর্ষার জলে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যাহার ক্ষেতে সুন্দর ফলস ফলিল না, সে যদি মেঘকে দায়ী করে তবে তাহা অসঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হয়। ঈশ্বর অনন্ত-শক্তির আধার, কাজেই তাঁহার প্রকাশের ধারা এবং পথও অনন্ত। মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যে পথ অনুসরণ করিবে সেইরূপ ফল পাইবে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দুইটি প্রকাশ দেখা যায়। একটি কর্মের প্রত্যক্ষ ফল, অপরটি কর্মজনিত সংস্কার। ফল অর্থে—সুখ বা দুঃখ বুঝিতে হইবে। সংস্কার বলিতে বুঝিব কোন বিশেষ ধরণের কর্মে প্রবৃত্তি।

স্বামীজী বলিয়াছেন: "বেদান্তমতে এই জগৎ কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়—এইরূপ নহে। আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সমান মূল্য। অথবা বলা যাইতে পারে, কোন জিনিসই—নিছক মঙ্গল বা নিছক অমঙ্গলের আকর নহে। যে অগ্নির সাহায্যে আমার শত্রু আমার বাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে সেই অগ্নির সাহায্যে আমার প্রতিবেশী আমাকে অন্নব্যঞ্জন রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারে। যে প্রদীপেব আলোর সাহায্যে মুদী তাহার দোকান বন্ধ করিয়া সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ পাঠ করে, সেই প্রদীপের আলো অনুসরণ করিয়া দস্যু পরস্ব অপহরণ করে। মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে"।

মানুষ নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়ে, তাহার কারণ সে জীবন বলিতে কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনকে বুঝিয়া থাকে। এই জীবন আসলে পশুজীবনের সদৃশ্য। সৎকর্ম করিলেও যদি অমঙ্গলের হাত হইতে অব্যাহতি না পাই তবে আর কর্ম করিয়া কি হইবে? এইরূপ চিন্তা নৈরাশ্যবাদের পরিপোষক। স্বামীজী এই জাতীয় লোককে আহবান করিয়া বলিয়াছেন: "মানুষ স্বরূপত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। সে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। এই উপলব্ধি আমার জীবন ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিলে আমি বুঝিতে পারিব পাপ ও অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা যতই অবিমিশ্র সুখের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইব ততই দুঃখরাশি আমাদিগকে চাপিয়া ধরিবে। কাজেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মুক্তি, যে মুক্তি আনন্দস্বরূপ। এই মুক্তি বা আনন্দ হইতেই সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আনন্দ বা মুক্তিতে সকল জীবন বিধৃত হইয়া আছে, পরিশেষে আবার সেই আনন্দ বা মুক্তিতে সকল প্রাণী বিলীন হইয়া যাইবে"।

এই জ্ঞান মানুষকে কর্মবিমুখ করিবে না, বরং তাহার কার্যকারিণী শক্তি বাড়াইয়া তুলিবে। স্বামীজী তাঁহার "জ্ঞানযোগ"-গ্রন্থে ( পৃঃ ৩২ ) বলিয়াছেন: "ঘটনাচক্র এইরূপ জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত

করাইবে না ; সুতরাং সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে ; উদ্ভিদ-দিগেরও গতি ঐরূপ। ইহাই কেবল কিন্তু সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে ; তৃণ ও পত্রখণ্ডসকল স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং হয়ত বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনন্ত বারিধিবক্ষে সংকর্ষিত হইবে। অতএব জীবন, সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যখন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ্ ও সামান্য জীবণুকণা পর্যন্ত, যে যেখানে বর্তমান রহিয়াছে, সকলেই সেই অনন্ত জীবন-সমুদ্রে—মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে"।

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার সঙ্গে এই বিষয়ে বিবেকানন্দের চিন্তার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে অমঙ্গল ও পাপ বলিয়া কিছুই নাই—এই কথা বলিয়াছেন স্পিনোজা। কেবল জ্ঞানলাভ করিলে অমঙ্গল, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি আর পৃথক্ সত্তা বলিয়া প্রতীত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অত্যন্ত নিকটে যখন একটি ফলফুলের বাগান দেখি, তখন ঘাস, গাছ, ফুল প্রভৃতি অনেকসময় অসমান, অসমঞ্জস এবং অবিন্যস্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি গগনচুম্বী কোন প্রাসাদের উপর হইতে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিব তৃণলতাগুল্ম, ফল, ফুল প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে একটি সুষম বিন্যাসের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন—ইহাই বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মনকে সর্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে, আত্মতত্ত্ব গুরুর কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করিলে তবেই সাধনার পথ সুগম হইবে। আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মননের সাহায্যে তাহার প্রত্যেকটি স্তর বিচার করিতে হইবে। সর্বশেষে বিচারলব্ধ সত্যকে ধ্যানের কোঠায় আনিয়া দেখিতে হইবে। এই কাজে বারে বারে ব্যর্থতা আসিবে সত্য, কিন্তু ব্যর্থতাকে জয় করিতে না পারিলে মানুষের জীবনের গৌরব কোথায় ? স্বামীজী বলিয়াছেনঃ "গরুকে কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনি নাই ; কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, মানুষ কখনই হয় না। অতএব বার বার অকৃতকার্য হও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে কৃতকার্য না হও, অন্তত, যাহাকে তুমি সর্বাপেক্ষা ভালবাস এমন এক ব্যক্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর—তারপর তাঁহাকে আর এক ব্যক্তিতে দর্শনের চেষ্টা কর। এইরূপে তুমি অগ্রসর হইতে পার"।

ঈশোপনিষৎ ব্রহ্মের অনির্বচনীয় স্বরূপকে এইভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন,

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বাস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

তিনি চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলেব বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?

বিজ্ঞান জড়জগতে, মনোজগতে এবং উদ্ভিদ্‌জগতে বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করিয়া থাকে। ঘন তরল এবং বায়বীয়—এই তিন প্রকার পদার্থের অন্তর্গত পরমাণুর স্বরূপ কি ইহাই পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধর্মও তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করিতেছে। 'বহুত্বই চরম সত্য'—এই ধারণা অজ্ঞানতাপ্রসূত। মানুষে মানুষে প্রভেদ, জাতিতে জাতিতে প্রভেদ প্রাতিভাসিক, উহা চরম সত্য নহে। স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন: "যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও তুমি এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নর নারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মনুষ্যে একত্ব; সকলেই এক—আর যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর প্রাণীরাও তাহাই। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাহার আর মোহ থাকে না! তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন ধর্মবিজ্ঞানে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে' (—জ্ঞানযোগ পৃঃ ২৭৫)।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ—এই চারি প্রকার সাধনমার্গের যে কোন একটিকে নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। জ্ঞানমার্গে বিচার-বিতর্কের প্রাধান্য। আত্মার স্বরূপ কি? দেহের সহিত আত্মার প্রভেদ কোথায়, জগতের স্বরূপ কি? ইহার অধিষ্ঠান সত্তা কি? এই সকল প্রশ্নের বিশ্লেষণ করিয়া ধীরে ধীরে আত্মতত্ত্বে পৌঁছানো যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্মমার্গের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন: "আমরা দেখিতে পাই সমস্ত বিশ্ব কর্মচঞ্চল। সমস্ত পৃথিবী কাজ করিতেছে। কিসের জন্য কাজ করিতেছে? মুক্তির জন্য। অণু পরমাণু হইতে মহত্তম সত্তা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঐ একই উদ্দেশ্যে—মানসিক মুক্তি, দৈহিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তির উদ্দেশ্যে—কাজ করিতেছে। কাজেই কর্ম অপরিহার্য। তবে উচ্চতম উদ্দেশ্যেই আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে। কর্মযোগ বলে—অবিরত কাজ কর, কিন্তু কাজে আসক্ত হইও না।

তোমার মনকে মুক্ত রাখ। 'আমি ও আমার' স্বার্থের এই নাগপাশ থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে"।

ভক্তিযোগপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন: "ভক্তি কখনো বিচারের বিরোধী হয় না। আমরা যাহাকে প্রেরণা (inspiration) বলি তাহা যুক্তির পরিণত রূপ"। তাঁহার কথা হইল, শক্তিমান হও। সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং প্রেমময় ভগবানের সন্ধান কর। দুর্বল ভগবৎ ভক্তি আয়ত্ত করিতে পারে না। সুতরাং দেহ, মন, নীতি ও আধ্যাত্মিকতা, কোনদিক হইতেই দুর্বল হইও না।

রাজযোগকে স্বামীজী বলিয়াছেন মনস্তাত্ত্বিক যোগ। আমরা যোগ বলিতে যদি বুঝি জ্ঞানের পরম সত্তার সহিত মিলন তবে রাজযোগ হইল তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার ব্যবহারিক, মনোদৈহিক উপায়। অখণ্ড অভিনিবেশর দ্বারাই এই যোগ আপন লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। শ্রীভগবানের উক্তি স্মরণীয়—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। স্বামীজী মত ও পথের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া চার প্রকার যোগের মাধ্যমে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সকল বস্তুতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধ হয়, এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

## বিবেকানন্দের কর্ম-পরিণত বেদান্ত

পরেশনাথ ভট্টাচার্য

আধ্যাত্মিক কূপমণ্ডুকতা বিবেকানন্দকে স্পর্শ করে নাই। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার অন্তঃসারটুকু যথাশক্তি শোষণ করিয়াছেন, আবার উহার বহিরাবরণকেও অনৃতবোধে পরিহার না করিয়া সত্যবোধে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সত্যের হিরণ্ময় পাত্রকে উন্মোচন করিয়া উহার কল্যাণতম রূপকে নিজবোধরূপে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁহার আজন্ম তপস্যা। কিন্তু নিজবোধরূপে আত্মসঙ্গায় অবস্থান করিয়াও তিনি উহাতে লীন হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। রামকৃষ্ণবর্ণিত সমুদ্রলীন লবণ-পুত্তলিকার মত পরম সত্যে নিরবশেষ-সত্তা হইয়া থাকা তাঁর কাম্য ছিল না। সমাধির ও ব্যুত্থানের, অন্তরের ও বাহিরের, তত্ত্বোপলব্ধির ও ব্যবহারিক প্রয়োগের, একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বের ও অনৈক্যবিজৃম্ভিত জগতের একান্তরতা, পর্যায়ক্রমিকতা এবং পারম্পর্যই ছিল বিবেকানন্দের অধ্যাত্মসাধনার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পরম সত্যের উভয় কোটিকে স্বীকার করিয়া সেই ভিত্তিতে ব্যবহারিক জীবনের বিন্যাস ও সংগঠনই বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গীন ও ব্যাপক অধ্যাত্মদৃষ্টি।

সুতরাং সত্যের উভয় কোটির একটি কোটিকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ এবং অপরটিকে অনৃতবোধে বর্জন করিবার একদেশদর্শিতা বিবেকানন্দের অধ্যাত্মদৃষ্টিকে স্থানু এবং পঙ্গু করে নাই। মত এবং পথের, তত্ত্ববোধ এবং তত্ত্বানুশীলনের একতানতা তাঁহাকে একধারে কর্মিষ্ঠ এবং তত্ত্বনিষ্ঠ করিয়াছে। সত্যের উভয়লিঙ্গতা, শিব-শক্তির অবিনাভাব, পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্মতা, সত্তা-প্রকাশের যৌগপদ্য এবং ব্রহ্ম-জগতের অবিচ্ছেদ্যতা—এক কথায় অধ্যাত্মদৃষ্টির ব্যাপকতা ও সর্বাঙ্গীনতা বিবেকানন্দকে শুধু গুহাহিত চেতনা করিয়া রাখে নাই, কিন্তু লোকসংগ্রহের অথবা জনকল্যাণের ব্রতে নিয়োজিত করিয়াছে। যদি তত্ত্বের একটি কোটিতে তাঁহার দৃষ্টি পর্যবসিত হইত তাহা হইলে হয়ত তিনি শুধু তত্ত্বদ্রষ্টা অথবা কর্মবীর, সত্তালীন অথবা প্রকাশচঞ্চল পুরুষ হইয়াই থাকিতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ-নির্দেশিত মূল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত মহামহীরুহটি হইয়া দাঁড়াইতেন না এবং ত্রিতাপতপ্ত জীবের অভয়-আশ্রয় হইতেন না। স্বচ্ছ তত্ত্বদৃষ্টির সহিত বলিষ্ঠ তত্ত্বানুশীলনের, সূক্ষ্ম সত্যোপলব্ধির সহিত সাহসিক সত্যপ্রয়োগের প্রয়াসই বিবেকানন্দ-জীবনের বৈশিষ্ট্য।

একটি গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতির লুপ্ত সংবিৎ ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই উহার ধারক এবং বাহক এমন একজন পুরুষ যিনি জাতির অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান ও বাস্তবের সহিত পুনরুপযোজন করিতে পারেন। বিবেকানন্দ সেই ভারতীয় পুরুষ যাঁহার মধ্যে এই জাতিমানসের নির্জ্ঞান বা বিস্মৃতগৌরব বাস্তবের আলোকে চেতন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নবতর বাস্তব

পরিস্থিতির নূতন সমাধান, নূতন ভাষ্য এবং নূতন উপযোজনের উদ্ভাবয়িতা ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁহার মতে বেদান্তের পুনরুজ্জীবনই মরা গাঙে বান তুলিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই বেদান্ত শুধু ব্যাসগ্রথিত ব্রহ্মসূত্র, উহার সারীরক প্রভৃতি ভাষ্য, ভাসতী প্রভৃতি টীকা এবং বেদান্তকল্পতরু প্রভৃতি টিপ্পনীর পঠন-পাঠন নয়। শুধু পঠন-পাঠনের ফল সীমাবদ্ধ থাকে মুষ্টিমেয়সংখ্যক পণ্ডিতের মধ্যে। এই ফল আপামর জনসাধারণকে স্পর্শ করে না। সুতরাং দেশের অগণিত মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যায়। এই সকল মানুষ শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী ম্লানমুখে ধারণ করিয়া নতশির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা কোন প্রকারে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচাইয়া রাখে মাত্র। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে ইহাদের মধ্যেই রহিয়াছে ভারতের সুপ্ত শক্তি। কর্মপরিণত বেদান্তের স্পর্শে এই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতে এবং ক্লিষ্ট জনগণের মোহনিদ্রা ঘুচাইতে হইবে। এই জন্য চাই বেদান্তের মৃত সঞ্জীবনী বাণী।

বিবেকানন্দ আক্ষেপ করিয়াছেন যে ভারতে বেদান্ত কর্মপরিণত রূপ গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ বেদান্তের অদ্বৈতশিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বাস্তব আকার ধারণ করে নাই, অথবা উহা সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। এই আক্ষেপে তিনি সঠিকভাবে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলা কঠিন। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে বেদান্ত হিন্দুর জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, শুধু তাহাই বা কেন, হিন্দুর জীবনসত্তার জন্মের পূর্ব অবস্থা হইতে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত—এক কথায় তাহার সমগ্র সত্তাকে অথবা তাহার ইহকাল-পরকালকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় শ্রুতি-স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ যে দিকেই তাকানো যায় সেইদিকেই দেখা যায় যে উহার মূল প্রতিষ্ঠা বেদান্ত। হিন্দুর দশবিধ সংস্কার, তাহার আহার, বিহার, ব্রত, পার্বন, পূজা, উপাসনা—অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বেদান্তের শাসনে অনুশাসিত। আহার আরম্ভে পঞ্চদেবতার উদ্দেশে আহার্যের উৎসর্গ, আবার আহারান্তে অমৃতদেবতা উদ্দেশ করিয়া পাত্রত্যাগ বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পূজার বিবিধ অঙ্গ, যেমন আসন, আচমন, সূর্যার্ঘ, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিসর্জন, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি একটি অন্বয় সত্যকে অর্থাৎ বৈদান্তিক তত্ত্বকে বুঝিবার বা উপলব্ধি করিবার উপকরণ মাত্র। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই দেবতার আকারে উপাসিত হইয়া থাকেন।

তাহা হইলে মনে হয় যে বিবেকানন্দ বেদান্তকে যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা যথার্থ নয়। বেদান্ত হিন্দুজীবনের সমগ্র সত্তাকেই কর্মপরিণতরূপে প্রভাবিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বিবেকানন্দের এই দোষারোপ উড়াইয়া দিবার মত নয়। বেদান্ত যদি সত্যই হিন্দুর সমগ্র জীবনসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে তাহা হইলে হিন্দুর বর্তমান দৈন্যদশার কারণ কি? বেদান্তের

অদ্বৈতমন্ত্র যদি হিন্দুসমাজের সকল স্তরেই কর্মপরিণত হইয়া থাকে, "অহং ব্রহ্মাস্মি", "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" অথবা "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের উত্তরাধিকারী হিন্দু পরাধীন হয় কেন, কেনই বা আপামর হিন্দু জনসাধারণ তাহার সমাজের বিধিব্যবস্থার সমান অংশীদার নয়, কেন আর্থিক বণ্টনের ও নানা অধিকার-ভোগের বৈষম্য ঘটে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে "সকলেই অমৃতের সন্তান" এই বাণী শুধু পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—কর্মপরিণতরূপ লইয়া দেখা দেয় নাই। অথবা এই সকল বাণী শুধু মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি দিয়াই মনন করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তব জীবনস্পর্শে উপলব্ধ হয় নাই।

একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকল বস্তুতে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত, যিনি প্রত্যেকটি ধূলিকণায় তিনিই জীবাত্মায় প্রকাশিত—ইহাই বেদান্তের মূল তত্ত্ব। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি স ইহ নানেব পশ্যাতি—এই অদ্বৈতদর্শনই বেদান্তের মর্মকথা। যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি, শুধু তাহাই নয় প্রতিটি জড় বা চেতন পদার্থই আমি, আবার আমিই প্রতিটি জড় বা চেতন পদার্থ—ইহাই মূল বৈদান্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষা অনুসারে প্রকৃতভাবে সমদর্শী ব্যক্তিই বৈদান্তিক। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। অর্থাৎ বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ সমদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন। এইরূপ বৈদান্তিক সমদর্শনের সহিত ব্যবহারিক আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই এই সমদর্শনকে কর্মপরিণত বেদান্ত অথবা প্রায়োগিক অর্থে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত কর্মপরিণত বেদান্তের প্রধান লক্ষণ হইল ভালবাসা বা প্রেম। "জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এইরূপ বিশ্বজনীন অর্থে জীবপ্রেম, শুধু জীবপ্রেমই নয় প্রতিটি সত্তাবান পদার্থের প্রতি প্রেম বা বিশ্বপ্রেমই যদি কর্মপরিণত বেদান্তের প্রধান লক্ষণ হইয়া থাকে তবে তাহা হইলে ইহা যে বিবেকানন্দকালীন ভারতে সক্রিয় ছিল না তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ সমদর্শনের পরিচয় সাম্য-নিয়ন্ত্রিত জীবনে। অথচ হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা নানা-প্রকার বিশেষ অধিকার বা প্রিভিলেজ্-এর দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট। কাহারও মন্দিরে প্রবেশ এবং দেবপূজার অধিকার রহিয়াছে, কাহারও বা তাহা নাই। ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমান দৃষ্টিতে দেখা দূরে থাকুক, চণ্ডালকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে কুকুরের মত অথবা তদপেক্ষা বেশী অবজ্ঞা দেখাইয়াছে তৎকালীন হিন্দুসমাজ।

স্বামীজী "বেদান্ত ও বিশেষ অধিকার" শীর্ষক একটি বক্তৃতায় বলিতেছেন "আমাদের কোন ভারতীয় পুরোহিতকে যদি জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাস করেন?' তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'বেদান্তই আমার ধর্ম; আমি অবশ্যই উহাতে বিশ্বাস করি; উহাই আমার জীবন।' 'আচ্ছা বেশ, আপনি কি সকল প্রাণীর এবং সকল বস্তুর সমতা স্বীকার করেন।' এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই করি।' কিন্তু পরমুহূর্তেই হয়ত কোন নীচ জাতির লোক ঐ পুরোহিতের নিকটে উপস্থিত হইল, আর তৎক্ষণাৎ উনি ঐ লোকটিকে বর্জন করিবার

জন্য পথের এক পার্শ্বে লাফাইয়া সরিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি লাফাইলেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'কারণ ঐ লোকটির স্পর্শ আমাকে অপবিত্র করিত।' আমি বলিলাম, 'কিন্তু আপনি যে এইমাত্র বলিলেন আমরা সকলেই সমান এবং আত্মার সহিত আত্মার পার্থক্য নাই।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ ঐটি গৃহীর পক্ষে একটি তত্ত্ব বা মতবাদ মাত্র ; আমি যখন বানপ্রস্থে যাইব তখন সকলকে সমান চক্ষে দেখিব।'

উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি শুধু উল্লিখিত পুরোহিতের আচরণেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহা অল্পাধিকভাবে সকল হিন্দুর পক্ষেই সমান সত্য। বিবেকানন্দকালীন ভারতে কর্ম-পরিণত বেদান্ত আচরিত হয় নাই, ইহা অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দ আলমোড়া হইতে শ্রীযুত মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত পত্রে বলিয়াছেন, "কর্মপরিণত বেদান্ত যাহা সহস্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্বজনীনভাবে কখন পুষ্টিলাভ করে নাই।" এই উক্তিতে স্বামীজী বলিতে চাহিয়াছেন যে কোনকালেই বেদান্তের মূলমন্ত্র বা শিক্ষা আপামর হিন্দু জনসাধারণের জীবনে আচরিত হয় নাই। বেদান্ত একেবারেই বা কোনকালেই বা কাহারও দ্বারাই কর্মপরিণত হয় নাই—এইরূপ কোন বক্তব্য উপরোক্ত আক্ষেপে বর্ণিত হয় নাই। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি হয়ত তাঁহাদের জীবন কর্মপরিণত বেদান্তের আলোকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত সাধনার ফল জনসাধারণের মধ্যে অথবা সমষ্টিগত স্তরে নামিয়া আসে নাই। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে উপনিষদের ঋষি হয়ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চই ঐ অমৃতস্বরূপের প্রকাশ। কিন্তু জনসাধারণ এই আর্য উপলব্ধির অংশীদার বা ফলভাগী হয় নাই।

সে যাহা হউক, উপরোক্ত ভঙ্গীর আলোচনায় বিশেষ লাভ নাই। স্বামীজী কর্ম-পরিণত বেদান্ত বা প্রাকটিক্যাল্ বেদান্তিজম্ বলিয়া যাহা বুঝাইতে চাহেন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করা যাউক। আমরা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সকল জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের উত্তরাধিকারী। আমরা অল্প নই, কিন্তু ভূমা বা বৃহৎ। 'পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ' এইরূপ চিন্তা বা আচরণ কর্মপরিণত বেদান্তের বিপরীত। আমরা নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অজ্ঞানের আবরণজাল আমাদের এই সত্যস্বরূপ অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করিতে পারে না। তাহা হইলে কর্মপরিণত বৈদান্তিক বুঝিবেন যে তিনি শুদ্ধ এবং অপ্রতিহত শক্তি—পাপ বা দুর্বলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদান্তের প্রধান বাণী হইল অদ্বৈত বা একত্বের বাণী। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সুতরাং ধূলিরেণু হইতে বিরাট আকাশ পর্যন্ত, কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই। উহাদের রূপ-পরিবর্তন বা বিকার ঘটিতে পারে মাত্র—কিন্তু উহাদের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই। "কিছু নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয়, তব মহিমায়।" মানুষ

হইতে কীটানুকীট পর্যন্ত সকল প্রাণী এই ব্রহ্মে অবস্থিত। সুতরাং অহিংসা, প্রেম, সেবা অথবা এক কথায় সমদর্শনই কর্মপরিণত বেদান্তের লক্ষ্য। ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি একত্বদর্শনের পরিপন্থী, সুতরাং পরিণত বেদান্তে ইহাদের স্থান নাই। তাহা ছাড়া যখন মৃত্যু নাই, তখন ভয় কিসের? কর্মপরিণত বেদনা মৃত্যুভয় দূর করিবে এবং সঞ্চয় করিবে অমিত বীর্য ও সাহস। আত্মবিশ্বাস কর্মপরিণত বেদান্তের সহচর। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধের সহিত আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকিতে পারে না।

স্বামীজী পুনঃপুনঃ মানুষকে সাবধান করিয়াছেন কেহ যেন অপর কাহাকেও দুর্বল না বলে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ভারতীয়রা দুর্বল নয়। তাহারা কর্ম-পরিণতির বেদান্তের অভয় ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইলেই পরাধীনতাশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহারা সুপ্ত সিংহ, জাগ্রত মেষশাবক নয়। বেদান্তের অদ্বৈত-মন্ত্র শুধু দর্শনেই সীমাবদ্ধ নয়। জড়বিজ্ঞানও দেশ ও কালের গণ্ডী প্রসারিত করিয়া এক-বিশ্ব বা য়ুনিভার্স রূপ লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। আত্মতত্ত্বই কর্মপরিণত তত্ত্ব। আত্মবিস্মৃত বা আত্মবিযুক্ত হইলে এই বিশ্ব অর্থহীন এবং সত্তাবিহীন হইয়া দাঁড়ায়। এই আত্মাকে ছাড়িয়া মুহূর্তকাল থাকিতে পারি না। সুতরাং আত্মবিদ্যাই প্রকৃত কর্মপরিণত বিদ্যা। আবার বেদান্ত আত্মবিদ্যারই নামান্তর। যে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে বহুরূপে অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকল বস্তুরূপে, বিশেষ করিয়া মেথর ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী অথবা নরনারায়ণরূপে, বিরাজমান সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই কর্মপরিণত বৈদান্তিক উপাসনা। এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনার কেন্দ্রমন্দির হইল এই আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আবার সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাও কর্মপরিণত বেদান্তের মূল শিক্ষা। সকল ধর্মই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা। যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সহজ অথবা কুটিল পথ ধরিয়া একই ঈশ্বরলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়াস। সত্য সকলের জন্মগত অধিকার। এই জন্মগত অধিকার পরিপূর্ণ করে কর্মপরিণত বেদান্ত।

দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত কর্মপরিণত হয় বেদান্তানুশাসিত আচরণে। আত্মৈবেদং সর্বম্। সুতরাং বসুধৈব কুটুম্বকম্। বেদান্তের আত্মোপলব্ধিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মবৎ অনুভূত হয়। আর এই আত্মোপলব্ধি কর্মপরিণত হয় আপামর ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সহিত একাত্মতাবোধে যাহার ফলে প্রত্যেকের প্রতি সম-বেদনা অথবা সহানুভূতি জাগিয়া ওঠে। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমের সর্বপ্লাবী প্রবাহে ভাসিয়া যায়। দুঃখীর দুঃখ, আর্তের আর্তনাদ হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়া ওঠে। সকলের দুঃখ বা ব্যথা নিজ বলিয়া অনুভূত হয়। কর্মপরিণত বৈদান্তিক সেবাব্রতী হইয়া ওঠেন। ঈশ্বর জ্ঞানে সকলের সেবাই তাঁহার ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞানান্ধকার এই আত্মবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাই কর্মপরিণত বৈদান্তিক প্রকৃত শিক্ষকের মত জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহায্যে মানুষের অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। একাত্মপ্রত্যয়সার উপলব্ধিতে মৃত্যুভয় পরাস্ত হয়। সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ উপলব্ধিতে আত্মার অসীমত্ব এবং অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের

লেশমাত্র থাকে না। তাই কর্মপরিণত বৈদান্তিক অকুতোভয়। শিকাগো বিশ্ব-ধর্ম-সভার বক্তৃতামঞ্চে বক্ষকপাটে হাত দুইখানি নিবন্ধ করিয়া পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের অনুপম ও দৃপ্তভঙ্গী এই অকুতোভয়তার জাজ্বল্যমান চিত্র।

বলা বাহুল্য যে কর্মপরিণত বৈদান্তিক শান্ত দান্ত ও সমাহিত। তিনি শান্ত মনে ও প্রেমনয়নে তাঁহার চিদ্‌ঘন নিরঞ্জনসত্তাকে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার দান্তভাবের নিকট ষড়রিপু পরাজিত হয়। রামকৃষ্ণের মতই তিনি কামকে প্রেমে পরিণত করেন। তিনি স্বস্বরূপে নিত্য সমাহিত থাকেন। স্বরূপেই তিনি উপলব্ধি করেন বিশ্বভুবনের স্বরূপ, আবার বিশ্বভুবনে তিনি শুধু নিজ আত্মাকেই দেখেন। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। বাহির তাঁহার নিকট বাহিরের ভেদ নাই, উভয়ই সমান। সুতরাং আবার আত্মদর্শন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কর্মপরিণত বৈদান্তিক জীবন্মুক্ত। শুধু লোকসংগ্রহের জন্য তিনি সকলের মুখে হাসেন আবার দুঃখে কাঁদেন।

## অপরোক্ষানুভূতি : শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ

**মিনতি কর**

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞার উত্তরসূরী স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মচিন্তা এক অখণ্ড মানবতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা অনন্ত সত্তা থেকে ভিন্ন নয়, প্রয়োজন হল সেই বোধকে জাগ্রত করা। এই বোধকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাই একটি মহতী প্রয়াস। দেহাত্মভাবনায় পরিভাবিত চিত্তে অসীম সত্তার পরিস্ফুরণ সম্ভাবিত হয় না, এ কারণে ব্যক্তিসত্তাকে ত্যাগ করে অসীম সত্তার অভিব্যক্তির জন্য সাধনের পরিশীলন একান্তভাবে অপেক্ষিত। বিবেকানন্দের তত্ত্বদৃষ্টিতে এই সাধনার মূল কথা হল 'ত্যাগ'। 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' উপনীষদীয় এই বচনের মর্মার্থ হল অমৃতত্ব লাভের উপায় ত্যাগ। ত্যাগ শব্দের পরিষ্কৃত অর্থ হবে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অহম্ বোধের ত্যাগ, যার ফলশ্রুতি অনন্ত ও অসীমের সঙ্গে একীভাব।

সমগ্র বিশ্বে যে সত্তা চৈতন্যরূপে আনন্দরূপে, ও সত্তারূপে অভিব্যঞ্জিত হচ্ছে, সেই সত্তাই 'অহম্' বা আমি রূপে অভিব্যক্ত। ব্যক্তির বিকেন্দ্রীকরণের ফলেই আসবে মহতের অনুভূতি, তখনই দূরীভূত হবে ভেদদৃষ্টি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ, তাই এই প্রকাশ পরিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে সীমিত, আর এই পরিচ্ছিন্নতাবোধ সর্ববিধ অনর্থের কারণ। মহতী প্রচেষ্টা ও সুসংবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার ক্রমোন্মেষের ফলে অনুভূত হয়ে থাকে অসীম সত্তার সঙ্গে একীভাব। এরই নাম অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা।

ঈশোপনিষদের মন্ত্রে বলা হয়েছে এই পরিবর্তনশীল জগতে ঈশ্বর যে সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত এই পরিশীলিত ভাবনাই চরম সত্য। জাগতিক বস্তুর প্রতি সর্বতোভাবে অনাসক্তি সমন্বিত হয়ে বিষয়ভোগ করলে বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বৈরাগ্যই সত্যদৃষ্টিকে উন্মোচিত করে।

**শঙ্করমত**

আচার্য শঙ্করের মতে অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, অবাঙ্মনসগোচর আত্মা সমস্ত প্রপঞ্চের আধার বলে বর্ণিত হয়েছে। এই অখণ্ড আত্মার উপলব্ধিই হল আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। এই অনুভূতিই আমাদের চরম লক্ষ্য, যার অপর নাম তত্ত্বজ্ঞান। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নিরূপণ না করলে কোনও শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় না, এই কারণে প্রথম অনুবন্ধচতুষ্টয় সম্বন্ধে বলার অপেক্ষা থাকে।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, মেধাবী (ধারণাসমর্থ), বিদ্বান্ (বেদাদি শাস্ত্রনিপুণ), অনুকূল যুক্তিতে স্থিত পুরুষ এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-

রূপ শুদ্ধ-চৈতন্য এই শাস্ত্রের বিষয়। শ্রুতি ও প্রমাণের মধ্যে বোধ্য ও বোধকরূপ সম্বন্ধ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই প্রয়োজন যার ফলে নিঃশেষরূপে সংসারবন্ধনের সমাপ্তি হয়। প্রয়োজনই প্রবৃত্তির কারণ।

**সাধনচতুষ্টয়**

তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের জন্য সাধনচতুষ্টয়কে অঙ্গীকার করতে হয়। আত্মা নিত্য, সমস্ত বস্তু অনিত্য এভাবে যে যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় তাকে বলা হয় নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেকজ্ঞান। ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুতে যে নিস্পৃহতা তার নাম বৈরাগ্য। সুখের হেতু বলে পরিচিত অথচ বিনাশশীল ভোগ্যবস্তু কোনও বিবেকবান্ পুরুষের আসক্তির কারণ হয় না। গুটিপোকা নিজের দেহ প্রসূত সূত্রসমূহের দ্বারা বারবার নিজেকে বেষ্টন করে পরিশেষে সেই আত্মকারাগারে আবদ্ধ হয়ে যায়, সংসারী মানুষের এই গুটিপোকার মত অবস্থা স্নেহানুবন্ধের দ্বারা গ্রথিত হয়ে সে মোহপাশে আবদ্ধ হয়। নির্বেদযুক্ত পুরুষই মুক্তি লাভ করতে পারে। এই কারণে বৈরাগ্যের প্রতি যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্তব্য।

শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধি—এই ছয়টি সাধন সম্পদ। ধ্যেয় বস্তুতে একনিষ্ঠভাবে অবস্থিতিকে শম বলে। তীব্র বৈরাগ্যই এর পূর্ববর্তী অঙ্গ। বাহ্যবৃত্তির নিগ্রহকে দম বলা হয়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ফলে চিত্তে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতে যে সুখ আছে তার প্রতি আসক্তিহীন হয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিগ্রহকে উপরতি বা সন্ন্যাস বলে। সর্ববিধ দুঃখের সহনশীলতার নাম তিতিক্ষা। আগম ও আচার্যবাক্যে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা বলে। পরমার্থ সদ্বস্তু শ্রদ্ধার দ্বারা নির্ণীত হয়। চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলা হয়। চিত্তের একাগ্রতাই সিদ্ধিলাভের একমাত্র কারণ। ধৈর্যহীন যোদ্ধার যেমন অস্ত্রসম্পদ্ সফল হয় না, তেমনই যার শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন নেই তার কোটিবার বেদান্ত শ্রবণও নিষ্ফল হয়ে থাকে।

সংসারে নির্বিণ্নচিত্ত পুরুষের মধ্যে যে মুক্তির জন্য আকুলতা তাকে বলে মুমুক্ষুতা। সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মে পৌরুষ ও সদসদ্‌বিবেকও দুর্লভতর তাই পার্থিব সুখভোগে একান্ত আসক্তি মানুষকে পশুর সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করে। এর জন্য অন্তঃস্থ বন্ধন মোচন করা একান্ত কাম্য। উক্তবিধ সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুর সমীপে উপস্থিত হয়েই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে থাকে।

আলোক ব্যতীত যেমন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনই সত্যানুসন্ধান ব্যতীত অন্য সাধনের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'আমি কে', 'আমার অস্তিত্ব কি' এভাবে সমুদিত জিজ্ঞাসার নাম বিচার। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে 'আমি' বলে যে বিনিশ্চয় তার কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। দৃশ্যমান বস্তুজগতের উত্থিতির কারণও অবিদ্যা। আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের ফলশ্রুতি হল অবিদ্যার আত্যন্তিক নাশ।

**আত্মা ও দেহের ভিন্নত্ব**

শ্রুতি নির্ধারিত আত্মা এক ও অংশরহিত। অবয়ব প্রভৃতি ভেদ থাকায় দেহই অংশযুক্ত। অবিদ্যাকৃত আবরণের ফলে অজ্ঞানী ব্যক্তি দেহ ও আত্মার ঐক্য দর্শনের কারণে অনন্ত দুঃখের সম্মুখীন হয়। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ আর দেহ জড়, অন্তর্যামী আত্মা ও জড়দেহের ঐক্যদর্শনও অজ্ঞানসম্ভূত। আত্মা প্রকাশক ও স্বচ্ছ, দেহ অস্বচ্ছ ও তমোগুণযুক্ত। আত্মা নিত্য ও সৎ, দেহ অনিত্য, অসৎ ও প্রতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। শৈশবকালে, যৌবনে ও বার্ধক্যে দেহ ভেদ হলেও অনুভবিতা বা আত্মার পরিবর্তন হয় না। এই কারণে দেহ ও আত্মার ভেদ সিদ্ধান্তিত হয়। বেদান্তমতে দেহের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন পারমার্থিক ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত দেহাত্মবোধ সত্যরূপে বিদ্যমান থাকে, তখনই এর প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈক্য বিজ্ঞানের পর এই বোধের মিথ্যাত্ব অবগত হওয়া যায়।

**আত্মার স্বপ্রকাশত্ব**

বেদান্তমতে আত্মা স্বপ্রকাশ আর আত্মজ্যোতির দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমা প্রভৃতি প্রকাশশীল পদার্থ বলে পরিগণিত পদার্থের মত আত্মার প্রকাশ নয়। লৌকিক প্রকাশক পদার্থসমূহ অন্ধকারের বিরোধী হলেও আর ঐ সকল পদার্থের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাত্রিতে অন্ধকার দেখা যায়; এইজন্য লৌকিক জ্যোতিযুক্ত পদার্থসমূহের প্রকাশের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু আত্মার প্রকাশ অপরিচ্ছিন্ন।

প্রশ্ন হতে পারে সূর্য, চন্দ্রমা প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ কি স্বতন্ত্রভাবে বিষয়ের প্রকাশ করতে পারে? এর উত্তরে শঙ্করাচার্য বেদান্তকেশরীতে বলেছেন আদিত্য, চন্দ্রমা, প্রভৃতি জ্যোতি পদার্থের দ্বারা যে বিষয়ের প্রকাশ হয় না, তা বিচিত্র নয়; কারণ বিদ্বান আত্মার প্রকাশকে অপেক্ষা করেই জড় বিষয় প্রকাশিত হয়। এইজন্য জ্ঞানময় চৈতন্যরূপ আত্মাকে বিদ্যুৎপুঞ্জ, অগ্নিসঙ্ঘ প্রভৃতি প্রকাশ করতে পারে না। সূর্য, চন্দ্রমা প্রভৃতি অস্তমিত হলে বাক্ জ্যোতির দ্বারা ব্যবহার সম্পাদিত হয়; কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে একমাত্র আত্মজ্যোতির সাহায্যেই স্বপ্নকালীন বিষয় প্রকাশিত হয়ে থাকে ও সৌষুপ্তস্মরণের উপপত্তি করা যায়। এইজন্য লৌকিক জ্যোতিঃ পদার্থের অতিরিক্ত একটি আন্তর জ্যোতিঃ পদার্থ স্বীকার করতে হয়; সেই জ্যোতিপদার্থই আত্মা।

**দ্বৈতমিথ্যাত্ব**

আমি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ, আমি দেহ, ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন এই হল সত্যজ্ঞান। সর্বাত্মা, সর্বরূপ, সর্বাতীত, অব্যয় আত্মা ও দেহের ভিন্নতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে দেহের অসত্যতা নিরূপিত হয়েছে। রজ্জুতে সর্পগ্রহের মত জীবত্বও মিথ্যাজ্ঞান।

যেমন অপরিস্ফুট আলোকে রজ্জু ক্ষণমধ্যে সর্পাকারে পরিণত হয়, তেমনই এই স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ আত্মার কোনও ভাবে পরিবর্তন না হয়েও এই বিশ্ব প্রপঞ্চাকারে প্রতিভান হয়ে থাকে। জগতের উপাদান কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থের বস্তুসত্তা না থাকায় সমগ্র প্রতীয়মান প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অতিরিক্ত নয়। এই কারণে ব্রহ্ম ব্যাপক ও বিশ্ব ব্যাপ্য এইভাবে এই ব্যাপ্য ব্যাপকভাব কল্পনা করা মিথ্যা। এই তত্ত্বজ্ঞান স্থিরীকৃত হলে ভেদভাবের আর অবসর থাকে না। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই শ্রুতি ব্রহ্মে দ্বৈত প্রতিভানের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে।

এই জগৎ অনুভবগ্রাহ্য হলেও, তার ব্যবহারযোগ্যত্ব থাকলেও তার অস্তিত্ব স্বপ্নের মত। স্বাপ্নিক জগতের জ্ঞান জাগরণকালের জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হওয়ায় স্বপ্নকালীন বস্তুসমূহের অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। অনুভবগোচর সকল বস্তুকে সৎ বলা যায় না। স্বপ্নসময়ে যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় তারা জাগরণকালে থাকে না। স্বপ্নসময়ে জাগরণকাল অলীক, আর জাগরণসময়ে স্বপ্ন অলীক; সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ই অলীক। অতএব এই অবস্থাত্রয়ের অসদ্রূপতা বিচারের দ্বারা সিদ্ধ করা যায়।)

**আত্মজ্ঞানের উপায়**

শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্তে ভ্রমজ্ঞানের কারণ যে অবিদ্যা তার দূরীকরণ আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব। আত্মাকে ধ্যান করে প্রারব্ধ কর্ম করলে আর মোহ উৎপন্ন হয় না। শঙ্করাচার্য স্পষ্টভাবে বলেছেন নিত্য অভ্যাস ব্যতীত আত্মজ্ঞান হয় না, এই কারণে শ্রেয়োলাভের জন্য জিজ্ঞাসুর ব্রহ্মবিষয়ে নিদিধ্যাসন কর্তব্য। অনেক সাধনার ফলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে থাকে। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যে উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন তার বিশদ আলোচনা করেছেন, তার সারাংশ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য বিবৃত হচ্ছে।

নির্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি স্থৈর্য সম্পাদিত হয় একেই যোগ বলা হয়। যোগের আটটি অঙ্গ।

যোগ=ইন্দ্রিয়সংযম। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

নিয়ম=সজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ ও বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার। যোগদর্শনে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণধান।

আসন=স্থিরভাবে আত্মচিন্তন। চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করে অন্য সুখের নাশ।

প্রাণায়াম=ব্রহ্মভাবনায় সমস্ত বৃত্তির নিরোধ। প্রপঞ্চের নিষেধকে রেচক (শ্বাসত্যাগ) নামক বায়ু বলে। 'আমি ব্রহ্ম' এই চিন্তায় শ্বাস-গ্রহণকে পূরক, আর উক্ত ভাবনায় চিত্তের স্থৈর্যকে কুম্ভক বলে। রেচক, পূরকাদি প্রাণনিগ্রহের উপায়।

প্রত্যাহার=সমস্ত বস্তুতে আত্মদর্শনের ফলে ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে উপরতি।

ধারণা=একাগ্রতা, মন যে যে বিষয়ে গমন করে সেই সকল বিষয়ে ব্রহ্মদর্শনের ফলে মনের স্থৈর্য। অদ্বিতীয় বস্তুকে অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ধারণ।

ধ্যান='আমি ব্রহ্ম' এইভাবে অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। অর্থাৎ অদ্বিতীয় বস্তুতে মনোবৃত্তির প্রবাহ।

সমাধি=জ্ঞান। সকল বৃত্তির বিস্মরণের ফলে নির্বিকাররূপে ব্রহ্মাকারতা প্রাপ্তি। নির্বাত প্রদেশে অকম্পমান দীপশিখার মত যোগীর মনও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। লয়, বিক্ষেপ, কষায় রসাস্বাদ সমাধির চতুর্বিধ বিঘ্ন।

সমাধির প্রভাবেই অপরোক্ষানুভূতি সম্পাদিত হয়। নির্বিকল্পক সমাধিই যোগীর চরম প্রাপ্তি। এই অবস্থা প্রাপ্তির পর যোগী আর অন্য বস্তুর কামনা করেন না। ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তি ব্রহ্মানুভূতির কারণ। কার্যে কারণতা অনুস্যূত হয়, কিন্তু কারণে কার্যতা থাকে না, অতএব বিচারের দ্বারা এ কথাই সিদ্ধান্তিত হয় যে কার্যাভাবে কারণত্ব থাকে না। সুতরাং বাক্যের অগোচরে যে বস্তু তাই বিদ্যমান থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কার্যকারণভাবও ব্রহ্মে কল্পিত।

**ব্যবহারিক জগৎ**

আচার্য শঙ্কর এই প্রপঞ্চের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন। দেশ কাল, কার্য ও কারণকে নিয়ে ব্যবহার প্রচলিত হয়। মনের অস্তিত্ব যতকাল আছে এ জগৎ ততকাল বিদ্যমান। শঙ্করমতে কাম, ক্রোধ ও লোভ পাপের হেতু; অতএব মতিমান্ পুরুষের অধ্যাত্ম যোগবলে এই ত্রিবিধ হেতুর পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি ব্যক্তি ব্রহ্মকে যা অর্পণ করে তাই দান নামে অভিহিত হয়। দেবতা, অতিথিগণকে অর্পিত অন্নই অমৃতস্বরূপ অন্যথা ঐ অন্ন নিষ্ফল। যে কেবল নিজের ভোগের জন্য তৎপর সে পাপকর্ম করে। যিনি গৃহে আগত দারিদ্র্য-পীড়িত যাচক ব্যক্তিকে অন্ন দান করেন তিনিই এই সংসারে প্রকৃতপক্ষে অন্নদাতা। যে অন্নার্থী সখাকে অন্নদান করে না, সে প্রকৃত সখা হতে পারে না। বাক্য মন ও দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকে ক্লেশ না করলেই অহিংসা উৎপন্ন হয়।

যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। শঙ্করাচার্য মনীষা-পঞ্চকে বলেছেন গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত সূর্য আর চণ্ডালের ঘটে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? নিস্তরঙ্গ আনন্দরূপ প্রত্যক্‌বস্তুতে ইনি ব্রাহ্মণ ও ইনি চণ্ডাল এই ভেদভ্রমের কারণ কি? যিনি ব্রহ্ম থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত শরীরে ওতপ্রোত আমি সেই সংবিৎস্বরূপ আত্মা—এই দৃঢ় প্রজ্ঞা যাঁর আছে তিনি চণ্ডাল হোন অথবা ব্রাহ্মণ হোন তিনি আমার গুরু।

বেদান্তদর্শনের (১।৩।৯৪) অপশূদ্রপ্রকরণে বেদান্তের অধ্যয়নে অধিকার সম্বন্ধে যা বলেছেন তার দ্বারা বোঝা যায় যে, উপনীত দ্বিজেরই এই বিষয়ে অধিকার আছে। বেদাধ্যয়নের অভাবনিবন্ধন শূদ্রের অধিকার নেই। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নেই, যেহেতু

উপনয়নপূর্বক বেদাধ্যয়ন হয়ে থাকে। আর উপনয়ন বর্ণত্রয়কে বিষয় করে। যেখানে যেখানে বিদ্যার উপদেশ আছে সেস্থানে উপনয়ন-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও গুরুশুশ্রূষা-পূর্বক বিহিত হয়েছে। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে শূদ্র চতুর্থ বর্ণ একজাতি, দ্বিজাতি নয়। ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি চতুবর্ণের শ্রবণযোগ্য। সুতরাং শূদ্রের ইতিহাস পুরাণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, বেদাধ্যয়নপূর্বক অধিকার নাই। শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ। বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্। (শাঙ্করভাষ্য, সূত্র ১।৩।৩৮) অনুপনীত দ্বিজেরও ইতিহাস পুরাণের অধ্যয়নপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। ইতিহাস ও পুরাণ বেদবাক্যকে উপজীব্য করেই রচিত হয়েছে।

ফলকথা এই যে বেদাধ্যযন কথাটির অর্থ হল উপনীত আচার্যের মুখ থেকে বেদ-বাক্যের গ্রহণ। উপনয়নসংস্কার সহিত দ্বিজ স্বয়ং বেদ পাঠ করলে তাকে বেদাধ্যয়ন বলা যায় না। শূদ্রও ব্রাহ্মণপ্রমুখ হয়ে বেদান্তশ্রবণরূপ অধ্যয়ন করতে পারে, এর ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। 'জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ' শঙ্করের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে জ্ঞান কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়। জ্ঞান প্রমাণজন্য। রামানুজ প্রভৃতি আচার্যেরা শূদ্রের অনধিকার নির্দেশ করেছেন; কিন্তু শঙ্কর শ্রুতির সিদ্ধান্ত অপহ্নব না করেও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ভিন্নভাবে নিরূপণ করেছেন। যেভাবেই হোক জ্ঞানের প্রকাশে কোনও তারতম্য নেই।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' এই শ্রুতি অনুসারে গুরুই জ্ঞানদাতা। গুরু শব্দের অর্থ হল যাঁর সহায়তায় অবিদ্যারূপ গ্রন্থির দ্বারা রচিত এই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গুরুব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে সর্বদা শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট। প্রশ্নোত্তর রত্নমালিকা গ্রন্থে গুরু শিষ্য সংবাদরূপে শঙ্করাচার্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন যা লৌকিক জীবনে অনুসরণীয়।

শিষ্য—সত্য বা সাধ্য কি?

গুরু—প্রাণিগণের কল্যাণসাধন।

শিষ্য—সুখপ্রদ বস্তু কি?

গুরু—সাধুলোকের সহিত মৈত্রী।

শিষ্য—কোন বিষয়ে প্রযত্ন করা উচিত?

গুরু—বিদ্যাভ্যাসে ও দানে।

শিষ্য—অলঙ্কার কি?

গুরু—চরিত্র।

শিষ্য—সংসারে চিন্তামণির মত দুর্লভ কি?

গুরু—প্রিয়বাক্যযুক্ত দান, গর্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য আর ত্যাগসহিত ধন, এদের চতুর্ভদ্র বলে।

শিষ্য—ধর্ম কি?

গুরু—যা শিষ্টগণের কুলপরম্পরাগত।

শিষ্য—দাতা কে?

গুরু—যিনি যাচকের তৃপ্তিসাধন করেন।

শঙ্কর বারবার বলেছেন আমি অসঙ্গ, আমি ব্রহ্ম বারবার এই চিন্তার সাহায্যে ব্রহ্মবোধ উৎপন্ন হয়। সাধুসঙ্গে চিত্তস্থাপন ও দরিদ্রকে অর্থ বিতরণ করলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

শঙ্করের মতে জীব ও অবতারের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীব মায়ামোহে বশীভূত কিন্তু অবতার মায়াকে বশীভূত করে অবতীর্ণ হন। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন··· 'তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি, জাত ইব আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ'। যিনি অবতার তিনি দেহযুক্তের ন্যায় প্রতিভাত হলেও তিনি দেহাত্মবাদের অতীত।

**বিবেকানন্দের মত**

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতমতকে অন্যান্য মতের পূর্ণতা বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের ষড়দর্শনের মূল লক্ষ্য আত্মজ্ঞান তারই মধ্য দিয়ে আমরা সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হব! স্থূল বস্তু থেকেই সূক্ষ্মতত্ত্বে পেঁছিতে হয়; তাই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ থেকেই অদ্বৈতবাদে পর্যবসান হবে।

**জীবজ্ঞানে শিবসেবা**

বিভিন্ন ধর্মের যে প্রকাশ তার একটা কেন্দ্রীভূত উপাদান আছে, তা'হল এই সংসারের দুঃখ থেকে বিমুক্তি। ভারতীয় দর্শনে যে মোক্ষধর্মের কথা বলা হয় তা হল আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থিতি। এইজন্য মোক্ষ হল আমাদের লক্ষ্য। একে এক আনন্দময় অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে সংসারচক্রের আবর্তন, তার থেকে বিচ্যুত হলে আর দুঃখ থাকে না। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে আনন্দময় সত্তা বিরাজমান, তারই বিস্মরণে সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত বিভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ অবিদ্যা বা মায়া। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এই সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে ঈশ্বত্ব, সেই ঈশ্বরভাবকে জাগ্রত করার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র পরিস্ফুরিত হলেও মানুষের মধ্যেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাই মনুষ্যরূপে ঈশ্বরের আরাধনা সম্ভব। এইজন্য স্বামীজীর দৃষ্টিতে জীবজ্ঞানে শিবসেবার ধর্মটি সর্বতোভাবে প্রকট। স্বামীজী যে সেবার কথা বলেছেন তার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের চরম মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে।

জগতের সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে যখন আমার একাত্মভাব অনুভূত হবে, তখন কিভাবেই বা আমি আমাকে আঘাত করতে পারি, কার প্রতিই বা আমার ঈর্ষা বা বিদ্বেষ উদ্রিক্ত হবে? নানাত্ববোধের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ, হিংসা প্রকটিত হয়, নানাত্ববোধ বিদূরিত হলে একই আত্মা চৈতন্যময়রূপে, জ্ঞানময়রূপে আনন্দময়রূপে উদ্ভাসিত হয়। ক্ষুদ্রকায় প্রাণী থেকে মহত্তর ও উন্নততর জীবের মধ্যে আছে অনন্ত

সত্তা, শুধুমাত্র রয়েছে তার প্রকাশের তারতম্য।

**আত্মিক শক্তির বিকাশের ক্রমোন্নতি**

কৃষক তার কর্ষিত ভূমির জন্য জলাশয় জল সংগ্রহ করে, জলাশয় থেকে ক্ষেত্রে আনার প্রণালীর মধ্যে আছে জলকে আবদ্ধ করার একটি যন্ত্র, যন্ত্রটা খুলে দেওয়া মাত্রই জল তার আপনশক্তিতে বহির্গত হয়। এই শক্তি তার মধ্যে কোনও নতুন সংযোজন নয়, এ শক্তি তার অন্তর্নিহিত। প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে অনন্ত শক্তিমত্তা, অনন্ত সত্তা ও অনন্ত পবিত্রতা আছে, এই অনন্ত সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার সংযোজন পথে বাধক এই দেহ। কিন্তু যখনই এই আত্মিক বিকাশ পর্যায়ক্রমে শুরু হয়, তখনই তমোগুণ রজোগুণে আর রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়। সত্ত্বগুণের বিকাশই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। মনের পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে যা অপরিবর্তনীয়, যা অপার্থিব, যা অধ্যাত্ম তারই স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

**অধিকারী**

শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তিরূপ উপেয়ে পৌঁছবার জন্য যেমন সকল ধর্মকে স্বীকার করেছেন, বিবেকানন্দও অনুরূপ মতের পরিপোষক। তার মতে জগতের যত ধর্ম আছে তাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলে মনে না করে তাদের একে অন্যের পরিপূরক বলে গ্রহণ করা উচিত; কারণ বিভিন্ন ধর্মীয় মত হল একই চরম সত্যের বিভিন্ন দিক্। মূলীভূত সত্য এক হলেও বিভিন্ন মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার প্রকাশ ভিন্ন। অতএব এই সত্যের সন্ধানে জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত এই ত্রিবিধ-ব্যক্তির স্থান থাকা প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের কথা বলেছেন।

কর্মযোগের মধ্যে নরনারায়ণের সেবা অন্তর্নিহিত আছে। কর্মের অর্থ আত্ম-শুদ্ধি। স্বার্থহীন কর্মের দ্বারাও আত্মদর্শন হয়। অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে আমাদের অহংভাবও বিদূরিত হয়। প্রতিটি দাক্ষিণ্য প্রতিটি সহানুভূতি আমাদের পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করে। তাই ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করতে হবে।

**আত্মজ্ঞানে শ্রবণাদির উপযোগিতা**

স্বামিজীর দৃষ্টিতে গ্রন্থসম্ভূত যে বিদ্য তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা থাকলেও তাতে অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে 'আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষের জন্য শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসনের প্রয়োজন। প্রথমে আত্মবিষয়ে শ্রবণ ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার অনুধাবন করতে হয়। আমাদের জ্ঞান হবে যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞভাবে বিশ্বাসে নয়। এরপর আত্মবিষয়ে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ আত্মবিষয়ে অনবরত চিন্তনের ফলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয়। যুক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসা দিয়ে বস্তুতত্ত্বকে জানতে হয়। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যেই আত্মজ্ঞান সম্ভব। অধ্যাত্মপথে অগ্রগতির

জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কেবল বিচারের দ্বারা, শাস্ত্রপাঠের দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না, সমাধির দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

**ব্রহ্মানুভূতি**

ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার শব্দের অর্থ হবে ধ্যানের পরম্পরায় যিনি বৃহৎ ও ব্যাপক তাঁর সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার একীভাব। স্বামীজীর মতে 'সোহহম্', -সোহহম্' এই চিন্তার ফলশ্রুতি হল অপরোক্ষানুভূতি। তিনি উপনিষদের উক্তির বিশ্লেষণে বলেছেন যে 'যিনি এই প্রজাপতির ডানার রঙে, আর গোলাপের কুঁড়ির অভিব্যক্তিতে বিরাজমান, তিনিই বৃক্ষ ও প্রজাপতিতে শক্তিরূপে বর্তমান। তিনি আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, যাঁর, ছায়া মৃত্যু ও যাঁর ছায়া অমৃত। যদি আমাদের মুক্তি অর্জন করতে হয় তাহলে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে। কোনও পলায়নী মনোবৃত্তি মুক্তিলাভের পন্থা নয়। ভয়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অশুভশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, এরাই হল আমাদের মুক্তির পরিপন্থী।

আমাদের স্বকীয় প্রচেষ্টার ফলেই চিত্তগত মালিন্য দূরীভূত হতে পারে। এই প্রচেষ্টার সফলতায় আমাদের দুঃখের অবসান হয়। সকল প্রকার শক্তির অপেক্ষায় জ্ঞানের শক্তি অধিক। শারীরিক বা বস্তুজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, অজ্ঞানই দুঃখের কারণ; অন্ধকাররূপ অজ্ঞতা থেকে আলোকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আত্মিক শক্তি। মন্দ চিন্তা ও মন্দ বাক্য শ্রবণের ফলে মানুষের মন অসদ্ভাবে পূর্ণ হয়, সচেতন না থেকেও এই অসদ্ভাব তার মনকে গ্রাস করে। এই কারণে সে অসদ্ভাবের দাস হয়ে অসৎকার্য করে। কিন্তু যদি কেউ সৎ-চিন্তা প্রসূত হয়ে সৎকার্য করে তখন তার মধ্যে মহদ্ভাবের আবির্ভাব হয়, এর ফলে শুভবুদ্ধির উদয়ে সৎকার্যে প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে আমাদের মনে শুভ সংস্কারের আধান করতে হবে। শুভবুদ্ধি ও সৎকর্মের দ্বারা আত্ম-সচেতনতা সম্ভাবিত হয়ে থাকে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অনুরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়। শুভ ও অশুভভেদে বাসনা দ্বিবিধ। অশুভবিরোধী শুভবাসনারূপ শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভবাসনাকে জয় করা সম্ভব। পৌরুষ প্রযত্নের দ্বারা অশুভ মার্গে প্রচলিত বাসনাকে শুভ মার্গে যোজনা করা যুক্তিযুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত বোধের উদয় হয়ে আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা যা অবধারিত সেই শুভ বাসনার অভ্যাস করা কর্তব্য। শুভ বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে বিষয়ে অনাসক্তি আসে।

**বৈরাগ্য**

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বৈরাগ্য আমাদের মূলমন্ত্র। ঈশোপনিষদে যে ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হবে বিষয়াসক্তি রহিত হয়ে বিষয়কে গ্রহণ করা। মনের সে বহির্মুখ থেকে অন্তর্মুখীকরণ তার পথ অনাসক্তি। যোগদর্শনেও বলা

হয়েছে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন ও তার বৃত্তি নিরোধ সম্ভবপর হয়। ইন্দ্রিয়-বশ্যতা থেকে আসে বিষয়বিমুখতা। বিষয়াসক্তি অনর্থের হেতু আর বৈরাগ্য মুক্তির সোপান। এই কারণে আমাদের বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

**সমীক্ষা**

পূর্বলিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে উপনিষদের ভাবধারায় স্থিত হয়ে বিবেকানন্দ ও শঙ্করাচার্যের মতের অনেকাংশে ঐকমত্য থাকলেও উভয়ের চিন্তাধারার স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। দেশে যখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবন তখন গৌড়পাদ ও শঙ্করের অভ্যুদয়। ব্রহ্মবিদ্যা গুরু পরম্পরাক্রমে অধীত ও অধিগত হওয়া যায়, এই হল শঙ্করের মত। এই কারণে শঙ্কর প্রোক্ত অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়হীন নয় ও তা শ্রুতিযুক্তি অনুসারী হওয়ায় শঙ্কর বলেন তাঁর প্রতিপাদিত মত প্রামাণিক। শঙ্কর বৌদ্ধমতবাদকে নিরসন করেন। 'কর্মই পরম পুরুষার্থ'—ভউপাদ কুমারিল মণ্ডনমিশ্রের মতও শঙ্কর খণ্ডন করেছেন। শাক্ত, গাণপত্য ও কাপালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনাচার ছিল তার দূরীকরণ করলেও দেবতার উপাসনায় কোনও বাধা সৃষ্টি করেননি।

পরাধীন ভারতবর্ষের জনচিত্ত যখন অবসাদগ্রস্ত হতাশাজর্জরিত তখন বিবেকানন্দ এনেছিলেন নব-অভ্যুদয়ের মন্ত্র। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি সকলের প্রতি প্রযোজ্য, তাই তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে স্বামীজী পুরাতন ভাবধারাকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করলেন; তিনি চাইলেন জড়তা থেকে, মোহগ্রস্ত-ভাব থেকে মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদ তাঁর মধ্যে প্রকটিত হল মানবতা-বোধের মধ্যে দিয়ে। দরিদ্র আর্ত অবহেলিত মানুষদের জন্য তাঁর হৃদয়গত প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হয়েছিল।

শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ উভয়েরই চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। যে জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, যে জ্ঞানের পর্যবসান অনুভবে, সেই অপরোক্ষানুভূতিই সকল সাধনার লক্ষ্য। শঙ্করাচার্য আত্মজ্ঞানের জন্য শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। বিবেকানন্দের মত হল—অন্ধবিশ্বাস নয়, কিন্তু যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে বস্তুর উপলব্ধি।

শঙ্করাচার্য প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে সত্তার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। শঙ্করের মতের আলোচনায় সবই মায়া ও সবই মিথ্যা বলে সাধারণের যে ধারণা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। শঙ্করমতকে এত সরলভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। শঙ্করাচার্যের প্রকৃত বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শঙ্করমতে 'মিথ্যা' শব্দটি পারিভাষিক। মিথ্যাত্বের প্রচলিত অর্থ ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য না জানার ফলেই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যে বস্তু একটি অধিষ্ঠানে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সেই বস্তুটি ঐ অধিকরণে প্রকৃতপক্ষে নেই, তাকেই মিথ্যা বলে। এর উদাহরণ হল রজ্জুসর্প। সর্প রজ্জুতে পরিদৃষ্ট

হলেও, সর্পের অস্তিত্ব কোনওকালেই রজ্জুতে সম্ভাবিত হয় না, অথচ অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়ে থাকে। প্রশ্ন হল কখন এই সর্পজ্ঞান বিদূরিত হবে? এর উত্তর হল যখন রজ্জু (সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান) রজ্জু বলে প্রতিভাত হবে। সুতরাং ভ্রান্তির অবসানের জন্য ভ্রান্তির অধিষ্ঠানের জ্ঞান আবশ্যক। এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মে নেই, এই কারণে জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের জ্ঞান যে ভ্রমমূলক তা' বোঝা যাবে।

জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য এটা আমাদের পুঁথিগত জ্ঞান। একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগতের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হয়, এই কারণে জগৎকে ব্যবহারিক সৎ বলা হয়। ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুর পারমার্থিক সত্তা না থাকলেও ব্যবহারকালে তাদের অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে। ব্যবহারিক সত্তা থেকেই আমাদের পারমার্থিক সত্তায় যেতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সকল প্রকার সাধনের বিধান করা হয়েছে। সুতরাং জাগতিক ব্যবহারকে উপেক্ষা করা অনুচিত। সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ সমস্ত ব্যবহারকালে সৎ। পারমার্থিক জ্ঞান অদ্বৈত। তাঁর মতে শ্রুতি স্মৃতি-প্রতিপাদিত কর্মের স্থান আছে।

বিবেকানন্দও বলেছেন এই জগৎ স্বপ্নের মত; কিন্তু এই বোধ কিভাবে উৎপন্ন হবে? এরই জন্য আত্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। এর ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়। জগতের মিথ্যাজ্ঞানের নির্ণায়ক ব্রহ্মজ্ঞান আর প্রতীয়মান মিথ্যাত্বের কারণ অবিদ্যা। বিবেকানন্দ বলেছেন 'জগতের সত্তা নেই শব্দের অর্থ এর পারমার্থিক সত্তা নেই। একে অসৎ বলা যায় না, কারণ জগত প্রতীতিগম্য। বেদান্তের ঋষিরা এই অবিদ্যক জগতের ঊর্ধ্বে আরও কিছু আছে বলে স্বীকার করেন'।

গুটিপোকা তার স্বনির্মিত জালে আবদ্ধ হয়ে যায়, মানুষ তেমনিভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ। গুটিপোকা যেদিন প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে সেদিন সে তার বন্ধনমুক্তির আনন্দ অনুভব করে। অনুরূপভাবে অবিদ্যার নাশে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা যেদিন তার বৃহৎ সত্তার সঙ্গে একাত্মভাব অনুভব করে সেদিন সে চরম আনন্দ লাভ করে থাকে। যে সত্তা বহির্বিশ্বে স্ফুরিত হচ্ছে সেই সত্তাকে আপন অন্তরে অনুভব করাই অদ্বৈতভাবনা।

শঙ্কর ও বিবেকানন্দ দুজনেই আত্মদর্শনের জন্য মনঃসংযমের কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন 'মানুষের মনের শক্তির অবধি নেই, যতই সংযম অভ্যস্ত হবে ততই তার শক্তির বিবৃদ্ধি হবে'। বহির্বিষয় থেকে মনকে প্রত্যক্‌তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিবেকানন্দ রাজযোগের যম, নিয়ম প্রভৃতি আটটি সাধনের কথা বলেছেন। যম ও নিয়ম ব্যতিরেকে যোগ সম্ভব নয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়, যে কথা শঙ্করেরও অভিমত।

যে কোনও সাধনার পক্ষে অভ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধনার অন্তরায় সন্দেহ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু বিষয়ে আমাদের সর্বদাই সন্দেহ উত্থিত হয়। অভ্যাসের ফলেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। এই প্রমাণমূলে বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মায়। বিবেকানন্দের মতে প্রত্যাহার শব্দের অর্থ হল মনের শক্তির

বহির্নির্গমনে বাধা. আর তাকে ইন্দ্রিয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। এই হল পরামুক্তির অদ্বিতীয় সোপান। মনের চঞ্চল স্বভাবতা বহু সাধনার পরেই দূরীভূত হতে পারে। এইভাবে মানুষ সমাধি অবস্থায় উপনীত হয়।

শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ উভয়েই সাধনার পথে গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। শংকরের মতে শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিত সংস্কৃত মন আত্মদর্শনের কারণ। শংকর ভক্তিকে জ্ঞানের সহকারী বলেছেন। মোক্ষের সমস্ত কারণের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। 'ভজ্' ধাতুর অর্থ হবে তদাকারে আকারিত হওয়া। ভক্তি কর্মের অন্তর্ভুক্ত। শংকরের সিদ্ধান্তে কাম্যকর্মে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়, কিন্তু ফলাভিসন্ধি রহিত নিষ্কাম কর্ম চিত্তগত নির্মলতা সম্পাদন করে; যার ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সন্ন্যাস। যে কর্মের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় তাকেই প্রকৃত কর্ম বলে। শঙ্কর ব্যবহারিক জগৎ স্বীকার করেছেন বলেই কর্মের অবকাশ আছে। তিনি কর্মক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের মতে প্রতিটি কর্মই পবিত্র। যোগের দ্বারা কর্ম করলে অহংভাব থাকে না। যে যখন মনোযোগসহকারে নিজের অহংভাব বিসর্জন দিয়ে তার কর্ম সম্পাদন করে—সেই কর্ম সর্বাংশে সুন্দর। কর্মযোগের মূল কথা আসক্তিশূন্য-ভাবে কর্ম সম্পাদনা ও স্বার্থত্যাগ। যে জ্ঞানী তার কর্ম থাকে না, কারণ তার বন্ধনও নেই—আসক্তিও নেই। যতটা স্বার্থত্যাগ করা যায়, ততটা সফলতা সিদ্ধ হয়। মানুষকে প্রতিটি কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

স্বামীজীর সিদ্ধান্তে মুক্তি শব্দের অর্থ হল ভালো, মন্দ এই উভয় থেকে মুক্তি। পরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি। স্বামীজী ব্যবহারজীবনে প্রয়োগযোগ্যভাবে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন।

জাগতিক জীবনে যে সমস্ত বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়, তাকে গৌণ জ্ঞান বলা হয়। যখন আমরা সর্বব্যাপক সত্তার সঙ্গে নিজের একীভাব অনুভব করি তাকে যথার্থ জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানই অপরোক্ষাঅনুভূতি।